# প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

**অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার**
উপাচার্য

নবম পুনর্মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

# পরিচিতি

**বিষয় : ঐচ্ছিক সমাজতত্ত্ব** **সাম্মানিক স্তর**

**পাঠক্রম : পর্যায়**
**ESO - 02 : 5-8**

| | **রচনা** | **সম্পাদনা** |
|---|---|---|
| পর্যায় 5 | অধ্যাপিকা সুজাতা সেন | অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিক |
| পর্যায় 6 | ড. সুকুমার সেন | অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী |
| পর্যায় 7 | অধ্যাপক অনির্বাণ ব্যানার্জী | ড. সুকুমার সেন |
| পর্যায় 8 | অধ্যাপক সুব্রত বাগচী | অধ্যাপক প্রশান্ত রায় |

**ঘোষণা**

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

**অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়**
নিবন্ধক

# নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

**ESO – 02**

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
5


| | | | |
|---|---|---|---|
| একক | 1 | বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য | 7-22 |
| একক | 2 | ভারতীয় সমাজের বিবর্তন ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট | 23-41 |
| একক | 3 | ভারতীয় সমাজের গঠন ঃ গ্রাম সম্প্রদায় ও নগর সম্প্রদায় | 42-58 |
| একক | 4 | বর্গ ও জাতি | 59-74 |


পর্যায়
6


| | | | |
|---|---|---|---|
| একক | 5 | পরিবার | 75-94 |
| একক | 6 | বিবাহ | 95-120 |
| একক | 7 | আত্মীয়তার বন্ধন | 121-140 |

পর্যায়
7


| | | |
|---|---|---|
| একক 8 | ভারতে সামাজিক স্তরবিন্যাস | 141-177 |
| একক 9 | উপজাতীয় সমাজব্যবস্থা | 178-195 |
| একক 10 | ধর্ম ও ভারতীয় সমাজ-১ | 196-212 |
| একক 11 | ধর্ম ও ভারতীয় সমাজ-২ | 213-239 |


পর্যায়
8


| | | |
|---|---|---|
| একক 12 | সংস্কৃতকরণ | 240-250 |
| একক 13 | জনসংখ্যার বিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তন | 251-258 |
| একক 14 | সামাজিক আন্দোলন ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও লিঙ্গ বৈষম্য | 259-269 |
| একক 15 | নগরায়ণ, উন্নয়ন ও নগর পরিকল্পনা | 270-274 |
| একক 16 | সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যাবলী | 275-280 |

# একক-১ ❑ বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য

গঠন :

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ ঐক্য ও বৈচিত্র্য
    ১.৩.১ ঐক্যের অর্থ
    ১.৩.২ বৈচিত্র্যের অর্থ
১.৪ ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের প্রকৃতি
    ১.৪.১ জাতপাতগত বৈচিত্র্য
    ১.৪.২ ভাষাগত বৈচিত্র্য
    ১.৪.৩ ধর্মীয় বৈচিত্র্য
    ১.৪.৪. জাতপাতব্যবস্থা উদ্ভূত বৈচিত্র্য
১.৫ ঐক্যের স্বরূপ
    ১.৫.১ ভৌগোলিক পরিবেশ ও ঐক্য
    ১.৫.২ ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি মধ্যে ঐক্য
    ১.৫.৩ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ঐতিহ্য
১.৬ সারাংশ
১.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১.৮ উত্তরমালা
১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

## ১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ শেষে আপনি যা অনায়াসে পারবেন, তা হ'ল ঃ

- ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের বিভিন্ন রূপগুলি অনুধাবন করা।
- বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের শক্তিগুলি সম্পর্কে জানা।
- বিভিন্ন মিশ্র সংস্কৃতি ভারতে কিভাবে সহাবস্থান করতে পারছে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যা আজকের দিনে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

## ১.২ প্রস্তাবনা

আমরা জানি ভারতীয় উপমহাদেশ বহু সংস্কৃতির ধারক। এখানে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা বর্ণের মানুষের এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই সব ব্যাপারে একটি ঐক্যমতে পৌঁছানোর যথেষ্ট বাধা আছে। ধর্ম, ভাষা, অঞ্চলের ভিত্তিতে ভারতবাসীরা বিভিন্নভাবে বিভক্ত। কিন্তু এত বৈচিত্র্য এবং বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের

সবার মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য স্পষ্ট। এই সংস্কৃতির প্রবহমানতার ফলে ভারতবাসীরা শত বৈচিত্র্যের মাঝেও নিজেদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সুস্পষ্ট। এই এককে আমরা দেখব কিভাবে বৈচিত্র্যের মাঝে, বিচ্ছিন্নতার ভেতরেও ভারতীয় সমাজের ঐক্যের রূপটি পরিস্ফুট হচ্ছে, ভারতীয় সমাজ কিভাবে বিশ্বের অন্যান্য সমাজের কাছে একটি অখণ্ড শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

## ১.৩ ঐক্য ও বৈচিত্র্যের অর্থ

ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের শক্তি অন্বেষণ করার আগে আমাদের জানা দরকার সমাজে ঐক্য বলতে কী বোঝায় এবং বৈচিত্র্যই বা কি অর্থ বহন করে।

### ১.৩.১ ঐক্যের অর্থ

ঐক্য বলতে বোঝায় অখণ্ডতা বা পূর্ণতা। এই ঐক্য বা একতা যে সবসময় সমরূপতার ওপর নির্ভরশীল হবে তার কোনও অর্থ নেই। আমাদের জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। এই বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজের মধ্যে কোনও সমরূপতা নেই। কিন্তু, তাদের কর্মসম্পাদনের মধ্য দিয়ে সাধারণ অবস্থায় জীবদেহের সামগ্রিক ঐক্য বজায় থাকে। জীবদেহ তার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য অংশগুলির কাছে ঠিক একই ধরনের কাজ দাবী করে না। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐক্য সমরূপতার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, এখানে সদৃশ বা একই ধরনের কাজ সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ঐক্য স্থাপিত হয়। এই ঐক্যের ধারণা যদি আমরা সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তাহলে দেখব সামাজিক ঐক্য একটি বিশেষ সমাজের অখণ্ডতাকে নির্দেশ করে। সমাজের অংশগুলির সমরূপ কাজকর্মের ভিত্তিতে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। আবার অংশগুলির বিভিন্নতার মাঝেও ঐক্যের মূল সুরটি আমরা খুঁজে নিতে পারি। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ডুর্কহ্যাইম (Durkheim) দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন সরল সমাজে সমরূপ বা সদৃশ অংশভিত্তিক ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরনের ঐক্যকে তিনি যান্ত্রিক সংহতি অথবা mechanical solidarity হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রাচীন সমাজের গণ্ডী ভেঙ্গে যাওয়ায় সমাজ ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে এবং এই সমাজে ঐক্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন অংশ তাদের সমরূপতা হারিয়ে অসদৃশ কাজের মধ্য দিয়েই সমাজের ঐক্য ধরে রাখতে চায়। এই ঐক্যকে তিনি জৈবিক সংহতি অথবা organic solidarity বলে বর্ণনা করেছেন। আমরা একটি নকশার সাহায্যে এই ঐক্যের প্রকৃতি তুলে ধরতে পারি।

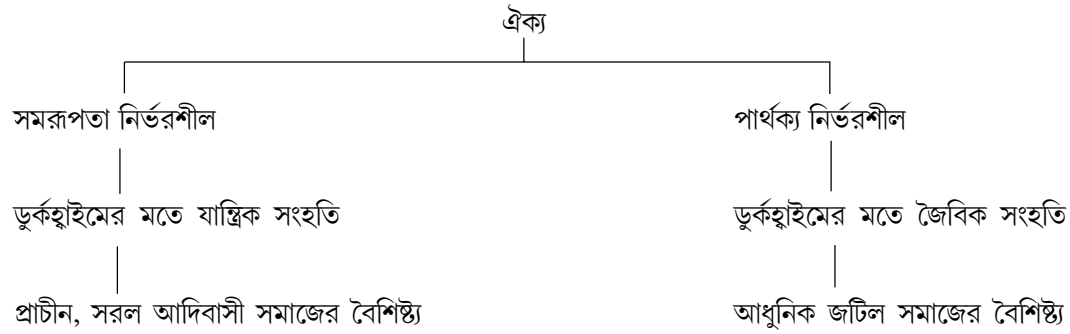

১.৫ অনুশীলনী-১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ঐক্যের অর্থ হ'ল যেখানে কোন বৈচিত্র্য নেই। ☐

(খ) ডুর্কহ্যুইমের মতে যান্ত্রিক সংহতিতে সমাজস্থ লোকেদের মধ্যে সমরূপতা খুঁজে পাওয়া যায়। ☐

(গ) সমরূপতা ঐক্যের প্রয়োজনীয় শর্ত। ☐

(ঘ) ডুর্কহ্যুইমের মতে আধুনিক জটিল সমাজ জৈবিক সংহতির ভিত্তিতে গ্রথিত। ☐

২। সমরূপতাভিত্তিক ঐক্য ও বৈচিত্র্যভিত্তিক ঐক্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কোথায়? (পাঁচ বা ছয়টি বাক্যে উত্তর দেবেন।)

## ১.৩.২ বৈচিত্র্যের অর্থ

বৈচিত্র্য বলতে সাধারণত আমরা পার্থক্য বুঝি। সমাজতত্ত্বে বৈচিত্র্য বলতে আমরা শুধু পার্থক্যকেই চিহ্নিত করি না। বৈচিত্র্য অর্থে এক্ষেত্রে আমরা এমন পার্থক্য বোঝাই, যার একটি সমষ্টিগত দিক আছে। অর্থাৎ এই সমস্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে একটি মানবগোষ্ঠী থেকে পৃথক করা যায়। আঞ্চলিক, ধর্মীয়, ভাষাগত অথবা জাতিগত পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে সমাজে বিভিন্ন সঙ্ঘ তৈরী হ'তে পারে। এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হ'ল যে ব্যক্তিগত পার্থক্য নয়, সমষ্টিগত পার্থক্য সমাজে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

সমরূপতার যেমন একটি সমষ্টিগত দিক আছে, বৈচিত্র্য অথবা অসমরূপতারও এই দিকটি বর্তমান। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে বৈচিত্র্য সমরূপতার ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। অর্থাৎ ভাষা, ধর্ম ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি সদৃশ হ'লে আমরা যেমন তাদের মধ্যে সমরূপতা আছে বলে মনে করি, সেরকম পৃথক পৃথক ভাষা, ধর্ম বা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তারা পৃথক পৃথক সঙেঘর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। সমাজে বিভিন্ন স্বার্থ সম্বলিত সঙ্ঘ তৈরী হয়। কোনও কোনও সময়ে তাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটলে তারা প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরোধিতা করে।

## অনুশীলনী-২

১। ঠিক হ'লে ☑, ভুল হ'লে ☒ চিহ্ন ব্যবহার করুন ঃ

(ক) সমষ্টিগত পার্থক্য সমাজে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। ☐

(খ) আঞ্চলিক, ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে সমাজে বিভিন্ন সঙ্ঘ তৈরী হতে পারে। ☐

(গ) বিভিন্ন সঙ্ঘগুলির মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। ☐

# ১.৪ ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের প্রকৃতি

ভারতবর্ষ নানা সংস্কৃতি, নানা ভাষা, নানা মতের কেন্দ্রস্থল। ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাজেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এত বিভেদের মধ্যে একতা বন্ধন করা মাঝে মাঝে বেশ কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থান্বেষণ বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। একদিকে বিশাল, প্রতিপত্তিশালী উচ্চশ্রেণী ও অপরদিকে সর্বহারা নিম্নজাতের ও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অবস্থান।

মধ্যবর্তী স্তরগুলি বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর দখলে। এছাড়াও ধর্ম, ভাষা, জাতি ও অঞ্চলের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতের লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্বার্থ প্রকট হয়ে পড়লেই দেশে বিচ্ছিন্নতার শক্তিগুলি জোরালো হয়ে ওঠে। আমরা এখন এই বৈচিত্র্য এবং তার ফলস্বরূপ বিরোধের সম্ভাবনাগুলি একে একে আলোচনা করব।

## ১.৪.১ জাতপাতগত বৈচিত্র্য

জাতি, বংশ এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। এই গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের মধ্যে বেশকিছু মৌলিক ব্যাপারে সাদৃশ্য থাকে। যেমন—ভাষা, পরিধান, খাদ্যরীতি ইত্যাদি। এরা নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে কোনও গোষ্ঠীতে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারে। এভাবে ভারতীয় সমাজে বিচিত্র মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি গোষ্ঠীর একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। এই গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা এক জাত, এক ভাষা, এখ সংস্কৃতি, এক বংশ এমনকি এক অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে কিছু প্রকৃত অথবা কাল্পনিক সাদৃশ্য খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, এই গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটি যদিও সব সদস্যদের মধ্যে একটি সাধারণ স্বার্থ (common interest) আছে বলে দাবী করে তথাপি প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই কিছু স্তরবিভাজন থাকে যেখানে সাধারণ স্বার্থের ধারণাটি ব্যাহত হয়। যাই হোক, আমাদের দেশে এই গোষ্ঠীগুলি নিজেদের সম্পর্কে খুব সচেতন। ভারতবর্ষ বহুজাত অধ্যুষিত দেশ এবং এখানে গোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটটি খুবই অনুভূতিপ্রবণ দিক। অনেক ক্ষেত্রেই মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে জাতপাতব্যবস্থা অথবা শ্রেণীব্যবস্থার প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলি জাতপাতব্যবস্থা ভিত্তিক হবে নাকি শ্রেণীভিত্তিক হবে সেটা গোষ্ঠীর প্রাসঙ্গিকতার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ জাতপাতব্যবস্থার ভিত্তিতে পৃথক পৃথক গোষ্ঠী তৈরী হতে পারে। যেমন—একটি বিশেষ স্থানের ব্রাহ্মণেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, গোষ্ঠী তৈরী করতে পারেন। আবার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতের লোকেরা সম্মিলিত হয়ে সঙ্ঘ গঠন করতে পারেন। এখানে তাদের জাতপাতগত (caste) সাদৃশ্য থাকবে না। কারণ, এখানে বিভিন্ন জাতের লোকেদের নিয়ে তাদের মধ্যে কোনও সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়।

একটি নির্দিষ্ট সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হতে পারে। ভারতবর্ষও বিচিত্র সম্প্রদায় নিয়ে তৈরী। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে রিসলে (Risley) জনসংখ্যা গণনার পরিদর্শক ছিলেন। তাঁর মতে, ভারতে হিন্দুদের মধ্যে অন্তত ২৩৭৮টি আসল জাত ছিল। এর মধ্যে এক-একটি জাত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় এবং সামাজিক সচলতার কারণে সংখ্যাটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জাতগুলির পাশাপাশি আরও বহু সম্প্রদায় ভারতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

বিচিত্র সম্প্রদায়গুলির স্বার্থে আঘাত লাগলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়। অনেক সময় বড় জনসংখ্যাবিশিষ্ট সম্প্রদায়গুলি জাতীয় সুবিধাসমূহ অর্জন করতে চায়। অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে মনে করে এবং এসব কারণে এদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এধরনের সাম্প্রদায়িক বিরোধ আমরা কখনও কখনও আমাদের সমাজে দেখি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোনও একটি রাজ্য থেকে কোনও লোকেরা যদি অভিবাসনের (migration) মাধ্যমে অপর একটি রাজ্যে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, তখন তাঁদের বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে অসমিয়া, হিন্দি, বাঙালী, গুজরাটি, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা একে অপরকে নিজেদের রাজ্যে বিদেশী বলে মনে করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজে বিভিন্ন অশান্তি দেখা দিতে পারে।

## অনুশীলনী-৩

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) এক গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের মধ্যে কিছু মৌলিক ব্যাপারে ——— থাকে।

(খ) সঙ্কীর্ণ স্বার্থ প্রকট হয়ে গেলে ——— শক্তি জোরালো হয়ে যায়।

(গ) রিসলের মতে ভারতে ——— মধ্যে ২৩৭৮টি জাত ছিল।

## ১.৪.২ ভাষাগত বৈচিত্র্য

মানবসমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হ'ল ভাষা, যার মাধ্যমে ব্যক্তিরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ভাষার মাধ্যমেই এক প্রজন্মের (generation) চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা অন্য প্রজন্মে আবর্তিত হয়। এক ভাষা অবলম্বী ব্যক্তিরা সেই ভাষার সংকেতগুলি বুঝতে পারেন বলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালাতে পারেন। এই সংকেতের মাধ্যমেই সামাজিকীকরণের শিক্ষা বা প্রক্রিয়া সমাজে চালু থাকে। কাজেই ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হ'তে পারে না।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ভাষার লোকের বাস। ১৯৭১-এর হিসাব অনুযায়ী ১৬৫২টি ভাষা ভারতে চালু ছিল। এর মধ্যে সবগুলির প্রচার বা ব্যবহার সমান নয়। ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত ভাষাগুলি মোটামুটি দু'টি মূল ভাষার ফসল। এই দু'টি মূল ভাষা হ'ল ইন্দো-ইউরোপীয় ও দ্রাবিড়িয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সমাজের রূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে। তাই দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে পালি ও প্রাকৃত ভাষার প্রচলন বেশী ছিল। হিন্দু সংস্কৃতিকে প্রচার করার জন্য সংস্কৃত ভাষা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। এই ইন্দো-এরিয়ান ভাষা থেকে আধুনিক অসমিয়া, বাঙলা, গুজরাটি, হিন্দি, মারাঠি, ওড়িয়া, উর্দু প্রভৃতি ভাষা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। অন্যদিকে মালয়লাম, কানাড়া, তামিল ও তেলেগু—এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবিড়িয় ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ও দ্রাবিড়িয়—এই দু'টি মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ভাষাগুলির প্রত্যেকটি থেকে আবার কিছু কিছু স্থানীয় উপভাষা তৈরী হয়েছে।

আমাদের বিশাল দেশে যতগুলি ভাষার অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে সবগুলিই সমান প্রচলিত নয়। আদিবাসীদের অনেক ভাষার প্রচলন খুবই সীমিত।

মধ্যযুগের ভারতের সংস্কৃতিতে প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উত্তরভারতে হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রাধান্য পায়। ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগুলি খুব দ্রুত সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হ'তে থাকে। অর্থাৎ, এইসব ভাষায় অনেক সাহিত্যচর্চা হয় ও ভাষাগুলি আরও পরিণত হ'তে থাকে। এইসব ভাষা এবং এর মাধ্যমে লেখা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এর ফলে, সমাজে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। সংস্কৃত ভাষার প্রচার কমে যায়। বিশেষত, উত্তরভারতে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণে এক মিশ্র সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে।

আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধানে কেবল ১৫টি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে হিন্দিভাষা ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা সবচাইতে বেশী (২৯.৬৫%)। বাংলা, তেলেগু ও মারাঠি—প্রত্যেকটি ভাষা পৃথকভাবে ৮ শতাংশ লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। তামিল ভাষা ৬.৮৭% ও উর্দুভাষা ৫.২২% লোকের মধ্যে প্রচলিত। অন্যান্য ভাষাগুলি যেমন—গুজরাটি, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাগুলির প্রত্যেকটি ৫% করে লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান ভারতবর্ষের মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যগুলি পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়েছে। তাই আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরালার বেশীরভাগ

লোকেরা তাদের নিজেদের রাজ্যের প্রধান ভাষাগুলির মাধ্যমে কথা বলে। তবে ছয়টি হিন্দিভাষাভিত্তিক রাজ্য, যেমন—বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং হরিয়ানা—এর সবগুলিতেই অধিকাংশ লোকের ভাষা হল হিন্দি।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান রাজ্যগুলি বেশ বড়। এখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের জন্য আরও ছোট রাজ্য দাবী করে এসেছে। বিহারের সাঁওতাল পরগণার ও ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা এবং বাংলা, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতে 'ঝাড়খণ্ড' নামক পৃথক রাজ্যের দাবী করে আসছে। সুদখোর ব্যবসায়ী, জমিদার ও অন্যান্য শোষকদের দীর্ঘদিনের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এরা পৃথক রাজ্য গঠন করতে চায়। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড রাজ্য বিলটি সংসদে পাস হয়েছে।

ভারতে এতগুলি ভাষা প্রচলিত থাকার ফলে অধিবাসীদের মধ্যে কোনও একটি বিশেষ ভাষার মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা অসুবিধাজনক। কাজেই যে কোনও একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্যোগকে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আমাদের দেশে ভাষা সমস্যার আর একটি মূল কারণ হ'ল ভারতবাসীদের ওপর জোর করে ইংরাজী ভাষার বোঝা চাপানো। ব্রিটিশ আমলে ইংরাজ সরকার ভারতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি শ্রেণী তৈরী করতে চেয়েছিল যাদের সাহায্যে এদেশে ইংরাজ শাসন সুদৃঢ় করা যায়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অষ্টম ধারা অনুযায়ী হিন্দি ও ইংরাজীকে যথাক্রমে রাষ্ট্রভাষা ও সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইংরাজী ভাষা এখনও পর্যন্ত সমাজে মর্যাদাজনক স্থান পাওয়ার মাধ্যম। ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে সাধারণ জনের দূরত্ব তৈরী হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় নেতারা বিভিন্ন সময়ে ইংরাজীর বদলে হিন্দি ভাষা অথবা যে কোনও রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষাকে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছেন। আবার হিন্দি ভাষাকে একক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে 'ত্রি-ভাষা' পদ্ধতি (three language formula) চালু করার চেষ্টা হয়েছে। এই তিনটি ভাষা হ'ল হিন্দি, ইংরাজী এবং অপর আর একটি আঞ্চলিক ভাষা যেমন, তামিল বা তেলেগু ইত্যাদি। আপনারা জানেন যে, দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা হিন্দি বিরোধী। হিন্দি ভাষাকে সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগকে এখানকার অধিবাসীরা (অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা) তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ১৯৬৩ সালে হিন্দি ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রতিবাদে ১৯৬৫ সালের ২৬ শে জানুয়ারী তামিলনাড়ুতে দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং ক্রমে তা অন্য অহিন্দি ভাষার রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে এই অহিন্দি ভাষার অধিবাসীদের স্বার্থে ইংরাজী ভাষাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এরপর বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনেকে মনে করেন, এই দেশীয় ভাষাগুলি চর্চার মধ্য দিয়ে ভারতের সংহতি বজায় রাখা সহজ হবে। তাঁদের মতে, উন্নতমানের আঞ্চলিক ভাষার সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজী ভাষাকে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতিদানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। কিন্তু, এক্ষেত্রেও আমাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ জাতীয় ঐক্য আনা খুব একটা সহজ হবে না; কারণ, বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মত বিনিময় করতে সক্ষম হবে না। এ থেকে বিভিন্ন ভাষার অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ভাষার বৈচিত্র্য ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য আনার পথে বাধা সৃষ্টি করে। সর্বভারতীয় কোনও ভাষা না থাকার ফলে আমাদের দেশে ভাষাভিত্তিক অনেকগুলি রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে।

এতগুলি ভাষার অস্তিত্বের কথা মাথায় রেখে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতের লোকেদের উচিত দক্ষিণ-ভারতের যে কোনও আঞ্চলিক ভাষা রপ্ত করা। তাহলে ভারতের এই দু'টি অংশে (উত্তর ও দক্ষিণ) যোগাযোগ সহজতর হবে।

জাতিব্যবস্থা ও প্রাদেশিকতা ভাষাসমস্যার সঙ্গে একত্রিত হয়ে জাতীয় সংহতির প্রশ্নটিকে আরও জটিল করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অন্ধ্রপ্রদেশে অনেক উপজাতির (subcaste) অস্তিত্ব আছে। এরা নিজেদের প্রদেশের বাইরে অন্য ভাষাভিত্তিক প্রদেশে একই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত লোকেদের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। কাজেই জাতিব্যবস্থা (caste), প্রাদেশিকতা ও ভাষার সমস্যা একই সঙ্গে সহাবস্থান করার ফলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। এই অবস্থায় ত্রিস্তর-ভাষাপদ্ধতি চালু করার পক্ষে অনেকে যুক্তি দিয়েছেন।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানবগোষ্ঠীর মত ভাষারও একটি সমষ্টিগত রূপ আছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'ভাষা'-র প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কখনও কখনও দেখা যায়, ভাষার ভিত্তিতে সমাজে স্তর নির্দেশিত হচ্ছে। আমরা সবাই জানি, ভাষা হ'ল জ্ঞান আহরণের মাধ্যম। সেই জ্ঞান যাতে কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'তে না পারে—সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার।

---

## অনুশীলনী-৪

১। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের লোকেদের মধ্যে কোন ভাষাকে কেন্দ্র করে কেন বিরোধ আছে তা লিখুন। (৫/৬টি বাক্য ব্যবহার করুন)

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ভারতের ভাষাগুলি মোটামুটি দু'টি মূল ভাষা থেকে সৃষ্ট। সেগুলি হ'ল ——— ও ———।

(খ) ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে আলাদা ——— চিহ্নিত হয়েছে।

(গ) ——— ও ——— ভাষাসমস্যার সঙ্গে একত্রিত হয়ে জাতীয় সংহতির প্রশ্নটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

(ঘ) হিন্দি ভাষাকে একক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ——— চালু করার চেষ্টা হয়েছে।

৩। সঠিক উত্তরে দাগ দিন ঃ

(ক) আমাদের দেশে হিন্দি ভাষায়/বাংলা ভাষায়/তামিল ভাষায় কথা বলার লোকের সংখ্যা সবচাইতে বেশী।

(খ) মালয়ালাম, কানাড়া, তামিল ও তেলেগু—এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবিড়িয় ভাষা/ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা।

---

## ১.৪.৩ ধর্মের বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র ধর্মের মিলনভূমি। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বাস করে। ১৯৮১ সালের আদমসুমারীতে দেখি ৮২.৬৪% শতাংশ লোক হিন্দু। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। এর পরের স্থানটি হল ইসলামধর্মের (১১.৩৫%)। পরবর্তী স্থানগুলিতে আছেন যথাক্রমে খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষেরা। এ ছাড়াও, আরও কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ভারতবর্ষের বাসিন্দা। এর সঙ্গে আদিবাসী ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও আমাদের সমাজে বাস করেন। আবার প্রতিটি ধর্মেই কিছু কিছু উপরিভাগ আছে। যেমন হিন্দুধর্মে দেখা যায় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবশ্রেণী আছে। এ ছাড়াও আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে নতুন কিছু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে প্রতিটি ধর্মেরই কিছু কিছু বিভাগ দেখা যায়।

আমাদের দেশে দুই বা আরও বেশী ধর্মের মিলনে মিশ্র ধর্ম সৃষ্টির উদাহরণ ইতিহাসে বহু দেখা যায়। যেমন, হিন্দুধর্ম ও আদিবাসীদের ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে মিলিত হয়ে একটি মিশ্র সংস্কৃতি তৈরী করেছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে কিছু সাঁওতালদের মধ্যে উচ্চজাতের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাস (M.N. Srinivas) দেখিয়েছেন, কিভাবে বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় 'সংস্কৃতায়ণ'* প্রক্রিয়া কাজ করেছে ; আবার একই আদিবাসী ধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই সংস্কৃতায়ণের প্রভাব বিভিন্ন।

অনেকে দেখিয়েছেন যে, পশ্চাৎপদ শ্রেণীর লোকেরা অনেক সময়েই খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। অনেকক্ষেত্রে আদিবাসীরা হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। অনেক হরিজন বৌদ্ধধর্মে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

সংস্কৃতে 'ধর্ম' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। মোটামুটিভাবে ব্যক্তিমানুষ এবং সমষ্টিগত সমাজে যে সকল ধ্যান-ধারণা ও আচরণগত রীতিনীতি ধারণ করে নিয়ে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রা অনুসরণ করে চলে সেই সমগ্র যৌগিক বিষয়ই ধর্মের আওতায় আসে। তাই দেখা যায়, হিন্দুধর্ম একক কোনও ধারণা বা বিশ্বাসকে অথবা এবং পূজা উপাসনা বিষয়ে সাদৃশ্যের থেকে বৈসাদৃশ্যই বেশী। এক অংশের কাছে যা অপরিহার্য অন্য এক অংশের কাছে তা গুরুত্বহীন হ'তে পারে।

ধর্মের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি ভারতে এক-একটি ধর্মের শাখাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বহু ধরনের বৈচিত্র্যের ফলে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক কোনও কোনও সময়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করে। সাম্প্রতিক কালে ভারতে (১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর) অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা এবং সমাজে তার প্রতিক্রিয়ার কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভিন্ন সমিতি ও গোষ্ঠী ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এদের প্রধান লক্ষ্য কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি করা। এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। 'হিন্দু মহাসভা', 'মুসলিম লীগ' প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি এই ধরনের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির উদাহরণ। অনেক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও বিশেষ বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মকে আশ্রয় করে বিভিন্ন বিদ্যালয় তৈরী হয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় অধিবাসীরা দেশের বিশেষ বিশেষ রাজ্যে বাস করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা মোটামুটি সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের মধ্যে অঞ্চল অনুযায়ী তাদের লোকসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য হয়। যেমন, দক্ষিণ-ভারতের তিনটি রাজ্যে (কেরালা, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ) ও উত্তর-পূর্বদিকের রাজ্যগুলিতে (নাগল্যাণ্ড, মেঘালয় ইত্যাদি) এদেশের খ্রীষ্টানরা তাদের ঘনবসতি স্থাপন করেছেন। শিখরা প্রধানত পাঞ্জাবে, বৌদ্ধরা মহারাষ্ট্রে এবং জৈনরা প্রধানত মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও গুজরাটে বসবাস করেন। এছাড়া আমাদের দেশের বিভিন্ন নগর অঞ্চলেও এদের দেখতে পাওয়া যায়।

---

## অনুশীলনী-৫

১। ভারতে প্রধানত কোন্ কোন্ ধর্মের লোক বাস করেন? (২টি বাক্যের মধ্যে উত্তর দিন)

২। ভারতের যে কোনও একটি আদিবাসীর নাম উল্লেখ করুন যার মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়।

---

* 'সংস্কৃতায়ণ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, শ্রীনিবাসের মতে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন জাতের লোকেরা বা আদিবাসীরা উচ্চ জাতের আচার, আচরণ, বিশ্বাস, জীবনধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন এবং এর ফলে কালক্রমে সেই নিম্নজাত বা আদিবাসীরা সমাজে উন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন।

৩। সঠিক উত্তরে দাগ দিন ঃ

(ক) শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—এগুলি হিন্দুধর্মের উপরিভাগ/মুসলিম ধর্মের উপরিভাগ/প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ধর্ম।

(খ) ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি আর্যদের আগমনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে/ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে/আদিবাসীদের সংস্কৃতায়ণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়াটির কথা নেহেরু/রিসলে/শ্রীনিবাস উল্লেখ করেছেন।

---

## ১.৪.৪ জাতপাতব্যবস্থা উদ্ভূত বৈচিত্র্য

জাতপাতব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের একটি অন্যতম প্রধান পরিচায়ক। জাতপাতব্যবস্থা বলতে সাধারণভাবে লোকেরা জাত ও বর্ণ এই দুটির প্রসঙ্গই তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে বিশদভাবে আমরা এই পর্যায়ের একক ১৯-এ আলোচনা করব। এখানে বর্ণ ও জাত সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

বর্ণ হ'ল কর্মের ভিত্তিতে সমাজস্থ লোকেদের মধ্যে মূল চারটি বিভাগ। এই চারটি বর্ণ হ'ল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের কাজ যথাক্রমে শিক্ষা দেওয়া, যজন-যাজন ও উপাসনা করা (ব্রাহ্মণদের কাজ); দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা (ক্ষত্রিয়দের কাজ); বাসনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করা (বৈশ্যদের কাজ); দৈহিক ও কায়িক, পরিশ্রমজনিত কাজ করা (শূদ্রদের কাজ)।

জাত হ'ল বংশের ভিত্তিতে তৈরী সামাজিক মর্যাদা-শ্রেণী যেখানে কেবল গোষ্ঠীসাপেক্ষ মধ্যে বিবাহ প্রথা (endogamy) অনুমোদিত এবং যেখানে নির্দিষ্ট একটি জাতের লোকেরা বংশানুক্রমিকভাবে একটি নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে জড়িত। ভারতবর্ষে এই রকম জাতের সংখ্যা ৩০০০-এর ওপর। এই জাতগুলি ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অঞ্চল ভিত্তিতে আমাদের সমাজে এই স্তরবিন্যাসে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একথা মনে করা ভুল যে, শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই জাতপাত প্রথা প্রচলিত আছে। জাতপাত প্রথার অস্তিত্ব অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ, সেখ, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। আবার তেলি, ধোপা, দর্জি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জাতও মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও জাতপাত আছে। ভারতে বহুক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের লোকেরা স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এইসব ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা তাঁদের পূর্বধর্মের জাতপাত প্রথা নতুন গ্রহণ করা ধর্মের মধ্যে প্রচলন করার চেষ্টা করেন। এভাবে শিখরাও জাতপাত প্রথা মেনে চলেন। এ থেকে বোঝা যায়, ভারতবর্ষে জাতপাতের বৈচিত্র্য কত বেশী।

আমরা এই এককে এতক্ষণ যে সব বৈচিত্র্য আলোচনা করলাম, সেইগুলি ছাড়াও ভারতবর্ষে আরও বহুধরনের বৈচিত্র্য দেখতে পাই; যেমন, অঞ্চলভিত্তিক বৈচিত্র্য, গ্রামজীবন ও নগরজীবন সম্পর্কিত বৈচিত্র্য, বিবাহ-প্রথা ভিত্তিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি। এই বহু বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ ভারতীয় সমাজের ঐক্যের প্রশ্নটিকে মাঝে মাঝে জটিল করে তোলে। এর পরেই আমরা দেখব এত বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়েও আমাদের সমাজের মূল স্রোতটি কিভাবে সংহতি গড়ার কাজটি করে চলেছে।

---

## অনুশীলনী-৬

১। সঠিক উত্তরে দাগ দিন ঃ

(ক) জাতিভেদ প্রথা—কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়/কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়/সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়।

(খ) জাতি প্রথায় সমজাতীয়দের মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত/সমজাতীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

(গ) বর্ণ হ'ল গায়ের রং-এর ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ/কর্মের ভিত্তিতে সমাজস্থ লোকেদের মূল চারটি বিভাগ/বংশের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ (একাধিক শব্দ ব্যবহার করতে পারেন)

(ক) ব্রাহ্মণদের কাজ ————————।

(খ) দৈহিক ও কায়িক পরিশ্রমজনিত কাজ করে ————————।

(গ) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কাজ যথাক্রমে ———————— এবং ————————।

## ১.৫ ভারতীয় সমাজে ঐক্যের স্বরূপ

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখলাম যে, ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে বহু সংস্কৃতির, বহু ধর্মের, বহু ভাষার, বহু জাতির লোকেরা বাস করেন। তাদের মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার, জীবনযাপন প্রণালী—সবের মধ্যেই বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু ঐসব আলোচনার পরেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা সবাই ভারতবাসী। শত বৈচিত্র্যের মাঝেও আমাদের মধ্যে কিছু ঐক্যের জায়গা আছে যা বিচিত্র সম্প্রদায়ের লোকেদের একটি মূল সূত্রে আবদ্ধ করেছে। সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে আমাদের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের স্বরূপটিকে আবিষ্কার করতে হবে। ১৯১১ সালের জনগণনা পরিদর্শক রিসলের (Risley) মতে, বহু কাঠামোগত ও সামাজিক বৈচিত্র্যের (ভাষাগত, প্রথাগত ও ধর্মগত) অভ্যন্তরে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত একটি ঐক্যের সুর খুঁজে পাওয়া যায়। বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনভূমি এই ভারতবর্ষ বিদেশী আক্রমণ ও শাসনের অভ্যন্তরেও তার ঐক্য বাঁচিয়ে রাখতে পেয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তর অসাম্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয় স্তরে ভারতের অখণ্ডতা বজায় থেকেছে। বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও মতামতের অস্তিত্ব ভারতকে একদিকে ধৈর্য্যশীল দেশ হিসেবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে, আর একদিকে তাকে একটি প্রাণবন্ত সংস্কৃতির বাহক হিসেবে উপস্থাপিত করেছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জাতীয়স্তরে একটি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতীয় সংবিধানে দল, মত, ভাষা, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সব অধিবাসীর জন্য মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাদের সবার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যকে আবিষ্কার করা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এই ঐক্যের স্বরূপ ও শক্তিগুলিকে আমরা এখন আলোচনা করব।

### ১.৫.১ ভৌগোলিক পরিবেশ ও ঐক্য

'সিন্ধু' বা 'ইন্দাস' কথাটি থেকে ইন্ডিয়া কথাটি এসেছে। প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে এই দেশকে ভারতখণ্ড বা জম্বুদ্বীপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র দেশটি ৩২,৮০,৪৮৩ স্কোয়ার কি.মি. এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই বিশাল ভূখণ্ডে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্য থাকলেও একটি অভ্যন্তরীণ ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও অন্য তিনদিকে সমুদ্র বেষ্টন করে রাখার ফলে এই দেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে কিছুটা রক্ষা করতে পারে। এর ফলে সমগ্র দেশের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ চীন ও তিব্বত থেকে ভারতবর্ষের সীমা বিচ্ছিন্ন হয়েছে হিমালয় পর্বতশ্রেণী দ্বারা। এই হিমালয়ের কোলে বিভিন্ন জায়গা সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই তীর্থক্ষেত্র।

অনেক পবিত্র নদী হিমালয় থেকে উৎসারিত হয়েছে। ভারতে আর্যসভ্যতা প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে হিমালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত উত্তর আফগানিস্তানকে আশ্রয় দিয়েছে। এই স্থান দিয়ে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। শৈলশহর কাশ্মীর ভূস্বর্গের নন্দন-কানন। এই অঞ্চলটি অনেক কবি এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্ম দিয়েছে। এই স্থান থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্য এশিয়াতে বিস্তারলাভ করে। উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পাশে গভীর অরণ্য, তিব্বত ও চীন দেশ থেকে ভারতকে সুরক্ষিত করছে। গাঙ্গেয় সমতলভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। গঙ্গানদী যুগ যুগ ধরে এই দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে বিরমাহীনভাবে। চলার পথে গঙ্গা জমিকে উর্বর করছে, সুজলা-সুফলা করে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবনদান করছে। সেইজন্য গঙ্গাকে এ দেশের লোকেরা দেবীজ্ঞানে পূজা করেন। গঙ্গা ছাড়াও যমুনা, চম্বল, নর্মদা, শোন প্রভৃতি নদীগুলি আমাদের দেশের মধ্য সমতলভূমির কোনও কোনও জায়গার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। উড়িষ্যায় মহানদী এবং দক্ষিণে কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীগুলি থেকে কৃষিকার্যে সাফল্য এনে দিয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বতমালা ও থর মরুভূমি আমাদের দেশকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে। দক্ষিণে বিশাল ভারত মহাসাগর থাকায় ভারতের এদিকটিও সুরক্ষিত। এভাবে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম-সবদিকই ভারতকে একটি সুবিধাজনক অবস্থা দান করেছে।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তদনুযায়ী আবহাওয়া ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র দেশে একটি বিশেষ সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্কৃতি ভারতের বিভিন্ন ভারতের বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের বোধ সঞ্চারিত করে।

রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। সমগ্র দেশকে একইভাবে চালনা করার জন্য ও শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের একটি সংবিধান এবং একটি সংসদ আছে। কাজেই, বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েও তারই মাঝে ঐক্য বন্ধনের প্রচেষ্টাও নিরন্তরভাবে চলেছে আমাদের সমাজে।

---

## অনুশীলনী-৭

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। ——— ভারতের সব অধিবাসীর জন্য মৌলিক অধিকার রক্ষার ও নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা আছে।

২। স্বাধীনতার পর থেকে ——— পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।

৩। উত্তরে ——— থেকে দক্ষিণে ——— পর্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ডের সর্বত্র একটি ঐক্যের সুর খুঁজে পাওয়া যায়।

৪। ——— নদীকে ভারতের লোকেরা দেবীজ্ঞানে পূজা করে থাকেন।

৫। উত্তরে ——— ও বাকী তিনদিকে ——— থাকার ফলে ভারতবর্ষ নিজেকে কিছুটা সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে।

---

## ১.৫.২ ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঐক্য

ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা পাশাপাশি সহাবস্থান করে আসছে। বৈচিত্র্যের মাঝেও তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ধারণ করে রাখার প্রচেষ্টা সবাইকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। আর্য ও দ্রাবিড়, হিন্দু ও মুসলমান একইসঙ্গে বসবাস করার ফলে সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে আত্তীকরণ (assimilaiton) সম্ভব হয়েছে। আমরা আগে দেখেছি বর্তমান ভারতে বহুধর্মের লোকেরা বাস করে। সামজতাত্ত্বিক শ্রীনিবাসের মতে, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে ঐক্য আনা সম্ভব হয়। হিন্দু, মুসলমান ও ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মের লোকেরা একে অপরের ধর্মীয় উৎসবে ও অনুষ্ঠানে

শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আবার সামাজিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় একধর্মের লোক তার প্রতিবেশী অন্য ধর্মের লোকের পাশে দাঁড়িয়ে ভরসা দেন। ভারতে ধর্ম ও পেশার মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পারসীকদের মদ বা সুরা জাতীয় তরলের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অর্থনৈতিক পেশার বৈচিত্র্য যেমন বাড়তে থেকেছে সেরকমই নির্দিষ্ট ধর্মের সঙ্গে নির্ধিষ্ট পেশার যোগাযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। যেমন, মুসলমানেরা কোনও নির্দিষ্ট পেশায় যুক্ত না থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিজেদেরকে নিয়োগ করছেন। সব ধর্মের লোকেরা এখন সমগ্র ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছেন। ফলে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে।

হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। বহু বিদেশীর আগমন ও আক্রমণ এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সময়ে রাজায় রাজায় যুদ্ধ সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম তার মূল সুরটি ধরে রাখতে পেরেছে। এই ঐক্যের প্রধান শক্তিটি তার ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। হিন্দু বা মুসলমান সাহিত্যে, ধর্মীয় শাস্ত্রে এই মহৎ ঐতিহ্যের (Great Tradition) উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কিছু ঐতিহ্য লোকের মুখে মুখে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে চলে—সেগুলি কোথাও লিখিত আকারে দেখা যায় না। এগুলি হ'ল ক্ষুদ্র ঐতিহ্য (Little Tradition)। এই দুই প্রকার রীতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্য প্রবাহমান হচ্ছে। হিন্দুধর্মের মধ্যে সবাইকে আশ্রয় দেওয়ার একটি গুণ আছে। এই ধর্ম জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত। কোনও বাধা একে পরিবেষ্টন করে রাখে না। মহৎ ও ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আদান-প্রদানের ফলে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি সব সময়েই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হ'তে হ'তে চলেছে। গ্রাম-সমাজ এবং আদিবাসী সমাজের আরাধ্য দেব-দেবীকেও এই ধর্ম উপযোজিত করছে। এই সহিষ্ণুতার জন্য একই সঙ্গে বহু ধর্ম বা বহু বিশ্বাস সম্পন্ন লোকেরা একত্রে অবস্থান করতে পারছেন। হিন্দুধর্মে কোনও একটি নির্দিষ্ট দেবতাকে উপাসনা করা হয় না,—বহু দেবদেবীর আরাধনা করা হয়। হিন্দুধর্ম সে অর্থে বহুদেববাদী।

ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আমাদের সমাজে তীর্থযাত্রার কথা উল্লেখ করতে পারি। ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু তীর্থস্থানের অস্তিত্ব দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বছরের বিভিন্ন সময়ে তীর্থযাত্রা করেন। এই সচলতার ফলে একটি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বন্ধন হয়। ভারতে উত্তরে কেদারবদ্রি থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর আর পূর্বে পুরী বা কামাখ্যা থেকে পশ্চিমে দ্বারকা—এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন তীর্থস্থান এবং পবিত্র নদীর অস্তিত্ব বহুযুগ ধরে এখানকার মানুষকে তীর্থভ্রমণের পিপাসা যুগিয়ে আসছে। এই তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে ধর্মচেতনা প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি মাতৃভূমির জন্য ভালবাসা বা স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেদের মধ্যে এর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটে। এইজন্য তীর্থযাত্রাকে আমরা ঐক্য বন্ধনের একটি অন্যতম সোপান হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

---

## অনুশীলনী-৮

১। সঠিক উত্তরে দাগ ☑ দিন ঃ

(ক) বংশপরম্পরায় লোকের মুখে মুখে যে ধারণা সঞ্চারিত হয় তাকে ক্ষুদ্র ঐতিহ্য বলে/প্রথা বলা হয়/আইন বলা হয়।

(খ) হিন্দুধর্ম আবর্তিত হয় এক নির্দিষ্ট দেবতাকে কেন্দ্র করে/বহু দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে/কোনও দেবতাকে কেন্দ্র না করে।

(গ) বিভিন্ন অঞ্চলে তীর্থস্থানের অস্তিত্ব ভারতবাসীদের মধ্যে সচলতা আনয়ন করে/তাদের নিজেদের অঞ্চলের প্রতি আনুগত্য তৈরী করতে সাহায্য করে।

৩। উত্তরে ——— থেকে দক্ষিণে ——— পর্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ডের সর্বত্র একটি ঐক্যের সূর খুঁজে পাওয়া যায়।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

তীর্থযাত্রা আমাদের দেশের ——— একটি অন্যতম প্রধান সোপান হিসেবে স্বীকৃত।

---

## ১.৫.৩ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ঐতিহ্য

বহু শতাব্দী ধরে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। আমরা এর আগে দেখেছি যে, জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্য এনেছে এবং এর ফলে কোনও কোনও সময়ে বিচ্ছিন্নতার শক্তিগুলি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, জাতিব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ 'যজমানি প্রথা' সমাজে ঐক্যবন্ধন করার মাধ্যমে হিসেবে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে আমরা একক-৩ (গ্রাম সম্প্রদায়) ও একক-৪ (বর্ণ ও জাতি)-এ বিস্তৃত আলোচনা করব। সংক্ষেপে এখন আমরা বলতে পারি যে, যজমানি প্রথার মাধ্যমে বৃহৎ খাদ্য-উৎপাদক জাতিভুক্ত লোকেরা তাঁদের নিজস্ব দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে অন্যান্য বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জাতির ওপর নির্ভর করেন। পরিবর্তে খাদ্য-উৎপাদকেরা বা যজমানেরা এই সমস্ত বিশেষ পেশাভিত্তিক জাতিকে খাদ্য দান করেন। প্রাচীন সমাজে সম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থাই এই যজমানি সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। এর সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক-প্রথা এবং অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই যজমানি সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণভাবে কোনও কোনও অঞ্চলের লোকেদের মূল্যবোধ ও তাদের সামাজিক জীবনযাত্রীকে প্রভাবিত করেছে। একজন খাদ্য-উৎপাদককে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ওপর নির্ভর করতে হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য, অন্যান্য বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য অপরাপর নীচু জাতিগুলির সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়; যেমন, ধোপাকে দিয়ে কাপড় কাচানো, নাপিতকে দিয়ে চুল কাটানো ইত্যাদি। এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক তাদের মধ্যে এমন ঐক্যবোধ জাগায় যে, যে কোনও সময়ে—সুদিনে বা দুর্দিনে এক জাতি অপর জাতির লোকেদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাজেই যজমানি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি জাতিই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে, প্রায় সব ধর্মের লোকেদের মধ্যেই জাতিব্যবস্থা দেখা যায়। আবার জাতিব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল যজমানি প্রথা। এই যজমানি ব্যবস্থার পারস্পরিকতার সূত্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও ঐক্যবন্ধন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ তাঁর পোশাক পরিচ্ছন্ন করার জন্য একজন মুসলমান ধোপার ওপর নির্ভর করতে পারেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ইতিহাস। এই ইতিহাসে আমরা উল্লেখ পাই যে, আমাদের মহান সম্রাট আকবর দীন-ই-ইলাহি নামে এক নতুন ধর্ম প্রচলন করেছিলেন। এর মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেরই মহৎ দিকগুলি লোকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা হয়। আবার ভারতীয় স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক শিল্পকলা, মূল্যবোধ, সামাজিক আচার আদান-প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। তার থেকে গড়ে উঠেছে সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্রের কথা মাথায় রেখে স্বাধীনতার পর আমাদের আমাদের রাষ্ট্র সংমিশ্রিত সংস্কৃতির আদর্শে ভারতের ঐক্য উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছে। জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রগুলি উন্নত করার চেষ্টা করছে। সব ধর্ম, সব জাতি ও সব ভাষার লোকেদের এখানে সমানভাবে দেখা হয়। একথা ঠিকই যে, আমাদের দেশের প্রধান দুটি ধর্ম—হিন্দু এবং মুসলমান কখনও একেবারে মিলেমিশে যেতে পারেনি; কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ই নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। কিন্তু নানক, কবীর, চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদে

এবং পরে গান্ধিজীর আদর্শে ও আধ্যাত্মচর্চায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সাথেও আমাদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রাচ্য সংস্কৃতির উদার ও সহিষ্ণু রূপটির সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন হয়। বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয়ের দানেই সমৃদ্ধ।

### অনুশীলনী-৯

**শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) জাতিব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ ——— সমাজে ঐক্যবন্ধন করার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত।

(খ) ভারতবর্ষের ইতিহাস পারস্পরিক ——— ইতিহাস।

(গ) সম্রাট আকবর ——— নামে এক নতুন ধর্ম প্রচলন করেছিলেন।

## ১.৬ সারাংশ

এই পাঠে আমরা আমাদের দেশে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যকে অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে খুঁজতে হবে সেহেতু আমরা আমাদের সমাজের বৈচিত্র্যপূর্ণ শক্তিগুলি আগে আলোচনা করেছি। তারপর এই ভিন্ন ভিন্নধর্মী শক্তিগুলির মাঝে ভারতবাসীর একতার সন্ধান করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের সমাজে ঐক্য বা সংহতির যে বুনিয়াদের কথা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে কেউ মনে করবেন না যে, আমাদের জাতীয় সংহতি গ্রন্থনার ক্ষেত্রে কোথাও কখনও কোনও সঙ্কীর্ণ স্বার্থভিত্তিক সংঘাত ঘটেনি। অনেক সময়েই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র দাঙ্গা হয়েছে যার প্রভাব সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা ও ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যার মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। কোনও কোনও সময়ে ভাষা বা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। যেমন তামিলনাড়ুর হিন্দিবিরোধী দাঙ্গা আমরা স্মরণ করতে পারি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্ত কলহ, যুদ্ধ বা দাঙ্গা কখনই দেশের মৌলিক ঐক্যকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যের বীজ সুপ্ত আছে। অনেক নতুন নতুন শক্তি এই সংস্কৃতিকে আরও পরিমার্জিত, বিস্তৃত ও আধুনিক করেছে। কিন্তু তার মধ্যে অন্তর্নিহিত সংহতির চেতনাটি কোনও অবস্থাতেই বিনষ্ট হয়নি। বৈচিত্র্যের মাঝে মিলন আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মাঝেও ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। দেশ বহিঃশত্রুর হাতে আক্রান্ত হ'লে এই ঐক্যবোধটি আমরা বুঝতে পারি। উদাহরণস্বরূপ আমরা সাম্প্রতিক কালের কার্গিলের যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের মন্ত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তি যুগিয়েছে। আপনারা এই পাঠ শেষ করে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন কিভাবে বিচ্ছিন্নতা বা বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ তার এক এবং অখণ্ড রূপটি বজায় রাখতে পেরেছে।

## ১.৭ সর্বশেষ প্রশ্নবলী

১। ডুর্কহাইম যান্ত্রিক সংহতি ও জৈবিক সংহতি বলতে কি বুঝিয়েছেন? (পাঁচ/ছয়টি বাক্য ব্যবহার করুন)

২। একটি বাক্য ব্যবহার করে ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈচিত্র্যের রূপগুলি উল্লেখ করুন।

৩। আমাদের সমাজে ঐক্যবন্ধনের সূত্রগুলি কি কি ২/৩টি বাক্যে লিখুন।

## ১.৮ উত্তরমালা

### অনুশীলনী-১

১। (ক) —— ☒ (খ) —— ☑ (গ) —— ☒ (ঘ) —— ☑

২। সমরূপতা ভিত্তিক ঐক্য—সমাজে এই ঐক্য আসে সমাজস্থ অংশগুলির একই ধরনের বা সমরূপ কর্মসম্প্রদানের মধ্য দিয়ে। ডুর্কহ্যাইম দেখিয়েছেন কিভাবে প্রাচীন সরল সমাজের মানুষেরা একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে সমাজের চাহিদা পূরণ করত ও এর মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করত। এই ধরনের ঐক্যকে তিনি 'জৈবিক ঐক্য' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বৈচিত্র্য—ঐক্য—সমাজে এই ঐক্য আসে সমাজস্থ অংশগুলির বিভিন্ন ধরনের কর্মসম্পদানের মধ্য দিয়ে। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করেন ও এর মধ্য দিয়ে সামাজিক চাহিদা তৃপ্ত হয়। সমাজে এভাবে সংহতি আসে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। একে ডুর্কহ্যাইম জৈবিক সংহতি বলে চিহ্নিত করেন।

### অনুশীলনী-২

১। (ক) —— ☑ (খ) —— ☑ (গ) —— ☒

### অনুশীলনী-৩

১। (ক) সাদৃশ্য (খ) বিভেদের (গ) হিন্দুদের

### অনুশীলনী-৪

১। উত্তর-ভারতে কয়েকটি রাজ্যে হিন্দি ভাষা ব্যবহারকারী লোকেদের বাস। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীরা হিন্দিবিরোধী। তাই হিন্দি ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতিদানের উদ্যোগকে উত্তর-ভারতের লোকেরা মেনে নিলেও দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীরা সমর্থন করেন নি। ১৯৬৫ সালে এই উদ্যোগের প্রতিবাদে তামিলনাড়ুতে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এদের উদ্যোগে ইংরাজী ভাষাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এইজন্য হিন্দি ভাষাকে সর্বস্তরে প্রচলিত করা হবে কি হবে না—এই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের লোকেদের মধ্যে বিরুদ্ধ মত আছে।

২। (ক) ইন্দো-এরিয়ান ও দ্রাবিড়িয়ান, (খ) রাজ্য, (গ) জাতিব্যবস্থা ও প্রাদেশিকতা, (ঘ) ত্রি-ভাষা পদ্ধতি।

৩। (ক) হিন্দি ভাষায়✓ (খ) দ্রাবিড়িয় ভাষা✓

### অনুশীলনী-৫

১। ভারতবর্ষ বিচিত্র ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বাস করেন।

২। সাঁওতালদের মধ্যে উচ্চ জাতের সংস্কৃতির প্রভাবে মিশ্র সংস্কৃতি তৈরী হ'তে দেখা যায়।

৩। (ক) হিন্দুধর্মের উপবিভাগ।✓ (খ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।✓ (গ) শ্রীনিবাস।✓

### অনুশীলনী-৬

১। (ক) সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়।✓

(খ) সমজাতীয়দের মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত।✓

(গ) কর্মের ভিত্তিতে সমাজস্থ লোকেদের মূল চারটি বিভাগ।✓

২। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) শিক্ষা দেওয়া, যজন-যাজন এবং উপাসনা করা।

(খ) শূদ্ররা।

(গ) দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ও ব্যবসার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।

**অনুশীলনী-৭**

১। ভারতীয় সংবিধানে (২) পঞ্চবার্ষিকী (৩) হিমালয় ও কেপকমোরিন (৪) গঙ্গা (৫) হিমালয় ও সমুদ্র।

**অনুশীলনী-৮**

১। (ক) ক্ষুদ্র ঐতিহ্য✓ (খ) বহু দেবদেবীকে কেন্দ্র করে✓ (গ) ভারতবাসীদের মধ্যে সচলতা আনয়ন করে।✓

২। ঐক্যবন্ধনের।

**অনুশীলনী-৯**

১। (ক) যজমানি প্রথা (খ) নির্ভরশীলতা (গ) দীন-ই-ইলাহি।

সর্বশেষ প্রণালী ঃ

১। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ডুর্কহ্যাইম দেখিয়েছেন প্রাচীন ও সরল আদিবাসী সমাজতান্ত্রিক সংহতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে মানুষের চাহিদা স্বল্প হওয়ায় বিভিন্ন মানুষ একই ধরনের কাজ করে থাকেন। তাঁদের কাজের সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করেই সমাজ ঐক্য খুঁজে পায়। কিন্তু তাঁর মতে, সমাজ যত আধুনিক হয় ততই তার জটিলতা বাড়ে এবং এই জটিল সমাজ তার জটিল চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছে তাঁদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ দাবী করে। এই কাজগুলি একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত থাকে বলে সব কাজগুলি সম্পন্ন হ'লে সমাজের চাহিদা পূরণ হয় ও তার ফলে সামাজিক ঐক্যবন্ধন হয়। বৈচিত্র্য বা বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে এই ধরনের ঐক্যবন্ধনকে ডুর্কহ্যাইম জৈবিক সংহতি বলে বর্ণনা করেছেন।

২। ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈচিত্র্যগুলি হ'ল জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় এবং জাতিব্যবস্থা উদ্ভূত।

৩। আমাদের দেশের ভৌগোলিক গঠন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিভিন্ন ধর্মের উদারনৈতিকতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ঐতিহ্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি যুগিয়েছে। এছাড়াও, স্বাধীনতার পর একটি সংবিধান সৃষ্টি ও একটি সংসদ গঠনের মধ্য দিয়ে সারা ভারতের অধিবাসীদের একসূত্রে গ্রথিত করার প্রচেষ্টা হয়। দেশের জাতীয় স্বার্থে আঘাত লাগলে এই ঐক্যবোধ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

## ১.৯ গ্রন্থপঞ্জী


| | | |
|---|---|---|
| Desai, A.R | : | Rural Sociology in India, Popular Prakashan, 1969 |
| Dutt, R. P. | : | India Today-Manisha, Granthalaya, 1986 |
| Sharma, K. L. | : | Indian Society, NCERT, 1990 |
| Singh, Yogendra | : | Modernization of Indian Tradition, Thomson Press (India) Limited, 1973 |

# একক-২ ❑ ভারতীয় সমাজের বিবর্তন ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

গঠন :

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ ভারতীয় সমাজ
২.৪ প্রাচীন ভারতে সমাজের চিত্র
  ২.৪.১ সিন্ধু সভ্যতা
  ২.৪.২ বৈদিক যুগের ভারতীয় সমাজ
  ২.৪.৩ বৈদিক যুগের পরবর্তী সময় ভারতীয় সমাজ
  ২.৪.৪ বর্ণাশ্রম ধর্ম
২.৫ মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ
  ২.৫.১ ইসলাম আধিপত্য
  ২.৫.২ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন
  ২.৫.৩ ইসলাম ধর্মে ব্রিটিশ প্রভাব
২.৬ আধুনিক যুগের সূচনা ঃ ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় সমাজ
  ২.৬.১ ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব
  ২.৬.২ পাশ্চাত্যায়ণ
  ২.৬.৩ নগরায়ণ ও শিল্পায়ন
  ২.৬.৪ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব
  ২.৬.৫ যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভাব
২.৭ স্বাধীন ভারত
  ২.৭.১ শিক্ষার প্রসার
  ২.৭.২ অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন
  ২.৭.৩. বর্তমান সমস্যা
২.৮ সারাংশ
২.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
২.১০ উত্তরমালা
২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

## ২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- প্রাচীন, মধ্য ও পরবর্তী সময়ে ভারতে সমাজ ও সংস্কৃতির চরিত্র কেমন ছিল।
- কোন্ কোন্ বিদেশী শক্তি আমাদের দেশে এসেছে ও তাদের প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে ও সমাজে বিভিন্ন সময়ে কি কি পরিবর্তন এসেছে।
- বর্তমান ভারতীয় সমাজের স্বরূপ কিরকম।
- বিভিন্ন বিদেশী প্রভাব সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ কিভাবে তার বিশেষত্ব বজায় রেখেছে।

## ২.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের ধারাটি যথার্থভাবে উপস্থাপিত করা একটি কঠিন কাজ। কারণ প্রাচীনকালে সংগঠিতভাবে সামাজিক ঘটনাবলীকে লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রাচীন সাহিত্য বা শাস্ত্রের কিছু কিছু তথ্য পাই, যার ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা করতে পারি। তবে সমস্যা হ'ল এই যে, এই পৌরাণিক সাহিত্য বা শাস্ত্র বিভিন্ন যুগে লেখা হয়েছে। এইসব সাহিত্যে যে সব সমাজের ছবি তুলে ধরা হয়েছে সেইসব সমাজগুলি একটি অপরটির থেকে হয়তো ৩০০০ বছর এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকতে পারে। কালের এই বিস্তর ব্যবধান থাকার ফলে বিভিন্ন সমাজের প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধে বিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হওয়ার কথা, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা এই বিভিন্ন সমাজগুলির কালের তফাৎকে অগ্রাহ্য করে প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে দেখা যায়, মহাভারতের বিভিন্ন অংশ প্রায় আট শতাব্দী ধ'রে লেখা হয়েছে।

এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পুরাণ বা শাস্ত্রের আলোচনার ওপর আমাদের অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয়। আমরা জানি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, বহু পরিবর্তনের মাঝেও আমদের সমাজে বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিকতা আছে। সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা—এই দু'টি প্রক্রিয়া সম্পর্কেই সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই পাঠে আমরা এই উদ্দেশ্যটি মনে রেখে আমাদের আলোচনা করব।

## ২.৩ ভারতীয় সমাজ

পূর্ববর্তী এককে (বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য) আমরা দেখেছি ভারতীয় সমাজ বিচিত্র জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজ সব সংস্কৃতির প্রতি তার সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। বিচিত্র সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন, উপযোজন ও আত্তিকরণের মাঝেও ভারতীয় সমাজ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে। আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিলনে ভারতীয় ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। এই সংমিশ্রণ প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি যুগ, বেদ-পরবর্তী যুগের মধ্য দিয়ে জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম ও ব্রিটিশ যুগ পার হয়ে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগেও এই ধারাবাহিকতা আমরা বজায় রাখতে পেরেছি। আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির বিচিত্র জায়গায়—ধর্ম, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য—সর্বত্রই এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়।

## ২.৪ প্রাচীন ভারতে সমাজের চিত্র

যে সব সাহিত্য বা পুঁথি থেকে ভারতের প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি সেগুলি সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষায় রচিত। এ প্রসঙ্গে বেদ, পুরাণ, মহাভারত এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন পুঁজি উল্লেখ করা যায়। এছাড়া বুদ্ধচরিত, জৈনসাহিত্য ও পালিভাষায় কিছু রচনা থেকেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি। তামিল, কানাড়া, তেলেগু, মালয়ালাম ভাষাতেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হয়। এছাড়া পারসি ও আরবি ভাষাতেও কিছু কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়। এইসব রচনা থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া যায় তা এখন আমরা একে একে আলোচনা করব।

### ২.৪.১ সিন্ধু সভ্যতা

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির একটি বিকশিত হয় ভারতে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আমরা সিন্ধু সভ্যতার কথা বলছি। এই সভ্যতা এমন এক উন্নত ধরনের সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যার প্রভাব বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাগৈতিহাসিক ও পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগকে একত্রে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম যুগটি প্রস্তর যুগ। এই যুগে আদিম মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। এরপর এল ব্রোঞ্জ যুগ এবং এই সময়ে মানুষ কৃষিকাজ আরম্ভ করল। ব্রোঞ্জ যুগ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে লৌহযুগের সূচনা হয়।

প্রথম প্রস্তর যুগে মানুষ শিকার করে খাদ্য সরবরাহ করত এবং এই কাজের জন্য নানা ধরনের পাথরের হাতিয়ার তৈরী করত। এরপর খাদ্য প্রস্তুতির জন্যও বিভিন্ন পাথরের হাতিয়ার সৃষ্টি আরম্ভ হয়। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবসমাজের আদিমতম কাল থেকে ভারতে জনবসতি বর্তমান ছিল। প্রত্নপ্রস্তর যুগে সংস্কৃতি বিকাশে দু'টি কেন্দ্রের নাম আমরা করতে পারি—উত্তরে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী সংস্কৃতি (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) এবং দক্ষিণে মাদ্রাজি সংস্কৃতি। মধ্যপ্রস্তর যুগে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হ'ল গুজরাতে লাঙঘ্নাজ বসতি। এখানকার মাটি খুঁড়ে মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগের ভারতের আদিম মানুষের জীবনপ্রণালীর অনেক নির্দশন পাওয়া গেছে। পূর্ব ভারতে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যখন নব প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছিল সেই সময়েই সিন্ধু উপত্যকায় বর্তমান ছিল ব্রোঞ্জ যুগের একটি উন্নত নগর-সভ্যতা। যাইহোক, কৃষিকাজ আবির্ভাবের সাথে সাথেই পাথরের বদলে এক নতুন ধাতুসঙ্কর ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং এই ধাতুর নাম অনুযায়ী যুগটি ব্রোঞ্জ যুগ নামে চিহ্নিত হয়। কৃষিকাজের সূচনার ফলে আদিম যুগের অবসান হয় এবং মানুষের প্রকৃতি নির্ভরশীলতা কমে যায়।

বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে দু'টি উন্নত নগর-সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। এই দু'টি জায়গায় মৃৎপাত্রের নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকার সংস্কৃতি এবং বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশের কৃষিজীবী সংস্কৃতিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান ছিল। পশ্চিম থেকে পূর্বে ১৫৫০ কিমি.-এর বেশী এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ১১০০ কি.মি.-এর বেশী অঞ্চল জুড়ে সিন্ধু সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতার নগর-পরিকল্পনা ছিল খুব উন্নতমানের। রাজপথ, রাস্তাঘাট, বাসগৃহ সবই ছিল পরিকল্পনামাফিক। রাস্তায় বৃষ্টির জল বার হওয়ার জন্য সুন্দর জল নিকাশি-ব্যবস্থা ছিল। শহরের ধনী ব্যক্তিরা প্রাসাদোপম বহুতল বাড়ীতে থাকতেন। এই গৃহগুলি পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরী এবং উন্নত ধরনের স্নানাগার ও শৌচাগার বিশিষ্ট। অপেক্ষাকৃত ছোট গৃহগুলি সাধারণ লোকেদের জন্য নির্মিত। সাধারণের ব্যবহার্য স্নানাগারগুলির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ২৩' × ৩০' × ৮'

মাপের একটি আয়তাকার জলাধারবিশিষ্ট উন্মুক্ত অঙ্গন বেষ্টন করে বহুকামরা ও বহুতল বিশিষ্ট গৃহগুলি নির্মিত হয়েছে। শস্য সঞ্চয়ের জন্য শস্যভাণ্ডার ছিল এই নগরগুলিতে।

এই সভ্যতায় ব্রোঞ্জের ব্যবহার অধিক ছিল। মহিলারা ব্রোঞ্জ নির্মিত বিভিন্ন গয়নাগাটি দিয়ে তাদের সৌন্দর্য বাড়াতেন। এছাড়া কিছু কিছু সোনা ও রূপা ব্যবহারের নির্দশনও পাওয়া যায়। যুদ্ধাস্ত্র তৈরীতে এ সময়ের মানুষেরা ব্রোঞ্জ বা অন্য কোনও ধাতু ব্যবহার করেন নি। এ থেকে মনে করা হয় প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা মোটামুটিভাবে অহিংস ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের কারিগরি ও প্রযুক্তির জ্ঞান ছিল উন্নত ধরনের। 'জ্যামিতি' ও 'জমির' সঠিক ব্যবহারের জ্ঞানও ছিল উন্নত মানের। তাঁদের উপাসনা পদ্ধতি থেকে মনে হয় এই সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির (race) লোকেদের সংমিশ্রণ হয়েছিল। তখনকার সমাজে স্তরবিন্যাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, হরপ্পা সভ্যতার আমলেই ভ্রূণাকারে ভবিষ্যতের বর্ণভিত্তিক সমাজ-কাঠামোর অস্তিত্ব ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার অবসান হয় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ভারতীয় সমাজের বিবর্তন আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজে পরিবর্তনের গতি অন্যান্য সমাজের এই গতির তুলনায় কম। এক যুগের সংস্কৃতির বিকাশ পরবর্তী যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে কিছু পরিমাণে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। সিন্ধু সভ্যতার প্রভাবও পরবর্তী লৌহযুগে বিস্তৃত হয়েছিল। স্বভাবতই ভারতীয় সমাজ তার নিজস্ব রীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

---

## অনুশীলনী-১

১। সঠিক উত্তরে দাগ দিন ঃ ☑

(ক) প্রস্তর যুগে মানুষেরা পাথরের/লোহার/তামার হাতিয়ার তৈরী করত।

(খ) সিন্ধু সভ্যতা বিশ্বের নতুন/প্রাচীন সভ্যতাগুলির অন্যতম।

(গ)সিন্ধু সভ্যতার সমাজে স্তরবিন্যাস ছিল না/ছিল।

(ঘ)মহিলারা (সিন্ধু সভ্যতায়) তামার/ব্রোঞ্জের/পাথরের অলঙ্কার ব্যবহার করতেন।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত ——— ও ——— দু'টি উন্নত নগর-সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়।

(খ) সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলিতে সাধারণের ব্যবহার্য ——— একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

(গ) এই সভ্যতায় উন্নত ধরনের ——— পরিকল্পনা ছিল।

---

## ২.৪.২ বৈদিক যুগে ভারতীয় সমাজ

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে রাশিয়া, মধ্য এশিয়া ও ইরাণ থেকে ইন্দো-আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে ও বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। পশুপালন ও কৃষিকাজকে এরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে এরা স্থায়ী কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পশুপালন থেকে স্থায়ী কৃষিব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৭০০ সাল পর্যন্ত চলে। আর্য সভ্যতা প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু, সিন্ধু সভ্যতা এর আগে বিকশিত হ'লেও সেখানে আমরা উন্নত নগরজীবনের প্রমাণ পেয়েছি।

বৈদিক সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ভারতে আর্যদের সম্পর্কে জানতে পারি। এই সমাজে কৃষি ছিল প্রধান পেশা। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্দির ও বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

মেগাস্থিনিসের ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা চালু ছিল। কিন্তু বিভিন্ন জাতির লোকেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনও মানা ছিল না। সমাজে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। মহিলাদের বেদ পড়ার অধিকার ছিল। উপনিষদের যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মহীয়সী নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ছিল। বৌদ্ধযুগে মহিলারা বেদ পড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

আর্যসমাজে যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল খুব উন্নত ধরনের। ঋগ্বেদে একশ দাঁড়বিশিষ্ট নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগে কৃষিজমি ও খনিজ সম্পদের খোঁজে সভ্যতা ক্রমশ পূর্বে বিস্তৃত হয়। এই সময়টি হল যজুর্বেদের যুগ (৭০০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এই সময়ে লোহার ব্যবহার খুব প্রচলিত ছিল এবং উন্নতমানের লোহার চাহিদাও বাড়তে থাকে। লোহার সঙ্গে তামা, রূপা, টিন প্রভৃতি ধাতুবিদ্যার চর্চাও উন্নত হয় এবং মৌর্যযুগ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে।

## ২.৪.৩ বেদ-পরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজ

আর্যরা যখন পূর্বদিকে তাদের সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন সে সময়ে আমাদের সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা 'দাস' নামে পরিচিত। পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভবও এই সময়ে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল যে, এই সময় থেকেই (খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী) মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। এ যুগের শেষদিকে চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধাতুবিদ্যা। সংকর ধাতুর উদ্ভব এই সময়েই ঘটে। এই ধাতুর নির্মিত তরবারির চাহিদা সুদূর গ্রীস পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

এই সময়ে হিন্দু সমাজ বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদান শুরু হয়।

সিন্ধু সভ্যতার প্রায় এক হাজার বছর পরে ভারতের দ্বিতীয় নগরসভ্যতা বিকশিত হয় মগধে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই সভ্যতার উত্থান মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবের সঙ্গে যুক্ত। মৌর্যযুগে শেষ মহান সম্রাট ছিলেন অশোক। এই সময়ে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষিজমির ওপর অধিকার স্থাপন করা। এযুগে বিস্তীর্ণ অঞ্চল রাষ্ট্রের অধীনে আসে এবং এর দেখাশোনার কাজে এক শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়।

ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায়, গুপ্তযুগে উত্তর-ভারতের সমাজ সবদিকেই উন্নতি লাভ করে। এ সময়ে বহু বিদ্যালয়, মন্দির ও মঠ নির্মিত হয়। পাটলিপুত্রে এরকম একটি মঠ বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বৌদ্ধ ও জৈন—এই দুই উদার ধর্মতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশলাভের ফলে সর্বধর্ম সমন্বয় সম্ভব হয়। ভারতীয় সমাজ এই সময়ে খুবই উন্নত ছিল বলে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি। এইজন্য গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়।

---

## অনুশীলনী-২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) পশুপালন থেকে ——— পরিবর্তনের প্রক্রিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০—৭০০ অব্দ পর্যন্ত চলে।

(খ) আর্যসভ্যতা প্রধানত ——— ছিল।

(গ) আর্যসমাজে মহিলাদের ——— পড়ার অধিকার ছিল।

(ঘ) আর্যসমাজে ——— বিবাহ প্রচলিত ছিল।

(ঙ) ৭০০—৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হ'ল ——— যুগ।

(চ) বেদ-পরবর্তী যুগে ভারতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ———।

(ছ) গুপ্তযুগে ——— ও ——— এই উদার ধর্মতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশের ফলে সর্বধর্ম সমন্বয় সম্ভব হয়।

২। সঠিক উত্তরে ☑ চিহ্ন দিন ঃ

(ক) আর্য সভ্যতা পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করার সময় ভারতীয় সমাজে চণ্ডাল/দাস/ব্রাহ্মণ নামে একটি নতুন শ্রেণী উদ্ভব হয়।

(খ) ঋগ্বেদে/যজুর্বেদে/অথর্ববেদে একশ দাঁড়বিশিষ্ট/নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(গ) বেদ-পরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল যে, এই সময় থেকে ব্যবসা আরম্ভ হয়/মুদ্রা প্রচলন হয়/সমাজে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়।

(ঘ) সিন্ধু সভ্যতার প্রায় এক হাজার বছর পরে ভারতের দ্বিতীয় নগরসভ্যতা বিকশিত হয় দিল্লিতে/হরপ্পাতে/মগধে।

(ঙ) সংকর ধাতুর নির্মিত তরবারির চাহিদা সুদূর মিশর/গ্রীস/সিংহল পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

---

## ২.৪.৪ বর্ণাশ্রম ধর্ম

এতক্ষণ দেখা গেল যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছিল; জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানের সব শাখাতেই এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, এই যুগের শেষদিকে বৌদ্ধ ও জৈন—এই দুই উদার ধর্মের ব্যাপ্তি কমে যায় এবং এর ফলে জাতিভেদ প্রথার পুনরুত্থান হয়।

এই সময়ের সমাজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব দায়িত্ব ও পারস্পরিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হ'ত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন দ্বারা। জাতিপ্রথার পাশাপাশি দাসপ্রথাও সমাজে চালু ছিল। দাসেরা নানা ধরনের কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে উচ্চজাতির লোকেদের সেবা করত। সামাজিক অনুশাসন বহির্ভূত কোনও কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কোনও ব্যক্তি জাতিচ্যুত হ'লে তার দাসেরও নীচে সামাজিক স্থান নির্ণয় করা হ'ত। এই স্থানের লোকেদের 'চণ্ডাল' বলা হ'ত। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার কথা মনে রেখে জাতিপ্রথাগুলিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হ'ত। পুরোহিত শ্রেণী তাঁদের নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী নানা ধরনের সামাজিক বিধি-নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করতেন।

ঋগ্বেদে উল্লেখ পাই যে, তখনকার সমাজ আর্য ও অনার্য—এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। আর্যদের মধ্যে আবার তিনটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। প্রথম গোষ্ঠী যাগযজ্ঞ, উপাসনা ইত্যাদি ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করত এবং এই গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের ব্রাহ্মণ বলা হ'ত। তাঁরা বেদ চর্চা করতেন এবং সমাজের সব গোষ্ঠীর হয়ে ধর্মপালন করতেন। এর পরের গোষ্ঠীতে ছিলেন ক্ষত্রিয়েরা। তাঁরা মূলত দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা বৈশ্য নামে পরিচিত।

পেশাগত কাজের ভিত্তিতে এই তিনটি শ্রেণীকে বর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হ'ত এবং এদের মধ্যে স্তরবিভাজন ছিল। সামাজিক স্তরের সর্বোচ্চ স্থানটিতে ব্রাহ্মণরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরের স্থান দু'টিতে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই তিনটি বর্ণ ছাড়া একটি চতুর্থ বর্ণের অস্তিত্বের কথা আমরা জানতে পারি—যার নাম শূদ্র। এই বর্ণের লোকেরা পূর্বোক্ত তিনটি বর্ণের লোকেদের সেবা করত। চতুর্বর্ণের উদ্ভব সম্পর্কে পৌরাণিক গল্পে উল্লেখ আছে যে, পরমব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। এই বর্ণনা থেকে এই চার বর্ণের সামাজিক অবস্থানের চিত্রটি পরিষ্কার হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ

করা প্রয়োজন যে, 'বর্ণ' ও 'জাতির' মধ্যে প্রভেদ আছে। কর্ম বা পেশা অনুযায়ী সমাজের মূল চারটি বিভাগকে বর্ণ বলা হয়। সাধারণভাবে সমগ্র ভারতীয় সমাজে এই বর্ণপ্রথা প্রযোজ্য। কিন্তু 'জাতি' বলতে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অঞ্চলভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি বুঝিয়ে থাকি। এই জাতির বাইরে বিবাহ নিষিদ্ধ। 'বর্ণ' ও 'জাতি' সম্পর্কে আমরা একক ৪-এ বিস্তারিত আলোচনা করব।

চারটি বর্ণের পাশাপাশি মানুষের জীবনে চারটি আশ্রমের উল্লেখও আমরা পাই। এই চারটি আশ্রম বা অবস্থান হ'ল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এই চারটি পর্যায় আসে এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের সঙ্গে সংযুক্ত কাজগুলি পৃথকভাবে তাকে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে হয়। যেমন, প্রথম আশ্রম অর্থাৎ, ব্রহ্মচর্যে ব্যক্তি শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করে। গার্হস্থ্য জীবনে ব্যক্তি বিয়ে ক'রে পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে ও পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালন করে। বাণপ্রস্থ আশ্রমে পরিবার থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা করে। সন্ন্যাস আশ্রমে ব্যক্তি সমস্ত জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। পার্থিব চিন্তা বা সুখ-দুঃখ তাকে বিচলিত করে না। মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সে কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকে।

### অনুশীলনী-৩

সঠিক উত্তরে দাগ ☑ দিন ঃ

(১) বর্ণ চিহ্নিত হ'ত—গায়ের রং অনুযায়ী/পেশা অনুযায়ী/অর্থনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী।

(২) আশ্রম ধর্মে তিনটি/চারটি/পাঁচটি আশ্রম উল্লিখিত আছে।

(৩) ব্রাহ্মণ বর্ণের কাজ হ'ল চিকিৎসা করা/যাগযজ্ঞ করা/ব্যবসা-বাণিজ্য করা।

(৪) সন্ন্যাস আশ্রমে ব্যক্তি পরিবারে প্রবেশ করে/চরিত্র গঠন করে/জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

## ২.৫ মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ

গুপ্তযুগের সুবর্ণ দিনগুলি ভারতীয় সমাজ ক্রমশ ভুলে যেতে বসেছিল। একদিকে বিদেশী মুসলমানের আক্রমণের আশঙ্কা, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই উভয় সঙ্কটে ভারত তখন ভুগছে।

### ২.৫.১ সমাজে ইসলাম আধিপত্য

অনৈক্যের সুযোগে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে ইসলামরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তর ভারতে মুসলমানদের অধীনে একটি বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পরে ভারতের দাক্ষিণাঞ্চলেও এই আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতীয় সমাজ ইসলাম সংস্কৃতির প্রভাবে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির মত দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা এত বেশী ছিল না। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে আরবের মুসলমানেরা দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। সিন্ধুপ্রদেশ ও গুজরাটে আরব মুসলমানদের আগমন হয়েছিল। কিন্তু, ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব ভারতীয় সমাজে বেশীমাত্রায় অনুভূত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে।

## ২.৫.২ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন

মুসলিম সংস্কৃতি আমাদের সমাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিবর্তন দেখা দিল।

সুফি সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দি ভাষায় লেখা প্রচলন করেন। হিন্দি ও পারসির সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার প্রসার আরম্ভ হয়। এদেশের সঙ্গীত জগতেও ইসলামিয় প্রভাব এক আলোড়ন তোলে। পারসি সঙ্গীতের প্রভাবে খেয়াল সঙ্গীতের উদ্ভব হয়। তবলা, সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের প্রচার হয়। হিন্দুধর্মকে মুসলমানধর্ম প্রভাবিত করে। মুঘল যুগে ভক্তিবাদের উদ্ভব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুসলমানধর্মের অদ্বৈতবাদ (monotheism) হিন্দু সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত করে। ভক্তি আন্দোলনের স্রোত সর্বত্রই প্রবাহিত হতে দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে এর মূল কেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধরনের ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মাধ্যমে এই ভাবধারার বাহকেরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পারস্পরিক দূরত্ব কমে যায়। গুরুনানক তাঁর বাণীর মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথাজনিত অসাম্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানেন। ভক্তিবাদের মধ্য দিয়ে কবীর মানুষের অন্তরের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। বাংলায় শ্রীচৈতন্য ভক্তিধারা নিয়ে আসেন। তুলসীদাস, সুরদাস, রামানন্দ—সবাই মানবপ্রেমের মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এর পাশাপাশি ইসলাম ও হিন্দু স্থাপত্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়। আমীর খসরু তাঁর সাহিত্যে হিন্দু সংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন ও হিন্দি ভাষায় রচিত কবিতার মধ্যে হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতির ঐক্যের ওপর আলোকপাত করেন। সম্রাট আকবর দীন-ই-ইলাহি নামক নতুন ধর্মের মাধ্যমে সব ধর্মের লোকেদের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেন।

## ২.৫.৬ ইসলাম ধর্মে ব্রিটিশ প্রভাব

ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসনকালে সর্বক্ষেত্রে যে উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল ব্রিটিশদের প্রভাবে তা বড় ধাক্কা খায়। মুসলমানেরা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের সম্মান ও ক্ষমতা হারান। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যে উদারনৈতিক ভাবধারার উল্লেখ ঘটেছিল তা আবার প্রাচীন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন আমরা মুসলমান ধর্মের উদারনৈতিক ভাবধারার ঢেউ দেখি, তেমনই অন্যদিকে এই ধর্মে কিছু সংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়। এইসব বিশ্বাসের ফলশ্রুতি হিসেবে স্বাধীন ভারত থেকে পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে পরে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

---

## অনুশীলনী-৪

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব ভারতীয় সমাজে বেশীমাত্রায় অনুভূত হয় ——— শতাব্দীতে।

(খ) গুপ্তযুগের সুবর্ণ দিনগুলি অবসান হওয়ার পর একদিকে ——— আক্রমণের আশঙ্কা, অন্যদিকে দেশের মধ্যে রাজ্যগুলির ——— এই উভয় সঙ্কটে ভারত তখন ভুগছে।

(গ) দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে ——— দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল।

(ঘ) বাংলায় ——— ভক্তিধারা আনলেন।

(ঙ) মুঘল যুগে ——— উদ্ভব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

(চ) ভক্তি আন্দোলনের ফলে ——— মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব কমে যায়।

(ছ) ভারতে ইসলাম আধিপত্য ———— প্রভাবে বড় ধাক্কা খায়।

(জ) আকবর ———— নামক নতুন ধর্মের মাধ্যমে সব ধর্মের লোকেদের কাছাকাছি আনেন।

## ২.৬ আধুনিক যুগের সূচনা ঃ ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় সমাজ

ভারতীয় সমাজে আধুনিক যুগের সূচনা হয় ব্রিটিশরা ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করার সময় থেকে (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে (মুঘল সাম্রাজ্যের শেষদিকে) অযোধ্যা মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়। তাদের সাম্রাজ্য কেবল দিল্লি-আগ্রা এলাকার মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ে। মুঘলদের কাছ থেকে একসময় ইউরোপীয়রা ব্যবসার সুবিধা আদায় করেছিল। তাই অষ্টাদশ শতকে তারা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে নিজেদের সুবিধা আদায়ের জন্য ইউরোপীয়দের সাহায্যপ্রার্থী হয়। এরই সুযোগ নিয়ে প্রথমে ইংরেজদের সঙ্গে অন্যরা এবং পরে ইংরেজরা এদেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হয়।

আমরা আগে আলোচনা করেছি মুঘল যুগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হয়েছিল। দুই সংস্কৃতির লোকেরা পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটি সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ তৈরী করেছিল। কিন্তু ভারতে গ্রামসমাজে যে কঠোর বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা চালু ছিল তার মূল এত দৃঢ় ছিল যে তাতে এই উদার সংস্কৃতির কোনও প্রভাব পড়েনি। ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালেও এই জাতিব্যবস্থা ও শ্রেণীব্যবস্থা খুব দৃঢ়ভাবে গ্রামসমাজের বুকে অধিষ্ঠিত ছিল। ভারতের অধিবাসীদের কোনও জাতীয় সচেতনতা (National consciousness) ছিল না। কোনও ব্যক্তির পরিচিতি তার জাত, পরিবার বা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই অবস্থায় ব্রিচিটশরা আমাদের দেশ শাসন আরম্ভ করে। তাদের শাসনকালে ভারতীয় সমাজের চিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়। কার্ল মার্ক্স দেখিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী সব বিজেতাদের থেকে ইংরেজ বিজেতাদের প্রধান পার্থক্য হ'ল এই যে, পূর্ববর্তী বিজেতারা ভারতীয় সমাজের মূল কাঠামোটি সেভাবে পরিবর্তিত করতে পারেনি। কিন্তু ইংরাজরা এই কাঠামোটিতে আঘাত হানে। ফলে সমাজে বিস্তর পরিবর্তন আসে।

### ২.৬.১ ভারতীয় সমাজে ইংরেজ শাসনের প্রভাব

ভারতীয় সমাজে ইংরেজদের আগমনের সময় থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে প্রধানত তিনটি ঘটনা থেকে। প্রথমত, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা এদেশের এতকালের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ব্রিটিশরা ভারতের সম্পদ আহরণ করে নিজ মাতৃভূমিতে পাঠানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল। ভারত জয় করার সময় থেকেই তারা এদেশের সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করা শুরু করে। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। ভারতের অধিবাসীরা নিঃস্ব হয়ে যায় এবং ভারত ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টান মিশনারিরা এদেশের লোকেদের কুসংস্কার দূর করার জন্য (এবং ইংরেজরা নিজেদের শাসন সুদৃঢ় করতে ভারতীয়দের সাহায্য পাওয়ার আশায়) নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এদেশের লোকেদের ধর্মান্তর করার উদ্যোগ নেন এবং তখন বহু ভারতীয় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেন।

ব্রিটিশরা এভাবে নিজেদের অজান্তেই শিক্ষাব্যবস্থা ও তার সঙ্গে যুক্ত উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা মারফৎ পরোক্ষে ভারতবাসীদের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় এবং ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজতাত্ত্বিক যোগেন্দ্র সিং দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক দিক থেকে এই সংযোগটি প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক—এই দু'টি সংস্কৃতির

সংযোগ। পাশ্চাত্য মূল্যবোধের পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে পারেনি। প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন আরও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও সমূহ পরিবর্তন দেখা যায়।

## ২.৬.২. পাশ্চাত্যায়ণ

আমরা দেখলাম ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় সমাজ পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য দুনিয়ার ঢেউ-এর আগমন ও তার ফলে আমাদের সমাজের পরিবর্তনের প্রক্রিযাকে সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাস পাশ্চাত্যায়ণ বা Westernization বলে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্যায়ণ প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের খাদ্য, বস্ত্র, জীবনাদর্শ, অভ্যাস, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আমাদের সমাজের কিছু লোক সরাসরি ব্রিটিশ প্রভাবের সংস্পর্শে আসে এবং বিদেশী শাসনের প্রথম সুযোগ-সুবিধাগুলি আদায় করে। কিছু লোক আবার এই প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য জনসাধারণ ব্রিটিশদের কলাকৌশলগুলি পরোক্ষভাবে জানতে পারে। কাজেই পাশ্চাত্যায়ণের প্রক্রিয়া ভারতীয় সমাজের এক এক স্তরকে এক এক ভাবে প্রভাবিত করে।

পাশ্চাত্যায়ণের ফলে আমাদের সমাজে উদারনৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটে। শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে, আইন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এবং আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের সর্বত্র পাশ্চাত্য চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটে। এই নতুন দিগন্তের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকীকরণেৰ প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের এতদিনকার ঐতিহ্যবাহী চেতনা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক যোগেন্দ্র সিং দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্যায়ণের প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। প্রথমত, ব্রিটিশরা সমগ্র ভারতবাসীর জন্য একটি সাধারণ বিচারব্যবস্থা চালু করেন। দ্বিতীয়ত, সিং-এর মতে, শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পাশ্চাত্যায়ণের প্রক্রিয়া প্রভূত সাহায্য করে। তৃতীয়ত, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। চতুর্থত, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবসথা উন্নত হয়। সবশেষে তিনি দেখান যে, ব্রিটিশদের স্বার্থে পাশ্চাত্যায়ণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হ'লেও এই প্রক্রিয়া ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং এই বোধ পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

প্রথমদিকে পাশ্চাত্য ধারণাগুলি ভারতে বড় নগরগুলির উচ্চ মধ্যবিত্তদের কেবল প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজী ভাষায় ভারতীয়দের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শ রোপণ করতে চাইছিল। এ ছাড়াও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের সাহায্যে তারা এদেশের কিছু কিছু রক্ষণশীল পুরনো প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজে পুরনো সনাতন ধারণাগুলি নতুন ভাবধারাকে ঠিকমত গ্রহণ করতে না পারায় সেখান সংঘাত ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষণশীল সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই বাধাদানের চেষ্টা করে। তাই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ভারতের সব অংশ থেকে সমান স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যায়নি। এখনও পর্যন্ত গ্রামে সাধারণ গরীব সমাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা কম। কাজেই অনেক সময় পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতির বিরোধ বাধে। কিন্তু বিশেষতঃ সমাজের প্রবর শ্রেণীতে—উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আমাদের দেশজ সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়।

## অনুশীলনী-৫

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) খ্রীষ্টান মিশনারিরা এদেশের লোকেদের ——— ঘটানোর চেষ্টা করেন।

(খ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ———— খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) কার্ল মার্ক্সের মতে, ইংরেজরা ভারতীয় সমাজের মূল ——— আঘাত হানে। ফলে সমাজে বিস্তর —— আসে।

(ঘ) ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ——— সাহায্যপ্রার্থী হয়।

(ঙ) ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে ——— ও শ্রেণীব্যবস্থা খুব দৃঢ়ভাবে সমাজের বুকে অধিষ্ঠিত ছিল।

(চ) ইংরেজ শাসনে ——— ফলে আমাদের সমাজে উদারনৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটে।

(ছ) ——— মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শ রোপণ করতে চাইছিল।

২। ঠিক ☑ অথবা ভুল ☒ চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) পাশ্চাত্যায়ণের ফলে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রক্রিয়া কোনভাবেই প্রভাবিত হয় নি।

(খ) ব্রিটিশরা নিজেদের অজান্তে শিক্ষাব্যবস্থা ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যবস্থা মারফৎ পরোক্ষে ভারতবাসীদের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

(গ) ভারতীয় সমাজে আধুনিক যুগের সূচনা হয় ব্রিটিশরা ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠিত করার সময় থেকে।

(ঘ) পাশ্চাত্যায়ণের প্রক্রিয়া ভারতীয় সমাজের সর্বত্রই একই রকম প্রভাব ফেলে।

(ঙ) এদেশের লোকেদের মনে পুরনো সংস্কারের বীজ রোপণ উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান মিশনারিরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠন স্থাপন করেন।

(চ) সমগ্র ভারতবাসীর জন্য ইংরাজরা একটি সাধারণ বিচারব্যবস্থা চালু করেন।

## ২.৬.৩ নগরায়ণ ও শিল্পায়ন

আমরা আগেই দেখেছি যে, ইংরাজরা এদেশে আসার ফলে প্রযুক্তিবিদ্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। এর ফলে বড় বড় শহরগুলিতে শিল্পের বিকাশ ও উন্নতি হয়। আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। শহরগুলি বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই শিল্পকেন্দ্রগুলি গ্রামের লোকেদের জীবিকার জন্য হাতছানি দেয়। কাজেই শিল্পায়নের পাশাপাশি নগরায়ণের প্রক্রিয়াও তার কাজ শুরু করে দেয়। (একক ৩-তে আমরা দেখব যে, নগরায়ণের প্রক্রিয়া ভারতে নতুন নয়। তবুও বলা যায়, শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের নগরায়ণের এক নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়।) নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ভারতের সর্বত্র একই গতিতে হয়নি। কোনও অঞ্চলে এই গতি খুব দ্রুত, কোথাও সে তুলনায় ধীরে হয়েছে। কোথাও আবার এর প্রভাব সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। জাতিভেদ প্রথাবিশিষ্ট রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে ইংরেজ শাসনের ফলে যে সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, তার মধ্যে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ সম্পর্কে একক ৩-তে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

## ২.৬.৪ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব

ইংরাজ শাসনকালে ভারতে শিক্ষার জগতে আমূল পরিবর্তন আসে। ব্রিটিশরা আসার আগে এদেশে শিক্ষার প্রসার সেভাবে দেখা যায়নি। ইংরাজী ভাষার প্রসারকল্পে ম্যাককুলের নীতি (১৮৩৫ খ্রীঃ), ১৮৮২ সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন স্থাপন এবং এর পাশাপাশি খ্রীষ্টান মিশনারিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস—এইসব ঘটনাগুলি ব্রিটিশ যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব ফেলতে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশ শিক্ষানীতি ভারতকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে, বর্তমান ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাতেও সেই ছাপ থেকে গেছে। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা ও মূল্যবোধের মূলে দারুণ আঘাত হানে। ফলে এদেশের সংস্কৃতিতে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং সমাজের সর্বত্র তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজরা এদেশে নিজেদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করে। এর সুযোগ-সুবিধাগুলি ভারতের লোকেরা ভোগ করতে পেরেছিল। রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অথবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন মূল্যবোধ ভিত্তিক চিন্তা বা মতাদর্শ সমগ্র ভারতবাসীর মনে দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলে। আমাদের দেশের এই মনীষীরা জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি তত্ত্বগুলি পাশ্চাত্যের কাছ থেকেই গ্রহণ করেন। কাজেই পাশ্চাত্যের উদার শিক্ষার পরিবেশে আমাদের আদর্শ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং এই চেতনাই আবার বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে।

## ২.৬.৫ যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভাব

যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে যাতায়াত ব্যবস্থা, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, ডাক ও তার ব্যবস্থা—সবই বোঝায়। ইংরেজরা এদেশে আসার পরেই নিজেদের শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। এতদিনকার সনাতন গ্রামকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের ফলে দূর দূর এলাকাগুলি পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসার সুযোগ পায়। এছাড়া সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও চিঠি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা, বেতার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তন হওয়াতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে আধুনিক মূল্যবোধের সংস্পর্শে এসে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ও সংস্কারাচ্ছন্ন অনেক প্রথাই পরিবর্তিত হয়। সামাজিক সচলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। একজন ব্যক্তি তার গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে বা শহরে যাওয়ার সময়ে তার দৈহিক সচলতার সঙ্গে সঙ্গে এতদিনকার অভ্যাস বা সংস্কারকেও অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত করে। জাতীয়তাবাদী আদর্শ বা ভাবধারা সব ভারতবাসীর মধ্যে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

## অনুশীলনী-৬

১। ঠিক ☑ অথবা ভুল ☒ চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) ইংরেজরা এদেশে আসার পর উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে ভারতের শহরগুলি বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়।

(খ) শিল্পকেন্দ্রগুলি ভারতের গ্রামের লোকেদের কোনওভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি।

(গ) নগরায়ণ বা শিল্পায়ন ভারতে সর্বত্র একই গতিতে সঙ্ঘটিত হয়।

(ঘ) ব্রিটিশ শিক্ষানীতি ভারতীয় সমাজকে মোটেই প্রভাবিত করেনি।

(ঙ) পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও চেতনা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হ'তে সাহায্য করে।
(চ) এদেশে আসার পরেই ইংরেজরা নিজেদের শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ভারতবাসীর মধ্যে ———— আদর্শ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।
(খ) ———— উন্নতির ফলে দূর দূর এলাকাগুলি পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসার সুযোগ পায়।
(গ) আমাদের দেশের মনীষীরা জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি তত্ত্বগুলি ———— কাছ থেকেই গ্রহণ করেন।

## ২.৭ স্বাধীন ভারত

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। ইংরেজ ভারত ছাড়ে, কিন্তু এদেশের মানুষের মনে তার বপন করা উদারনৈতিক চেতনা বা যুক্তিবাদী ভাবধারা বিনষ্ট করা সম্ভব হয়নি। ইংরেজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে স্বাধীন ভারতে নতুন রাষ্ট্র গঠন করার সঙ্কল্প নেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক কাঠামো অনুযায়ী ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ভারতীয় সংবিধান গঠিত হয়। এখানে সব জাতের, সব ধর্মের, সব ভাষার লোকেদের সমান অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কোনও বিশেষ ধর্ম বা জাতির প্রাধান্য এখানে মেনে নেওয়া হয়নি। বিচারব্যবস্থাতেও কোনও শ্রেণী-ভেদাভেদ নেই। আইনের চোখে সব নাগরিক সমান। জন্মসূত্রে অর্জিত পরিচিতির ভিত্তিতে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। কেবল তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর লোকেদের জন্য কিছু সুযোগ বা সুবিধা দেওয়া হয়, যাতে তারা তাদের অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠে ভারতীয় সমাজের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সমাজে নারী ও পুরুষ এখন সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার এখন স্বীকৃত (১৯৫৫ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী)। বহু মহিলাই এখন পরিবারের গণ্ডীর বাইরের জগৎকে চিনতে শিখেছেন।

### ২.৭.১ শিক্ষার প্রসার

ইংরেজদের দেখানো পথ অনুযায়ী আমাদের দেশে শিক্ষার সচেতনতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ব্যাপারে জনমানসে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাকে উৎসাহদানের জন্য স্বাধীন ভারতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। বহু রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হচ্ছে। শিক্ষার বিভিন্ন শাখা খুলে তাকে জীবনমুখী ও বাস্তববাদী করার প্রচেষ্টা চলছে। দেশে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়ে থাকাকালেই ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী ও হিন্দি ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাতেও শিক্ষাদান করা হচ্ছে, যাতে বিভিন্ন রাজ্যের লোকেদের মধ্যে যোগাযোগও রক্ষা করা যায় আবার নিজেদের মাতৃভাষার ঐতিহ্যকেও সমৃদ্ধ করা যায়। এখন গ্রামাঞ্চলেও অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া শিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ তৈরী হওয়ায় ও যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের পছন্দমত প্রতিষ্ঠানে জীবিকা সংস্থান সম্পর্কিত শিক্ষাগ্রহণের চেষ্টা করছে। এতে বেকারত্ব রোধের রাস্তাও তৈরী হচ্ছে। এখন ডাকযোগে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুফল আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন। বহু মানুষের সামনে এখন শিক্ষার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের সামনে এমন এক জগৎকে নিয়ে এসেছে যেখানে আমাদর পুরনোর আদর্শগুলি অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। আমরা এখন সব ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে চাইছি। শিক্ষার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। আমাদের সমাজে এখন বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রায়োগিক শিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও বয়স্ক অশিক্ষিতদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ত্রিভাষা-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের প্রায় সর্বত্রই চালু হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসার মাঝেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখনও পর্যন্ত ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য আমরা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিনি। নতুন নতুন মূল্যবোধ বা আদর্শ আমাদের পুরোনো ঐতিহ্যের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে একটি মিশ্র সংস্কৃতি তৈরী করেছে।

---

## অনুশীলনী-৭

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ভারতীয় সংবিধানে গঠিত হয় ——— সালের ———।

(খ) এখন ভারতবর্ষে আইনের চোখে সবাই ————।

(গ) ভারতীয় সংবিধানে সব জাতের, সব ধর্মের, সব ভাষার লোকেদের ——— অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) বহু রাজ্যে ——— প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

(ঙ) এখন ——— শিক্ষাদান করা হচ্ছে যাতে বিভিন্ন রাজ্যের লোকেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় আবার নিজেদের মাতৃভাষার ঐতিহ্যকেও সমৃদ্ধ করা যায়।

(চ) নতুন নতুন মূল্যবোধ বা আদর্শ আমাদের পুরোনো ঐতিহ্যের সাথে ——— হ'য়ে একটি ——— সংস্কৃতি তৈরী করেছে।

---

## ২.৭.২ অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন

আমরা এর আগের এককে (একক ১) দেখেছি যে, আমাদের দেশ বহু ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। স্বাধীনতার পর ভাষার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ করা হয়। এই প্রতিটি রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু সাদৃশ্যও আছে। বিভিন্ন রাজ্যগুলি পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল থেকে জাতীয় ঐক্যের বোধটি শক্তিশালী করে। আমরা আগের এককে (একক ১) আলোচনা করেছি কিভাবে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মাঝেও ভারতবাসীরা তাদের সাংস্কৃতিক এবং সে অর্থেই জাতীয় সংহতি রক্ষা করে চলেছে।

স্বাধীন ভারতে রাজতন্ত্র ও জমিদারি প্রথার অবসান হয়েছে। ভূমিসংস্কার আন্দোলনের ফলে সবুজ বিপ্লব হয়ে আমাদের দেশ আগের তুলনায় অনেক স্বয়ম্ভর হ'তে পেরেছে।

ভারত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। বর্তমানে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে। এছাড়াও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রামের জনজীবন উন্নত হয়েছে। তারা নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও দাবী নিজেরাই কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে পারছে। নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন মহিলাদের সম্পত্তির অধিকারও আইনগতভাবে স্বীকৃত।

### ২.৭.৩ বর্তমান সমস্যা

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ এখনও বহু সমস্যায় জর্জরিত। দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ধর্ম বা জাতির ঊর্ধ্বে আমরা উঠতে পারছি না। বিবাহের ক্ষেত্রে পণপ্রথা একটি গভীর সমস্যা হিসেবে এখনও বর্তমান। সমাজে মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই দেশের বেশীরভাগ বিত্ত কুক্ষিগত। সাধারণ ও দরিদ্র লোকেদের চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। দেশ বেকার সমস্যায় আচ্ছন্ন। অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও যুবকেরা জীবিকার সন্ধান পাচ্ছেন না। পুরুষ ও মহিলার সমান অধিকারের কথা আইন স্বীকৃত হ'লেও বাস্তবে সমাজের বহু ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক কম সুযোগ পাচ্ছেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বহু ব্যবস্থা নেওয়া হ'লেও এখনও গ্রামের নিরক্ষর মানুষ স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদাসীন। শিক্ষার প্রসারও প্রয়োজনের তুলনায় কম। এর সঙ্গেই সম্পর্কিত ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা। জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি আমাদের সমাজে কি ধরনের ভয়াবহতা ডেকে আনতে পারে সে সম্পর্কে গ্রামের অনুন্নত, দরিদ্র, নিরক্ষর লোকেদের কোনও সচেতনতা নেই। সর্বোপরি, দারিদ্র্য ভারতীয় সমাজের প্রধান সমস্যা; দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্যাও দূর করা যাবে না। বিভিন্ন সমস্যায় জড়িত আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য বর্তমান সামাজিক কাঠামোর রদবদলের প্রয়োজন।

---

### অনুশীলনী-৮

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ——— আন্দোলনের ফলে সবুজবিপ্লব হয়ে আমাদের দেশ আগের তুলনায় অনেক স্বয়ম্ভর হ'তে পেরেছে।

(খ) ——— ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে।

(গ) দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ——— বা ——————— ঊর্ধ্বে আমরা উঠতে পারছি না।

(ঘ) ——————— ভারতে মানুষের প্রধান সমস্যা।

(ঙ) দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে অন্যান্য ——— সমস্যাও দূর করা যাবে না।

(চ) স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বহু ব্যবস্থা নেওয়া হ'লেও এখনও ——————— নিরক্ষর মানুষ স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদাসীন।

---

## ২.৮ সারাংশ

---

আমরা এই এককে দেখলাম যে, প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ কিভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিবর্তিত হচ্ছে। এই বিবর্তনের প্রক্রিয়া এখনও চলছে। প্রাচীন যুগে সিন্ধু সভ্যতার সময়ে আমরা উন্নত নগর-ব্যবস্থার নিদর্শন পাই। বৈদিক যুগে সভ্যতা মূলত গ্রামকেন্দ্রিক ছিল। আর্যরা এদেশে আসার পর বর্ণাশ্রম প্রথা চালু হয়। এরপর মধ্যযুগে ভক্তিবাদী আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন ধর্মের নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় সমাজে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের স্বরূপ আমরা খুঁজে পাই। কিন্তু, আপনারা দেখেছেন ইংরেজরা এদেশে আসার পর আমাদের সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং এই সময় থেকেই ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। খ্রীষ্টান মিশনারিরা এদেশে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল

উদারনৈতিক। ধর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতীয় সমাজ উদার পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। সমাজের সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় সমাজে ইংরেজ শাসনের কিছু সদর্থক ভূমিকা আছে। তাঁদের মতে, ইংরেজরা নিজেদের শাসন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এমন কিছু পরিবর্তন এ সমাজে নিয়ে আসেন যার ফলে ভারতবাসীরা উপকৃত হয়। যেমন—উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি। আমরা আলোচনা করেছি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা কিভাবে এদেশের নগরায়ণ, শিল্পায়ন, শিক্ষাব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থায় তার প্রভাব ফেলেছে। সর্বোপরি, পাশ্চাত্য জীবনবোধের সংস্পর্শে ভারতে জাতীয় ঐক্যবোধের উন্মেষ ঘটে এবং সামাজিক—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়।

ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় ভারতে বিদেশী শাসনের অবসান হয়। স্বাধীন ভারত তার নতুন সংবিধান তৈরী করে। কিন্তু আমাদের সমাজ গঠনে আমরা পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন আইন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখনও ভারত তার নিজস্ব বহুবিধ সমস্যা দূর করার পথে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

আপনি জানেন, সমাজ কখনই এক জায়গায় থেমে থাকে না—বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলে। ভারতীয় সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন যুগ থেকে ভারতীয় সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এক যুগ থেকে অন্য যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন। বর্তমানেও ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আমাদের সমাজে প্রভাব ফেলেছে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের প্রাচীন মূল্যবোধ বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হ'তে হ'তে চলেছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের চেহারাও পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু এ'সব পরিবর্তন সত্ত্বেও কিছু মূল জায়গায় ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় আছে। নানা বৈচিত্র্য নানা বিভেদ সত্ত্বেও ভারতবাসীরা জাতীয় স্তরে নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে আপনি কিছুদিন আগেকার (১৯৯৯ জুন-জুলাই) কারগিলের ঘটনা স্মরণ করতে পারেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বহু ভারতীয় যোদ্ধা তাদের জীবন দান করেছেন, বহু নির্ভীক সেনা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে লড়াই চালিয়ে গেছেন। নিজেদের মধ্যে ধর্ম-জাত-ভাষার ব্যবধান ভুলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। এই সংহতি সব ভারতবাসীকে একটি জাতি হিসেবে এগিয়ে চলার পথে প্রেরণা যোগাচ্ছে।

## ২.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

পাঁচ/ছয়টি বাক্য ব্যবহার ক'রে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(১) প্রাচীন যুগের ভারতীয় সমাজের কি চিত্র পান?

(২) বর্ণাশ্রম ধর্ম বলতে কী বোঝায়?

(৩) স্বাধীনতার পর ভারতীয় সমাজে কি কি পরিবর্তন দেখা যায়?

(৪) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে কি ধরনের পরিবর্তন আনে?

(৫) ভক্তিবাদের মূল ভাবধারা বা আদর্শ কি?

(৬) ভারতীয় সমাজে বর্তমানে প্রধান সমস্যাগুলি কি?

## ২.১০ উত্তরমালা

**অনুশীলনী—১**

১। (ক) পাথরের (খ) প্রাচীন (গ) ছিল (ঘ) ব্রোঞ্জ

২। (ক) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে (খ) স্নানাগারগুলির (গ) নগর

**অনুশীলনী—২**

১। (ক) স্থায়ী কৃষিব্যবস্থায় (খ) গ্রামকেন্দ্রিক (গ) বেদ (ঘ) বিধবা (ঙ) যজুর্বেদের (চ) ধাতুবিদ্যা (ছ) বৌদ্ধ ও জৈন

২। (ক) দাস (খ) ঋগ্বেদে (গ) মুদ্রাপ্রচলন হয় (ঘ) মগধের (ঙ) গ্রীস

**অনুশীলনী—৩**

(১) পেশা অনুযায়ী (২) চারটি (৩) যাগযজ্ঞ করা (৪) জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে

**অনুশীলনী—৪**

(ক) দ্বাদশ শতাব্দীতে (খ) মুসলমান; অন্তর্দ্বন্দ্ব (গ) আরব মুসলমানেরা (ঘ) শ্রীচৈতন্য (ঙ) ভক্তিবাদের (চ) হিন্দু-মুসলমানের (ছ) ব্রিটিশদের (জ) দীন-ই-ইলাহি

**অনুশীলনী—৫**

১। (ক) ধর্মান্তর (খ) ১৮৮৫ (গ) কাঠামোটিতে ; পরিবর্তন (ঘ) ইউরোপীয়দের (ঙ) জাতিব্যবস্থা (চ) পাশ্চাত্যায়ণের (ছ) শিক্ষাব্যবস্থার

২। (ক) ☒ (খ) ☑ (গ) ☑ (ঘ) ☒ (ঙ) ☑ (চ) ☑

**অনুশীলনী—৬**

১। (ক) ☑ (খ) ☒ (গ) ☒ (ঘ) ☒ (ঙ) ☑ (চ) ☑

২। (ক) জাতীয়তাবাদী (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থার (গ) পাশ্চাত্যের

**অনুশীলনী—৭**

(ক) ১৯৫০, ২৬ শে জানুয়ারী (খ) সমান (গ) সমান (ঘ) বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক (ঙ) ত্রিভাষাভিত্তিক (চ) সংমিশ্রিত; মিশ্র

**অনুশীলনী—৮**

(ক) ভূমি-সংস্কার (খ) পঞ্চায়েত (গ) ধর্ম; জাতি (ঘ) দারিদ্র্য (ঙ) আনুষঙ্গিক (চ) গ্রামের

### সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

১। সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষায় রচিত বিভিন্ন পুঁথি থেকে প্রাচীন যুগের ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে দু'টি উন্নত নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতার নগর-পরিকল্পনা খুবই উঁচু মানের ছিল এবং এখানে কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে সমাজ প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক ছিল। বেদ-পরবর্তী যুগে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার প্রায় এক হাজার বছর পরে মৌর্যযুগে মগধে দ্বিতীয় নগরসভ্যতা বিকশিত হয়। গুপ্তযুগে ভারতীয় সমাজ সবক্ষেত্রেই চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

২। প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হ'ত। বর্ণ অর্থাৎ পেশা অনুযায়ী আর্যদের সময়ে ভারতীয় সমাজ চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ ও উপাসনা করতেন; ক্ষত্রিয়রা

দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন ও আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন; বৈশ্য বর্ণের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ করতেন। এই তিনটি বর্ণ ছাড়া একটি চতুর্থ বর্ণ ছিল যার নাম শূদ্র। শূদ্ররা উপরোক্ত তিনটি বর্ণকে সেবা করত। সামাজিক স্তরের সর্বোচ্চ স্থানে ব্রাহ্মণরা, তারপর ক্ষত্রিয়রা, এরপর বৈশ্যরা এবং সর্বনিম্নস্থানে শূদ্ররা অধিষ্ঠিত ছিল। চার বর্ণের পাশাপাশি চার আশ্রমের কথাও আমরা জানতে পারি। প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্যে মানুষ নিজেদের চরিত্র গঠন করে ; এরপর গার্হস্থ্য জীবনে ব্যক্তি পরিবার গঠন করে তার দায়দায়িত্ব পালন করে। বাণপ্রস্থ আশ্রমে ব্যক্তি সমস্ত জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। উপরোক্ত বর্ণ ও আশ্রমকে একত্রিত করে আমরা বর্ণাশ্রম ধর্মের সম্পর্কে জানতে পারি।

৩। স্বাধীন ভারতে নতুন সংবিধান অনুযায়ী সব জাতের, সব ধর্মের, সব ভাষার লোকেদের সমান অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। মহিলারা এখন সম্পত্তির অধিকারী। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর ভাষার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ করা হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন আনার চেষ্টা চলছে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে এবং পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি-সংস্কারের নানা সুফল আমরা পাচ্ছি। পুরনো জমিদারি প্রথা অবসান হয়েছে।

৪। ইংরেজরা এদেশে আসার পরেই নিজেদের শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। এর ফলে দূর দূর এলাকাগুলি পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসার সুযোগ পায়। এছাড়া সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও চিঠি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা বেতার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তন হওয়াতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ সহজসাধ্য হয়। আন্তর্জাতিক স্তরেও যোগাযোগ সম্ভব হয়। যোগাযোগের ফলে আধুনিক মূল্যবোধের সংস্পর্শে এসে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সমাজের অনেক প্রথা ও আচার পরিবর্তিত হয়। সামাজিক সচলতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

৫। ভক্তিবাদের উদ্ভব ভারতীয় সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ভাবধারার বাহকেরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, এর ফলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পারস্পরিক দূরত্ব কমে যায়। ভক্তিবাদীরা, যেমন গুরুনানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য—সবাই মানবপ্রেমের মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং ভক্তিবাদের মূল আদর্শ হ'ল মানবজাতির মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে সবার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।

৬। ভারতীয় সমাজ বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। সাধারণ নির্বাচনের সময় দেখা যায় যে, বহু ক্ষেত্রেই আমরা ধর্ম বা জাতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারছি না। বিবাহের ক্ষেত্রে পণপ্রথা একটি গভীর সমস্যা হিসেবে এখনও বর্তমান। সমাজে সাধারণ ও দরিদ্র লোকেদের চরম হতাশায় দিন কাটাতে হয়—মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই দেশের বেশীরভাগ বিত্ত কুক্ষিগত। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও যুবকেরা জীবিকার সন্ধান পাচ্ছেন না, দেশের বেকার সমস্যাও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। লোকেদের স্বাস্থ্য সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি, নারীরা এখনও সব ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন নি। শিক্ষার প্রসারও প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং এর সঙ্গেই জড়িত রয়েছে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা। সবশেষে বলা যায়, দারিদ্র্য হ'ল ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সমাজের অন্যান্য সমস্যাগুলি।

## ২.১১ গ্রন্থপঞ্জী


Bose, N.K. : The Structure of Hindu Society, Orient Longman, 1975

Hunter, W.W. : The Indian Empire : Its Peoples, History and Products, Orient Longman

Sharma, K.L. : Indian Society, NCERT, 1990

কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোনগার্দ-লেভিন গ্রিগোরি কতোভ্স্কি (অনুবাদ ঃ চট্টোপাধ্যায় ও শর্মা) ভারতবর্ষের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রগতি প্রকাশন-১৯৮২

# একক-৩ ❑ ভারতীয় সমাজের গঠন ঃ গ্রামসম্প্রদায় ও নগরসম্প্রদায়

গঠন :

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ ভারতীয় সমাজের কাঠামো ঃ গ্রামজীবন ও নগরজীবন
৩.৩.১ ভারতীয় গ্রামের রূপ
৩.৩.২ গ্রামীণ ঐক্য
৩.৩.৩. গ্রামগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
৩.৩.৪. গ্রামসমাজে পরিবর্তন—মার্ক্সের মত
৩.৩.৫. স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতের গ্রামসমাজ
৩.৪ ভারতের নগরজীবন
৩.৪.১ প্রাচীন ভারতে নগর
৩.৪.২ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের নগর
৩.৪.৩ নগরের ক্রমবিস্তার
৩.৪.৪. নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য
৩.৪.৫. ভারতীয় সমাজজীবনে নগরায়ণের প্রভাব ঃ পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে এর পার্থক্য
৩.৫ গ্রাম ও নগরজীবনের ধারাবাহিকতা ঃ ভারতীয় সমাজ
৩.৬ সারাংশ
৩.৭ সর্বশেষ প্রণালী
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী
৩.৯ উত্তরমালা

## ৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠশেষে আপনি যা সহজেই বুঝতে পারবেন ঃ

- ভারতীয় সমাজের গঠন।
- ভারতীয় গ্রামসমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি।
- গ্রামসংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা।
- নগরজীবনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি।
- ভারতে নগরায়ণের প্রকৃতি।
- ভারতীয় সমাজে গ্রাম ও নগরজীবনের মূল্যবোধের পাশাপাশি সহাবস্থান।

## ৩.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে (একক-২) আমরা ভারতীয় সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। এবারে আমরা ভারতীয় সমাজের গঠনের দিকে তাকাবার চেষ্টা করব।

ভারতীয় সমাজের ছবি সম্পূর্ণ করতে গেলে গ্রামজীবন ও নগরজীবন—উভয় সম্পর্কেই সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ জানতে গেলে কেবল ভারতীয় গ্রামগুলির জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট। কারণ ভারতীয় সমাজ মূলত গ্রামসমাজ। অধিকাংশ ভারতবাসী গ্রামে বসবাস করেন। তাই গ্রামের গঠন, গ্রামের আভ্যন্তরিণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যবস্থা, গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, বিভিন্ন গ্রামের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ভারতীয় সমাজে সার্বিক প্রভাব ফেলে। কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রামের পাশাপাশি নগর বা শহরের অবস্থানও ভারতীয় সমাজের একটি দারুণ সত্য। এমনকি বহু প্রাচীন সভ্যতাতেও ভারতে শহরের উপস্থিতি দেখা গেছে। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবে ভারতে নগরায়ণের এক নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়। বহু শহর ও নগর বিস্তারলাভ করতে থাকে। গ্রামের বহু মানুষ জীবিকার সন্ধানে নগরে আসে। এই নগরজীবন ও নগরায়ণের প্রক্রিয়া সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই এই এককটিতে আমরা ভারতীয় সমাজের দুইটি রূপ—গ্রামজীবন ও নগরজীবন উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করব।

## ৩.৩ ভারতীয় সমাজের কাঠামো—গ্রামজীবন ও নগরজীবন ঃ

সমাজতত্ত্বে অধিকাংশ ধ্রুপদী কাজেই দেখা যায় যে, মানবসমাজের দু'ধরনের আবাসনের মধ্যে বৈপরীত্য আনয়ন করা হয়েছে, যেমন—গ্রামজীবন ও নগরজীবন, সম্প্রদায় ও সমিতি, যান্ত্রিক সংহতি ও জৈবিক সংহতি ইত্যাদি। এইসব কাজে দেখানো হয়েছে যে, সমাজ এক ধরনের সরল জীবন থেকে ক্রমশ আর এক জটিল জীবনে প্রবেশ করছে এবং তার সঙ্গে নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সমন্বিত সামাজিক কাঠামো উদ্ভব হচ্ছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রথম ধরনের সামাজিক সংগঠনে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দৃশ্যমান; আর শেষোক্ত সংগঠনগুলি আধুনিক জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। ভারতীয় সমাজের গঠন আলোচনা করতে গেলে সুবিধার জন্য এর দু'টি কাঠামোগত রূপ আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করতে পারি—গ্রামজীবন ও নগরজীবন। তবে এই দু'টি রূপ আলাদাভাবে আলোচিত হ'লেও কোনও নির্দিষ্ট চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রাম ও নগর সম্প্রদায়ের শুরু বা শেষ আমরা নির্দেশিত করতে পারি না।

### ৩.৩.১ ভারতীয় গ্রামের রূপ

ভারতীয় সমাজের সভ্যতা নির্ধারণ করতে গেলে জাতিব্যবস্থা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই জাতিব্যবস্থায় কোনও জাতিই কিন্তু এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দৈনন্দিন কাজ চালাতে গেলে একটি জাতিকে অন্যান্য বিভিন্ন জাতির ওপর নির্ভরশীল হ'তে হয়। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই প্রতিটি জাতি তার চলার পথের রসদ সংগ্রহ করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্কটি কিভাবে রক্ষা করা হয় তা পরিচ্ছন্নভাবে বোঝার জন্য আমরা ভারতবর্ষের গ্রামসমাজকে আলোচনা করব। একজন গ্রামবাসীর কাছে তাঁর গ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার স্বরূপ জানতে হ'লে ভারতের ক্ষুদ্র এবং স্বনির্ভর গ্রামসম্প্রদায় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ বহুলাংশেই গ্রামনির্ভর সমাজ। চার্লস মেটকাফ (Charles Metcalfe) নামক এক ব্রিটিশ শাসক ভারতের গ্রামসমাজ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে বলেছেন,—"The village communities are little republics, having nearly everything that they want within themselves and almost independent of any foreign relations." অর্থাৎ গ্রামসমাজগুলি ছোট গণরাজ্য যেখানে তারা নিজেদের চাহিদার সবই পূরণ করতে পারে এবং বাইরের সমস্ত সম্পর্ক থেকে এরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এই মতকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি ভারতের গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা খুবই সরল। গ্রামগুলি সাধারণভাবে কৃষিনির্ভর। এই প্রাচীন ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি যৌথ জমির মালিকানা ভোগ করে। কৃষির পাশাপাশি হস্তশিল্পও এখানে প্রসারলাভ করে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপটি স্যার হেনরি মেইন, কার্লমার্ক্স ও গান্ধিজীর লেখাতেও পাই।

## ৩.৩.২ গ্রামীণ ঐক্য

অনেক সময় দেখা যায়, একই গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ তাদের জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিজেদের গ্রাম সম্পর্কে গর্ববোধ করেন। গ্রাম সম্পর্কে এই সচেতনতা তাঁদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন করে। একই ভূখণ্ডে বসবাস করার ফলে তাঁদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ থাকে। তাঁদের জীবন-যাপন প্রণালীও সাদৃশ্যযুক্ত হয়। তাঁরা একই ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ভোগ করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের (দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি) সময় তাঁরা একই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। একটি নির্দিষ্ট গ্রামের লোকেরা অন্য গ্রামে তাঁদের নিজস্ব গ্রামের নাম দ্বারাই চিহ্নিত হন, সেক্ষেত্রে জাতি বা অন্যান্য ব্যাপার গৌণ হয়ে যায়। আবার প্রতিটি গ্রামেই পৃথক পৃথক আচার-ব্যবস্থা বা আদর্শবোধ থাকে যার ভিত্তিতে গ্রামবাসীদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রামের নিজস্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী জাতিগুলির সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। যে কোনও সময় আপনারা সুযোগ পেলে লক্ষ্য করবেন যে, একটি নির্দিষ্ট জাতিভুক্ত ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব গ্রাম ছেড়ে অন্য আর একটি গ্রামে অতিথি রূপে গেলে এই শেষোক্ত গ্রামের জাতির সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব জাতির অবস্থান নির্ণীত হবে। তাঁর নিজের গ্রামের জাতির সামাজিক অবস্থান এক্ষেত্রে কোনভাবেই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। কাজেই গ্রামভেদে একই জাতির সামাজিক অবস্থানে পার্থক্য থাকতে পারে। এতে বোঝা যায় যে, গ্রামের একটি আলাদা সত্তা আছে এবং গ্রামবাসীরা তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি, ব্যবহার, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই সত্তা আরোপ করেন।

বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক টনিজ (Tonnies)-এর বক্তব্য আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারি। ১৮৭৭ সালে তাঁর গ্রন্থ 'Gemeinschaft und Gesellschaft'—এ টনিজ দেখান যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপের সমাজ ক্রমশ Gemeinsechaft বা সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজ থেকে Gesellschaft বা সমিতিভিত্তিক সমজে পরিবর্তিত হ'তে থাকে। এর কারণ হিসেবে তিনি শিল্পের অগ্রগতি ও বিকাশকে নির্দিষ্ট করেন। শিল্পের বিকাশের ফলে কৃষিনির্ভর সহজ-সরল সম্প্রদায় ক্রমশ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং পরিবর্তে শিল্পনির্ভর জটিল সমাজের উদ্ভব ঘটতে থাকে। টনিজ দেখিয়েছেন, গ্রামসম্প্রদায় যেহেতু ক্ষুদ্র, এখানে লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সার্বিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য মিলিত হন। একই স্থানে দীর্ঘদিন একই ধরনের জীবনযাপন করার সুবাদে নিজেদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে তাঁরা ক্রমশ শক্তিশালী করেন এবং তাঁদের বাসস্থান বা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নিয়ে গর্ববোধ করেন। এই ধরনের ছোট, সরল অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের সব বৈশিষ্ট্যই আমরা গ্রামসম্প্রদায়ের মধ্যে খুঁজে পাই।

গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপদানের ক্ষেত্রে গ্রামের বিভিন্ন জাতিগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হিসেবে অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা যজমানি প্রথার উল্লেখ করতে পারি। বিভিন্ন জাতিগুলি এই প্রথার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল থেকে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। ফলে, এই গ্রামের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, যজমানিপ্রথা কোনও কোনও সময় একটি গ্রামের স্বল্পপরিসরে কেবল সেই নির্দিষ্ট গ্রামের জাতিগুলির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অন্যান্য নিকটবর্তী গ্রামের জাতিগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা এই এককেই পরে দেখব, এই প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন জাতিগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কিভাবে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সেক্ষেত্রে গ্রামগুলি কিন্তু তাদের স্ব-নির্ভরতা বজায় রাখতে বাধার সম্মুখীন হয়।

## অনুশীলনী—১

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) সমাজ —— জীবন থেকে ক্রমশ এক —— জীবনে প্রবেশ করছে।

(খ) কোনও নির্দিষ্ট ——— ভিত্তিতে গ্রাম ও নগর সম্প্রদায়ের ——— বা ——— আমরা নির্দেশিত করতে পারি না।

(গ) দৈনন্দিন কাজ চালাতে গেলে একটি জাতিকে অন্যান্য জাতির ওপর ——— হ'তে হয়।

(ঘ) একই ——— বসবাস করার ফলে গ্রামবাসীদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ থাকে।

(ঙ) গ্রামসম্প্রদায় ক্ষুদ্র হবার ফলে লোকেদের সম্পর্ক খুব ———।

২। ঠিক ☑ অথবা ভুল ☒ চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) গ্রামের নিজস্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী জাতিগুলির সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়।

(খ) ভারতীয় সমাজের সভ্যতা নির্ধারণ করতে গেলে আমাদের সমাজের জাতিব্যবস্থা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(গ) চার্লস মেটকাফ নামক এক ব্রিটিশ শাসক প্রাচীন ভারতীয় গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেন।

(ঘ) প্রাচীন ভারতের গ্রামসমাজে কৃষির পাশাপাশি বৃহদায়তন শিল্প প্রসারলাভ করে।

(ঙ) জাতিগুলির সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয় প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব প্রথা অনুযায়ী।

(চ) ডুর্কহ্যাইম তাঁর গ্রন্থ Gemeinschaft Und Gesellschaft-এ সমাজ পরিবর্তনের কথা আলোচনা করেন।

(ছ) গ্রামের অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে গেলে নিজেদের জাতিই তাদের মুখ্য পরিচয় বহন করে।

৩। সঠিক উত্তর চিহ্নিত ☑ করুন ঃ

(ক) ভারতীয় গ্রামে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন—লর্ড কর্ণওয়ালিশ/চার্লস মেটকাফে/হেস্টিংস।

(খ) সম্প্রদায় (Gemeinschaft) ও সমিতি (Gesellschaft)-এর মধ্যে পার্থক্য দেখান—মার্ক্স/ওয়েবার/টনিজ।

## ৩.৩.৩ গ্রামগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এতক্ষণ আমরা ছোট ছোট ভারতীয় গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এইসব গ্রামগুলির স্বয়ম্ভরতা বা স্বনির্ভরতা এসেছে তার ক্ষুদ্রত্ব থেকে। এই অর্থাৎ সরল জীবনযাত্রা এবং স্বল্পপরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধতা

গ্রামগুলিকে এমন চরিত্রদান করেছে যাতে তাকে অন্য কোনও বহিঃশক্তির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না,—নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, নিজস্ব লোকজনের ওপর নির্ভর করেই এইসব গ্রামের সরল অনাড়ম্বর চাহিদাগুলি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। গ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ শক্তির সঙ্গেই জড়িত আছে গ্রামের ঐক্যের প্রশ্নটি। কিন্তু গ্রামের ঐক্য বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি গ্রামগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রশ্নটিও বিভিন্ন তাত্ত্বিকের লেখায় গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, গ্রামের স্বনির্ভর, স্বাধীন ও বহিঃপ্রভাব বিচ্ছিন্ন রূপের বর্ণনা গ্রাম সম্পর্কে একটি অতিরঞ্জিত ধারণার প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। গ্রামের সম্পর্কে অনেক আধুনিক তথ্যেই দেখা যায় যে, গ্রামকে কোনও গণরাজ্য বা republic বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়। গ্রামগুলি বহির্জগতের চাহিদার মুখে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা তথা বিচ্ছিন্নতা কখনই বজায় রাখতে পারেনি। বিভিন্ন পরিবর্তনের ঢেউ গ্রামগুলিতে এসে লেগেছে বিভিন্ন সময়ে। প্রাচীনকালে যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিরা প্রয়োজন মেটাতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়া-আসা করেছেন। বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, এক গ্রামের মধ্যে এই বন্ধন সবচেয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই সূত্র ধরে বিবাহিত দম্পতি ও তাদের সন্তানেরা বা আত্মীয়রা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ভ্রমণ করেছেন। প্রাচীনকালে কোনও একটি গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অন্যান্য গ্রাম থেকে লোকজন সমাবেশ হওয়ার ঘটনাও আমরা শুনেছি। একথা ঠিকই যে, এই সচলতার ব্যাপারটি সব গ্রামবাসীর ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য নয়,—কারণ, এমন অনেক মহিলা গ্রামে থেকেছেন যাঁরা হয়তো তাঁদের জীবদ্দশায় কখনও তাঁদের পরিচিত জায়গার বাইরেই যাননি। কিন্তু এইসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীনকালে বেশীরভাগ লোকই বেশ সচল ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে বহু কাজেই সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বাধীন থাকতে পারেনি। অনেক সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে গ্রামের ঐক্যের ধারণাটিও আমরা সব সময় অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে পারিনা। কারণ, একই গ্রামের লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে (যেমন—জাতিগত অবস্থান, শ্রমবিভাজন এবং শক্তি বা সম্মান বন্টন ইত্যাদি) কলহের ঘটনাও আমরা শুনে থাকি। ফলে, গ্রামের অভ্যন্তরে পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীর অস্তিত্বের নিদর্শনও পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের গ্রামের ওপর গবেষণামূলক যত কাজ হয়েছে তাতে প্রায় সর্বত্রই গ্রামকে বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অপরিবর্তনীয় হিসেবে কল্পনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। যজমানি প্রথার দৌলতে বিভিন্ন গ্রামের জাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদান চালানোয় গ্রামগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা যায় না। যজমাানি প্রথাতে যজমান বা মূলত খাদ্য-উৎপাদক জাতি অপরাপর জাতিগুলিকে খাদ্য যোগান দেয় এবং পরিবর্তে এইসব পেশাভিত্তিক জাতিগুলি যজমানের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করে। কোনও সময় কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যজমানেরা অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীভুক্ত লোকেদের নানাভাবে পুরস্কৃত করত। কিন্তু ক্রমশ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এবং শিল্পায়ন বা নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই পারস্পরিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায় এবং এই জাতিগুলি তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য তাদের নিজেদের গ্রামের অথবা নিকটবর্তী গ্রামগুলির জাতিদের ওপর নির্ভর না করে ক্রমশ নগর ও শহরের নানারকম সুবিধাজনক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ লুই ডুমোর (Dumont) মতে, ভারতীয় সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল গ্রাম। এই মত অনুযায়ী গ্রাম শুধু একটি ভৌগোলিক স্থান নয়,—কেবল কয়েকটি গৃহ, রাস্তা বা জমির সমষ্টি নয়। গ্রামের একটি স্বতন্ত্র্য সত্তা আছে। ম্যান্ডেলবাম দেখিয়েছেন যে, স্থানীয় লোকেদের কাছে তাদের গ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ—এটা ঠিকই। পাশাপাশি আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, স্থানীয় লোকেরাই কখনও কখনও গ্রামসীমা অতিক্রম করে আরও বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। কাজেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রামকে পৃথক করে নিয়ে গবেষণা চালানো গেলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার বৃহত্তর সমাজের স্বরূপ জানার ব্যাপারে গ্রামকে এভাবে আলাদা করে নিয়ে সমীক্ষা চালানো অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক গ্রামকে ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণের একক হিসেবে মানতে রাজী নন।

## ৩.৩.৪ গ্রামসমাজে পরিবর্তন ঃ মার্ক্সের মত

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে গ্রামের চেহারা কিন্তু অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে যায় ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর। ইংরেজরা এদেশে আসার আগে গ্রাম সম্পর্কে মার্ক্সের চিন্তায় গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতার অস্তিত্বটিই গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর মতে, ''Those small and extremely ancient Indian communities, some of which have continued down to this day are based on possession in common of the land, on the belending of agriculture and handicrafts and on an unalterable divison of labour, which serves, whenever a new community is started, as a plan and scheme ready cut and dried.'' অর্থাৎ, মার্ক্স এইসব গ্রামগুলিতে কৃষির পাশাপাশি হস্তশিল্পের বিকাশকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, এখানকার লোকেদের মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাজন নীতি ছিল যার ভিত্তিতেক আবার নতুন সম্প্রদায় তার কাজ সম্পাদন করত। গ্রামের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্রটি মার্ক্সের মতো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় ভারতে ব্রিটিশদের আগমনের পরে।

মার্ক্স দেখিয়েছেন, গ্রামের হস্তশিল্প, তাঁতের চরকা ধ্বংস করে ইংরাজরা কিভাবে গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট করে দেয়। এভাবে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মার্ক্স যদিও এই বুর্জোয়া সামাজিক বিপ্লবের ক্ষতিকারক দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তবুও প্রাচীন গ্রামসমাজের প্রতিক্রিয়াশীল মৃতপ্রায় রূপটিও আমাদের তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন গ্রামসমাজকে ইংরেজ শাসকেরা ভীষণভাবে দলিত করে যেমন এই সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, সেরকম আবার নিজেদের অজান্তে সামাজিক পরিবর্তন এনে ভারতীয় সমাজের পক্ষে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে।

জমিস্বত্ত্বের ক্ষেত্রে জমিদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইংরেজরা ভারতীয় গ্রামে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ও বৈষম্যের এক অভিনব পদ্ধতি চালু করে। জমিদারি প্রথায় জমিদারেরা (সাধারণত উচ্চ জাতিভুক্ত ব্যক্তিগত) ইংরেজ সরকারের পক্ষে গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। বিনিময়ে তারা বিদেশী সরকারের কাছ থেকে কিছু আনুকুল্য লাভ করত। রায়তওয়ারি প্রথায় রায়তরা অর্থাৎ প্রজারা কিছু অর্থের বিনিময়ে কিছু জমির স্বত্ত্ব ভোগ করত। তারা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের সঙ্গে কাজকর্মের ব্যাপারে আদান-প্রদান চালাত এবং সেইজন্য জমিদারেরা এই রায়তদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারত না। এই জমিস্বত্ত্বের প্রথাগুলির অবলুপ্তির পর গ্রামীণ সমাজে অনৈক্যের চিত্রটি আরও সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে।

## অনুশীলনী-২

১। **সঠিক উত্তর চিহ্নিত করুন ঃ ☑**

(ক) যজমানি প্রথায়—জাতিগুলি পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভর করে।/একটি বিশেষ জাতি অন্য জাতির তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।/জাতিগুলির মধ্যে সচলতা বাড়ে।

(খ) মার্ক্সের মতে/নেহেরুর মতে/গান্ধিজীর মতে ইংরেজরা নিজেদের অজান্তে পরিবর্তনের বীজ বপন করে ভারতে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেন।

(গ) রায়তওয়ারি ও জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করেন—ইংরাজরা/স্বাধীন ভারত সরকার/এদের কেউ না।

(ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়/ক্রমশ শিথিল হয়।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) গ্রাম সম্পর্কে অনেক আধুনিক তথ্যেই দেখা যায় যে, গ্রামকে ——— হিসাবে বর্ণনা করা ঠিক নয়।

(খ) বহির্জগতের চাহিদার মুখে গ্রামগুলি নিজেদের ——— কখনই বজায় রাখতে পারেনি।

(গ) একই গ্রামের লোকেদের ভিতর বিভিন্ন কারণে ——— ঘটনাও শোনা যায়।

(ঘ) ——— দৌলতে বিভিন্ন গ্রামের জাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদান চালায়।

(ঙ) প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রামের চেহারা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে যায় ———— এদেশে আসার পর।

(চ) —— দেখিয়েছেন, গ্রামের হস্তশিল্প, তাঁতের চরকা ধ্বংস করে ইংরেজরা কিভাবে গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট করে দেয়।

## ৩.৩.৫ স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতের গ্রামসমাজ ঃ

প্রাচীন গ্রামকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজ কিভাবে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হ'তে থাকে সে সম্পর্কে ৫০-এর দশক থেকে অনেক গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশিত হতে থাকে,—যেমন—এস.সি. দুবের 'ইণ্ডিয়ান ভিলেজ', এম. এন. শ্রীনিবাসের (সম্পাদিত) 'ইণ্ডিয়ান ভিলেজেস', ম্যাক্কিম ম্যারিয়ট সম্পাদিত 'ভিলেজ ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি। গ্রামসমাজের যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে বলে এ সমস্ত গবেষণায় দেখান হয়েছে সেগুলি হ'ল—শ্রেণীব্যবস্থা, জাতিব্যবস্থা, পরিবার, যজমানি প্রথা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, গ্রাম ও জাতি পঞ্চায়েত, শিক্ষা ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হ'ল, এই পরিবর্তনের ঢেউ কিন্তু গ্রামসমাজের সর্বত্র একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতের গ্রামসমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। জাতিব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেছে। যজমানি প্রথা অনেকাংশে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। কারণ, বিভিন্ন জাতিগুলি তাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য আশেপাশের শহরগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বাজার অর্থনীতি উদ্ভবের ফলে জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের সময় জাতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আবার স্বজাতির ক্ষেত্রেও পাত্র বা পাত্রীকে ভিন্ন গোত্রভুক্ত হ'তে হবে। যেমন ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত 'ভরদ্বাজ' গোত্রের পাত্র বিবাহ করার সময় 'ভরদ্বাজ' ব্যতীত অন্য গোত্রের ব্রাহ্মণ পাত্রীর সন্ধান করবেন। কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে, জাতিব্যবস্থায় পরিবর্তন আসলেও এই প্রথা অবলুপ্ত হয়নি,—বরং অন্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। আগেকার জাতিপঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় দেখা যায়, ভারতের গ্রামগুলিতে জাতির ভিত্তিতে দলগুলি ক্ষমতায় আসে।

সবুজ বিপ্লবের ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নতুন ঢেউ এসেছে। শিক্ষার প্রসার, ফসল ফলানোর নতুন পদ্ধতি, উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকরণ, কৃষকদের বর্ধিত আয়, ঋণ নেওয়ার বিভিন্ন ব্যবস্থা—ইত্যাদি নানা কারণে আজ গ্রামসম্প্রদায় নগরজীবনের অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। তবুও এখনও ভারতে গ্রামজীবন ও শহরজীবনের সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাস ও জীবনযাত্রায় কিছু পার্থক্য রয়েই গেছে।

**অনুশীলনী-৩**

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) গ্রাম সম্পর্কে ৫০-এর দশকের পর বিভিন্ন গবেষণাধর্মী লেখাগুলি হ'ল ——— এর ———, সম্পাদিত ———, ——— সম্পাদিত ——— ইত্যাদি।

(খ) বিভিন্ন জাতিগুলি তাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য আশেপাশের ——— ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

(গ) বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় ——— এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

(ঘ) ——— বিপ্লবের ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নতুন ঢেউ এসেছে।

## ৩.৪ ভারতে নগরজীবন

গ্রাম থেকে নগর সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। গ্রামগুলি যেখানে প্রধানত কৃষি-নির্ভর, নগরবাসিন্দারা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকৃষিমূলক বৃত্তি গ্রহণ করে। এইসব বৃত্তির মধ্যে বৈচিত্র্যও দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই নগরে সামাজিক সচলতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। আর এসবের ফলে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পরিচিতির তুলনায় অর্জিত সামাজিক পরিচিত বেশী প্রাধান্য পায়। যেমন, নগরের কোনও বিশেষ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর বৃত্তি দিয়ে সমাজের কাছে পরিচিত হবেন, (যেমন—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অধ্যাপক তাঁর স্বজাতি (যেমন—ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা তপসিলী জাতিভুক্ত) দিয়ে নয়। এছাড়াও নগরের বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে সাধারণত প্রশাসনিক কার্যালয় থাকে। যেমন—জেলা সদর বা মহকুমা সদর ইত্যাদি। আর নগরে ন্যূনতম নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক বাস করে।

### ৩.৪.১ প্রাচীন ভারতে নগর ঃ

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভারতে নগরসভ্যতা বহু প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে ভারতে নগরজীবন ভারতীয় সভ্যতারই সমসাময়িক। আপনি জানেন খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা শহর দু'টি সিন্ধু নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল। এই শহরগুলির প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা খুবই উন্নতমানের ছিল। ভারতে নগরায়ণের আর একটি পর্যায় আরম্ভ হয় মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের পরে—যেমন, উজ্জয়িনী, তাম্রলিপ্ত, শ্রাবস্তী, বৈশালি, অযোধ্যা, পাটলিপুত্র প্রভৃতি। এই শহরগুলি মোটামুটি ব্যবসাকেন্দ্র বা কারুশিল্প কেন্দ্রের নিকটবর্তী জায়গায় গড়ে উঠেছিল। ধাতব শিল্পীরা অথবা তাঁত বা কাঠ শিল্পীরা একত্রিত হয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশ এই একত্র বাস করার বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থাই পরে শহরের জন্ম দেয়। সমাজতাত্ত্বিক যোগেন্দ্র সিং দেখিয়েছেন, এই প্রাচীন শহরগুলি ক্রমোচ্চ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্বলিত ছিল। সামাজিক স্তরবিন্যাস অনুযায়ী পুরানো মূল্যবোধ বা সংস্কৃতিকে ধরে রাখার প্রয়াস এখানে দেখা যেত। সুযোগ সম্বলিত সুবিধাজনক স্থানগুলিও সামাজিক সুবিধাজনক জায়গায় নির্দিষ্ট থাকত এবং তারপরেই সুযোগ পেতেন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও ব্যবসায়ীরা। নিম্নজাতিভুক্ত অথবা অস্পৃশ্যদের লোকালয় নির্দিষ্ট হতে সবচাইতে কম সুবিধাজনক জায়গায়—উচ্চজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শের অনেক দূরে।

প্রাচীন ভারতে নগরায়ণ প্রক্রিয়া সঙ্ঘটিত হ'ত বিভিন্ন কারণে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখবেন যে, নগরায়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম থেকে নগরে যারা আসছে, তাদের জীবনযাপনের প্রক্রিয়া, মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপক পরিবর্তন

আসে এবং তাদের এই পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণার দ্বারা তাদের ছেড়ে আসা গ্রামবাসীরা প্রভাবিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এখানকার নগরায়ণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন— রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, রাজা ও তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অনুচরবর্গের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে শহরগুলির কাঠামো তৈরী করা হয়েছিল। এঁরা মোটামুটিভাবে চারপাশের কৃষিকাজ এবং তার থেকে উপার্জিত সম্পদে আগ্রহ দেখাতেন। প্রাচীন শহরগুলি অনেক সময় দুর্গকে ঘিরেও গড়ে উঠত। এই শহরগুলির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতের লোকেরা তাদের বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত থেকে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনে সাহায্য করতেন। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা উত্থান-পতন থাকলেও ভারতের সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুটা স্থিতিশীল ছিল। ব্যবসায়ী এবং কারিগরেরা বিভিন্ন সঙ্ঘ তৈরী করে তার মাধ্যমে ব্যবসা, উৎপাদন, জিনিসপত্র লেনদেন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করত। তৃতীয়ত, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখকালে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে নগরসমাজের কর্তারা কোনও কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় বা আবার সম্রাট অশোকের শাসনকালে এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করে। মুঘল যুগে আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে ইসলাম ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। প্রাচীন ভারতে অনেক তীর্থক্ষেত্রভিত্তিক শহর (যেমন—এলাহাবাদ, গয়া, হরিদ্বার প্রভৃতি), ব্যবসাকেন্দ্রিক শহর (যেমন—দিল্লি, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি), বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক শহরের (যেমন—নালন্দা, তক্ষশিলা প্রভৃতি) নাম আমরা শুনে থাকি। কাজেই ভারতে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা শিল্পায়নের পরে এসেছে মনে করলে ভুল হবে।

---

## অনুশীলনী-৪

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) নগরবাসিন্দারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ——— বৃত্তি গ্রহণ করে।

(খ) জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পরিচিতির তুলনায় ——— সামাজিক পরিচিত নগরে বেশী প্রাধান্য পায়।

(গ) খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে ——— ও ——— শহর দু'টি সিন্ধু নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল।

(ঘ) ভারতের প্রাচীন শহরগুলি ক্রমোচ্চ ———— সম্বলিত ছিল।

(ঙ) প্রাচীন ভারতের শহরগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও ——— প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুটা স্থিতিশীল ছিল।

(চ) সম্রাট অশোকের শাসনকালে পাটলিপুত্র শহরটিতে ———— ধর্ম প্রসারলাভ করে।

(ছ) ভারতে ———— সভ্যতা শিল্পায়নের আগেই এসেছে।

---

## ৩.৪.২. ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের নগর

ইউরোপের ব্যবসায়ীরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের নগরায়ণ প্রক্রিয়াটির একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। এই সময়ে উপকূলবর্তী নগর বা শহর গড়ে উঠতে থাকে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শহরগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদেশীরা তাদের ব্যবসায়িক প্রসার ঘটায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হওয়ায় নতুন নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উন্নতি হয় (যেমন—

ডাক ও তার ব্যবস্থা, রেলসড়কে যাতায়াত ব্যবস্থা ও উন্নত ধরনের রাস্তাঘাট ও জলপথ নির্মাণ)। এ সবের ফলে নগরে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি ইংরেজরা গ্রামের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ধ্বংসসাধন আরম্ভ করে। গ্রামের বহু কারিগর তাদের কাজ হারিয়ে নতুন জীবিকার সন্ধানে নগরের নতুন নতুন সুযোগের দ্বারস্থ হয়।

ব্রিটিশ আমলে ভারতে শিক্ষার প্রসার ঘটে আগের এককে আপনি দেখেছেন। নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমলা, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ, ডাক্তার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাদারের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁদের নতুন যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের দ্বারা তাঁরা সমগ্র দেশে বিশেষত নগর ও শহরের লোকেদের কাছে নতুন দিগন্ত মেলে ধরেন। এই নতুন নগরায়ণের প্রক্রিয়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ এনে দেয় এবং এর ফলে সমাজে বিভিন্ন পেশায় সচলতা আসে। স্তরবিভক্ত ভারতীয় সমাজের কঠোর রূপটি অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখবেন যে, নতুন আর্থিক বা সামাজিক সুযোগসুবিধাগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চজাতের ব্যক্তিরা আদায় করতে সক্ষম হন। বিংশ শতাব্দীতেও নগরায়ণের এই চরিত্রটিকে আমরা আরও শক্তিশালী হ'তে দেখি।

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, ভারতের লোকেরা নগর সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের নগরগুলি তাদের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ শিল্পের সম্প্রসারণ মানুষের নতুন নতুন চাহিদা বৃদ্ধি করছিল, যেগুলি তারা (পুরনো নগরগুলি) মেটাতে পারছিল না। আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন যে, বিংশ শতাব্দীতে নগরায়ণের যে নতুন ধারা লক্ষ্য করা যায় তাতে শিল্পায়নের প্রভাবও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

## ৩.৪.৩ নগরের ক্রমবিস্তার

দেখা যায় যে, নগরায়ণ যখন শিল্পায়নের হাত ধরে ভারতে ক্রমবিস্তৃত হচ্ছে, তখন শহরের সংখ্যা এবং আয়তন— উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতের তুলনায় বিং শতাব্দীতে নগরায়ণের হার দ্রুত বেড়েছে। ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ভারতবর্ষের এই ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ধারাটি উল্লেখ করা হয়। এখনকার শহরগুলি জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত। কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, ভারতের বিভিন্ন শহরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বিভিন্নভাবে হয়েছে। কাজেই ভারতের নগরায়ণের ধারাটিতে বেশ অসমতা লক্ষ্য করা যায়।

জনসংখ্যার তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, ১৯৯১ সালে আমাদের নগরবাসীদের সংখ্যা ২২ কোটির কাছাকাছি। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬ কোটির সামান্য বেশী। বিভিন্ন ধরনের লোকেরা এইসব শহরগুলিতে বাস করেন। ভারতে নগরের অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে। লোকসংখ্যা অনুযায়ী এই শ্রেণী নির্ধারিত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারিতে নগরকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। লোকসংখ্যা বা শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ছাড়াও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে শিল্পনগরীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায়।

---

## অনুশীলনী-৫

**১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) বিংশ শতাব্দীতে নগরায়ণের যে নতুন ধারা লক্ষ্য করা যায়, তাতে ——— প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

(খ) গ্রামের বহু কারিগর তাদের কাজ হারিয়ে নতুন ——— সন্ধানে ——— নতুন নতুন সুযোগের দ্বারস্থ হয়।

(গ) নতুন নগরায়ণের প্রক্রিয়ায় ——— ভারতীয় সমাজের কঠোর রূপটি অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে যায়।

(ঘ) শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে ——— যুগের নগরগুলি তাদের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল।

২। ঠিক ☑ অথবা ভুল ☒ চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) নগরায়ণ যখন শিল্পায়নের হাত ধ'রে ভারতে ক্রমবিস্তৃত হচ্ছে, তখন শহরের সংখ্যা ও আয়তন—উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) ভারতের বিভিন্ন শহরে জনসংখ্যার বৃদিধ একই হারে হয়েছে।

(গ) স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে শিল্পনগরীর সংখ্যার ক্রমশ বাড়ছে।

## ৩.৪.৪ নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য

সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্সওয়েবার (Max Weber) দেখিয়েছেন যে, ভাল বাজার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ীশ্রেণীকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে ওঠে। এই ব্যবসাকে আরও সফল করতে সাহায্য করে নগরেই গড়ে ওঠা ধর্মীয়, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব কিছুর ফলে নগরে আমরা মিশ্র ও ভিন্ন সংস্কৃতি লোকজদনকে একসঙ্গে বসবাস করতে দেখতে পাই। এই বিচিত্র সংস্কৃতির লোকেদের সংগঠনগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নৈর্ব্যক্তিক হয় এবং তাদের ব্যবহারগুলি কিছু নির্দিষ্ট চুক্তি দ্বারা নির্দেশিত থাকে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নগরকে আমরা সহজেই সহজ-সরল পরিবেশ বিশিষ্ট গ্রামসমাজ থেকে পৃথক করে নিতে পারি।

ভারতের নগরগুলিকে আমরা জনসংখ্যা, পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে পারি। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে ভারতে একটি নগর-সম্প্রদায়ের পরিধির মধ্যে অন্ততপক্ষে ৫০০০ লোকের বাস করা প্রয়োজন বলে ধরা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক (ecological) প্রেক্ষাপটে নাগরিক কাজকর্মের বিস্তৃতি কতটা তা বিচার করা হয়। যেমন—বাড়ীগুলির মান কিরকম, বাজার কত দূরে, ব্যবসায়িক কেন্দ্র বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নগর কতটা উন্নতিলাভ করতে পারছে সেটা দেখা হয়। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শহরবাসীদের বিশিষ্ট মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপকে তুলে ধরা হয়। বড় নগরে যেমন দিল্লিতে একই জায়গায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোককে আপনারা বাস করতে লক্ষ্য করেছেন। এঁদের ভাষা, পরিধান, খাওয়াদাওযার ধরনে বিস্তর বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু গ্রামসমাজে আমরা সেখানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এই ধরনের বৈচিত্র্য কখনই দেখতে পাই না।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ভারতীয় সমাজের স্তরবিভক্ত রূপটি নগরায়ণের ফলে কিছুটা শিথিল হয়ে গেলেও উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই নাগরিক সুযোগ-সুবিধাগুলি বেশী পরিমাণে ভোগ করতে পারেন। ভিক্টর, ডি'সুজা চণ্ডীগড় শহরের ওপর তাঁর একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, শিক্ষা, বৃত্তি এবং আয়ের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর ভিত্তি করে নগরে সামাজিক শ্রেণী গঠিত হয়। একই সামাজিক শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের একই ধরনের সামাজিক মর্যাদা বা সামাজিক অবস্থান থাকে। শ্রেণী-অবস্থানের ক্ষেত্রে ডি'সুজা বৃত্তিগত মর্যাদাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। শহরের বিভিন্ন শ্রেণীগুলি তাদের পেশার সঙ্গে জড়িত বিশেষ বিশেষ কাজ করেন। যেমন, কোনও ব্যক্তি শিক্ষকতা করেন, কেউ ডাক্তারি পেশায় নিযুক্ত, কেউ বা আইনজ্ঞের ভূমিকা পালন করেন, আবার কেউ কেউ ইঞ্জিনিয়ার পেশার সঙ্গে জড়িত কাজকর্ম করেন। নিম্নলিখিত বিভিন্ন পেশার লোক নিয়ে আমাদের নগরসমাজের সম্পূর্ণ কাঠামোর চিত্রটি আমরা পাই—

(১) উচ্চপর্যায়ের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও আমলাগণ।

(২) উচ্চ আয়যুক্ত পেশাদার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পে পেশার আধিকারিকগণ, বিভিন্ন কলাকুশলী ও বড় ব্যবসায়ী।

(৩) সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কেরানীগণ ও কর্মচারীগণ, বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, সাংবাদিক, ছোট দোকানের মালিকগণ, ছোটখাট পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিরা।

(৪) মজুর-সম্প্রদায়ের লোকেরা, যেমন—কারিগর, যন্ত্রাদির চালক, পারিবারিক বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীরা, হকার, ফেরিওয়ালা এবং অন্য শ্রমজীবীরা।

---

## অনুশীলনী-৬

**১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) নগরে আমরা ——— সংস্কৃতির লোককে একসঙ্গে বসবাস করতে দেখি।

(খ) নগরের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ——— এবং তাদের ব্যবহারগুলি কিছু নির্দিষ্ট ——— দ্বারা নির্দেশিত থাকে।

(গ) শ্রেণী-অবস্থানের ক্ষেত্রে ডি'সুজা ——— মর্যাদাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

(ঘ) ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে একটি নগর-সম্প্রদায়ের পরিধির মধ্যে অন্ততপক্ষে ——— লোকের বাস করা প্রয়োজন বলে ধরা হয়েছে।

---

## ৩.৪.৫. ভারতীয় সমাজজীবনে নগরায়ণের প্রভাব ঃ পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে পার্থক্য

প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হ'লেও পরবর্তীকালে এই প্রক্রিয়া অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আনয়ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাও তৈরী করছে। বস্তি, জনসংখ্যার চাপ এবং অপরাধপ্রবণতা নগরজীবনের স্বাভাবিক দৃশ্য। কাজেই প্রথমত, বিভিন্ন কারণে নগরায়ণের উদ্ভব ঘটলেও পরে অন্যান্য বিভিন্ন ঘটনার কারণ হিসেবে এই প্রক্রিয়া উল্লিখিত হয়।

অনেকে মনে করেন যে, নগরায়ণের ফলে ভারতের জাতিব্যবস্থা শ্রেণীব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে বা যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতে নগরায়ণের ফলে এ'রকম পরিবর্তন হয়েছে একথা মনে করার কোনও কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে আপনারা মনে রাখবেন যে, ভারতের নগরায়ণ পাশ্চাত্য দেশের নগরায়ণ থেকে স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জীবিকার সন্ধানে এবং নিজেদের আয় বৃদ্ধির আশায় লোকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল। তাদের এসব আশা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণ হয়। এর ফলে তারা কিছুদিনের মধ্যেই নগরজীবনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় এবং নিজেরা নগর জনসংখ্যার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের এই ধরনের নগরায়ণ সঙ্ঘটিত হ'তে দেখা যায় না।

ভারতীয় সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, নগরের আপাত সুযোগ-সুবিধা বা বিলাসবহুল জীবন গ্রামবাসীদের আকৃষ্ট করে। তাছাড়া গ্রামে কৃষিকার্য যেহেতু ঋতুর ওপর নির্ভরশীল সেহেতু পল্লীবাসীদের অনেকেই কয়েক মাসের জন্য বিভিন্ন সুযোগের সন্ধানে অস্থায়ীভাবে নগরে বাস করে। অনেকে আবার যথার্থ যোগ্যতা না থাকায় নগরে জীবিকা সন্ধানে ব্যর্থ হয় এবং নগরের উপকণ্ঠে বস্তিতে থাকতে বাধ্য হয়। এরা নগরজীবনের জীবনধারার সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারে না।

কাজেই আমরা দেখি যে, নগরায়ণের ফলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। একদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন, নতুন ও পরিবর্তিত মূল্যবোধ ইত্যাদি নগরায়ণের ফল। কিন্তু গ্রাম ও নগরে সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক সঙ্ঘগুলি ভিন্ন ধরনের হ'লে জাতিব্যবস্থা, আত্মীয়তা-বন্ধন এবং বিবাহপ্রথা ইত্যাদি

দিক থেকে উভয়ক্ষেত্রে কাঠামোগত কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে পাশ্চাত্যের নগরায়ণের প্রক্রিয়া ও প্রভাবের সঙ্গে আমাদের সমাজের নগরায়ণের প্রক্রিয়া ও ফলাফলের চরিত্রগত কিছু পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

---

### অনুশীলনী-৭

**ঠিক ☑ অথবা ভুল ☒ চিহ্নিত করুন ঃ**

(১) বস্তি, অপরাধপ্রবণতা, জনসংখ্যার চাপ নগরজীবনের স্বাভাবিক দৃশ্য।

(২) ভারতের নগরায়ণ প্রক্রিয়া ও পাশ্চাত্যের নগরায়ণ প্রক্রিয়া ঠিক একইভাবে ঘটেছে।

(৩) ভারতীয় গ্রামসমাজ থেকে জীবিকা ও অন্যান্য সুযোগের সন্ধানে এসে অধিবাসীরা নগরজীবনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়।

(৪) ভারতে গ্রাম ও নগরে সংস্কৃতি ভিন্ন হ'লেও জাতিব্যবস্থা, আত্মীয়-বন্ধন ও বিবাহ-প্রথায় উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে।

---

## ৩.৫ গ্রাম ও নগর জীবনের ধারাবাহিকতা ঃ ভারতীয় সমাজ

ভারতে গ্রামসমাজ ও নগরসমাজ আলোচনার পর এই দুই জীবনের বৈশিষ্ট্য আপনি কিছুটা বুঝতে পারলেন। কিছু জায়গায় এই দুই ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে আশা করি এটাও নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, আমাদের দেশের নগরায়ণ প্রক্রিয়াটি গ্রামসমাজ ও নগরসমাজের ধারবাহিকতার দিকটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আমাদের সমাজে পারিবারিক বন্ধনগুলি খুব দৃঢ় হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে নগরে এসে লোকেরা তাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনকেও নগরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এরা নিজেদের জাতির আচার বা বিবাহপ্রথা মোটামুটি অনুসরণ করে চলে। গ্রামজীবনের বৈশিষ্ট্য বা ভিত্তি—পারিবারিক বন্ধন, বিবাহ-প্রথা ও জাতিপ্রথা—ভারতের নগরজীবনে নতুন সামাজিক পরিবেশকেও প্রভাবিত করেছে। কে. এম. কাপাডিয়া, আই, পি, দেশাই, এ. এম. শাহ প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকগণ তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ভারতে নগরজীবনের সঙ্গে পৃথক একক পরিবারের (unclear family) কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁদের মতে, শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের পরেও ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা দেখা যায়। গ্রামের মত ভারতীয় নগরেও আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। তাই এখনও পর্যন্ত দেখা যায় যে, গ্রামের কোনও ছাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য নগরে তার অন্য আত্মীয়স্বজনদের কাছে বাস করতে পারে। আবার গ্রামের কোনও ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে দেখা যায় তার নগরের আত্মীয়রা সুচিকিৎসার জন্য তাকে নগরে তাদের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। পরিবারের লোকেদের বাড়ী ফিরতে দেরী হলে গ্রামের পরিবারের মতই নগরের লোকেরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কাজেই ভারতবর্ষে আমরা গ্রামসমাজ ও নগরসমাজের মধ্যে সেভাবে কোনও সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা টানতে পারি না।

পরিশেষে আমরা বলব, নগরসমাজে কিছু পরিবর্তন আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাই। যেমন—পরিবারের আয়তন যথাসম্ভব ছোট রাখার চেষ্টা নগরসমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা এবং এ ধরনের আরও অনেক কাজ এখন পরিবারের বদলে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পাদন করায় শহরে পরিবারের কাজ অনেকাংশে কমে গেছে। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বেড়ে গেছে। পুরুষের সঙ্গে তারাও এখন সমান অধিকার দাবী করছে। সংখ্যায় কম হ'লেও বিয়ের ক্ষেত্রে স্বনির্বাচিত পাত্র-পাত্রী কোনও কোনও ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে জাতিপ্রথা সবসময় অনুসরণ করা হচ্ছে না। তবে অনেক

সমাজতাত্ত্বিক দেখান যে, শহরে বা নগরগুলিতে এখনও ভারতীয় সমাজের লোকেরা জাতিভেদ প্রথা মেনে চলে। এই প্রথায় গঠনগত পরিবর্তন হয়তো এসেছে, কিন্তু প্রথাটি লুপ্ত হয়নি। গুল্ড (Gould) দেখিয়েছেন যে, পেশাগত ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা মানা হয় না কিন্তু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে (যেমন—বিয়ের ক্ষেত্রে) জাতিব্যবস্থাকে এখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

---

### অনুশীলনী-৮

**ভুল হলে ☒, ঠিক ☑ দাগ দিন ঃ**

(ক) শিল্পায়ন ও নগরায়ণের পরেও ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

(খ) ভারতবর্ষে গ্রামসমাজ ও নগরসমাজের মধ্যে আমরা সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানতে পারি।

(গ) ভারতীয় সমাজের লোকেরা শহরে এখনও জাতিভেদ প্রথা মেনে চলে।

(ঘ) পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে শহরে এসে লোকেরা তাদের পারিবারবর্গ বা আত্মীয়স্বপজনকে ভুলে যায়।

---

## ৩.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা ভারতের সামাজিক গঠন আলোচনা করতে গিয়ে তার মূল দুটি স্তম্ভ—গ্রামজীবন ও নগরজীবনকে বিশ্লেষণ করলাম।

কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক ভারতীয় গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপটিকে বেশী গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। এই দিকটি মাথায় রেখে তাঁরা বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজকে ভালোভাবে জানতে গেলে ভারতীয় গ্রামগুলিকে পৃথকভাবে পাঠ করা দরকার। আবার অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে, গ্রামকে সমাজের থেকে পৃথক করে নিয়ে আলাদা ভাবে আলোচনা করা অর্থহীন। কারণ প্রাচীনকালেও গ্রামগুলি নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে শুধুমাত্র আবদ্ধ থাকতে পারেনি। দৈনন্দিন কাজ চালানোর ব্যাপারে (যেমন—যজমানি ব্যবস্থা, গ্রামগুলির মধ্যে বিবাহের প্রথা বা village exogamy) আধুনিক যুগের মত না হ'লেও গ্রামগুলি পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে চলত। কাজেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামের পৃথক রূপের পরিচয় প্রয়োজন হ'লেও গ্রামের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সম্পর্কের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নগরজীবন ভারতের লোকেদের কাছে সে অর্থে নতুন নয়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও আমরা শহরের উল্লেখ পাই। কিন্তু শিল্পায়ন উদ্ভূত নগরায়ণের প্রক্রিয়া নতুন মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা আনয়ন করে। গ্রামের লোকেরা নতুন জীবিকার সন্ধানে নগরে চলে আসতে থাকতে। তাদের পরিবারে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতীয় গ্রামের জাতিভেদ প্রথা সমাজে সচলতার বিরোধী ছিল। কিন্তু নগরসভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতিব্যবসথার কঠোরতা ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। সমাজ অনেক সচল হয়ে যায়। নগরে বিভিন্ন পেশার মানুষ একত্রে বসবাস করে এবং তাদের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীগত অবস্থান বিভিন্ন প্রকারের হয়। এভাবে নগরে একটি মিশ্র ও জটিল সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যদিও নগরের সংস্কৃতি ভিন্ন স্বাদের, তবুও ভারতীয় সমাজে জাতিব্যবস্থা, বিবাহ-প্রথা ও আত্মীয়বন্ধুর বন্ধন এত প্রগাঢ় যে, বহুল পরিবর্তনের ঢেউ-এর মাঝেও আমাদের সমাজের মূল চরিত্রটি এখনও পর্যন্ত ধাক্কা খেয়ে বিলুপ্ত হয়নি। তাই নগরসভ্যতার অনেক প্রভাব সমাজে আলোড়ন তুললেও গ্রামসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নগরের মানুষের মধ্যে এখনও বন্ধন যোগাচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভারতে নগর ও গ্রামজীবন কাঠামোগত দিক থেকে উভয় উভয়ের পাশাপাশি বিরাজ করে।

## ৩.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। চার্লস মেটকাফের মতে ভারতের গ্রামসমাজের চেহারাটি কেমন? (৪/৫টি বাক্যে লিখুন।)

২। প্রাচীন ভারতে গ্রামীণ ঐক্যের ধারণাটি ৪/৫ টি বাক্যে বর্ণনা করুন।

৩। প্রাচীন ভারতীয় গ্রামগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার রূপটি ৫/৬টি বাক্যে লিখুন।

৪। জমিদারি ব্যবস্থা ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা বলতে কি বোঝেন? (৫/৬টি বাক্যে লিখুন।)

৫। ইংরেজরা আসার পরে ভারতীয় গ্রামসমাজে মার্ক্স কি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন? (৪/৫টি বাক্যে লিখুন।)

৬। প্রাচীন ভারতে শহরগুলিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল? (৫/৬টি বাক্যে লিখুন।)

৭। কি কি ধরনের পেশার ব্যক্তিরা ভারতীয় নগরসমাজের সম্পূর্ণ কাঠামোটি গঠন করেছেন? (পেশাগুলি ক্রম অনুযায়ী লিখুন?।)

৮। ভারতের নগরায়ণ প্রক্রিয়া পাশ্চাত্যের নগরায়ণ প্রক্রিয়া থেকে কিভাবে স্বতন্ত্র? ব্যাখ্যা করুন। (৫/৬টি বাক্যে লিখুন।)

## ৩.৮ উত্তরমালা

**অনুশীলনী-১**

১। (ক) সরল, জটিল (খ) বৈশিষ্ট্যের, শুরু, শেষ (গ) নির্ভরশীল (ঘ) ভূখণ্ড (ঙ) ঘনিষ্ঠ

২। (ক) ☑ (খ) ☑ (গ) ☑ (ঘ) ☒ (ঙ) ☑ (চ) ☒ (ছ) ☒

৩। (ক) চার্লস মেটকাফ ☑ (খ) টনিজ ☑

**অনুশীলনী-২**

১। (ক) জাতিগুলি পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভর করে ☑ (খ) মার্ক্সের মতে ☑ (গ) ইংরেজরা ☑ (ঘ) ক্রমশ শিথিল হয় ☑

২। (ক) গণরাজ্য (খ) স্বাতন্ত্র্য (গ) কলহের (ঘ) যজমানি প্রথার (ঙ) ইংরেজরা (চ) মার্ক্স

**অনুশীলনী-৩**

(ক) এস. সি. দুবের 'ইন্ডিয়ান ভিলেজ', এম. এন. শ্রীনিবাসের (সম্পাদিত) 'ইন্ডিয়ান ভিলেজেস', ম্যাককিম ম্যারিয়টের (সম্পাদিত) 'ভিলেজ ইণ্ডিয়া' (খ) শহরগুলির (গ) জাতিকে (ঘ) সবুজ

**অনুশীলনী-৪**

(১) অকৃষিমূলক (২) অর্জিত (৩) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো (৪) স্তরবিন্যাস (৫) অর্থনৈতিক (৬) বৌদ্ধধর্ম (৭) নগরকেন্দ্রিক

**অনুশীলনী-৫**

১। (ক) শিল্পায়নের (খ) জীবিকার, নগরের (গ) স্তরবিভক্ত (ঘ) প্রাক্-শিল্পায়ন

২। (ক) ☑ (খ) ☒ (গ) ☑

**অনুশীলনী-৬**

(ক) মিশ্র (খ) নৈর্ব্যক্তিক, চুক্তি (গ) বৃত্তিগত (ঘ) ৫০০০

## অনুশীলনী-৭

(১) ☑ (২) ☒ (৩) ☒ (৪) ☑

## অনুশীলনী-৮

(ক) ☑ (খ) ☒ (গ) ☑ (ঘ) ☒

## সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

১। চার্লস মেটকাফের মতে, প্রাচীন ভারতের গ্রামসমাজগুলি ছোট গণরাজ্য ছোট গণরাজ্য যেখানে অধিবাসীদের সব চাহিদাই পূরণ হয়। তাই বাইরের সমস্ত সম্পর্ক থেকে এরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আয়তনে ক্ষুদ্র এবং লোকেদের জীবনযাত্রা সরল হওয়ার ফলে এই সমাজের সব প্রয়োজনই গ্রামের অভ্যন্তরে মেটানো সম্ভব হয়। অন্য কোনও গ্রাম বা শহরের ওপর এই সমাজগুলি নির্ভরশীল নয়।

২। প্রাচীন ভারতে একই গ্রামে অধিবাসীরা একটি ভূখণ্ডে সবাই মিলে বসবাস করার ফলে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ পেতেন। একই প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকার ফলে এবং একই অভিজ্ঞতায় জীবন কাটানোর ফলে তাঁদের মূল্যবোধ একই রকম হয় ও জীবনযাপন প্রণালী সাদৃশ্যযুক্ত হয়। গ্রামের বাইরে কোথাও গেলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব গ্রামের নাম দ্বারা পরিচিত হ'তেন—জাতি দিয়ে নয়। গ্রাম সম্পর্কে অধিবাসীদের একটি সচেতনতা ও গর্ববোধ তাঁদের মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধন করত।

৩। অনেক সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে, ভারতের গ্রামগুলি বহির্জগতের চাহিদার মুখে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কখনই বজায় রাখতে পারে নি। প্রাচীনকালেও নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যক্তিরা অনেক সময় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়া-আসা করেছেন। ভিন্ন গ্রামের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ-বন্ধনের ফলে গ্রামগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে। এছাড়াও যজমানি প্রথার দৌলতে বিভিন্ন গ্রামের জাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদান চালিয়েছে এবং তার ফলেও গ্রামগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছে।

৪। জমিস্বত্ত্বের ক্ষেত্রে জমিদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তন ক'রে ইংরেজরা ভারতীয় গ্রামে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যের এক অভিনব পদ্ধতি চালু করে। জমিদারি প্রথায় জমিদাররা ইংরেজ সরকারের পক্ষে গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। বিনিময়ে তারা বিদেশী সরকারের কাছ থেকে কিছু আনুকূল্য লাভ করত। রায়তওয়ারি প্রথায় রায়তরা কিছু অর্থের বিনিময়ে কিছু জমির স্বত্ত্ব ভোগ করত। তারা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের সঙ্গে কাজকর্মের ব্যাপারে আদান-প্রদান চালাত এবং সেইজন্য জমিদারেরা এই রায়তদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারত না।

৫। মার্ক্স দেখিয়েছেন, প্রাচীন ভারতীয় গ্রামের হস্তশিল্প, তাঁতের চরকা ধ্বংস করে ইংরেজরা গ্রামের স্বয়ং সম্পূর্ণতা নষ্ট করে দেয় এবং এ'রকম সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মার্ক্স যদিও এই বুর্জোয়া সামাজিক বিপ্লবের ক্ষতিকারক দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; তবুও প্রাচীন গ্রামের প্রতিক্রিয়াশীল রূপটিও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন ভারতের গ্রামসমাজকে ইংরেজ শাসকেরা মেরুদণ্ডবিহীন করে তোলে। তার পাশাপাশি নিজেদের অজান্তে সামাজিক পরিবর্তন এনে এই ইংরেজরাই ভারতীয় সমাজের পক্ষে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে।

৬। সমাজতাত্ত্বিক যোগেন্দ্র সিং দেখিয়েছেন যে, ভারতের প্রাচীন শহরগুলি ক্রমোচ্চ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্বলিত ছিল। স্তরবিন্যাস অনুযায়ী পুরনো সংস্কৃতিকে ধ'রে রাখার প্রয়াস এখানে দেখা যেত। সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুবিধাজনক স্থানগুলি সামাজিক অবস্থান বিভিন্ন অধিবাসীর মধ্যে বন্টন করা হ'ত। যেমন, রাজা বা নগরপ্রধানের কর্মস্থল সর্বাধিক সুবিধাজনক জায়গায় নির্দিষ্ট থাকত এবং তারপরেই সুযোগ পেতেন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা ও ব্যবসায়ীরা। নিম্নজাতিভুক্ত ব্যক্তি অথবা অস্পৃশ্যদের লোকালয় নির্দিষ্ট হ'ত সর্বাপেক্ষা কম সুবিধাজনক জায়গায়—উচ্চতাজিভুক্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শের অনেক দূরে।

৭। নিম্নলিখিত বিভিন্ন পেশার লোক নিয়ে আমাদের নগরসমাজের কাঠামোর সম্পূর্ণ চিত্রটি আমরা পাই—

(১) উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও আমলাগণ।

(২) উচ্চ আয়যুক্ত পেশাদার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পে পেশার আধিকারিকগণ, বিভিন্ন কলাকুশলী ও বড় ব্যবসায়ী।

(৩) সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কেরাণীগণ ও কর্মচারীগণ, বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, সাংবাদিক, ছোট দোকানের মালিকগণ, ছোট পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ।

(৪) মজুর-সম্প্রদায়ের লোকেরা, যেমন—কারিগর, যন্ত্রাদির, চালক, পারিবারিক বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীরা, ফেরিওয়ালা এবং অন্য শ্রমজীবীরা।

৮। পাশ্চাত্যদেশে জীবিকার সন্ধানে লোকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের এসব আশা পূর্ণ হয়। কিছু দিনের মধ্যেই তারা নগরজীবনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় ও নগরজনসংখ্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ভারতে গ্রামের অধিবাসীরা নগরের আপাত বিলাসবহুল জীবনের আকর্ষণে এখানে আসলেও তারা নগরজীবনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না। আবার, কিছু লোক নগরে কয়েক মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে বাস করে কারণ গ্রামে কৃষিকাজ ঋতুনির্ভর। অনেকে আবার যোগ্যতার অভাবে উপযুক্ত জীবিকা সন্ধানে ব্যর্থ হয় ও বস্তিতে থাকতে বাধ্য হয়। এরা কেউই নগরজীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে নিজেদের মূল্যবোধ মানিয়ে নিতে পারে না।

## ৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী


1. Dutt, R. P. : India Today—Manisha Granthalaya, 1986
2. Mandelhaum, David G. : Society in India, Popular Prakashan, 1972
3. Sharma, K. L. : Indian society, NCERT, 1990
4. Singh, Y. : Modernization of Indian Tradiiton, Thomson Press (India) Limited, 1973

# একক-৪ ❑ বর্ণ ও জাতি

গঠন :

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ প্রাচীন ভারতে বর্ণ ও জাতি

- ৪.৩.১ বর্ণের উদ্ভব
- ৪.৩.২ শ্রমবিভাজন ও বর্ণ
- ৪.৩.৩. বর্ণের কঠোরতা
- ৪.৩.৪. ব্রাহ্মণের ক্ষমতাবৃদ্ধি
- ৪.৩.৫. আশ্রমধর্ম

৪.৪ জাতপাত প্রথার উদ্ভব

- ৪.৪.১ জাতপাতের সংখ্যা বৃদ্ধি
- ৪.৪.২ জাতপাত প্রথার কঠোরতা
- ৪.৪.৩ জাতপাত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
- ৪.৪.৪. অহিন্দু সমাজের জাতপাতের অস্তিত্ব
- ৪.৪.৫. জাতপাত প্রথার বিবর্তন
- ৪.৪.৬ বর্তমান ভারতে জাতপাত প্রথা

৪.৫ সারাংশ

৪.৬ সর্বশেষ প্রণালী

৪.৭ উত্তরমালা

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

## ৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠশেষে আপনি যা করতে পারবেন—

● প্রাচীন ভারতে বর্ণ কিভাবে উদ্ভব হয়েছিল এবং কিভাবে তা সমাজের মৌলিক কাঠামো হয়ে দাঁড়ালো তা অনুধাবন করতে।

● বর্ণপ্রথাতে কিভাবে বিভিন্ন পরিবর্তন আসলো এবং কালক্রমে তা কিভাবে একটি কঠোর রূপ পরিগ্রহণ করল তা বুঝতে।

● জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা করতে।

● বর্তমান সমাজে বর্ণ বা জাতির কি ধরনের প্রভাব আছে তা বিশ্লেষণ করতে এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজে জাতিপ্রথার প্রভাব সম্পর্কে অনুমান করতে।

## ৪.২ প্রস্তাবনা

একক ২-তে ভারতীয় সমাজের বিবর্তন আলোচন করার সময় 'বর্ণ ও জাতি' সম্পর্কে আপনি কিছু ধারণা পেয়েছেন। এই এককে আমরা সম্পূর্ণভাবেই 'বর্ণ ও জাতি'র ওপরেই আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় সমাজের মূল কাঠামো অনেকাংশেই 'বর্ণ ও জাতি'র ওপর নির্ভরশীল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে চিনতে গেলে বর্ণ ও জাতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। এই প্রথার উদ্ভব সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। আবার ক্রমবিকাশ, বিস্তার ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে এই প্রথা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে ভারতীয় সমাজের চেহারা আমাদের কাছে অধরা থেকে যাবে।

বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা আমাদের ঐতিহ্যের বাহক। কালের বিবর্তনে বহুল পরিবর্তন হয়েছে—সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার-ব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে আমাদের বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথাতেও বহুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথা অবলুপ্ত হয়নি। অর্থাৎ যুগের ব্যবধানে এই প্রথা পরিবর্তিত বা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

## ৪.৩ প্রাচীন ভারতে বর্ণ ও জাতি

বর্ণবিভাগ ও জাতিভেদ প্রথাকে ভারতীয় সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু নৃতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যতে আমরা জানতে পারি তা ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশেও বর্ণ ও জাতির কিছু কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষে এই প্রথার ক্রমবিকাশ ও বিস্তার লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে এবং এখানেই বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা কঠোর রূপ পরিগ্রহ করে।

ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্রে 'আর্য' ও 'দস্যু'—এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বর্ণ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ রঙ। এই রঙ বা বর্ণের ভিত্তিতে আর্য ও দাসদের পৃথকভাবে চেনা যেত। আর্যরা গৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং দাসেরা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ছিলেন। অধ্যাপক ঘুরে (Ghurye) দেখিয়েছেন যে, আর্য ও দাসের এই পার্থক্য পরবর্তীকালে আর্য ও শূদ্রের পার্থক্যকেই চিহ্নিত করে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, প্রাক্-বৈদিক যুগে বর্ণবিভাগের আবির্ভাব হয়। তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে একথাও বলা হয় যে, প্রাচীন ইরানেও সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল যেগুলি 'পিসত্রা' অর্থাৎ বর্ণ বা রঙ হিসেবে চিহ্নিত হ'ত। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, সামাজিক স্তরে বিন্যস্ত করার পদ্ধতি পূর্ববর্তী ইন্দো-ইরানীর যুগ থেকে প্রচলিত ছিল।

### ৪.৩.১ বর্ণের উদ্ভব

ঋগ্বেদে 'আর্য' ও 'দস্যু'—এই দু'টি শ্রেণীর উল্লেখ ছাড়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে যে, চতুবর্ণের সৃষ্টি হয় 'পুরুষ' থেকে। সেই পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য বর্ণ সৃষ্টি হয়। এই তিন বর্ণের পরিচর্যার জন্য চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্র সৃষ্টি হয় পুরুষের পদদ্বয় থেকে। বৈদিকযুগের পরবর্তী সাহিত্যেও উল্লেখ আছে যে, চতুবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে পরম ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পদযুগল থেকে।

বর্ণব্যবস্থা আর্যসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হ'লেও আর্যদের দ্বারাই এই ব্যবস্থা সৃষ্ট হয়েছে কিনা তা নিয়ে কোনও কোনও তাত্ত্বিক সংশয় প্রকাশ করেন। কারণ, আর্যরা ভারত ছাড়াও ইউরোপ ও পারস্যে গিয়ে স্থির হয়। কিন্তু

সেসব দেশে 'বর্ণ' বা 'জাত' ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আর্যপূর্ব দ্রাবিড়ীয় সভ্যতায় (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতায়) জাতব্যবস্থার কড়াকড়ি আর্য সভ্যতায় এই ব্যবস্থা থেকে বেশি ছিল। আমরা বলতে পারি সম্ভবত আর্য ও অনার্য উভয় সমাজব্যবস্থার সংমিশ্রণেই এই বর্ণপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল।

নৃতত্ত্ববিদেরা দেখিয়েছেন, আর্য আগমনের আগে (প্রাক্-আর্য যুগে) ভারতে মূলত তিনটি বর্ণের লোকেরা বসবাস করতেন,—পীতবর্ণের কিন্নররা থাকতেন উত্তরে হিমালয় পর্বতের গায়ে, শ্যামবর্ণের দ্রাবিড়দের বাস ছিল সিন্ধুনদের অববাহিকায় এবং পূর্বাঞ্চলে কৃষ্ণকায় অস্ট্রিকগণ বসবাস করতেন। গৌরবর্ণের আর্যরা এই তিন বর্ণের লোকেদের সঙ্গে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে সম্ভবত বর্ণ সম্পর্কে সচেতনতা ছিল। বিশেষত এখানকার কৃষ্ণবর্ণের দাস ও বিজয়ী গৌরবর্ণের আর্যদের মধ্যে বর্ণহেতু সামাজিক পার্থক্যও গড়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে সম্ভবত এভাবেই বর্ণভেদের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে বৃত্তির ভিত্তিতে সামাজিক বিভাগগুলি বর্ণবিভাগ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

---

## অনুশীলনী-১

**শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(১) ভারতবর্ষে বর্ণ ও জাতি প্রথা ———— রূপ পরিগ্রহ করে।

(২) ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্রে ——— ও ——— এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৩) ——— গৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং ———— কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ছিলেন।

(৪) পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে যে, চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয় ——— থেকে।

(৫) পুরুষের ——— থেকে ব্রাহ্মণ, ——— থেকে ক্ষত্রিয়, ——— থেকে বৈশ্য বর্ণ সৃষ্টি হয়।

(৬) তিন বর্ণের পরিচর্যার জন্য চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ ———— সৃষ্টি হয় পুরুষের ———— থেকে।

(৭) কৃষ্ণবর্ণের দাস ও বিজয়ী ———— মধ্যে বর্ণহেতু সামাজিক ———— গড়ে উঠেছিল।

---

## ৪.৩.২ শ্রমবিভাজন ও বর্ণ

কোনও কোনও পণ্ডিত দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, আর্যদের আগমনের পর ভারতবর্ষে এক উন্নত সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে, সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কারের পর এইসব মত ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। সিন্ধুসভ্যতার পতনের পর খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে যাযাবর ইন্দো-আর্যরা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করতে থাকেন। তাঁরা প্রথমদিকে পশুপালনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। পশুপালন থেকে স্থায়ী কৃষিব্যবস্থায় পরিবর্তনের মাঝে প্রায় এক থেকে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত আর্যরা ভারতের স্থানীয় অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। কাজেই এই সময়ের ভারতের ইতিহাস আর্য ও অনার্যদের সংগ্রামের ইতিহাস। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'জাতিভেদ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন,—''...যখন আর্যেরা সপ্তনদীর তীরবর্তী প্রদেশে পদার্পণ করেছিলেন, তখন এ দেশের আদিম অধিবাসীগণের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে তাঁহারা জয়লাভ করেছিলেন। এই জয়লাভের পর তাঁহাদের প্রভুত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। আদিম অধিবাসীগণের কিয়দংশ তাঁহাদের দাসত্ব স্বীকার করিল অপরাংশ পর্বত ও অরণ্যাদিতে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর তাঁহাদের উপরে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা দাসত্ব স্বীকার করিল তাহারা দাস ও যাহারা উপদ্রবকারী হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা 'দস্যু' নামে পরিচিত হইল। কিন্তু উভয়ে এক জাতির লোক। ইহারাই ভবিষ্যতের শূদ্র''। (শিবনাথ শাস্ত্রী—জাতিভেদ— সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সংস্করণ-১৩৭০) শিবনাথ শাস্ত্রী আরও লিখেছেন, ''...যখন প্রতিনিয়ত দস্যুগণের উপদ্রব চলিতে লাগিল, এবং তাহাদের ভয়ে সুখ শান্তিতে শ্রমের অন্ন ভোগ করা আর্যদিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িল, তখন আর্যগণের

আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। তাহারা আপনাদের মধ্য হইতে কতকগুলি সবলকায় সাহসী ও সমরকুশল লোক বাছিয়া আপনাদের গ্রাম ও জনপদ সকলের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। ইঁহারা সশস্ত্র হইয়া দলে দলে স্বীয় স্বীয় অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই ক্রমে ক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। 'ক্ষত্র' শব্দের অর্থ যাহারা ক্ষয় হইতে রক্ষা করে।...এই ক্ষত্রগণ আদিতে অবিভক্ত আর্যসমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন; তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র প্রভৃতি প্রভেদ ছিল না; কর্মভেদবশতঃ এই সকল প্রভেদ উৎপন্ন হইল।'' আবার শাস্ত্রী দেখাচ্ছেন, ''বর্তমান হিন্দুসমাজের ধর্মানুষ্ঠানের সাহায্যের জন্য যেমন এক শ্রেণীর দশকর্মান্বিত লোক দৃষ্ট হয়, প্রাচীন আর্যসমাজের বেদমন্ত্র সকলের রক্ষা ও শিক্ষার নিমিত্ত এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই উত্তরকালে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।'' এভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত সমাজের অন্যান্য সাধারণ লোকজন (যাঁরা মোট জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা বেশী অংশ) কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হলেন এবং বৈশ্য হিসেবে চিহ্নিত হ'লেন। এভাবে অর্থ উৎপাদন আরম্ভ হ'ল। কাজেই আর্যরা কাজ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হিসেবে এবং এদেশের আদিম অনার্য লোকেরা শূদ্র হিসেবে চিহ্নিত হলেন। এই শূদ্র বা দাসেরা সংগঠিত ছিলেন 'বিশ্' নামের এক জনগোষ্ঠীতে। আবার বৈদিক মানবগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর জন্যও একই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে দেখলে আর্য এবং দাসদের মধ্যেকার লড়াইকে মনে হবে মোটামুটিভাবে একই ধরনের জীবনযাপনকারী বৈদিক জনগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ সংঘাত। ঋগ্বেদের বহুসূক্ত থেকে মনে হয়, আর্য-দেবতা ইন্দ্র দাসদের জয় করেছিলেন। এইসব সূক্তে উল্লিখিত আছে যে, ইন্দ্র এই নীচ দাসবর্ণকে গুহায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক হিসেবে তিনি দাসদের বশ মানানোর চেষ্টা করেন।

ঋগ্বেদে 'বর্ণ' শব্দটি আর্য এবং দাস উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লেও শব্দটি কোন শ্রমবিভাজনের ইঙ্গিত দেয় না। কিন্তু এই শ্রমবিভাজনই হয়ে ওঠে পরবর্তী কালের ব্যাপক সামাজিক শ্রেণীগুলোর ভিত্তি। 'আর্য' এবং 'দাস' বর্ণ ছিল দু'টি বড় জনগোষ্ঠীর দল, যেগুলি তখন ভেঙে গিয়ে সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে।

---

## অনুশীলনী—২

**শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

১। সিন্ধুসভ্যতা পতনের পর খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে যাযাবর ——— দলে দলে ভারতে প্রবেশ করতে থাকেন।

২। পশুপালন থেকে স্থায়ী কৃষিব্যবস্থায় পরিবর্তনের মাঝে দীর্ঘসময় আর্যরা ভারতের স্থানীয় ——— সঙ্গে ——— লিপ্ত ছিলেন।

৩। আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের সংগ্রামে ———— জয়লাভ করলেন।

৪। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে যাঁরা আর্যদের দাসত্ব স্বীকার করল তারা ——— এবং যারা তাঁদের উপদ্রবকারী হয়ে দাঁড়াল, তারা ——— নামে পরিচিত হ'ল। এরাই ভবিষ্যতের ————।

৫। আর্যরা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের মধ্য থেকেই কিছু উপযুক্ত লোককে ——— করে গ্রাম ও জনপদের প্রান্তে স্থাপন করলেন। এঁরাই ক্রমে ———— বলে চিহ্নিত হ'লেন।

৬। প্রাচীন আর্যসমাজের বেদমন্ত্র রক্ষা ও শিক্ষার জন্য যাঁরা নিযুক্ত হলেন তাঁরা ভবিষ্যতে ———— বলে প্রসিদ্ধ হ'লেন।

৭। ———— কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হ'লেন।

৮। ঋগ্বেদে 'বর্ণ' শব্দটি কোনও ———— ইঙ্গিত দেয় না।

---

## ৪.৩.৩ বর্ণের কঠোরতা

বৈদিক যুগে এক বর্ণের অপর বর্ণত্ব প্রাপ্তির ঘটনা প্রায়ই ঘটত। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ ও আহার গ্রহণের ব্যাপারে কোনও নিষেধ ছিল না। মনুসংহিতাতে দেখা যায় যে, মনু অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষও নিম্নবর্ণের কন্যার মধ্যে বিবাহের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ নিম্নজাতীয় পুরুষ ও উচ্চজাতীয় কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। তবে নিতান্ত অসদ্ভাব বা কলহ না ঘটলে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক আহারাদি গ্রহণের ব্যাপারে কোনও নিষেধ ছিল না।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, ভারতীয় সমাজে বর্ণপ্রথার উৎপত্তি হয় প্রাক্-শ্রেণীবিভক্ত সমাজে। এই বর্ণই পরে শ্রেণী-সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলি ক্রমশ কঠোর রূপ পরিগ্রহ করে। কালক্রমে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বর্ণপ্রথাও ক্রমশ বৃত্তিমূলক বা পেশাভিত্তিক হয়ে পড়ে। এভাবে সামাজিক গোষ্ঠী বা বর্ণগুলি জাতির রূপ নেয়। এজন্যই অনেক সময় 'বর্ণ' ও 'জাতি'র মধ্যে পার্থক্য করা জটিল হয়ে পড়ে।

## ৪.৩.৪ ব্রাহ্মণের ক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রথমদিকে আর্যজাতির প্রথম দু'টি বর্ণ অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—প্রত্যেকেই নিজেকে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার প্রয়াসে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই বিবাদ বহু শতাব্দী ধরে চলে এবং অবশেষে ঠিক হয় যে, ক্ষত্রিয়রা কেবল দেশরক্ষা ও রাজ্যশাসন করবে এবং ব্রাহ্মণরা কেবল যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ইত্যাদি কাজ করবে—কেউ কারও অধিকারের সীমা অতিক্রম করবে না। কিন্তু এরপর থেকে ব্রাহ্মণদের প্রতাপ ও আধিপত্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। ক্ষত্রিয় রাজাকে চালনা করার জন্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিযুক্ত হ'ল। সর্বত্রই দেশ ও সমাজের চালিকাশক্তির কাজ ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্পন্ন হ'তে লাগল। সেই সময়কার সমাজ ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হ'ত এবং আধ্যাত্মিক বা ধর্মসংক্রান্ত সব কাজেই ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা যতই নিরঙ্কুশ হ'তে লাগল অপরাপর বর্ণের লোকেদের অবস্থা ততই হীন হ'ল। তার সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক অধিকার খর্ব করা হ'ল। মনু বলেছেন—"...ব্রাহ্মণদের দাসত্ব করিবার জন্যই ঈশ্বর তাহার (শূদ্রের) সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বীয় প্রভু যদি শূদ্রকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন তাহা হইলেও শূদ্র দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না; কারণ দাসত্ব তাহার স্বভাবজাত, কে তাহা লঙঘন করিতে পারে?" ক্রমশ শূদ্রদের ওপর পশুত্ব আরোপ করার জন্য তাদের ধর্মের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, এই বর্ণভেদের মাধ্যমে আর্যরা নিজেদের জাতিগত শুদ্ধতা বজায় রাখতে চেয়েছেন,—নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে কৃষ্ণকায় স্থানীয় অধিবাসীদের দমন করতে চেয়েছেন।

## ৪.৩.৫ আশ্রমধর্ম

বর্ণভেদের সঙ্গে নীতিকারেরা উচ্চ বর্ণগুলির জীবনধারা পরিচালনা করার জন্য কিছু নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এভাবে আমরা আশ্রম-প্রথার উল্লেখ পাই। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের জীবনে এই প্রথা অনুযায়ী চারটি অধ্যায় দেখা যায়। প্রথম জীবন, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যে ব্যক্তি পড়াশুনায় মনোনিবেশ করে ও চরিত্র গঠন করে; দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ গার্হস্থ্যে ব্যক্তি পরিবার গঠন করে এবং তার দায়-দায়িত্ব পালন করে; তৃতীয় অধ্যায়ে বা বাণপ্রস্থে সংসার, পরিবার থেকে নিজেকে মুক্ত করে ব্যক্তি বনে যায় ও তপস্যায় নিমগ্ন হয়; সবশেষে, অর্থাৎ সন্ন্যাসে ব্যক্তি সব জাগতিক বন্ধন থেক নিজেকে মুক্ত করে কৃচ্ছ্রসাধনা করে। ইহজাগতিক মায়ায় নিজেকে সে আর জড়িত করে না—পরম

বা অলৌকিক লাভের সাধনায় সে তখন মগ্ন, উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা আশ্রমধর্ম পালনের মাধ্যমে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। নিম্নবর্ণের লোকেদের সাথে এভাবেও তাদের দূরত্ব বজায় থাকত।

---

### অনুশীলনী—৩

**ঠিক ☑ কি ভুল ☒ চিহ্নিত করুন ঃ**

১। বৈদিক যুগে এক বর্ণের অপর বর্ণত্ব প্রাপ্তি প্রায়ই ঘটত।

২। মনু প্রতিলোম বিবাহের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

৩। বৈদিক যুগে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক আহারাদি গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধ ছিল না।

৪। কালক্রমে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

৫। বর্ণপ্রথা প্রথম থেকেই পেশাভিত্তিক ছিল।

৬। ক্ষত্রিয় রাজাকে চালনা করার জন্য পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

৭। ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা যতই নিরঙ্কুশ হ'তে লাগল, অপরাপর বর্ণের লোকেদের অবস্থাও ততই উন্নত হ'তে লাগল।

৮। শূদ্রদের ওপর মনুষ্যত্ব আরোপ করার জন্য তাদের ধর্মের অধিকার অস্বীকার করা হয়নি।

৯। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ—সব ব্যক্তিদের জীবনেই আশ্রমধর্ম অনুযায়ী চারটি অধ্যায় দেখা যায়।

১০। গার্হস্থ্য স্তরে মানুষ গৃহ ছেড়ে বনে গিয়ে তপস্যা করে।

১১। সন্ন্যাসে ব্যক্তি সব জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কৃচ্ছ্রসাধনা করে।

---

## ৪.৪ জাতপাত প্রথার উদ্ভব

বৈদিক যুগের শেষ বর্ণগুলির মধ্যে পেশাভিত্তিক আরও ছোট ছোট বিভাগ দেখা যায়। এই বিভিন্ন উপবিভাগগুলি পরে অনড় ও অনমনীয় 'জাত' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই জাতগুলির আচরণবিধির ধর্মশাস্ত্রে বা মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত ছিল। কিন্তু এই বিধিগুলি নতুন ধ্যানধারণা অনুযায়ী পরিমার্জিত হ'তে পারে। অর্থাৎ, তখনও পর্যন্ত জাতগুলি অনড় বা কঠোর রূপ পরিগ্রহ করেনি। কোনও কোনও সময়ে যাজকশ্রেণী বা পুরোহিতশ্রেণী তাদের নিজেদের ভাবধারা বা শ্রেণী-উদ্দেশ্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী সমাজে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগগুলি সামাজিক চাহিদাপূরণের মাধ্যম হিসেবে ধরা হ'ত। সমাজের বিচিত্র প্রয়োজনগুলি এই জাতগুলি তাদের নির্দিষ্ট পেশা বা কাজের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ করার চেষ্টা করত। বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি পেশার ভিত্তিতে পৃথক হ'লেও নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজগুলি সম্পন্ন করত। এভাবে অনেক সমাজবিজ্ঞানী জাতপাত প্রথার একটি কর্মনির্বাহী তত্ত্ব (functional view) বা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তখনও পর্যন্ত জাতপাত প্রথার বংশগত ভিত্তি স্বীকৃত হয়নি।

### ৪.৪.১ জাতপাতের সংখ্যা বৃদ্ধি

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনকারী হিসেবে ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। ফলে, বহু ব্রাহ্মণ দরিদ্র হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। (পরে অবশ্য হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয় এবং ব্রাহ্মণদের প্রভাব আবার বৃদ্ধি পায়।) ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি ক্ষত্রিয়দের

মর্যাদাও হ্রাস পায়। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন বর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের নিয়োগের ফলে পেশাদার যোদ্ধা ক্ষত্রিয়দের সামাজিক পদমর্যাদা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল। ক্ষত্রিয়দের আর্থিক অবস্থা এর ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কাজে অন্যান্য বর্ণের লোকেদের নিয়োগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বৈশ্য বর্ণের কাঠামোতেও অবক্ষয় আরম্ভ হয়। গুপ্তরাজাদের সময় এই ভাঙন আরও দ্রুতগতিতে হয়। দরিদ্র বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে পার্থক্য এই সময় ছিল নগণ্য। কৃষিকাজ ও কারুশিল্পের উন্নতি ঘটায় এইসব কাজে এই সময়ে বহু শূদ্র শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। এভাবে বর্ণবৈষম্য তার প্রাচীন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছিল। এর পরিবর্তে বংশভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক জাতপাত প্রথা ক্রমশ গুরুত্ব পেতে আরম্ভ করে। জাতগুলি ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এরা পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থে আবদ্ধ ছিল। জাত-গঠনের প্রক্রিয়া চলে দীর্ঘদিন ধরে। শ্রমবিভাগ ও শ্রমের বিশেষীকরণের ফলে ভারতীয় শহর ও গ্রামাঞ্চলে জাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব জাত-সংগঠনগুলিতে বর্ণভেদের রীতি কঠোরভাবে মানা হ'ত। তবে পরবর্তীকালে জাতপাতের যে অনমনীয় চরিত্র দেখা যায়, গুপ্তযুগে এর নিয়মকানুন ততটা কঠোর ছিল না,—জাতগুলি তখনও তাদের ঐতিহ্যগত পেশা বদলাতে পারত এবং অনেক গোষ্ঠীই পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিল। যেমন, পশ্চিম ভারতের একদল তাঁতি উৎপাদনগত নানা সমস্যার কারণে একসময়ে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে কেউ সৈনিক, কেউ ধনুর্দ্ধর সৈনিক, কেউবা চারণকবি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে। এভাবে বর্ণগত স্তরবিভাগের বিচারে তারা তাদের সামাজিক মর্যাদা অনেকটা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। অনেক পণ্ডিত দেখান যে, বর্ণশুদ্ধি রক্ষা করার জন্য একই বর্ণের বাবা-মায়ের সন্তানকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহের সন্তানকে তার বাবা বা মায়ের সামাজিক স্তর থেকে ভিন্ন অন্য আর একটি স্তরের বা নির্দিষ্ট একটি জাতের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল। ব্রাহ্মণেরা এভাবে চেষ্টা করেন সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত নতুন নতুন সামাজিক স্তর বা জাতের উৎপত্তির কারণ দেখাতে। ক্রমে ক্রমে সমাজে অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তারা চতুর্বর্ণের কাঠামোর বাইরে সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরে স্থান পায়। এরা সবচেয়ে হীন ধরনের কাজ করতে বাধ্য হয়। সমাজস্থ উচ্চবর্ণের বা জাতের লোকেরা এদের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। এদের দেহে কখনও কখনও উলকি চিহ্ন এঁকে এদের নীচু সামাজিক পদমর্যদা বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত। এরা কোনরকম রাজনৈতিক অধিকারও ভোগ করতে পারত না।

---

## অনুশীলনী—৪

**ঠিক ☑ অথবা ভুল ☒ চিহ্নিত করুন ঃ**

১। বৈদিক যুগের শেষে বর্ণগুলির মধ্যে পেশাভিত্তিক আরও ছোট ছোট বিভাগ দেখা যায়।

২। বৈদিক যুগে বিভিন্ন জাতির জন্য কোনও আচরণবিধি ছিল না।

৩। অনেক সমাজবিজ্ঞানী জাতিভেদ প্রথার একটি কর্মনির্বাহী তত্ত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

৪। প্রথম থেকেই জাতিভেদ প্রথার বংশগত ভিত্তি স্বীকৃত হয়।

৫। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৬। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কাজে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের লোকেদের নিয়োগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

৭। গুপ্তরাজ্যে দরিদ্র বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে পার্থক্য ছিল খুব বেশী।

৮। বর্ণবৈষম্য ক্রমে তার প্রাচীন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছিল এবং পরিবর্তে বংশভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক জাতিভেদ প্রথা ক্রমশ গুরুত্ব পেতে আরম্ভ করে।

৯। জাতিগঠনের প্রক্রিয়া বেশীদিন ধরে চলেনি।

১০। গুপ্তযুগে জাতিগুলি তাদের ঐতিহ্যগত পেশা বদলাতে পারত না।

১১। অনেক পণ্ডিত দেখান যে, বর্ণগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে জাতিপ্রথার উদ্ভব।

## ৪.৪.২ জাতপাত প্রথার কঠোরতা

প্রথমদিকে জাতগুলি ছিল পেশাভিত্তিক। কালক্রমে সামাজিক গোষ্ঠীগুলি কঠোর রূপ পরিগ্রহ করে। পরে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বর্ণপ্রথাও ক্রমশ বৃত্তিমূলক বা পেশাভিত্তিক হয়ে পড়ে। এভাবে প্রাথমিক অবস্থার বর্ণগুলি জাতের রূপ নেয়।

জন্মসূত্রে জাত-নির্ধারণের প্রক্রিয়া উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জাতপাত প্রথা কঠোরতা প্রাপ্ত হয়। এর সঙ্গে সমগোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক সীমিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জাতের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানারকম বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। নতুন নতুন পেশা বা বৃত্তি উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উপজাত ও মিশ্রজাতের সৃষ্টি হয়। জাতপ্রথায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

বর্ণসৃষ্টির প্রথম অবস্থায় প্রথম তিন বর্ণের সচলতার পথ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু শূদ্রদের বৃত্তি পরিবর্তনের কোনও অধিকার ছিল না। অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত। সেভাবে ব্রাহ্মণদেরও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণের কথা শোনা যায়, কিন্তু, বৈশ্যদের সঙ্গে এই দুই বর্ণের মেলামেশা কম ছিল। বৈশ্যরা শূদ্রদের কাছাকাছি ছিল। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। এই বিরোধ মেটানোর জন্য জাত-ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপদান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

জাত-ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও দৃঢ় করে গড়ে তোলার জন্য ধর্ম ও কর্মবাদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁরই দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্ট হয়েছে, কাজেই তাঁর বিধান আমাদের মেনে চলা উচিত। কর্মবাদে দেখানো হয় আমাদের এই জীবনের কর্মফল আমরা পরের জন্মে ভোগ করব। এজন্মে ভাল কাজ করলে, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম যথাযথ পালন করলে পরজন্মে আমরা উচ্চতর বর্ণ প্রাপ্ত হ'তে পারি। এভাবে ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে পরিশেষে আমাদের মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব।

---

## অনুশীলনী—৫

**শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

১। প্রথমদিকে জাতগুলি ছিল ————।

২। পরবর্তীকালে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ ———— হয়ে যায়।

৩। নতুন নতুন পেশা বা বৃত্তি উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ——— ও ——— সৃষ্টি হয়।

৪। বর্ণসৃষ্টির প্রথম অবস্থায় প্রথম তিন বর্ণের ———— পথ উন্মুক্ত ছিল।

৫। জাত-ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও দৃঢ় করে গড়ে তোলার জন্য ———— ও ——— ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৬। কর্মবাদে দেখানো হয় আমাদের এই জীবনের ——— আমরা পরের জন্মে ভোগ করব।

---

## ৪.৪.৩ জাতপাতব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে আমরা জাতিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সব অধিবাসীর মধ্যেই এই ব্যবস্থা বিস্তারলাভ করেছে। বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জাতিভেদ প্রথার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে। প্রথমত, জাতিব্যবস্থা বংশানুক্রমিক। পেশা অনুযায়ী জাতি নির্ধারণের পাশাপাশি পিতার জাত অনুযায়ী সন্তানের জাত নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়ত, নিজেদের জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ সীমবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে কেবল ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহই শুদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে,

প্রতি জাতের অন্তর্গত বিভিন্ন সবরজাতগুলিও এই গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ ব্যবস্থাকে (Endogamy) সমর্থন করে। সেহেতু একটি উপজাতির মধ্যেই বিবাহ সীমিত থাকে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণের সবরজাত) পাত্রের বিবাহ সেই সবরজাত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গেই সঙ্ঘটিত হতে পারে—ব্রাহ্মণজাতভুক্ত অন্যান্য সবরজাতের কন্যার সঙ্গে নয়। তৃতীয়ত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার জাতপাতব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উঁচুজাতের লোকেরা নীচুজাতের ছোঁয়া খাদ্য বা জল গ্রহণ করে না। নীচুজাত বিশিষ্ট লোকেরা মন্দিরে প্রবেশের বা পানীয় জল ব্যবহারের অনুমতি পায় না। অস্পৃশ্য, অর্থাৎ নীচুজাতের লোকেদের ছায়া দেখলেও উঁচুজাতের লোকেদের জাত যায়। চতুর্থত, জাতব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তর দেখা যায়,—ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ স্তর সর্বজনস্বীকৃত। এরপর অঞ্চলভেদে এক এক জাত এক এক স্তর দখল করে। কিন্তু সর্বনিম্নস্তরে সর্বত্রই অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্যরা অবস্থান করে। কাজেই জাতের একটি আঞ্চলিক ভিত্তি আছে। পঞ্চমত, জাতগুলি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিতি পায়। জন্মসূত্রে ব্যক্তির জাত নির্ধারিত হয় এবং আজীবন সে সেই জাতের দ্বারাই পরিচিত হয়। ষষ্ঠত, এই ব্যবস্থায় এককভাবে ব্যক্তি সামাজিক সচলতা প্রদর্শনের সুযোগ পায় না। কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে কোনও কোনও জাত নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে পারে। যেমন, বাংলায় বল্লাল সেন কুলীন-প্রথা প্রবর্তন করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি করেন। কর্মদোষে বা কর্মগুণে গোষ্ঠীগুলি এই স্তরগুলির মধ্যে ওঠানামা করতে পারত। আবার সমাজতাত্ত্বিক শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন, উঁচুজাতের জীবনাদর্শ বা অভ্যাস অনুকরণ করে নীচুজাতের লোকেরা সমষ্টিগতভাবে তাদের জাতকে সামাজিক স্তরবিন্যাসে উচ্চতর স্তরভুক্ত হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারে। আমরা আগের এককে দেখেছি, এই প্রক্রিয়াকে শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ণ' প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বলা যায় যে, জাতপাতব্যবস্থা সমাজে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। অনেক ক্ষেত্রেই উঁচুজাতের ব্যক্তিরা সামাজিক মর্যাদা ভোগ করার সুবাদে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাতেও বলশালী হন। প্রথম অবস্থায় বর্ণবিভক্ত সমাজে স্তরগুলি পেশাভিত্তিক ছিল এবং কালক্রমে পেশার বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাত ও সবরজাতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সৃষ্টি গোষ্ঠীগুলি সবসময় সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিন্যস্ত জাতগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল না। তাই অনেক সময় দেখা গেছে যে, শূদ্র বা বৈশ্য অথবা অপেক্ষাকৃত নীচুজাতের লোকেদের আর্থিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা সামাজিক মর্যাদায় অনেক ছোট।

---

## অনুশীলনী—৬

**সঠিক উত্তরে ☑ দাগ দিন ঃ**

১। জাতপাতব্যবস্থা হল একটি বংশগত/অর্জিত পরিচয়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

২। জাতপ্রথায় নিজেদের জাত বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকে/বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ হ'তে পারে।

৩। জাতপাতব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতের স্তরবিন্যাস সব অঞ্চলে একই হয়/অঞ্চলভেদে পৃথক হ'তে পারে।

৪। এককভাবে কোনও ব্যক্তি/গোষ্ঠীগতভাবে কোনও কোনও জাত নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে পারে।

৫। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সৃষ্ট গোষ্ঠীগুলি—সবসময় সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিন্যস্ত জাতগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল/প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল না।

---

## ৪.৪.৪ অহিন্দু সমাজে জাতের অস্তিত্ব

মনে রাখবেন যে, জাতপাত প্রথা কেবল ভারতীয় হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মুসলমান, শিখ এমনকি খ্রীষ্টানদের মধ্যেও জাতপাত প্রথা আছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতের জনসংখ্যা কমিশনার দেখিয়েছেন যে, অহিন্দু ভারতীয়দের মধ্যে গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহভিত্তিক গোষ্ঠী ছিল। এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কিছু বংশগত পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠীগুলি কেবল নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ প্রথা চালু রেখেছিল। মুসলিমদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বা অপবিত্রতার ধারণাও আমরা দেখতে পাই। তাদের মধ্যে হিন্দু জাত-গোষ্ঠীগুলির মত ভূস্বামী, ঝাড়ুদার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী দেখা যায়। শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পেশাভিত্তিক জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়। এদের মধ্যে আবার অস্পৃশ্যতা অথবা অপবিত্রতার নীতিও মানতে দেখা যায়।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যেমন—শ্রীলঙ্কা, বার্মা এমনকি জাপানেও জাতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু ভারতে, বিশেষত হিন্দুদের মধ্যে, জাতপাত প্রথা যেভাবে উদ্ভূত হয়ে এদের জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে—এমনটা আর কোনও ক্ষেত্রে হয়নি।

## অনুশীলনী—৭

**শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

১। মুসলিমদের মধ্যে ——— বা ——— র ধারণা আমরা দেখতে পাই।
২। জাতপাত প্রথা কেবল ভারতীয় ——— বৈশিষ্ট্য নয়।
৩। ব্রিটিশ আমলে অহিন্দু ভারতীয়দের মধ্যে জাতের মত ———— ভিত্তিক গোষ্ঠী ছিল।
৪। শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ———— জাতের অস্তিত্ব দেখা যায়।
৫। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র যেমন ———— এমনকি ——— জাতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে।

## ৪.৪.৫ জাতপাত প্রথার বিবর্তন

ভারতের জাতপাত প্রথা বিভিন্ন সময়ের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। প্রাচীন যুগে বর্ণ বা জাতপাত প্রথা সমাজের বুকে যখন অনড় হয়ে বসেছে, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যখন সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়েছে—সেইসময়ে এই প্রথার মূলে কুঠারঘাত করেন মহাত্মা শাক্যসিংহ। তিনি ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক তথা সামাজিক প্রভুত্বের প্রতিবাদ করলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সময় থেকে নীচজাতীয় লোকেদের উন্নতি আরম্ভ হ'ল। বহু নিকৃষ্ট বর্ণের লোক বুদ্ধের শরণাপন্ন হ'লেন। এভাবে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথা কিছুটা শিথিল হ'ল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হ'ল না। পাটলিপুত্রের রাজারা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করলেও অন্য প্রদেশের রাজারা হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করার চেষ্টা করলেন—ফলে জাতিভেদ প্রথা লুপ্ত হ'ল না।

জাতিভেদের ওপর মুসলমান রাজারা দ্বিতীয় আঘাত হানেন। এঁরা জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শূদ্র ও নিকৃষ্ট জাতিভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিরা এঁদের সংস্রবে এসে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে লাগলেন। এঁদের অনেকে জমিদারি লাভ করলেন। সংস্কৃত ভাষার অনাদর হওয়াতে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ক্রমশ কমতে থাকে।

জাতিভেদ প্রথার এরকম বিবর্তনের সময় এদেশে ইংরাজদের আগমন হয়। নগরায়ণ প্রক্রিয়া আলোচনার সময় (একক-৩-তে) আমরা দেখেছি যে, ইংরেজরা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশের

সমাজের মূল ভিত নড়িয়ে দেয়। তাদের প্রচেষ্টায় সব জাতির লোকেদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে শিক্ষালাভ করতে থাকে। একত্র বসা, খাওয়া, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথার সংস্কারগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। উদার পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে আমাদের দেশের লোকেদের মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচে গিয়ে মন ক্রমশ প্রসারিত হ'তে লাগল। জাতিভেদ প্রথার কঠোর রূপ অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে গেল। কিন্তু এই ব্যবস্থা অন্যরূপ পরিগ্রহ করল।

ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতীয় জনগণ জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়লে তাদের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ানো কঠিন হবে। এই সত্য অনুধাবন করে তারা ভারতের জাতপাতব্যবস্থাকে অন্যরূপে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে। ব্রিটিশরা আসার পরে ভারতীয় সমাজের আধা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটে এবং ক্রমশ ধনতান্ত্রিক ধাঁচের আধুনিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। স্বভাতই এর ফলশ্রুতি অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস। এই অর্থনৈতিক শ্রেণী যত শক্তিশালী হ'তে থাকে জাতপাত প্রথার সঙ্কীর্ণ আচারগুলি ততই আলগা হয়, বিশেষত নগর অঞ্চলে। সমাজতাত্ত্বিক এ. আর. দেশাই দেখিয়েছেন, খুব উন্নত না হ'লেও জাতপাত ব্যবস্থা ক্রমশ শ্রেণীব্যবস্থার চরিত্র গ্রহণ করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জাত ও শ্রেণী—ভারতীয় সমাজের চিত্রকে পরিস্ফুট করার দু'টি স্তম্ভ। সমাজতাত্ত্বিক যোগেন্দ্র সিং-এর মতে, জাতপাত প্রথার পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীব্যবস্থাই আবর্তিত হয়। জাতপাত-দ্বন্দ্ব বা জাত-বিবাদ প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী-দ্বন্দ্বেরই নামান্তর। জাতপাত-সংগঠনগুলি তাদের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে।

## ৪.৪.৬ বর্তমান ভারতে জাতপাত প্রথা

স্বাধীন ভারতে জাতপাত প্রথা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক সংস্কার বা গোঁড়ামি (যেমন—অস্পৃশ্যতা, শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার ইত্যাদি) হয়তো লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু আপনি দেখেছেন আমাদের সমাজ থেকে জাতপাত প্রথা সেই অর্থে এখনও বিলুপ্ত হয়নি। বিশেষত বিহারের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত বহুলাংশে আমরা স্ব-জাত থেকে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করে থাকি। জাতপাতবিন্যাস ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা সম্পর্কযুক্ত হিসেবে দেখতে পাই। তাই দেখা যায়, উচ্চজাতের লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করছে—অন্যদিকে নীম্নজাতভুক্ত লোকেদের মধ্যে অভাব ও দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী হিসেবে বিরাজ করছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্বাধীন ভারত সরকার তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ জাতপাত প্রথার একটি নতুন মাত্রা দেয়। জাতপাত ব্যবস্থা ভারতের রাজনীতিতেও প্রবেশ করেছে। ক্ষমতাপ্রধান জাতপাত বা শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলেও সমর্থ হয় এবং এভাবে জাতপাত বিন্যাসে তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। আমরা দেখি যে, লোকসভা বা বিধানসভা অথবা জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে জাত-সংগঠনগুলি অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সাধারণ নির্বাচনেও অনেক সময় জাতভিত্তিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এভাবে আধুনিক ভারতীয় সমাজ নির্বাচন, কর্মজীবনের সুযোগ, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতপাত প্রথার প্রভাব আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারি না। তথাকথিত উচ্চজাতের লোকেদের হাতে অনেক সময় 'হরিজন' বা অস্পৃশ্যদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। কাজেই জাতপাত বর্তমান ভারতীয় সমাজে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। তবে 'জাতপাত' ব্যবস্থাটি অর্থনৈতিক শ্রেণীকে প্রভাবিত করলেও জাত ও শ্রেণী কখনও এক নয়। জাত কখনও শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত হয় না আবার শ্রেণী কখনও জাতের পদবাচ্য হ'তে পারে না। যাই হোক, আমরা দেখলাম

যে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে জাতপাত প্রথা বর্তমানে তার বহু পূর্ব বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেছে। কিন্তু এ প্রথা এখনও আমাদের সমাজ থেকে দূরে সরে যায়নি। সমাজের প্রাচীন ভিত্তি হিসেবে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতপাত প্রথা প্রবেশ করে তার প্রভাব বিস্তার করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে।

### অনুশীলনী—৮

১। **একটি শব্দে উত্তর দিন ঃ**

(ক) প্রাচীন ভারতে পাটলিপুত্র ব্যতীত অন্য প্রদেশের রাজারা কোন্ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রদর্শনের চেষ্টা করেন?

(খ) প্রাচীনযুগে জাতপাত প্রথার মূলে কে কুঠারঘাত করেন?

(গ) জাতপাত প্রথার ওপর কোন্ রাজারা দ্বিতীয় আঘাত হানেন?

(ঘ) সংস্কৃত ভাষার অনাদর হওয়াতে কাদের প্রতিপত্তি কমতে থাকে?

(ঙ) কাদের প্রচেষ্টায় ভারতের সব জাতের লোকেদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়?

(চ) ইংরেজ শাসনকালে জাতপাতব্যবস্থা ক্রমশ কোন্ ব্যবস্থার চরিত্র গ্রহণ করতে থাকে?

২। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) জাতপাতবিন্যাস ও অর্থনৈতিক ——— অনেক ক্ষেত্রে আমরা সম্পর্কযুক্ত হিসেবে দেখতে পাই।

(খ) ——— পর থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য ——— জাতপাত প্রথাকে একটি নতুন মাত্রা দেয়।

(গ) দেশের সাধারণ নির্বাচনে অনেক সময় ——— দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(ঘ) বর্তমান ভারতীয় সমাজে ——— অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে।

(ঙ) সমাজের প্রাচীন ভিত্তি হিসেবে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ——— প্রবেশ করে তার প্রভাব বিস্তার করছে ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নতুন ———— পরিগ্রহ করছে।

(চ) ——— জাতপাত ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

(ছ) উদার পাশ্চাত্য ———— প্রসারের ফলে আমাদের দেশের লোকেদের মনের ——— ঘুচে যেতে লাগল।

(জ) ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতীয় জনগণ জাতি, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে ———— হয়ে পড়লে তাদের পক্ষে ——— বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ানো কঠিন হবে।

## ৪.৫ সারাংশ

এই এককে আমরা বর্ণের উদ্ভব ও ক্রমে জাতির বিকাশ ও বিবর্তন আলোচনা করলাম। ঋগ্বেদে 'আর্য' ও 'দাস'—এই দু'টি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌরবর্ণের উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট আর্যরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে এদেশের কৃষ্ণকায় খর্বাকৃতি নাসিকাবিশিষ্ট লোকেদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই দুই গোষ্ঠীতে লড়াই চলাকালে নিজেদের প্রয়োজন সাধনের জন্য আর্যদের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনটি বর্ণ সৃষ্ট হয়। আর দাসেরা শূদ্র বর্ণ হিসেবে চতুর্থ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমশ, সামাজিক বিবর্তনের ফলে বর্ণব্যবস্থার মধ্য থেকেই জাতপাত প্রথা উদ্ভূত হয়। এই প্রথাটিও প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ ও ব্রিটিশ যুগের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। প্রথমে কর্মবিভাজনের ওপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অনেক পণ্ডিত দেখাতে

চেষ্টা করেন যে, এই ধরনের শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে সমাজ সুষ্ঠুভাবে চালিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতের পারস্পরিক সম্পর্ক নানা ধরনের নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে জাতপাত প্রথা কঠোরতা প্রাপ্ত হয়। ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর জাতপাত প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি অনেক পরিমাণে শিথিল হয়। কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের সুদৃঢ় করার জন্য এদেশের লোকেদের মধ্যে গোষ্ঠীতন্ত্র অর্থাৎ জাতপাতগত, ধর্মগত বা ভাষাগত বিভেদকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। কাজেই জাতপাত প্রথার কঠোর রূপ কিছুটা পরিমাণে পরিবর্তিত হ'লেও এই প্রথার মাধ্যমে অন্যভাবে বিভিন্ন বিভেদের বীজ রোপিত হয়।

জাতপাতের মাধ্যমেই একসময় আমাদের পরিচিতি ঘটত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে জাতের প্রভাব পরিলক্ষিত হ'ত। নানা পরিবর্তনের ফলে জাতের কঠোরতা অনেক কমে গেলেও আর্থিক বা রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে বর্তমানেও জাতপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আধুনিক সমাজে জাতের একটি শ্রেণীচরিত্রও লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণীস্বার্থকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে জাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কাজেই উদারনৈতিক মূল্যবোধের অভ্যুদয়ে জাতের ধর্মীয় আবরণ অনেক পরিমাণে ক্ষয় হ'লেও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতের প্রভাব বর্তমান সমাজেও আমরা কাটিয়ে উঠতে অথবা এড়িয়ে চলতে পারি না।

## ৪.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। ঋগ্বেদের মন্ত্রে বর্ণ সম্পর্কে কি চিত্র পাওয়া যায়?
২। বর্ণপ্রথার উদ্ভব কিভাবে হয়?
৩। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বলতে কি বোঝায়? এদের মধ্যে কোন্‌টিকে মনু স্বীকৃতি দিয়েছেন?
৪। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল?
৫। চারটি আশ্রমধর্ম সম্পর্কে কি জানেন? বর্ণনা করুন।
৬। জাতপাত প্রথার কর্মনির্বাহী ব্যাখ্যা কিভাবে করা যায়?
৭। কিভাবে জাতপাত প্রথা কঠোরতা প্রাপ্ত হয়?
৮। ভারতীয় সমাজ 'অস্পৃশ্যতা'র ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
৯। ভারতের জাতপাতব্যবস্থায় গোষ্ঠীগত সচলতা বলতে কি বোঝায়?
১০। অহিন্দু সমাজে জাতপাত প্রথা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
১১। জাতপাত প্রথার ওপর আঘাতগুলি কি কি? আলোচনা করুন।
১২। স্বাধীন ভারতে জাতপাতভেদ প্রথার অস্তিত্ব আছে কি? মন্তব্য করুন।

## ৪.৭ উত্তরমালা

### অনুশীলনী-১

(১) কঠোর (২) 'আর্য' ও 'দস্যু' (৩) আর্যরা, দাসেরা (৪) পুরুষ (৫) মুখ, বাহুদ্বয়, (৬) শূদ্র, পদদ্বয় (৭) গৌর আর্যদের পার্থক্য।

### অনুশীলনী-২

(১) ইন্দো-আর্যরা (২) অনার্যদের যুদ্ধবিগ্রহে (৩) আর্যরা (৪) দাস-দস্যু-শূদ্র (৫) সশস্ত্র, এয় (৬) ব্রাহ্মণ (৭) বৈশ্যরা (৮) শ্রমবিভাজনের।

## অনুশীলনী-৩

(১) ☑ (২) ☒ (৩) ☑ (৪) ☑ (৫) ☒ (৬) ☑ (৭) ☒ (৮) ☒ (৯) ☒ (১০) ☒ (১১) ☑

## অনুশীলনী-৪

(১) ☑ (২) ☒ (৩) ☑ (৪) ☒ (৫) ☒ (৬) ☑ (৭) ☒ (৮) ☑ (৯) ☒ (১০) ☒ (১১) ☒

## অনুশীলনী-৫

(১) পেশাভিত্তিক (২) সীমাবদ্ধ (৩) উপজাতি, মিশ্রজাতি (৪) সচলতার (৫) ধর্ম—কর্মবাদের (৬) কর্মফল।

## অনুশীলনী-৬

(১) বংশগত (২) নিজেদের জাত বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকে (৩) অঞ্চলভেদে পৃথক হতে পারে (৪) গোষ্ঠীগত ভাবে কোন কোন জাত (৫) প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল না।

## অনুশীলনী-৭

(১) অস্পৃশ্যতা-অপবিত্রতার (২) হিন্দুসমাজের (৩) অন্তর্বিবাহ (৪) পেশাভিত্তিক (৫) শ্রীলঙ্কা, বার্মা-জাপানেও।

## অনুশীলনী-৮

১। (ক) হিন্দুধর্মের (খ) মহাত্মা শাক্যসিংহ (গ) মুসলমান রাজারা (ঘ) ব্রাহ্মণদের (ঙ) ইংরেজদের (চ) শ্রেণীব্যবস্থার।

২। (ক) শ্রেণীবিন্যাসকে (খ) স্বাধীনতার, সংরক্ষণ (গ) জাতপাতভিত্তিক (ঘ) জাতাপাত প্রথা (ঙ) জাতপাত প্রথা, রূপ (চ) মুসলমান রাজারা (ছ) শিক্ষার, সঙ্কীর্ণতা (জ) বিভক্ত, ব্রিটিশ শাসনের।

## সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। ঋগ্বেদে গৌরবর্ণবিশিষ্ট আর্য ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট দাসের উল্লেখ ছাড়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। এই তিন বর্ণের পরিচর্যার জন্য চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্র সৃষ্ট হয় পুরুষের পদদ্বয় থেকে।

২। নৃতত্ত্ববিদেরা দেখিয়েছেন, আর্য আগমনের আগে ভারতে মূলত তিনটি বর্ণের লোকেরা বসবাস করতেন—পীতবর্ণের কিন্নররা থাকতেন উত্তরে হিমালয় পর্বতের গায়ে, শ্যামবর্ণের দ্রাবিড়দের বাস ছিল হিন্দুনদের অববাহিকায় এবং পূর্বাঞ্চলে কৃষ্ণকায় অষ্ট্রিকগণ বাস করতেন। গৌরবর্ণের আর্যরা এই তিন বর্ণের লোকেদের সঙ্গে যুক্ত হন। এখানকার কৃষ্ণবর্ণের দাস ও বিজয়ী গৌরবর্ণের আর্যদের মধ্যে বর্ণহেতু সামাজিক পার্থক্যও গড়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে সম্ভবত এভাবেই বর্ণভেদের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে বৃত্তির ভিত্তিতে সামাজিক বিভাগগুলি বর্ণবিভাগ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৩। উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের কন্যার মধ্যে বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হয়। অপরপক্ষে নিম্নজাতীয় পুরুষ ও উচ্চজাতীয় কন্যার মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হ'লে তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। মনু অনুলোম বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৪। বহু শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার লড়াই চলে। কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজাকে পরিচালনা করার জন্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার সময় থেকে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। সেই

সময়কার সমাজ ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হ'ত এবং আধ্যাত্মিক বা ধর্মসংক্রান্ত সব কাজেই ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং অপরাপর বর্ণের লোকেদের অবস্থা ক্রমশ হীন হ'ল।

৫। বর্ণভেদের সঙ্গে নীতিকারেরা উচ্চবর্ণগুলির জীবনধারা করার জন্য চারটি আশ্রম বা অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম জীবনে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ব্যক্তি পড়াশুনায় মনোনিবেশ করে ও চরিত্র গঠন করে; দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ গার্হস্থ্য ব্যক্তি পরিবার গঠন করে তার দায়দায়িত্ব পালন করে। তৃতীয় অধ্যায়ে বা বাণপ্রস্থ আশ্রমে ব্যক্তি নিজেকে সংসার ও পরিবার থেকে মুক্ত করে বনে গমন করে ও তপস্যায় নিমগ্ন হয়; সবশেষে অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমে ব্যক্তি সব জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে 'পরম' লাভের সাধনায় মগ্ন হয়। উচ্চবর্ণের লোকেরা এভাবে আশ্রমধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করত। নিম্নবর্ণের লোকেদের সঙ্গে এই আশ্রমধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে তাদের দূরত্ব বজায় রাখা কিছু পরিমাণে সম্ভব হ'ত।

৬। বৈদিকযুগের শেষে বর্ণগুলির মধ্যে পেশাভিত্তিক ছোট ছোট বিভাগ দেখা যায়। কোনও কোনও তাত্ত্বিকের মতে, পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগগুলি সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম। সমাজের বিচিত্র প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ করার জন্য জাতগুলি তাদের নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক কাজকর্ম সম্পাদন করত। গোষ্ঠীগুলি পেশার ভিত্তিতে পৃথক হ'লেও নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজগুলি সম্পন্ন করত। এভাবে সমাজের ভারসাম্য বজায় থাকত। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এ ধরনের কর্মনির্বাহী তত্ত্ব (জাতপাতভেদ সম্পর্কে) দিয়েছেন।

৭। জন্মসূত্রে জাতনির্ধারণের প্রক্রিয়া উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জাতপাত প্রথা কঠোরতা প্রাপ্ত হয়। এর সঙ্গে সমগোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক সীমিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জাতের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানারকম বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ মেটানোর জন্য জাতপাতব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপদান করা হয়। ধর্ম ও কর্মবাদের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় কঠোর করে গড়ে তোলা হয়।

৮। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার জাতপাতব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই বিচার অনুযায়ী উঁচুজাতের লোকেরা নীচুজাতের ছোঁয়া খাদ্য বা জল গ্রহণ করতে পারবে না। নীচুজাতের লোকেরা অস্পৃশ্য বা অচ্ছুৎ এবং সেজন্য তারা পানীয় জল ব্যবহারের অনুমতিটুকুও পাবে না। মন্দিরে তাদের প্রবেশ। তাদের ছায়া দর্শনও উঁচুজাতের লোকেদের নিষিদ্ধ।

৯। ভারতীয় সমাজে জাতপাতব্যবস্থার বিধিনিষেধের পাশাপাশি আমরা দেখি গোষ্ঠীগতভাবে কোনও কোনও জাত নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে পারে। যেমন—বাংলায় বল্লাল সেন কুলীন-প্রথা প্রবর্তন করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি করেন। কর্মদোষে বা কর্মগুণে গোষ্ঠীগুলি এই স্তরগুলির মধ্যে ওঠানামা করতে পারত। সামাজতাত্ত্বিক শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন, উঁচুজাতের লোকেদের জীবনাদর্শ অনুকরণ করে নীচুজাতের লোকেরা সমষ্টিগতভাবে তাদের জাতকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উচ্চতর স্তরভুক্ত হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারে।

১০। গবেষণায় দেখা গেছে, অহিন্দু অর্থাৎ মুসলমান, শিখ এমনকি খ্রীষ্টানদের মধ্যেও জাতের মত অন্তর্বিবাহভিত্তিক গোষ্ঠী আছে। তাদের মধ্যে হিন্দু জাতগোষ্ঠীগুলির মত ভূ-স্বামী, ঝাড়ুদার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী দেখা যায়। এই পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি এদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বা অপবিত্রতার ধারণাও দেখা যায়। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যেমন—শ্রীলঙ্কা, বার্মা এমনকি জাপানেও জাতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে।

১১। প্রাচীনযুগে বর্ণ বা জাতপাতভেদ প্রথা সমাজের বুকে যখন অনড় হয়ে বসেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক তথা সামাজিক প্রভুত্বের প্রতিবাদ করে এই প্রথার মূলে কুঠারঘাত করেন মহাত্মা শাক্যসিংহ। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সময় থেকে বহু নিকৃষ্ট বর্ণের লোক বুদ্ধের শরণাপন্ন হন।

জাতপাত প্রথার ওপর দ্বিতীয় আঘাত হানেন পৌত্তলিকার বিরোধী মুসলমান রাজারা। এঁদের শাসনকালে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি কমতে থাকে এবং শূদ্র ও নিকৃষ্ট জাতভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিরা এঁদের সংস্রবে এসে নিজেদের অবস্থান উন্নতি ঘটান।

ইংরেজরা এদেশে আসার পর তাদের প্রবর্তিত উদার পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে জাতপাত প্রথার কঠোর রূপ অনেক পরিমাণে শিথিল হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে—ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে শিক্ষালাভ করতে থাকে এবং তাদের একত্র খাওয়া বসা, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে জাতপাত প্রথার সংস্কারগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু প্রথাটি অবলুপ্ত না হয়ে অন্যরূপ পরিগ্রহ করল।

১২। স্বাধীন ভারতে জাতপাতবিন্যাস ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসকে অনেকক্ষেত্রে আমরা সম্পর্কযুক্ত হিসেবে দেখতে পাই। তাই উচ্চজাতের লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ জাতপাত প্রথাকে একটি নতুন মাত্রা দেয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় জাতপাত ভিত্তিক সংগঠনগুলি প্রবেশ করে এবং এভাবে জাতপাতব্যবস্থা ভারতের রাজনীতিতেও প্রবেশ করেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত আমরা স্ব-জাত থেকে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করে থাকি। আধুনিক ভারতীয় সমাজে দেশের সাধারণ নির্বাচন, কর্মজীবন ক্ষেত্র, শিক্ষাজগৎ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখা যায়। এভাবে বর্তমান ভারতে জাতপাত প্রথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিস্তার করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে।

## ৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী


১। আন্তোনভা, বোন্‌গার্দ-লেভিন, কতোভ্‌স্কি ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮২

২। চাকলাদার, স্নেহময় ঃ ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭

৩। শর্মা, রামশরণ ঃ প্রাচীন ভারতের শূদ্র, কে. পি. বাগচী এবং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯

৪। শাস্ত্রী, শিবনাথ ঃ জাতিভেদ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্করণ, ১৩৭০।

# একক ৫ ❑ পরিবার

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ পরিবারের সংজ্ঞা

৫.৪ পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব

৫.৪.১ পরিবারের বৈশিষ্ট্য

৫.৫ পরিবারের প্রভারভেদ

৫.৫.১ দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার

৫.৫.২ যৌথ পরিবার

৫.৫.৩ হিন্দু যৌথ পরিবার

৫.৫.৪ যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য

৫.৬ ভারতীয় মুসলিম পরিবার

৫.৭ পরিবারের কার্যাবলী

৫.৭.১ সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা

৫.৮ যৌথ পরিবারের ভাঙনের কারণ

৫.৮.১ উদ্ভূত প্রবণতা

৫.৯ পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ

৫.১০ সারাংশ

৫.১১ অনুশীলনী

৫.১২ গ্রন্থপঞ্জী

## ৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ—

- কিভাবে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব ঘটল
- পরিবারের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ
- দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার ও যৌথ পরিবার কাকে বলে
- ভারতবর্ষে যৌথ পরিবারের প্রকৃতি কি রকম
- পরিবারের কার্যাবলী

- যৌথ পরিবারের ভাঙনের কারণ
- পরিবারের ভবিষ্যৎ

## ৫.২ প্রস্তাবনা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজজীবন যাপনের জন্য মানুষ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানিক আচারব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে পরিবারই সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। পরিবার ব্যবস্থাই মানুষকে প্রাণীজগতের অন্যান্য জীবের থেকে পৃথক করেছে। বর্তমান এককে আমরা পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা দেখব, দম্পতি কেন্দ্রিক পরিবার এবং যৌথ পরিবার কাকে বলে। ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থা কি রকম এবং সময়ের সঙ্গে পরিবার ব্যবস্থায় কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

## ৫.৩ পরিবারের সংজ্ঞা

পৃথিবীর যে কোনও সমাজেই পরিবার হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সঙঘ। সাধারণভাবে বলতে গেলে স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যে প্রাথমিক সঙঘ তাকে পরিবার বলা হয়। ম্যাক আইভার ও পেজ (Mac Iver and Page) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ''The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for procreation and upbringing of children.'' অর্থাৎ, যৌন বাসনা চরিতার্থ করা, সন্তান উৎপাদন ও সন্তান পালনের জন্যই মানুষ পরিবার গঠন করে। আবার বার্জেস ও লক (Burgess and Locke) পরিবারের অন্যতর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, পরিবার বলতে বোঝায় a group of persons united by ties of marriage, blood or adoption, constituting a single household; interacting and communicating with each other in their respective social roles of husband and wife, of son and daughter, mother and father, brother and sister; creating and maintaining a common culture. অর্থাৎ বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক বা দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট; পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক রক্তের অথবা দত্তকের মাধ্যমে। দ্বিতীয়, পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা একই বাসস্থানে বাস করে। তৃতীয়ত, পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা সমাজ-নির্দিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের পারিবারিক ভূমিকা পালন করে; যেমন, পিতা-মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ইত্যাদি। চতুর্থত, প্রত্যেক পরিবারেরই একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে।

## ৫.৪ পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব

আদিম সমাজের অতীতে গভীর অনুসন্ধান চালিয়েও এমন কোনও গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়নি যেখানে পরিবারের অস্তিত্ব ছিল না। সব সমাজেই সব সময়েই দেখা গেছে নারী-পুরুষের যৌন মিলনের উপর কোনও না কোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। কিছু গবেষক মনে করেন যে, মানবসভ্যতার আদিযুগে নির্বিচার যৌনাচার প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা আদিম মানুষের উৎসবের সময় যৌন স্বেচ্ছাচারিতা, স্ত্রী বিনিময়, অতিথি আপ্যায়নে

স্ত্রী-উপহার দেওয়া প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এও দেখিয়েছেন যে, মধ্য অস্ট্রেলিয়া ও ট্রব্রিয়ান্ডদ্বীপের আদিম আদিবাসীদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে পিতৃত্বের ধারণা অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু এইসব যুক্তি পরবর্তীকালের নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের উদ্ভব সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়। একটি মত অনুসারে বিবর্তনের আদি যুগে পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক ; অন্যমতানুসারে তা ছিল পিতৃতান্ত্রিক। হেনরী মেইন (Henry Maine) এর মতে, আদিম সমাজে পরিবারই ছিল মূল সঙঘ। জাতি, উপজাতি প্রভৃতি বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন সমষ্টিকরণের মাধ্যমে। ওয়েষ্টারমার্কের (Wetermarck) মতে, পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে পুরুষের অসূয়া এবং অধিকারবোধ থেকে; যে অধিকার ক্রমশ প্রথাসিদ্ধ হয়। অন্যদিকে, ব্রিফলট (Brifflut) বলেন যে, আদিম যুগে নারীই ছিল সামাজিকভাবে প্রভাবশালী। শিকারজীবন থেকে কৃষিকাজে উত্তরণ ও সম্পত্তির ধারণার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিকতার ধারণার উদ্ভব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজ পিতৃতান্ত্রিক না মাতৃতান্ত্রিক ছিল তা বর্তমানকালে বলা সম্ভবই নয়, কারণ ইতিমধ্যে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে এবং সামান্য কিছু প্রত্নতান্ত্রিক উৎস ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণই আমাদের কাছে নেই। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড (Gordon childe) দেখিয়েছেন যে, আদিম মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার কারণে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে পিতৃতান্ত্রিকতা বা মাতৃতান্ত্রিকতাকে অবলম্বন করেছে।

অতএব, বলা যায় যে, পরিবারের উদ্ভবের পিছনে কোনও একটিমাত্র কারণ কাজ করেনি। ম্যাক্ আইভার ও পেজের মত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, The family has no origin in the sense the there ever existed a stage of human life from which the family was absent or another stage in which it emerged. বিবর্তনের পথে সমাজ কোনও একটি ধারা অবলম্বন করেনি। অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের ধারায় পুষ্ট হয়ে সে বিবর্তিত হয়েছে। তাই কোনও একটি মানুষী প্রবণতা দ্বারা পরিবার সৃষ্ট হয়েছে একথা বলা যায় না। মানুষের প্রয়োজন, ইচ্ছা ও প্রবণতার সংমিশ্রণেই সর্বত্র পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে।

## ৫.৪.১. পরিবারের বৈশিষ্ট্য

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব অন্য যে কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী। পরিবার ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং এর যে কোনও ধরনের পরিবর্তন সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন সূচনা করে। বিভিন্ন সমাজে পরিবারের ধরন বিবিধ; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও নানারকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবার ব্যবস্থা চিরস্থায়ী। দেশ, কাল, সমাজ নির্বিশেষে পরিবারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হ'ল ঃ

(১) **বিশ্বজনীনতা ঃ** পরিবার ব্যবস্থা পৃথিবীর সব সমাজেই বিদ্যমান। সমাজ-প্রগতির যে কোনও স্তরেই পরিবার ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এমনকি মনুষ্যেতর প্রাণীজগতেও পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই কোনও-না-কোনও পরিবারের সদস্য।

(২) **আবেগ-নির্ভরতা ঃ** পরিবারের অন্যতম ভিত্তি হ'ল আবেগ-নির্ভরতা। যৌন মিলন, সন্তান উৎপাদন, পিতৃ-মাতৃস্নেহ সবই আবেগ-সঞ্জাত, রোমাণ্টিক প্রেম থেকে বংশগৌরব, সঙ্গী/সঙ্গিনীর প্রতি মমত্ব থেকে অর্থনৈতিক নির্ভরতা, সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারবোধ থেকে বংশধারা রক্ষা সবই পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

**(৩) প্রাথমিক প্রভাব ঃ** যে কোনও মানব-শিশুই যেহেতু কোনও-না-কোনও পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের প্রাথমিক প্রভাব অনস্বীকার্য। পরিবারই শিশুর জৈবিক অভ্যাস ও মানসিক-বৃত্তিগুলির দিক্‌নির্দেশ করে দেয়। পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তির প্রথম স্ফুরণ ঘটে এবং তার প্রভাব সারাজীবন ব্যাপ্ত থাকে।

**(৪) সীমিত আকার ঃ** পরিবারের আকার সর্বদাই সীমিত। কারণ, পরিবারের অস্তিত্ব রক্তের সম্পর্কের দ্বারা নির্দ্ধারিত। সুতরাং, সামাজিক কাঠামোয়, বিশেষত সভ্য সমাজে, পরিবার অন্যান্য গোষ্ঠী-সম্পর্ক বিরহিত এক সামাজিক সঙঘ।

**(৫) সামাজিক কাঠামোয় মূল অবস্থান ঃ** সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূলে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। আদিম সমাজে ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক পিতৃশাসিত সমাজে সামাজিক কাঠামো পরিবার-নির্ভর ছিল। আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে পরিবার তার কাজকর্ম অনেকটাই অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাছে হারালেও, দেখা যায় যে, কোনও  কোনও সামাজিক স্তরে বসবাসকারী মানুষেরা কতকগুলি পরিবারের সমাহারমাত্র।

**(৬) পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বশীল ঃ** অন্যান্য যে কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মানুষ পরিবারের প্রতি বেশী দায়িত্বশীল ও যত্নবান হয়। দেশের বিপদের সময় মানুষ একদিন সংগ্রাম করে হয়তো জীবন বিসর্জনও দেয়; কিন্তু পরিবারের কল্যাণের জন্য মানুষ সারাজীবন পরিশ্রম করে। পরিবারের মধ্যে মানুষ, বিশেষত নারী, পরিবারের অন্যান্যদের জন্য নির্দিষ্ট ও গুরুদায়িত্ব পালন করে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, পরিবার মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। পরিবারের প্রতি ভালবাসা ও তৃপ্তিলাভের জন্যই মানুষ এই দায়িত্ব পালন করে।

**(৭) সামাজিক বিধিনিষেধ ঃ** প্রত্যেক সমাজেই কিছু সামাজিক বিধিনিষেধ ও কিছু আইন-কানুন দ্বারা পরিবার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত। 'বিবাহ' এই রকম একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা সমাজ নরনারীর যৌন-মিলন, সন্তানের পিতৃ/মাতৃপরিচয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বিবাহের পদ্ধতি বিভিন্ন সমাজে, দেশে, ধর্মে-ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু তার মূল কথা হ'ল যৌন জীবন যাপনের উপর বিধিনিষেধ-আরোপ। পরিবার হ'ল এমনই এক প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় বা পারস্পরিক সম্মতিতেও নিষ্ক্রান্ত হ'তে পারে না।

**(৮) চিরস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী চরিত্র ঃ** প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন; কিন্তু সঙঘ হিসেবে পরিবার ক্ষণস্থায়ী, কারণ, একজন ব্যক্তিমানুষের জীবদ্দশাতেই তা সীমাবদ্ধ।

## ৫.৫ পরিবারের প্রকারভেদ

যদিও পরিবার একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান কিন্তু তার গঠন ও কাঠামোর ক্ষেত্রে কেবল বিভিন্ন সমাজের মধ্যেই নয় একই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও পার্থক্য আছে। বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের গঠন ও কাঠামোকে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) বৈবাহিক সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, এবং ভাই-বোন সম্পর্কের উপর নির্ভর করে সবচেয়ে বিস্তৃত শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

আমরা মূলত যে যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবারের প্রভারভেদ করতে পারি সেগুলি হ'ল ঃ প্রথমত, পরিবার রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক (consanguine) অথবা বিবাহ সম্পর্ক ভিত্তিক (conjugal) হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, পরিবার গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ ভিত্তিক (endogamous) বা গোষ্ঠী বহির্ভূত ভিত্তিক (exogamous) হ'তে পারে। তৃতীয়ত, পতি বা পত্নীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারের প্রভারভেদ হ'তে পারে। যেমন, একগামী (monogamous) পরিবার, বহুপত্নীক (Polygamous) বা বহুভর্তৃক (Polyandrous) পরিবার। চতুর্থত, পরিবারে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পিতৃশাসিত (patriarchal) বা মাতৃশাসিত (matriarchal) পরিবারকে এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। পঞ্চমত, বংশধারার ভিত্তিতে পরিবার পিতৃপরিচায়ী (Patrilineal) বা মাতৃপরিচায়ী (matrilineal) হ'তে পারে। ষষ্ঠত, বিবাহপরবর্তী সময়ে বসবাসের স্থানের নিরিখে পরিবার পতি-আবাসিক (Patrilocal) বা পত্নী-আবাসিক (matrilocal) হ'তে পারে। সপ্তমত, প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিই দুই পরিবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে। একটি হ'ল যে পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রতিপালিত হয়। তাকে বলে পালিয়িতৃ পরিবার বা family of orientaion। অন্যটি হ'ল বিবাহের পর সে যখন নিজে সংসার স্থাপন করে ও সন্তানের জন্ম দেয় সেই পরিবারকে জন্মদাতৃ পরিবার বা family of procreation বলা হয়। অষ্টমত, পালয়িত পরিবার ও জন্মদাতৃ পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে পরিবারের আবার দুরকম প্রভারভেদ করা যায়, যথা, দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার (nuclear family) ও যৌথ পরিবার (Joint family)।

## ৫.৫.১ দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার

পরিবার ব্যবস্থাকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়—দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার ও যৌথ পরিবার। দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার স্বামী-স্ত্রী এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যাদের নিয়ে গঠিত হয়। দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের সংহতি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক যৌন আকর্ষণ ও সাহচর্যের উপর এবং পিতা-মাতা ও পুত্র-কন্যার পারস্পরিক সাহচর্যের উপর। যখন পুত্র কন্যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে তখন এই ধরনের পরিবারের সংহতি দৃঢ় থাকে এবং পুত্রকন্যারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে সংহতি শিথিল হ'তে থাকে। প্রধানত আধুনিক শিল্প ভিত্তিক সমাজেই দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের অস্তিত্ব বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের আবার কিছু উপ-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়; যেমন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের পুত্র-কন্যার সঙ্গে এক বা একাধিক অবিবাহিত বা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন অথবা বিধবা/বিপত্নীক আত্মীয় বাস করে তাকে সম্পূরক দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার বলে। দ্বিতীয়ত, যেখানে একজন বিধবা বা বিপত্নীক তার অবিবাহিত পুত্র-কন্যা অথবা অবিবাহিত/বিপত্নীক/বিধবা/বিবাহ-বিচ্ছিন্ন ভাই-বোনের সঙ্গে বাস করে তাকে অবর-দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার বলে। তৃতীয়ত, যেখানে একজন পুরুষ বা নারী একাকী বাস করে তাকে এক-ব্যক্তি পরিবার বলে। চতুর্থত, যেখানে একটি দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের সদস্যরা পূর্বতন কোনও দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারে বিধবা/বিপত্নীক/বিবাহ বিচ্ছিন্ন সদস্য বা সদস্যাদের সঙ্গে বাস করে তাকে সম্পূরক অবর-দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার বলে। যেমন, কোনও বিধবা, বিপত্নীক, তার অবিবাহিত পুত্রকন্যা এবং বিধবা শাশুড়ীসহ যে পরিবার তার উল্লেখ করা যায়। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের পরিবারের যথেষ্ট অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তবে, সামাজিক প্রথা অনুসারে এদের যৌথ পরিবার হিসেবেই উল্লেখ করা হয়।

## ৫.৫.২ যৌথ পরিবার

সাধারণভাবে, যৌথ পরিবার বলতে সেই ধরনের পরিবারকে বোঝায় যেখানে একাধিক প্রজন্মের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা একসঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করে, একই পাকশালে রন্ধন করা আহার্য গ্রহণ করে এবং একই সম্পত্তির আয় থেকে যৌথভাবে জীবন নির্বাহ করে। পিতৃ-পরিচায়ী যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব নির্ভর করে পিতা-পুত্র সম্পর্কে উপর ভিত্তি করে এবং মাতৃপরিচায়ী যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব নির্ভর করে মাতা-কন্যার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। আবার একাধিক ভাই সপরিবারে একসঙ্গে বাস করে যৌথ পরিবার গঠন করতে পারে। এই ধরনের পরিবারকে সহগামী ছন্তুপ্সপুণ্ত্রন্দ্বজ্জ্বপুগ্ন যৌথ পরিবার বলে। প্রধানত কৃষিভিত্তিক সমাজেই যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও আরব দেশগুলিতে তাই-পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় যৌথ পরিবারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এমনকি শিল্পোন্নত জাপানেও যৌথ পরিবার—যাকে বলা হয় 'দোজুকু'—বর্তমান; যদিও তাঁর সংখ্যা বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান। পশ্চিমী দেশেও যৌথ পরিবার লুপ্ত হয়নি যদিও তার চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। সেখানে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার একই বাড়ীতে না হ'লেও একই অঞ্চলে বাস করে এবং পরস্পরের মধ্যে নিয়ত যোগাযোগ রাখে।

দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার এবং যৌথ পরিবারের উপরোক্ত সংজ্ঞা এক অর্থে সীমিত কারণ উক্ত সংজ্ঞাগুলি পরিবারের গঠন ব্যতীত অন্য কিছুই ব্যাখ্যা করেনা। যদি কালের নিরিখে বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম, জাতি ও শ্রেণীর ভিত্তিতে পরিবারের ধরনকে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার এবং যৌথ পরিবার দুটি কোনও বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব নয় বরং পরস্পর-নির্ভর পরম্পরা।

সময়ের সাথে সাথে পরিবারের কাঠামোয়, তার আয়তন, গঠন, সদস্যদের মর্যাদা ও ভূমিকা, প্রথা এবং বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। ভারতবর্ষে এমন কোনও পরিবার নেই-যা চিরকালীনভাবে দম্পতিকেন্দ্রিক থেকেছে; প্রায়শই দেখা যায় যে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা বা অবিবাহিত ভাই-বোন দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারে বাস করছে। এও দেখা যায় যে, কোনও কারণে যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার স্থাপিত হ'লেও যৌথ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আর্থিক, ধর্মীয়, প্রথাগত ও হার্দিক সম্পর্ক রাখা হয়।

## ৫.৫.৩ হিন্দু যৌথ পরিবার

যৌথ পরিবার, বিশেষত হিন্দু যৌথ পরিবার একটি বহু আলোচিত বিষয় এবং এর সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইরাবতী কার্ভে প্রমুখরা একই বাসস্থানে বাস করাকে পরিবারের যৌথত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে গোল্ড (H. Goluld), কোলেন্দা (P. Kolenda) এবং রামকৃষ্ণ মুখার্জী একই বাসস্থান এবং যৌথ পাকশালের ব্যবস্থাকে যৌথ পরিবারের গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। আবার বেইলা (F.G.Bailey), মদন (T.N. Madan) প্রভৃতি সম্পত্তির যৌথ মালিকানাকে আবশ্যিক মনে করেছেন। দেশাই (I.P. Desai) এবং আরও অনেকে আত্মীয়দের সম্পর্কে দায়িত্ব পালনকে যৌথত্বের চিহ্ন মনে করেছেন। ইরাবতী কার্ভের মতে, প্রাচীন ভারতের পরিবারে বাসস্থান ও সম্পত্তি যৌথ ছিল এবং পরিবারের কার্যাবলী যৌথভাবে পরিচালিত হ'ত। তিনি এই ধরনের পরিবারকে সাবেকী পরিবার বলে উল্লেখ করেছেন। কার্ভে যৌথ পরিবারের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ "A joint family is a group of people who generally live under one roof, who eat cooked food at one hearth, who hold property in common and who participate in common family whorship and are related to each other as some particular type of kindered". অর্থাৎ, যৌথ পরিবার বলতে সেই ধরনের মানবগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা একই বাড়ীতে বসবাস করে,

একই পাকশালায় রন্ধন করা আহার্য গ্রহণ করে, একই সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে, পারিবারিক উৎসবে একই সঙ্গে অংশগ্রহণ করে এবং কোনও না কোনভাবে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

গোরের (M.S. Gore) মতে, একটি আদর্শ হিন্দু যৌথ পরিবার স্বামী-স্ত্রী, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্ররা ও তাদের স্ত্রী ও সন্তান এবং পরিবারের কর্তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয়। সাধারণত একটি যৌথ পরিবারে তিন বা তদুর্দ্ধ প্রজন্মের মানুষেরা বাস করে। এমনকি মৃত পূর্বপুরুষ এবং অজাত সন্তানদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। প্রভু (P.N. Prabhu) বলেছেন যে, ''The living members of the family are, so to speak, trustees of the house which belongs to the 'pitris', the ancestor, in the interests of the 'putras', the future members of the family..... The central idea is the worship of family (Kula) as a temple of the sacred tradition.'' অর্থাৎ পরিবারের বর্তমান সদস্যরা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত গৃহের অছি (trustee) মাত্র; এবং উত্তরপুরুষের স্বার্থে সম্পত্তির রক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত। মূল কথাটি হ'ল পবিত্র পরম্পরা রক্ষার জন্য বংশের (কুল) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। সপিন্ডকরণ, পতিআবাসিক ব্যবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা, পিতৃ-পরিচায়ী বংশক্রমাগম (descent) এবং উত্তরাধিকার হিন্দু যৌথ পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য। হিন্দু যৌথ পরিবারের প্রবীণতম সদস্য পরিবারের কর্তা হিসেবে বিবেচিত হন। এই ধরনের পরিবারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্রমাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য স্থিরীকৃত হয়। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যরা প্রবীণ সদস্যদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য থাকে এবং প্রবীণ সদস্যদের কাজ ও সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করতে পারে না। পরিবারের শিশু সন্তানেরা পরিবারের সকল বয়োজ্যেষ্ঠরই সন্তানরূপে বিবেচিত হয়। যৌথ পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর (conjugal) সম্পর্কের চেয়ে পিতা পুত্র (filial) সম্পর্ক বা ভাই-ভাই (fraternal) সম্পর্ক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, যৌথ পরিবার কেবলমাত্র কতকগুলি দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের সমষ্টিমাত্র নয়।

## ৫.৫.৪ হিন্দু যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য

এখন আমরা ভারতীয় হিন্দু যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করতে পারি।

**প্রথমত, যৌথ বাসস্থান (common residence) ঃ** যৌথ বাসস্থান যৌথ পরিবারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও কোনও কোনও সময় যৌথ বাসস্থান ব্যতিরেকেই যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তবুও যৌথ বাসস্থান যৌথ পরিবার গঠনের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

**দ্বিতীয়ত, একত্রে ভোজন (commensality) ঃ** যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্যই হ'ল যে, পরিবারের সদস্যরা একই পাকশালে রন্ধন করা খাদ্য গ্রহণ করে এবং সাধারণত একই সঙ্গে ভোজন করে।

**তৃতীয়ত, সম্পত্তির যৌথ অধিকার (common ownership of property) ঃ** কোনও কোনও সমাজতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, সম্পত্তির যৌথ মালিকানা যৌথ পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে যৌথ সম্পত্তির অর্থ হ'ল হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬) অনুসারে তিন প্রজন্ম পর্য্যন্ত পরিবারের সমস্ত জীবিত পুরুষ ও মহিলার পৈতৃক সম্পত্তিতে অংশ অংশ থাকবে এবং অংশীদারদের সম্মতি ছাড়া সম্পত্তি দান-বিক্রী করা যাবে না।

**চতুর্থত, সহযোগিতা ও সহানুভূতি (co-operation and sentiment) ঃ** দেশাই (I.P. Desai), কাপাদিয়া (K.M. Kapadia) প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদরা যৌথ পরিবার গঠনে সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সহযোগিতা ও সহানুভূতি কার্যকর হয়। আত্মীয়দের প্রতি সহমর্মীতাবোধ ও দায়িত্ব পালন থেকে।

এক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের থেকে ভৌগলিকভাবে দূরে বাস করতে পারে এমনকি যৌথ সম্পত্তির অংশীদারও না হ'তে পারে কিন্তু যৌথ পরিবারবোধ তাদের একান্ত বন্ধনে আবদ্ধ রাখে; পরস্পরের প্রয়োজনে সহযোগিতা করে।

পঞ্চমত, ধর্মীয় ও প্রথাগত বন্ধন (ritual bond) ঃ যৌথ পরিবারবোধের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও প্রথাগত আচার ব্যবস্থার ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান যৌথ পরিবারের সদস্যদের একসূত্রে বাঁধে। যেমন, পিতৃপুরুষের বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও পিন্ডদানের সময় পরিবারের সকল ভাইরা একত্র হয়। কিংবা বিবাহ বা উপনয়নের সময় পরিবারের সকলের উপস্থিতি কাম্য বলে মনে করা হয়। অনেক পরিবারেই গৃহদেবতা পূজার ব্যবস্থা থাকে কিম্বা বাৎসরিক দুর্গাপুজার আয়োজন করা হয়। সেগুলিতে পরিবারের সকলে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে অথবা শরিকদের মধ্যে পালা করে পূজার দায়িত্ব দেওয়া হয়; তবে সেক্ষেত্রেও সকলেই আনন্দানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এমনকি যৌথ পরিবার ভেঙে গেলেও ধর্মীয় ও প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান পালনের সময়ে পরিবারের সকলকে একত্রিত হ'তে দেখা যায়। ফলে যৌথ পরিবার-বোধ অক্ষুন্ন থাকে।

যৌথ পরিবারের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যৌথ বাসস্থান ও একত্রে ভোজন পরিবার যৌথত্বের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক। অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি পরোক্ষ পরিচায়ক।

এবারে দেখা যাক্, যৌথ পরিবারের সদস্য কারা হ'তে পারেন। তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, যৌথ পরিবারের সদস্যদের আত্মীয়তার সম্পর্কের ধরন। দ্বিতীয়ত, যৌথ পরিবারে প্রজন্মের সংখ্যা। তৃতীয়ত, সম্পত্তির অংশীদারত্বের ধরন।

পিতৃপরিচায়ী যৌথ পরিবার মূলত গঠিত হয় পরিবারের সদস্যদের বংশগত (lineal) অথবা সহগামী (collateral) সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং এই ধরনের যৌথ পরিবার আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ একাধিক বিবাহিত দম্পতির দ্বারা গঠিত হয়। মাতৃপরিচায়ী যৌথ পরিবার গঠিত হয় মাতা, তাঁর কন্যা এবং কন্যার বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা কন্যাদের দ্বারা। মাতার ভাই পরিবারের ব্যবস্থাপকের ভূমিকা পালন করে। স্বামীরা স্ত্রীর পরিবারে বাস করে। উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মাতৃপরিচায়ী পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যৌথ পরিবারে আবার কিছু উপ-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। কোলেন্দার মতে, এই উপবিভাগগুলি হ'ল ঃ প্রথমত, যেখানে একাধিক ভাই স্ত্রী ও সন্তানসহ একই পরিবারে বাস করে তাকে সহগামী যৌথ পরিবার বলে। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত সহগামী যৌথ পরিবার অবিবাহিত, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন বা বিধবা/বিপত্নীক আত্মীয় বাস করে তাকে সম্পূরক সহগামী যৌথ পরিবার বলে। সাধারণত, বিধবা মা, বিপত্নীক পিতা অথবা অবিবাহিত ভাই কিম্বা বোন এই ধরনের পরিবারের সদস্য হয়। তৃতীয়ত, যে পরিবারের পিতা সস্ত্রীক এবং পুত্রের স্ত্রী-সন্তানসহ একসঙ্গে বাস করে তাকে বংশগত যৌথ পরিবার বলে। চতুর্থত, যে পরিবারে বংশগত যৌথ পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্কিত অবিবাহিত, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন অথবা বিধবা/বিপত্নীক ব্যক্তিরা বাস করে তাকে সম্পূরক বংশগত যৌথ পরিবার বলে। পঞ্চমত, যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, তাদের বিবাহিত পুত্র সন্তানসন্ততিসহ বাস করে তাকে বংশগত সহগামী যৌথ পরিবার বলে। ষষ্ঠত, এই ধরনের পরিবারের সঙ্গে যখন অবিবাহিত কিংবা বিধবা/বিপত্নীক আত্মীয়, যেমন বিধবা/বিপত্নীক বোন বা ভাই কিম্বা অবিবাহিত ভাইপো, বাস করে তাকে সম্পূরক বংশগত সহগামী যৌথ পরিবার বলে।

আবার দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারে প্রজন্মের সংখ্যার দ্বারাও যৌথ পরিবার নির্ণয় করা যায়। দেশাই, মদন

প্রমুখ মনে করেন যে, কোনও পরিবারে অন্তত তিন প্রজন্মের মানুষ সপরিবারে একসঙ্গে বসবাস করলে তাকে যৌথ পরিবার বলা যেতে পারে।

সম্পত্তির অংশীদারীত্বের ধরণের ভিত্তিতেও হিন্দু যৌথ পরিবারের ব্যাখ্যা করা চলে। গোরে (M.S. Gore) যৌথ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, পরিবার হ'ল সেই ধরনের সঙঘ যেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরা সম্পত্তির সম-অধিকারী। স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানেরা তাঁদের উপর নির্ভরশীলমাত্র। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬) পাস হওয়ার আগে পর্যন্ত পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় দুই ধরনের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা ছিল। পূর্বভারতে, বিশেষত বাংলা ও আসামের ব্যবস্থাকে বলা হ'ত 'দায়ভাগ' ব্যবস্থা; যে ব্যবস্থায় পিতা হ'লেন সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির দান-বিক্রীয় অধিকার প্রাপ্ত। অন্য ব্যবস্থার নাম হ'ল 'মিতক্ষির' ব্যবস্থা যা বাকী উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক পুত্র সন্তানেরই পিতার পিতৃপুরুষের সম্পত্তিতে অধিকার থাকে। পুত্রকে বঞ্চিত করে পিতা সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, হিন্দু আইন অনুসারে স্ত্রী-কন্যারা সম্পত্তির অধিকারী নয়। ১৯৩৭ সালে প্রণীত আইনে এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা হয়। বলা হয় যে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাঁর স্বামীর স্থাবর সম্পত্তির আয় যাবজ্জীবন ভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া বিবাহকালে কন্যাকে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি 'স্ত্রীধন' হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬) উক্ত ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে কোনও ব্যক্তি যদি ইচ্ছাপত্র (will) না করে মারা যায় তাহলে তার মা, স্ত্রী, ও কন্যা সম্পত্তির সমান অংশীদার বলে বিবেচিত হয়। এই আইন অনুসারে একজন মহিলা একদিকে তার পিতার, অন্যদিকে তার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'তে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে, যৌথ পরিবার কাদের নিয়ে গঠিত হয় এবং তারা পরিবারের অন্যদের সঙ্গে কি কি বিষয় ভাগ করে এবং অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তার চরিত্র সময়েভেদে বা পরিবার ভেদে ভিন্ন হয়। আবার অঞ্চল, সম্প্রদায় বা জাত-পাত ভেদেও ভিন্ন হ'তে পারে। শরিকদের মধ্যে সম্পত্তি, পৈতৃক বাসস্থান ভাগাভাগি কোন্ সময়ে করা যেতে পারে সে ব্যাপারে পরিবারে-পরিবারে ভিন্নমত থাকতে পারে। আবার গড় আয়ু, বিবাহের বয়স, পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে যৌথ পরিবার ভাঙ্গা-গড়া হ'তে পারে।

অঞ্চল, সম্প্রদায়, জাতপাত ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে কোলেন্দা হিন্দু যৌথপরিবারের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা ধরন লক্ষ্য করেছেন। প্রথমত, নিম্ন-বর্ণের চেয়ে উচ্চ-বর্ণের যৌথ পরিবারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত, মধ্যভারতের, যথা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের চেয়ে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত, যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের সময় অঞ্চলভেদে এবং পরিবারভেদে ভিন্ন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, হিন্দু পরিবার ব্যবস্থা যৌথ পরিবার ও দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ত প্রবাহমান।

## ৫.৬ ভারতীয় মুসলিম পরিবার

শরিয়তের নির্দেশ ও নবী কথিত সনাতন ধারা অনুসারেই মুসলিম বিবাহ, পরিবার ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই ঐতিহ্যই মুসলিম সামাজিক জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম পরিবার ব্যবস্থা আলোচনা করা যায়।

ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত মুসলিমরাও ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ এবং দম্পতিকেন্দ্রিক উভয় ধরনের পরিবারের অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত, মুসলিম পরিবার পিতৃপরিচায়ী ও পতি-আবাসিক হয়ে থাকে। তবে এর ব্যতিক্রম যে লক্ষ্য করা যায় না তা নয়। লাক্ষাদ্বীপ, মালাবার এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলে মাতৃপরিচায়ী পরিবার বর্তমান। ঐশ্লামিক ব্যবস্থায় কৌমার্য পালনকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয় না এবং বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনকে কর্তব্য মনে করা হয়। যদিও বিবাহ বিচ্ছেদ ইসলাম অনুমোদিত ব্যবস্থা কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। পরিবারের সুস্থিতি ইসলামে একান্ত কাম্য কিন্তু যেখানে বোঝাপড়ার অভাবে সুস্থ বৈবাহিক জীবনযাপন অসম্ভব হয় যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত। মুসলিম পরিবারে স্বামী বা পরিবারের কর্তার সংসার প্রতিপালন অবশ্যকর্তব্য। প্রতিপালিত হওয়া স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে পড়ে। মুসলিম নারীর সামাজিক জীবন প্রধানত পরিবারকেন্দ্রিক। সাংসারিক কাজ ও সন্তান পালনেই মুসলিম নারীর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এই ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই মুসলিম নারীর মর্যাদার স্থান নির্ধারিত হয়। যেম মেনন কেরালার মুসলিম নারীদের সামাজিক মর্যাদার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মুসলিম সমাজে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানের গুরুত্ব এবং কদর বেশী। অতীতে কন্যাসন্তানের জন্মকেই অবাঞ্ছিত বলে মনে করা হ'ত। বর্তমানে অনেকটাই ঔদার্য এসেছে। তবে শিক্ষা, বিবাহ বা জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানের মতামতকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। মুসলিম পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'পর্দা প্রথা'। যেহেতু অধিকাংশ মুসলিম পরিবারই যৌথ পরিবার সেহেতু পরিবারের মহিলারা বাসগৃহের একটি নির্দিষ্ট অংশে, যাকে অন্দরমহল বা জেনানা মহল বলা হয়, বাস করে। এই 'পর্দা' প্রথার মাধ্যমে মুসলিম নারীদের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখা হয়। অতীতে এই প্রথা পরিবারের সামাজিক মর্যাদাসূচক ছিল। শিক্ষার প্রসার ও আধুনিকীকরণের ফলে এই প্রথা অনেকাংশেই দূরীভূত হয়েছে।

## ৫.৭ পরিবারের কার্যাবলী

ম্যাকআইভার ও পেজ বলেছেন যে, পরিবার, হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সঙঘ। সমাজের মধ্যে এটি ক্ষুদ্রতম এবং ঘনিষ্ঠতম সঙঘ। আদিম সমাজই হোক্ কিম্বা আধুনিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজই হোক্, পরিবারকে আশ্রয় করেই সমাজ গড়ে উঠেছে। পরিবারেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে; পরিবারের মধ্যেই বিভিন্ন প্রজন্ম পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামাজিক মানুষ হিসেবে তৈরী হয়ে ওঠে। তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার এমন কতকগুলি কাজকর্ম সম্পাদন করে যা অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। পরিবারের এই কাজকর্মকে আবার দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে—ব্যক্তিগত দিক ও সামাজিক দিক। তবে যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তাই পরিবারের ব্যক্তিগত দিকের সামাজিক তাৎপর্য্য আছে; আবার সমাজ যেহেতু পরিবারের সমন্বয়েই গঠিত হয় তাই সমাজ পরিবারের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। কিংসলে ডেভিস পরিবারের প্রধান চারটি কাজের উল্লেখ করেছেন, যথা প্রজনন, ভরণপোষণ, প্রতিস্থাপন ও সামাজিকীকরণ। বটোমোর আবার পরিবারের কাজকর্মকে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অন্যদিকে মার্ডক মনুষ্য পরিবারের কাজকর্মের মধ্যে যৌন, প্রজনন, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির নিরিখে আমরা পরিবারের কতকগুলি কাজকর্ম নির্দেশ করতে পারি। প্রথমত, যৌনাচরণ ঃ জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও একপ্রকার প্রাণী। সুতরাং অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষেরও যৌন বাসনা আছে। কিন্তু, যেহেতু মানুষ

সমাজ সৃষ্টি করেছে সেহেতু মানুষ অবাধ যৌনাচরণের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে পরিবার সৃষ্টির মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, প্রজননঃ প্রকৃতির নিয়মই হ'ল সৃষ্টি করা। জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর মতই মানুষও প্রজননশীল প্রাণী। সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে, এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের থেকে আর এক প্রজন্মের হাতে সমাজকে হস্তান্তরিত করতে হ'লে প্রজনন অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু, প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পরিবারের বাইরেও নরনারীর যৌন মিলনের ফলে প্রজনন সম্ভব। উত্তরে বলা যায় যে, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানই একমাত্র যৌন মিলনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে বৈধ প্রজনন ও উত্তরাধিকার সৃষ্টি করতে পারে। তৃতীয়ত, প্রতিপালন ঃ জন্মের পর মানব শিশু থাকে নিতান্তই অসহায়। পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা, আদর-যত্ন ও স্নেহচ্ছায়াই শিশুকে লালিত-পালিত করে। কেবল শিশুরই নয়, পরিবার বয়স্ক ও বৃদ্ধেরও আশ্রয়স্থল। দৈনন্দিন যত্ন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা মানুষ পরিবারের মাধ্যমেই লাভ করে। বিপদের সময় পরিবারই ত্রাতার ভূমিকা পালন করে। চতুর্থত, অর্থনৈতিক ঃ জীবনধারণের জন্য এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য কিছু অর্থনৈতিক কাজ—অর্থাৎ জীবিকা অর্জন করা—পরিবারের অবশ্য করণীয়। আদিম সমাজে কৃষিকাজ ছিল পরিবার ভিত্তিক এবং কৃষিকাজের মাধ্যমেই পরিবারের ভরণপোষণ হ'ত। আধুনিক সমাজে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে। তবে আধুনিক শিল্পায়িত ও নগরভিত্তিক সমাজে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম 'ভোগভিত্তিক'। পঞ্চমত, উত্তরাধিকার ঃ উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া পৃথিবীর সমস্ত সমাজের পরিবারেই লক্ষ্য করা যায়। প্রতি পরিবারই কিছু না কিছু স্থাবর এবং/অথবা অস্থাবর সম্পত্তি, যেমন জমি, যেমন জমি, বাড়ী এবং/অথবা, গহনা, টাকা, তৈজসপত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে। সেগুলি ভোগদখল করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দিয়ে যাওয়াও পরিবারের অন্যতম কাজ, যদিও উত্তরাধিকারের ধরন ও নিয়মকানুন বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ষষ্ঠত, মনস্তাত্ত্বিক ঃ মানুষের মানসিক চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ততা, ভালবাসা এবং স্নেহ-মমতা পরিবারের মধ্যেই খুঁজে পায়। স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক ও মানসিক চাহিদার নিবৃত্তির জন্য পরিবারের বন্ধন একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হৃদয়-মন বিযুক্ত নয়। পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ উভয়কে এক অনন্য তৃপ্তি এনে দেয়। স্বামী স্ত্রীর কাছে আশা করে মমত্ব, আনুগত্য সহযোগিতা। স্ত্রী নির্ভর করে স্বামীর ভালবাসা, নিরাপত্তা, তত্ত্বাবধানের উপর। গৃহকোণ মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে এখানে সে বর্হিজগতের সমস্ত মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে আপন জগৎ সৃষ্টি করতে পারে।

## ৫.৭.১ সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা

সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা অতি অবশ্য উল্লেখনীয়। কোনও মানব শিশুই সামাজিক মানুষ হিসেবে জন্মায় না। জন্মের সময় মানব শিশুর সঙ্গে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর শিশুর কোনও তফাৎই থাকে না। তার সমস্ত বোধই থাকে আত্ম-অভিমুখী বা ego-centric। জন্মের পর বেশ কয়েকবছর শিশু তার জীবনধারণের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিশেষত বাবা এবং মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে। পরিবারের মধ্যে অন্যান্য সদস্যদের সংস্পর্শে সাহচর্যে ও শিক্ষায় আত্ম-অভিমুখী মানব-শিশু সমাজ-অভিমুখী বা socio-centric হয়ে ওঠে। তাই শিশুর সামাজিকীকরণ পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। পরিবারের মাধ্যমেই শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। প্রথম জীবনে পরিবারে সে যে শিক্ষালাভ করে তা আজীবন স্থায়ী হয়। এছাড়া, পরিবারে শিশু দু'ধরনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে। একটি হ'ল authoritarian relationship বা কর্তৃত্বমূলক সম্পর্ক, অন্যটি হ'ল equalitarian relationship বা সখ্যতামূলক সম্পর্ক। পিতা-পুত্র/কন্যার সম্পর্ক কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে ভাই-বোন (sibling) বা বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ক সখ্যতা ভিত্তিক। শাসন এবং স্নেহ-মিশ্রিত নির্দেশের মাধ্যমে বাবা-মা শিশুকে সামাজিক আচরণবিধি শিখিয়ে দেন। অন্যদিকে, ভাই-বোন বা বন্ধুদের কাছ থেকে শিশু সমাজজীবনে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা জেনে যায়। শিশু পরিবারের মাধ্যমেই বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমেই তার চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়। তার মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলির স্ফুরণ ও বিকাশ পরিবারস্থ নিকটজনের স্নেহ, ভালবাসা ও সাহচর্যেই ঘটে থাকে। অন্যদিকে, পরিবার যেহেতু সমাজেরই অঙ্গ, সুতরাং সমাজ-স্বীকৃতি সাংস্কৃতিক ভাবধারা পরিবারের মাধ্যমেই শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে, প্রত্যেক সমাজ প্রজন্ম হ'তে প্রজন্মান্তরে তার সংস্কৃতিকে বহন করে চলে এবং পরিবার ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। আবার, যেহেতু জন্মমাত্র শিশু বিশেষ সামাজিক পরিচিতি বা মর্যাদা লাভ করে তার পরিবারের মর্যাদার ভিত্তিতে, সেহেতু শিশুকে বাবা-মা তাঁদের বৃহত্তর গোষ্ঠী, শ্রেণী, প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। অর্থ, মর্যাদা, ক্ষমতা, শিক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতে কোন্ সামাজিক স্তরে শিশুর অবস্থান জীবনের শুরুতেই তা নির্দেশ করে দেন। তাই পরিবারকে অনেক সময় transfer point of civilisation বলে উল্লেখ করা হয়।

## ৫.৮ যৌথ পরিবারের ভাঙনের কারণ

যৌথ পরিবারের যে চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে তা কিন্তু গত ২০০ বছরে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারার উল্লেখ করতে গিয়ে ওম্যালী (L.S.S. O'Malley) বলেছেন, ''The joint family is an institution which had its origin in earlier order of society, when the country was thinly populated, the population was mainly agrarian and cultivation was capable of expansion to meet the needs of the growing families. Each family depended on its own labour and the larger it was, the greater was the number of hands available for work..... the conditions favourable to it were those of a stable society in which the members of a family lived in the same place and followed the same pursuits from generation to generation. The economic complex has been transformed during the last hundred years. A largely increased population has caused pressure on soil....There is no longer the same community of interests owing to small size of holdings and the pressure of circumstances necessitating the adoption of different calling....The extension of communications has facilitated migration'. প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ভারতের গ্রামীন অর্থনীতিতে সম্পত্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল। ওই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিল্প ও বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, ফলে মার্ক্স বর্ণিত প্রতিযোগিতা ও বাজার-নির্ভর এক নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

যৌথ পরিবারের কাঠামোর পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে দেশাই (I.P. Desai), কাপাদিয়া (K.M. Kapadia), রস (Aileen Ross), গোরে (M.S. Gore), শাহ্ (A.M. Shah) মুখার্জী (Ramkrishna Mukherjee) প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদরা উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতে হিন্দু যৌথ পরিবারের যে সার্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বা হচ্ছে তা সম্যক্ অনুধাবন করতে হ'লে যৌথ পরিবারের কাঠামোর পরিবর্তনের মৌলিক বা প্রধান উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা দরকার। পরস্পরসম্পর্কযুক্ত বেশ কিছু উপাদান, যেমন, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, আইনীব্যবস্থা, নগরায়ন ও শিল্পায়ন প্রভৃতি ভারতের চিরায়ত পরিবার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। সময়ের নিরিখে

ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে এদের প্রভাব কম-বেশী অনুভব করেছে এবং একেকটি উপাদানের প্রভাব একেক সময়ে গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এদের সার্বিক ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব পরিবার ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে।

এখন, পরিবর্ত্তন সূচনাকারী এবং উপাদানগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, অর্থনৈতিক উপাদান ঃ ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন অর্থ-ব্যবস্থার ফলে ভারতে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। চা, কফি, রবার, নীল প্রভৃতির বাণিজ্যিক চাষ শুরু হওয়ার ফলে শস্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। এর সঙ্গে যান-বাহনের উন্নতি পেশা বা জীবিকার্জনের বিভিন্ন পথ খুলে দেয়। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সরকারী কাজ বা চাকরীর সুযোগ দারুনভাবে বৃদ্ধি পায়। যারা এর সুযোগ গ্রহণ করে তারা তাদের পারিবারিক বৃত্তি ত্যাগ করে শহরাঞ্চলের দিকে চলে যায়। এদের মধ্যে যারা বিবাহিত তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যায় ; যার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সাংবিধানিক সংস্থানের দ্বারা নারী-পুরুষ সমান সুযোগ লাভের ফলে নারীরও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজকর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ আসে। নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মধ্যে নারী-পুরুষ বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হ'তে থাকে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাগত উপাদান ঃ ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার সুযোগ ও তৎসহ সরকারী কাজে যোগদানের সুযোগ জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের কাছেই উপস্থিত হয়। শিক্ষা বিস্তারের ফলে—বিশেষত উচ্চশিক্ষালাভের ফলে, ইংরাজী শিক্ষার শিক্ষিত এক নব্য বুদ্ধিজীবি সমাজের উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, উদার ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের বেশ কিছু প্রচলিত অন্যায় সংস্কার ও প্রথা লক্ষ্য করেন এবং সেগুলির যৌক্তিকতাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। বাল্যবিবাহ রদ, নারীশিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহের প্রচলন, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রবৃতির জন্য তাঁরা উদ্যোগী হ'তে থাকেন, শিক্ষিত পুরুষেরা শিক্ষিতা নারীকেই কেবল বিবাহে ইচ্ছুক হ'ন। এর প্রভাব পরিবার ব্যবস্থার উপর পড়তে থাকে।

তৃতীয়ত, আইনগত উপাদান ঃ বৃত্তি ও পেশা, শিক্ষা, বিবাহ, সম্পত্তি প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন পরিবারব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় কর্মচারী ক্ষতিপূরণ (১৯২৩) (Indian Workmen Compensation Act), নূন্যতম মজুরী আইন (১৯৪৮) (Minimum Wages Act), ব্যক্তিকে পরিবারের উপর আর্থিক নির্ভরতা ব্যতিরেকে স্বাবলম্বী হ'তে সাহায্য করেছে। ১৯৩০ সালের Gains of Learing Act হিন্দু যৌথ পরিবার ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এই আইন অনুসারে যৌথ পরিবারের অর্থসাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আয় তার নিজস্ব বলে বিবেচিত হবে। তার অর্জিত আয়ের উপর যৌথ পরিবারের কোনও দাবী থাকবে না। ১৯২৯ সালের বাল্য-বিবাহ রদ আইন (Child Marriage Restraint Act) পুরুষের ক্ষেত্রে বিবাহের নূন্যতম বয়স ১৮ বৎসর এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৪ বৎসর স্থির করে দেয়। পরবর্তী কালে তা যথাক্রমে ২১ বৎসর ১৮ বৎসর এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৪ বৎসর স্থির করে দেয়। পরবর্তী কালে তা যথাক্রমে ২১ বৎসর ১৮ বৎসর স্থির হয়। ১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবার পুনর্বির্বাহ আইন (Hindu Widows' Remarriage Act) বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করে। এছাড়া, Hindu Married womens' Right to Separate Residence and Maintenance Act 1946, Hindu Marriage Disabilities Removal Act, 1946, Hindu Marriage Validating Act, 1949, Special Marriage Act, 1954, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রভূত সহায়তা করে এবং এর প্রভাব পরিবার ব্যবস্থার উপর অনুভূত হয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে (Hindu Succession Act, 1956) পিতার

সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। এর ফলে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের চিরাচরিত ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসে।

চতুর্থত, শিল্পায়ন ও নগরায়ন ঃ বিংশ শতাব্দীতে শিল্পায়ন ও নগরায়ন পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধারাকে তরান্বিত করেছে। শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিও উদারীকরণ যৌথ পরিবারের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। পশ্চিমী দেশের মত শিল্পায়ন অর্থনীতিকে শিল্প-নির্ভর করে তুলেছে। যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করার প্রবণতা বেড়েছে। জীবিকার সন্ধানে লোকে বিভিন্ন কলকারখানায় যোগ দিয়েছে। ফলে যৌথ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধন শিথিল হয়েছে এবং পারিবারিক সংহতির ভিত্তিও দুর্বল হয়েছে। শিল্প-শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয় নিজস্ব বলে বিবেচিত হওয়ার যৌথ পরিবারের ওপর মানুষের নির্ভরতা কমেছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়নের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় নারীকে কলকারাখানায়, অফিসে, স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এমনকি সৈনবাহিনীতেও কর্মরতা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর নারীর নির্ভরশীলতা কমে যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে গ্রাম-সমাজ ও নগর-সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। নগর-সমাজের তুলনায় গ্রাম-সমাজে নারী স্বামীর উপর বা পরিবারের উপর আর্থিকভাবে অধিকতর নির্ভরশীল। নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতার ফলে তার কাছে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কমেছে। স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ রয়েছে। স্ত্রী কর্মরতা হওয়ার দরুন পারিবারিক জীবনযাত্রায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক 'প্রভু-দাসী' সুলভ নয় বরং বন্ধুত্বের সম্পর্ক। পারিবারিক ক্ষেত্রেও নতুন সাংস্কৃতিক মূলবোধের সৃষ্টি হয়েছে। পিতা বর্তমানে আর পূর্বেকার কর্তৃত্বমূলক অবস্থানে স্থির নন, বরং পরিবারের অন্যান্যদের—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির—সহযোগী গুরুজন মাত্র। আগে পরিবারের ঐক্য, সংহতি বজায় রাখার জন্য পরিবারের লোকেরা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশ বা নির্দেশ মেনে চলত। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক ব্যাপারে সমতার নীতি অনুসরণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে সমাজে গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচলিত হওয়ায় পরিবারও তাঁর প্রভাবধীন হয়েছে।

নগরায়ন প্রক্রিয়াও যৌথ পরিবার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। নগরায়ন বলতে বোঝায় মানুষের গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন ; কৃষিভিত্তিক পেশা থেকে শিল্পভিত্তিক বা পরিষেবামূলক পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ এবং নাগরিক জীবন-যাপন ধারা অনুসরণ। নগর-সমাজের বৈশিষ্ট্য হ'ল জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি, জনসমষ্টির বৈধিব্য, বৃত্তি বা পেশার বিভিন্নতা, শ্রমবিভাজনের জটিলতা, বাসস্থানের স্বল্পতা এবং নৈর্ব্যক্তিক ও পরিচয়হীন জীবনযাপন। মূলত স্থানসংকুলানের অভাবে নগরাঞ্চলের মানুষের পক্ষে বৃহৎ যৌথ পরিবার পরিপোষণ করা সম্ভব হয় না। নগর-সমাজে পুরুষ এবং অনেক ক্ষেত্রেই নারীকেও কর্মব্যপদেশে অধিকাংশ সময়ে বাড়ীর বাইরে থাকতে হয় এবং বহু পারিবারিক কাজকর্মের জন্যও পরিবারের বাইরের লোকের উপর নির্ভর করতে হয়। বিনোদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যাপারে পর-নির্ভরতার নগর-সমাজে অবশ্যম্ভাবী। ফলে, পরিবারের কাজকর্ম সঙ্কুচিত হয়। এই ধরনের পরিবর্তন পরিবারস্থ শিশুদের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। নগর-সমাজে নৈর্বক্তিক ও পরিচয়-বিহীন, অজ্ঞাতভাবে জীবন যাপন করা যায় বলে প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয়। এর ফলে পারিবারিক আচারব্যবহারে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে পরিবর্তন আসে।

## ৫.৮.১ উদ্ভূত প্রবণতা

এতক্ষণ আমরা যৌথপরিবারের ভাঙনের নঞর্থক উপাদানগুলি আলোচনা করেছি। সমাজতত্ত্ববিদরা কিন্তু লক্ষ্য করেছেন যে, যৌথ পরিবারের চিরায়ত ধারণায় হয়ত কিছু পরিবর্তন এসেছে শিল্পায়ন ও নগরায়নের কারণে, কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে যৌথ পরিবার বা যৌথ পরিবার-বোধ ভেঙে পড়েনি। কাপাদিয়া তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, শহরে অভিবাসী মানুষেরা অন্যত্র বসবাসকারী যৌথ পরিবারের সঙ্গে সতত যোগাযোগ রেখে চলে। শহর-অভিবাসী একই পরিবারের মানুষেরা বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার স্থাপন করলেও যৌথ পরিবার-বোধ মুক্ত হয় না ও যৌথ পরিবারের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অটুট রাখে। দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ সময়ে-যেমন, জন্ম, বিবাহ, অসুস্থতা, পূজা-পার্বন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে তারাই সহায়তা করে, দুঃখ-আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। গ্রাম বা মফস্বল থেকে আগত যৌথ পরিবারভুক্ত সদস্যকে আশ্রয় দেওয়া বা আর্থিক সাহায্য করা শহরবাসী সদস্যের কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়। ফলে ধীরে ধীরে শহরেও যৌথ পরিবারবোধ সম্পন্ন দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার সৃষ্টি হয় এবং তারা এক পারস্পরিক অধিকার, কর্তব্য, দায়িত্ব, মমত্ববোধের মাধ্যমে যৌথ পরিবার গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়ত, শিল্পায়নের ফলে যৌথ পরিবারের কার্যকারীতা লুপ্ত হয়েছে এই তত্ত্বটিও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা অভ্রান্ত বলে মনে করেন না। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা ভারতের বেশ কিছু শিল্পপতি পরিবারের উল্লেখ করেছেন যাঁরা যৌথভাবে শিল্পের মালিকানা ভোগ করেন এবং শিল্প পরিচালনার আয় থেকে যৌথভাবে জীবন নির্বাহ করেন। মিলটন সিংগার (Milton singer) উল্লেখ করেছেন যে, জীবনযাত্রার ধরন পরিবর্তিত হ'লেও এই শিল্পপতি পরিবারগুলি যৌথ পরিবারের মূল্যবোধ ও মানদন্ড অনুসরণ করে চলে। গত তিন প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষাগত, বৃত্তিগত ও বাসস্থানগত পরিবর্তন ঘটেছে; সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক প্রথা ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তার ফলে যৌথ পরিবারভুক্ত মানুষেরা শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হ'লেও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়নি। গ্রামের পরিবর্তে শহরে এক নতুন ধরনের যৌথ পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। কোলেন্দা (Kolenda) বরং মনে করেন যে, শিল্পায়ন যৌথ পরিবার বোধকে আরও সংহত করেছে; কারণ, অর্থনৈতিক প্রগতি ও উল্লম্ব সামাজিক সচলতার (upward social mobality) জন্য পারস্পরিক সহযোগীতার একান্ত প্রয়োজন।

অবশ্য, প্রাচীন যৌথ পরিবার ও আধুনিক শহুরে যৌথ পরিবারের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য আছে। আধুনিক যৌথ পরিবারে বাসস্থানগত বা আহার ইত্যাদি ব্যাপারে যৌথত্ব বজায় থাকলেও কোনও কোনও বিষয়, যেমন, শিক্ষার জন্য ব্যয়, বসন-ব্যসন সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি, ব্যক্তিগত ব্যয় বলে বিবেচিত হয়। আবার বর্তমানে যৌথ পরিবারের ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক পরিবারেই দেখা যায় যে, পুত্রের সংসারে পিতা-মাতা বাস করছেন। এমনকি এও দেখা যায় যে, স্ত্রীর পিতা-মাতার সংসারে একত্রে বসবাস করছেন। বর্তমানে অনেক স্বামী-স্ত্রী কার্যব্যপদেশে বহুক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকেন; সেক্ষেত্রে সন্তানের দেখাশোনা ও পালনের জন্য পিতামাতার উপস্থিতি উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে এও দেখা যায় যে, বর্তমানে বেশ কিছু সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার বৃদ্ধ পিতামাতা নিজ আয়ের উপর নির্ভর করেন, জীবনধারণের জন্য আর্থিকভাবে সন্তানের উপর নির্ভরশীল থাকেন না। তাছাড়া, বিবাহিতা কন্যার সংসারে পিতামাতা বসবাস করছেন এও দেখা যায়।

সুতরাং আধুনিক যৌথ পরিবারের লক্ষণ হ'ল ঃ

১। প্রাচীন যৌথ পরিবারের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু প্রয়োজনে এই পরিবারের সদস্যরা যৌথ পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করতে প্রস্তুত।

(২) প্রাচীন পরিবার বা গ্রামীন সমাজেই যৌথ পরিবারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। নগর-সমাজে যৌথ পরিবারের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে।

(৩) যৌথ পরিবারেও সদস্যসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান।

(৪) শিল্পায়নের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে পড়েনি তার চরিত্র পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

(৫) যতদিন পর্যন্ত যৌথ পরিবার বোধ অক্ষুন্ন থাকবে ততদিন পর্যন্ত পরিবর্তন সত্বেও যৌথ পরিবার অটুট থাকবে।

## ৫.৯ পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ

পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নঞর্থক ও সদর্থক দু'প্রকার মতবাদই সমাজতত্ত্ববিদরা পোষণ করেন। গত দুই শতাব্দীতে বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সমাজে এমন মৌলিক পরিবর্তন এসেছে যে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও যৌক্তিকতা এক বিশাল সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অস্বাভাবিক দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে অদূর ভবিষ্যতে পরিবার ব্যবস্থার এক অকল্পনীয় পরিবর্তন সমাসীন বলে অনেকে মনে করেন। লুন্ডবার্গ তো (Ferdinand Lundberg) মনে করেন যে, পরিবার ব্যবস্থাই লুপ্ত হয়ে যাবে। স্প্রট (Sprott) বলেছেন যে, পশ্চিমী সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় পরিবারের কাজ বহুলাংশে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। পরিবারের অনেক কাজকর্মই রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হয়েছে; যেমন, শিক্ষা, বিশেষত শিশু-শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিনোদন ব্যবস্থা প্রভৃতি। ফলে, পরিবারের প্রয়োজন অনেকাংশেই ফুরিয়ে এসেছে। যেমন, উইলিয়াম উল্‌ফ (William Wolf) বলেছেন যে, শিশুর প্রতিপালন করা ছাড়া পরিবারের আর কোনও প্রয়োজন বোধহয় থাকবে না। বারট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russel) এবং মার্গারেট মীডও (Margaret Mead) অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। পরিবারের ভবিষ্যৎচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে টফলার (Alvin Toffler) মন্তব্য করেছেন যে, শিল্পায়িত সমাজের জঙ্গমতার জন্য ভৌগোলিক সচলতা বৃদ্ধি পায়। এমনতবস্থায় যৌথ পরিবার সচলতার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, এই ধরনের সমাজে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের জনসংখ্যা কম হবে। জন্মহার হ্রাস, পিতামাতার কর্তৃত্ব হ্রাস, কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি ও বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পরিবার ব্যবস্থাকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে।

অন্যদিকে, যাঁরা পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সদর্থক দিকটি তুলে ধরতে চান তাঁরা বলেন যে, বর্তমানে পরিবার ব্যবস্থায় যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে তা পরিবর্তনমুখী ক্রান্তিকালের সমস্যা মাত্র। পরিবার ক্রমশ আচার-নির্ভরতা থেকে সম্পর্ক-নির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে। পরিবারের সুস্থিতি অতীতের তুলনায় মোটেই কমেনি। এই মতবাদের সমর্থক ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেছেন যে, পরিবারের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, যথা, স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন, সন্তান প্রতিপালন এবং সুখী গৃহকোণ অতীতের তুলনায় আধুনিক পরিবারেই আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আধুনিক পরিবার স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণ ও ভালবাসার উপরই বেশী নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সুখী জীবনযাপনের উপকরণগুলি মানুষের করায়ত্ত হয়েছে ও ভবিষ্যতে আরও হবে। পরিবারের কাজকর্ম কমে যাওয়ায় পরিবারভুক্ত মানুষেরা পরস্পরের প্রতি আরও বেশী মনোযোগ দিতে পারবে। ম্যাক আইভার মনে করেন যে, পরিবারের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্মের বর্তমানে গুণগত একান্ত উন্নতি ঘটেছে ; ফলে পরিবারের

সদস্যদের মধ্যে এই কাজকর্ম আরও সূচারুভাবে সম্পন্ন করার প্রবণতা বেড়েছে। তাছাড়া, সমাজে শিল্পায়নের ফলে যত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ ততই শান্তি ও নির্ভরতার জন্য পরিবারমুখী হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা পরিবর্তনমুখী হ'লেও তার অস্তিত্ব মোটেই সঙ্কটাপন্ন নয়। কাপাদিয়া মনে করেন যে, শুধু গ্রাম বা ছোট শহরাঞ্চলেই নয়, বড় বড় শিল্প-নগরীতেও যৌথ পরিবার তথা পরিবার বোধ অত্যন্ত সুদৃঢ়। বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের মতদ্বৈধতা ও সংঘাতের মধ্যেও যৌথ পরিবারের প্রতি আনুগত্য বিদ্যমান।

তবে ভবিষ্যতের পরিবার কেমন হবে তা এখনই অনুমান করা কঠিন। সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। তবে এই পরিবর্তনের ধারা কোনদিকে বইবে তা অতীতের সমাজ যেমন নির্দেশ করতে পারেনি বর্তমানের সমাজও পারবে না। প্রবহমান নদীর মত সে তার আপন পথ রচনা করে নিতে পারবে।

## ৫.১০ সারাংশ

সমাজজীবন যাপনের জন্য মানুষ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে পরিবারই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যে প্রাথমিক সঙঘ তাকে পরিবার বলা হয়। আদিমযুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সব সমাজেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে কোথাও পরিবার ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। বিবর্তনের বিভিন্ন ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল ঃ বিশ্বজনীনতা, আবেগ-নির্ভরতা, প্রাথমিক প্রভাবসম্পন্নতা, সীমিত আকার, মূল অবস্থান, সদস্যদের দায়িত্বশীলতা, সামাজিক বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং চিরস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী চরিত্র। পরিবার বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে, যেমন, রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক বা বিবাহসম্পর্ক ভিত্তিক, গোষ্ঠীসাপেক্ষ বিবাহ ভিত্তিক বা গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ভিত্তিক, একগামী, বহুপত্নীক বা বহুভর্তৃক, পিতৃশাসিত বা মাতৃশাসিত, পিতৃপরিচায়ী বা মাতৃপরিচায়ী, পতি-আবাসিক বা পত্নী-আবাসিক, পালয়িতৃ কিংবা জন্মদাতৃ। পরিবার ব্যবস্থাকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়—দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার ও যৌথ পরিবার। দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার স্বামী, স্ত্রী এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যাদের নিয়ে গঠিত হয়। দম্পত্তিকেন্দ্রিক পরিবারের সংহতি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণের উপর এবং পুত্র-কন্যার সাহচর্য্যের উপর। দম্পত্তিকেন্দ্রিক পরিবারের কিছু উপ-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজেই দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের অস্তিত্ব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। অন্যদিকে, যৌথ পরিবার বলতে সেই ধরনের পরিবারকে বোঝায় যেখানে একাধিক প্রজন্মের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা একসঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করে, একই পাকশালে রন্ধন করা আহার্য গ্রহণ করে এবং একই সম্পত্তির আয় থেকে যৌথভাব জীবন নির্বাহ করে। প্রধানত কৃষিভিত্তিক সমাজেই যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য কালের নিরিখে বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম, জাতপাত ও শ্রেণীর ভিত্তিতে পরিবারের ধরনকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার ও যৌথ পরিবার দুটি কোনও বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব নয় বরং পরসম্পর নির্ভর পরম্পরা।

হিন্দু যৌথ পরিবার একটি বহু আলোচিত বিষয় এবং এর সংজ্ঞা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। একটি আদর্শ হিন্দু যৌথ পরিবার স্বামী, স্ত্রী, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা ও তাদের স্ত্রী ও সন্তান এবং পরিবারের

কর্তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয়। সাধারণত একটি যৌথ পরিবারে তিন বা তদূর্দ্ধ প্রজন্মের মানুষেরা বাস করে; এমনকি মৃত পূর্বপুরুষ এবং অজাত সন্তানদেরও পরিবারের অন্তর্ভূক্ত বলে ধরা হয়; অর্থাৎ পরিবারের বর্তমান সদস্যরা কাছ থেকে প্রাপ্ত গৃহের অছি মাত্র এবং উত্তর পুরুষের স্বার্থে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত। মূল কথাটি হ'ল পবিত্র পরম্পরা রক্ষার জন্য বংশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। সপিন্ডকরণ, পতি-আবাসিক ব্যবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা, পিতৃ-পরিচায়ী বংশক্রমাগত এভং উত্তরাধিকার হিন্দু যৌথ পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল ঃ যৌথ বাসস্থান, একত্রে ভোজন ব্যবস্থা, সম্পত্তির যৌথ অধিকার, সহযোগিতা ও সহানুভূতি, ধর্মীয় ও প্রথাগত বন্ধন। তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে যৌথ পরিবারের সদস্য কারা হতে পারেন তা নির্ণয় করা যেতে পারে; যথা, যৌথ পরিবারের সদস্যদের আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে, যৌথ পরিবারে বসবাসকারী প্রজন্মের সংখ্যার ভিত্তিতে ও সম্পত্তির অংশীদারীত্বের ধরনের ভিত্তিতে; তবে সমাজভেদে, সময়ভেদে বা পরিবারভেদে এর চরিত্রের কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে।

মুসলিম পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নবী কথিত সনাতন ধারা অনুসারেই মুসলিম বিহাহ, পরিবার ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ এবং দম্পতিকেন্দ্রিক উভয় ধরনের পরিবারের অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মুসলিম পরিবার পিতৃ-পরিচায়ী ও পতি-আবাসিক হয়ে থাকে। ঐশ্লামিক ব্যবস্থায় বিবাহ এবং সন্তানোৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত, মুসলিম পরিবারে স্বামী বা পরিবারের কর্তার সংসার পালন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। মুসলিম নারীর সামাজিক জীবন প্রধানত পরিবারকেন্দ্রিক। মুসলিম সমাজে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্র-সন্তানের গুরুত্ব বেশী তবে বর্তমানে অনেকটাই ঔদার্য এসেছে। 'পর্দা' প্রথা মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিবারের প্রধান প্রধান কার্যাবলী হ'ল ঃ যৌনাচরণ প্রজনন, প্রতিপালন, অর্থনৈতিক, উত্তরাধিকার নির্ধারণ, মনস্তাত্বিক ও সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর আত্ম-অভিমুখী মানবশিশু পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়বন্ধুদের সহযোগিতা ও শিক্ষায় সমাজ-অভিমুখী হয়ে ওঠে। পরিবার এইভাবে ব্যক্তি ও সমাজেব যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে।

সাবেকী যৌথ পরিবারের গত ২০০ বৎসরে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তনকারী এই উপাদানগুলি হ'ল ঃ অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, আইনগত, শিল্পায়ন ও নগরায়ন। তবে পরিবর্তন হলেও প্রকৃতপক্ষে যৌথ পরিবার বা যৌথ পরিবারবোধ ভেঙে পড়েনি। আধুনিক যৌথ পরিবারের লক্ষণগুলি হ'ল ঃ দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার প্রয়োজনে যৌথ পরিবারের প্রতি কর্তব্য করতে প্রস্তুত। গ্রামীন কাজেই যৌথ পরিবার বেশী বর্তমান; তবে সেখানেও সদস্য সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। শিল্পায়নের ফলে যৌথ পরিবারে ভেঙে পড়েনি তার চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। যৌথ পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার মতবাদই প্রচলিত আছে। নঞর্থক মতবাদ অনুসারে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারে সন্তান সংখ্যা হ্রাস পাবে; পিতামাতার কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে; কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাবে; বিবাহ-বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে সদর্থক মতবাদ অনুসারে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার ক্ষুদ্র হওয়ায় মানুষের পরিবারের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, পরিবারের কাজকর্মের গুণগত পরিবর্তন হবে। ভারতেও পরিবারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হলেও কোনওভাবেই তার অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন নয়।

## ৫.১১ অনুশীলনী

(১) পরিবারের সংজ্ঞা দিন (পাঁচ লাইনের মধ্যে)

_____

_____

_____

_____

_____

(২) পরিবারের বৈশিষ্ট্য কি কি?

(৩) পরিবার কয় প্রকার হতে পারে? (সঠিক উত্তরে চিহ্ন দিন)

(i) ২ (ii) ৫ (iii) ৬ (iv) ৮

৪। দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার ও যৌথ পরিবারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৫। হিন্দু যৌথ পরিবারের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কি কি? তিন লাইনে উত্তর দিন।

_____

_____

_____

৬। ভারতীয় মুসলিম পরিবার সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।

৭। পরিবারের কার্যবলী কি কি ব্যাখ্যা করুন।

৮। যৌথ পরিবারের ভাঙনের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করুন।

৯। **নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ঠিক অথবা ভুল নির্দেশ করুন।**

(ক) পরিবারের শিশুর সঙ্গে পিতামাতার সম্পর্ক সখ্যতামূলক (ঠিক/ভুল)।

(খ) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬) চালু হওয়ার আগে বাংলা ও আসামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থাকে বলা হ'ত 'মিতাক্ষর' ব্যবস্থা (ঠিক/ভুল)।

(গ) সাধারণত মুসলিম পরিবার পতি-আবাসিক ও পিতৃপরিচায়ী হয়ে থাকে (ঠিক/ভুল)।

(ঘ) শিল্পায়ন ও নগরায়ন পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধারাকে ত্বরান্বিত করেছে (ঠিক/ভুল)।

(ঙ) গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের ফলে যৌথ পরিবারের বোধ লুপ্ত হয়েছে (ঠিক/ভুল।)

১০। পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সদর্থক ও নঞর্থক মতবাদগুলি কি কি?

## ৫.১২ গ্রন্থপঞ্জী


১। Bettomore, T.B. : Sociology, Unwin University Books, London, 1962

২। Ahuja, Ram : Indian Social System, Rawat Publications, New Delhi

৩। Davis, Kingsley : Human Society, The Macmillan Co. New York, 1961

৪। Kapadia, K.M. : Marriage & Family in India, OUP, Bombay, 1973

৫। Bhattacharya, D.C. : Sociology.

৬। Mac Iver & Page : Society, The Macmillan Co. New York, 1959.

৭। কর, পরিমল ভূষণ ঃ সমাজতত্ত্ব, রাজ্যপুস্তক পর্ষদ ১৯৭৪

# একক ৬ ❑ বিবাহ

গঠন :

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ বিবাহের সংজ্ঞা

৬.৪ বিবাহের প্রকারভেদ

- ৬.৪.১ একগামিতা
- ৬.৪.২ বহুপত্নীকত্ব
- ৬.৪.৩ বহুভর্তৃকত্ব

৬.৫ পাত্র/পাত্রী নির্বাচন

- ৬.৫.১ গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ
- ৬.৫.২ গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ
- ৬.৫.৩ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ
- ৬.৫.৪. সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহ
- ৬.৫.৫. সঙঘ-বিবাহ
- ৬.৫.৬. পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি
- ৬.৫.৭. বিবাহের বয়স

৬.৬ হিন্দু বিবাহ

- ৬.৬.১ হিন্দু বিবাহের প্রকারভেদ
- ৬.৬.২ হিন্দু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি
- ৬.৬.৩ কন্যাপণ
- ৬.৬.৪ বরপণ
- ৬.৬.৫ হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইন

৬.৭ মুসলিম বিবাহ

- ৬.৭.১ মুসলিম বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি

৬.৮ বিবাহ বিচ্ছেদ

- ৬.৮.১ হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ পদ্ধতি
- ৬.৮.২ মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ পদ্ধতি

৬.৯ সারাংশ
৬.১০ অনুশীলনী
৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী

## ৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- বিবাহ কাকে বলে
- বিভিন্ন প্রকারের বিবাহের পদ্ধতি
- বিভিন্ন সমাজের স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন পদ্ধতি
- হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি
- মুসলিম বিবাহ পদ্ধতি ও
- বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত নিয়ম কানুন

## ৬.২ প্রস্তাবনা

উইল ডুরান্ট (Will Durant) বলেছেন যে, মানুষের জীবনের মূল সত্য রাজনীতি বা বাণিজ্যের মধ্যে নিহিত নয়; তা আছে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মধ্যে—পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের মধ্যে—পিতামাতা ও সন্তান সন্ততির সম্পর্কের মধ্যে। মানবজীবনের সুখ গৃহকোণেই খুঁজে পাওয়া যায়। তাই পরিবার নামক সঙ্ঘের সঙ্গে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। নারী ও পুরুষের দীর্ঘস্থায়ী যৌন সম্পর্ক ও সন্তানের জন্মদান বৈধকরণ ও লালন পালনের সমাজ-স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হ'ল বিবাহ। বিবাহ কিছু সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সাধিত হয়। বিবাহের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর দৈহিক সম্পর্ক সমাজ-স্বীকৃতভাবে স্থাপিত হয়। বিবাহ নারী-পুরুষের কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালনের সূচনা করে। তাই বলা হয় যে, পশুরা যৌন ক্রিয়ায় মিলিত হয়, কিন্তু মানুষ বিবাহ করে। তাছাড়া সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহের অন্যতম গুরুত্ব রয়েছে। সমাজের চোখে বৈধ সন্তানের জন্ম কেবলমাত্র বিবাহের মাধ্যমেই সম্ভব হ'তে পারে। বিবাহ সম্পত্তির উত্তরাধিকার চিহ্নিত করে। বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার সৃষ্টি হ'তে পারে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যা মানব সমাজের অনুবর্তনে সহায়ক হয়েছে।

বর্তমান এককে আমরা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমাদের আলোচনার মধ্যে থাকবে বিবাহের প্রকারভেদ, স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন পদ্ধতি, হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিবাহ পদ্ধতি ও আচারব্যবস্থা ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি। এর মাধ্যমে বিবাহ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা গড়ে উঠবে আশা করা যায়।

## ৬.৩ বিবাহের সংজ্ঞা

প্রত্যেক মানুষকেই সারাজীবন সমাজে কোনও না কোনও ভূমিকা পালন করে যেতে হয়। এর মধ্যে দু'টি ভূমিকা মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যথা, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং বৈবাহিক ও পারিবারিক ভূমিকা। মানুষের জীবনের অধিকাংশ সময় এই দুই ভূমিকার মধ্যে দিয়েই কেটে যায়। আবার এই দুই ভূমিকার মধ্যে বৈবাহিক ভূমিকা হ'ল প্রাথমিক-সম্পর্ক ভিত্তিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা হ'ল গৌণ-সম্পর্ক ভিত্তিক। প্রাথমিক সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্ত, উদার, আবেগমূলক ও অনির্দিষ্ট। অন্যদিকে গৌণ সম্পর্ক সীমাবদ্ধ, আবেগহীন, প্রয়োজনভিত্তিক ও চুক্তি ভিত্তিক। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবাহের গুরুত্ব হ'ল এটি অন্যান্য প্রাথমিক সম্পর্কের থেকে, যেমন, বান্ধুবান্ধব, আলাদা। কারণ, বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত যৌন-সম্পর্ক ভিত্তিক; যে সম্পর্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বিবাহের মাধ্যমে সমাজের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাধিত হয়; (১) যৌন প্রয়োজনসাধন ও (২) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ওয়েষ্টারমার্ক (Wesermarck) বলেছেন যে, it is a relation of one or more men to one or more women which is recognised by custom or law and involves certain rights and duties both in the case of the parties entering the union and in the case of the children born of it. রিভার্স (Rivers) মতে, বিবাহ পুরুষ ও নারীর যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠান। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান না থাকলে সমাজে যৌন যথেচ্ছাচার প্রচলিত হ'ত। কুস (koos) এর মতে, বিবাহ পালয়িতৃ পরিবার (family of orientation) এবং জন্মদাতৃ পরিবারের (family of procreation) মধ্যে বিভাজন রেখা। পালয়িতৃ পরিবারে মানুষকে শৈশবে, কৈশোরে এবং বয়ঃসন্ধিকালে যে ভূমিকা পালন করতে হয় সেখানে কোনও দায়িত্বপালনের প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু বিবাহের পর জন্মদাতৃ পরিবারে মানুষকে স্বামী/স্ত্রী, পিতা/মাতা, জীবিকা অর্জনকারী ব্যক্তি, প্রভৃতি হিসেবে বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। রোসেনথালও (Rosenthal) বিবাহের আইনগত ও সামাজিক দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, বিবাহ হ'ল আইনগত ও সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে দু'টি নারী-পুরুষের মধ্যে মিলন।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, বিবাহ হ'ল সমাজ-ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আইন ও সমাজ-স্বীকৃত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দায়িত্ব পালনের কর্মবিভাজন করা থাকে। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন ও ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়েই পরিবার ও পরিবার-ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে এবং সামাজিক কাঠামো অক্ষুন্ন থাকে।

## ৬.৪ বিবাহের প্রকারভেদ

বিবাহের প্রকার বিভিন্ন রকমের হ'তে পারে। এই প্রকারভেদ নির্ভর করে বিবাহকারী ব্যক্তির সংখ্যার দ্বারা এবং আইনসঙ্গতভাবে কার সঙ্গে বিবাহ সম্ভব সেই নিয়মের দ্বারা; তবে সাধারণভাবে বিবাহ দুই প্রকার হ'তে পারে—একগামী বিবাহ (monogamous marriage) ও বহুগামী বিবাহ (polygamous marriage)।

## ৬.৪.১ একগামিতা

একগামী বিবাহে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীরই বিবাহ হয়। মোটামুটিভাবে পৃথিবীর সব দেশেই একগামীত্ব দেখতে পাওয়া যায় এবং আধুনিক শিল্পায়িত ও নগরায়িত সমাজে এই ধরনের বিবাহের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। এমনকি যে সমাজে বহুগামীতা অনুমোদিত সেখানেও অর্থনৈতিক কারণে এবং সামাজে নারী-পুরুষের সংখ্যার ভারসাম্যের জন্য আধিকাংশ লোকে একটি মাত্র বিবাহ করে। আবার অধিকাংশ একগামী সমাজে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ অনুমোদিত। এই ধরনের বিবাহকে ক্রমিক একগামিত্ব (serial monogamy) বলে। অধিকাংশ পশ্চিমী দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। কোনও কোনও সমাজে আবার সরাসরি একগামীত্ব (Widow Remarriage Act 1856) চালু হওয়ার আগে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্ভব ছিল না। নিম্নবর্ণের কোনও কোনও সমাজে পুনর্বিবাহ প্রথা চালু ছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রেও মৃত স্বামীর ভাই এর সঙ্গে বিবাহ সম্ভব ছিল।

হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ (Hindu Marriage Act, 1955) চালু হওয়ার আগে হিন্দু সমাজে বহুগামীত্ব প্রচলিত থাকলেও দেখা যায় যে, সাধারণভাবে হিন্দুসমাজ বিবাহের ক্ষেত্রে একগামী ছিল। কেবলমাত্র রাজা, জমিদার, সামন্ত, গ্রাম্য মোড়ল শ্রেণীর কিছু সামান্য সংখ্যক মানুষই বহুগামী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মানুষেরা বহুগামী প্রথা রদ করার আন্দোলন শুরু করেন। স্বাধীনতার পর হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫ দ্বারা হিন্দু, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়, যথা, শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধদের মধ্যে একগামীত্ব চালু করা হয়। খ্রীষ্টান এবং পার্শিরা চিরকালই একগামী।

অন্যদিকে বহুগামীত্ব দুই প্রকারের হ'তে পারে, যথা বহুপত্নীকত্ব ও বহুভর্তৃকত্ব (Polygynny and polyandry).

## ৬.৪.২ বহুপত্নীকত্ব

একই পুরুষের সঙ্গে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে এক বা একাধিক বিবাহকে বহুপত্নীকত্ব বলে। উপজাতি সম্প্রদায়, এস্কিমো এবং আফ্রিকার কোনও কোনও সমাজে বহুপত্নীকত্বের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মেও বহুপত্নী গ্রহণ অনুমোদিত। তবে একজন মুসলিম একসঙ্গে চারটির বেশী স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে না। কোনও কোনও সমাজে পুরুষ তার স্ত্রীর বোনদেরও বিবাহ করে, তাকে sororal বহুপত্নীকত্ব বলা হয়।

বৈদিক যুগ থেকে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন চালু হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে পুরুষের একাধিক বিবাহ অনুমোদিত ছিল; যদিও বৈদিক বিবাহ বিধি একগামীত্ব শ্রেয় মনে করত। ধর্মসূত্র অনুসারে একজন পুরুষ বিবাহের দশবছর পরে আবার বিবাহ করতে পারে যদি তার স্ত্রী সন্তানহীনা হয়; বিবাহের তের বা চোদ্দ বছর পর আবার বিবাহ করতে পারে যদি তার ইতিপূর্বে শুধু কন্যাসন্তান হয়ে থাকে এবং সে যদি পুত্রসন্তান আকাঙ্খা করে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে বিবাহের আটবছর পরে যদি তার স্ত্রী সন্তানহীনা হয়। যদি তার সন্তানরা জীবিত না থাকে তাহলে সে বিবাহের দশবছর পর বিবাহ করতে পারে। যদি তার কেবলমাত্র কন্যাসন্তান থাকে তাহলে বিবাহের এগার বছর পর বিবাহ করতে পারে এবং প্রথম বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিবাহ করতে পারে যদি তার স্ত্রী কলহপ্রিয়া, দুর্দমনীয়া এবং রূঢ়ভাষিনী হয়। কাপাদিয়া (K. L. Kapadia) দেখিয়েছেন যে হিন্দু রাজাদের মধ্যে বহুপত্নীকত্ব ছিল এবং রাণীদের মধ্যে স্তরভেদ ছিল। মধ্যযুগে বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহুপত্নীকত্বের প্রচলন ছিল দেখা যায়। রিস্‌লে (Risley) দেখিয়েছেন যে, কোনও কোনও কুলীন ব্রাহ্মণ একশ'র বেশী বিবাহ করেছিলেন।

যদিও সমাজে বহুপত্নীকত্ব অমুমোদিত ছিল তবে তা সাধারণত রাজপুরুষ ও ধনীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং সমাজে বহুপত্নীকত্বকে সুনজরে দেখা হ'ত না। মহাভারতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, সে ক্ষমাহীন পাপ কাজ করে।

হিন্দুবিবাহ আইন, ১৯৫৫ পাস হওয়ার পর অবশ্য বহুপত্নী গ্রহণ ব্যবস্থা হিন্দুদের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আইনগত কারণ ছাড়াও বহুপত্নীকত্ব বন্ধের সামাজিক কারণগুলি হ'ল বর্তমানে কেউই বিশ্বাস করে না যে বৃদ্ধবয়সে দেখাশোনার জন্য বা মৃত্যুর পর 'মোক্ষ' লাভের জন্য পুত্রসন্তান একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে গেলে একাধিক স্ত্রী পোষন করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, একাধিক স্ত্রী সংসারে কলহ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, চতুর্থত, বর্তমানের নারী শিক্ষিত, সচেতন ও অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হওয়ার ফলে বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হয়।

### ৬.৪.৩ বহুভর্তৃকত্ব

একই নারীর সঙ্গে এক স্বামী বর্তমান থাকতে এক বা একাধিক পুরুষের বিবাহকে বহুভর্তৃকত্ব বলে। বহুভর্তৃকত্ব ভারতে বহুকাল ধরেই প্রচলিত। এর সবচেয়ে প্রাচীন উদাহরণ হ'ল মহাভারতে উল্লেখিত দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ। হিমালয় সন্নিহিত উত্তরভারতে ও দক্ষিণভারতের কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে বহুভর্তৃকত্ব প্রচলিত আছে। কাংড়া উপত্যকার জৌনসার-বাওয়ার থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত এবং উত্তরপ্রদেশের দেরাদুন অঞ্চলে এর অস্তিত্ব দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরির টোডাদের মধ্যে এবং মালাবার অঞ্চলের নায়ারদের মধ্যে বহুপত্নীকত্ব প্রচলিত আছে। তবে ওয়েষ্টারমার্ক নায়ারদের বহুভর্তৃকত্বকে বিবাহ হিসেবে মানতে নারাজ। কারণ, এক্ষেত্রে বিবাহ ব্যবস্থা খুবই শিথিল ও ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং স্বামীরা স্ত্রীদের সঙ্গে প্রায় বাস করত না এবং স্বামীর বা পিতার কর্তব্য পালন করত না। মালাবার বিবাহ আইন, ১৮৯৬, নায়ারদের বিবাহ ব্যবস্থায় স্বায়ীত্ব সূচনা করে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কেরলের কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুভর্তৃকত্ব প্রচলিত ছিল। মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের ইরাভা, কানিয়ান, ভেল্লান এবং আসরি গোষ্ঠীর মধ্যে বহুভর্তৃকত্ব প্রচলিত ছিল। অবশ্য এদের আচরিত বহুভর্তৃকত্বকে ভ্রাতৃক বহুভর্তৃকত্ব (Fraternal polyandry) বলা হয়, কারণ এই ব্যবস্থায় একজন নারী একই পরিবারের ভাইদের বিবাহ করে।

বহুভর্তৃকত্বের প্রধান কারণগুলি হ'ল ঃ (১) সম্পত্তির বিভাজন রোধ করা (বিশেষত ভ্রাতৃক বহুভর্তৃকত্বের ক্ষেত্রে) (২) ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে সংহতি রক্ষা করা (৩) বাণিজ্যের জন্য বা সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য স্বামী দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকা, (৪) অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণ, যথা অনুর্বর জমি বিভাজন রোধ করা প্রভৃতি।

## ৬.৫ পাত্র/পাত্রী নির্বাচন

প্রত্যেক সমাজেই বিবাহের পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু বাধা-নিষেধ থাকে। কোনও কোনও সমাজে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে আবার কোনও সমাজে পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের ভার থাকে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের উপর। আর এই বিধিনিষেধগুলি কোনও ক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রযুক্ত হয় আবার অন্য ক্ষেত্রে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। সাধারণত পাত্র-পাত্রী নির্বাচন পদ্ধতিকে দুইটি ভাগে ভাগ

করা যায়; (১) পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে বা কারা (২) পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি; অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় পাত্র বা পাত্রীর কোন্ গুণাবলীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিষয়গুলিকে এবার আলাদা ভাবে আলোচনা করা যাক্।

হিন্দুসমাজে পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; যথা গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ (Endgamy) ও গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ (Exogamy)।

## ৬.৫.১ গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ

যখন একই গোষ্ঠী থেকে পাত্র এবং পাত্রী নির্বাচন যথাযথ বলে বিবেচিত হয় তখন তাকে গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ বলে। এই গোষ্ঠী জাতপাত, সম্প্রদায়, বর্ণগত, নৃতাত্ত্বিক বা ধর্মীয় হ'তে পারে। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে সবর্ণ বিবাহ এই শ্রেণীর বিবাহ। আইনগত বাধা না থাকলেও সব সমাজেই অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সঙ্গে বিবাহ সুনজরে দেখা হয় না। পশ্চিমী দেশে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির বিবাহ শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে নানারকম সামাজিক ও আইনগত বিধিনিষেধ রয়েছে। হিন্দুসমাজে বিবাহ প্রধানত জাতপাত ভিত্তিক বা বর্ণ (Varna) ভিত্তিক। তাছাড়াও অঞ্চল, সম্প্রদায় এবং ভাষাভিত্তিক। ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে অন্তত তিনশ' জাত (Caste) আছে; প্রতিটি জাত আবার অসংখ্য অবরজাত (Sub-caste)-এ বিভক্ত এবং এক্ষেত্রে বিবাহ অবশ্যই গোষ্ঠী সাপেক্ষ হ'তে হয়। যেমন, হিন্দু সমাজে প্রধান চারটি বর্ণ বিভাগ হ'ল-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই প্রধান চারটি বর্ণ আবার বিভিন্ন অবর-জাত (Sub-caste)-এ বিভক্ত, যেমন কুলীন, ভঙ্গ-কুলীন প্রভৃতি। এক্ষেত্রেও বিবাহ গোষ্ঠী সাপেক্ষ হ'তে হয়। আবার বিবাহের ক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিক গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহও লক্ষ্যণীয়; যেমন, বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি শ্রেণী বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বঙ্গজ প্রভৃতি আঞ্চলিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এক্ষেত্রে বিবাহ কেবল বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠী সাপেক্ষ শুধু নয়, অঞ্চল ভিত্তিক গৌষ্ঠীসাপেক্ষও হ'তে হয়। যদি দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে মারাঠী, তেলেগু, তামিল, তামিল, কন্নড় প্রভৃতি ভাষার জাতির মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ যেমন, পিসীর সন্তান বা মামাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উত্তর ভারতে এ ধরনের বিবাহ আদৌ অনুমোদিত নয়।

গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ কেবলমাত্র হিন্দুসমাজেই নয়, অন্যান্য অ-হিন্দু সমাজেও অনুসরণ করা হয়। মুসলিম সমাজে 'সৈয়দ' বংশীয়রা অভিজাত হিসেবে বিবেচিত এবং এঁদের মধ্যে গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ প্রচলিত। মুসলিম সমাজে সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও পশ্চিমভারতে অনেক মুসলিম গোষ্ঠী খুড়ভুতো/জ্যাঠাতুতো ভ্রাতা-ভ্রগ্নীর বিবাহকে আদর্শ-বলে মনে করে। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও সম্পত্তির বিভাজন রোধ করাই এর উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়।

অতীতে জাতপাত ভিত্তিক গোষ্ঠীসাপেক্ষ বিবাহ সমর্থন করা হ'ত, কারণ মনে করা হ'ত এই ধরনের বিবাহ বৈবাহিক সম্পর্ককে সুসমন্বিত করে; দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠী-বৃত্তির কলাকৌশল সংগুপ্ত রাখে; তৃতীয়ত, গোষ্ঠীর সংহতি বজায় রাখে, গোষ্ঠীর সদস্য-সংখ্যা ও গোষ্ঠী-শক্তি অক্ষুন্ন রাখে। অন্যদিকে এই ধরনের বিবাহের নঞর্থক দিকগুলি হ'ল ঃ প্রথমত, এর ফলে গোষ্ঠী-বিচ্ছিন্নতাও গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয়ত, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্র সীমিত হওয়ার ফলে অনেক সময়েই সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়; তৃতীয়ত, বাল্যবিবাহ, বরপণ প্রভৃতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

সবশেষে বলা যায় যে, ভারতে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও আন্তঃজাত বা আন্তঃধর্ম (inter caste or inter religious) বিবাহ বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। কেবলমাত্র শিক্ষিত শহুরে মানুষের মধ্যেই এই ধরনের বিবাহের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষই গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ অনুসরণ করে।

## ৬.৫.২ গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ

যখন একই গোষ্ঠীভুক্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং দু'টি ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন যথাযথ বলে বিবেচিত হয় তখন তাকে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ বলা হয়। গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহের উদ্ভবের কারণ হিসেবে কিছু তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ম্যাকলেনান (Maclenan) বলেছেন যে, অতীতে গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর স্বল্পতার কারণে গোষ্ঠী বহির্ভূত-বিবাহের উদ্ভব ঘটেছে, মর্গান (L.H.Morgan) বলেছেন যে, আদিম সমাজে গোষ্ঠীর মধ্যে যৌন যথেচ্ছার রোধ করার জন্য গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ওয়েষ্টারমার্ক মনে করেন যে, একই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন অনাকর্ষণের জন্যই এই প্রথার উদ্ভব হয়েছে। এই প্রথার প্রচলনের পিছনে দু'টি কারণ আছে বলে কানে (Kane) উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হ'লে তাদের ত্রুটিগুলি সন্তানের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহের বাধা না থাকলে গোপন যৌন সম্পর্কে সৃষ্টি হ'তে পারে ফলে গোষ্ঠীর নৈতিক অধঃপতন ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

যাই হোক, এই উদ্ভবের পিছনে যে কারণই থাকুক না কেন দেখা যায় যে, সব সমাজেই যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়। যেমন, অজাচার (incest) কিংবা কোনও কোনও আত্মীয় সম্পর্কের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক সব সমাজেই নিন্দিত এবং পরিত্যাজ্য বলে গন্য করা হয়। মাতা ও পুত্র কিংবা পিতা ও কন্যার মধ্যে বিবাহ সব সমাজেই নিষিদ্ধ। প্রাচীন মিশর ও পেরু ভিন্ন অন্য কোথাও কোনও সমাজেই আপন ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ হয় না। অধিকাংশ পশ্চিমী দেশে খুড়তুতো, জ্যাঠাতুতো ভ্রাতা-ভগ্নীর (first cousin) মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

হিন্দু সমাজে অন্য দুই প্রকার গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত। সেগুলি 'সগোত্র' বহির্ভূত বিবাহ এবং 'সপিন্ড' বহিভূত বিবাহ।

'গোত্র' বলতে বোঝায় এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যরা মনে করে যে তারা কোনও পৌরাণিক পূর্বপুরুষ বা 'ঋষির' বংশধর। অর্থাৎ কোনও ঋষি সেই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের আদিপুরুষ। যেমন, কাশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, বাৎস প্রভৃতি। অতীতে কেবলমাত্র আটটি গোত্র বর্তমান ছিল। ক্রমশ তার সংখ্যা কয়েক হাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'প্রবর' এর বিষয়টিও আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতি গোত্র কতকগুলি 'প্রবর' আছে। এই গুলিও কিছু ব্যক্তির নামানুসারী। বলা হয় যে, প্রবর-প্রবর্তক ঋষিরা গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের বংশধর। সুতরাং, মনে করা হয় যে, সগোত্র ও সপ্রবর সম্পন্ন ব্যক্তিরা একই বংশধারার বাহক। অতএব এদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সমাজতত্ত্ববিদদের মতে, ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাদের আগে সগোত্র বিবাহের উপর কোনও বাধানিষেধ ছিল না। অনেকে বলেছেন যে, বৈদিক যুগে সগোত্র বহির্ভূত বিবাহের কোনও ধারণার অস্তিত্ব ছিল না। মানুসংহিতার মাধ্যমেই প্রথম সগোত্র বহির্ভুত বিবাহের প্রচলন হয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, রক্ত-সম্পর্ক ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে যে বাধা থাকে তার সঙ্গে গোত্র-প্রবর নিষেধের কোন সম্পর্ক নাই। হিন্দু বিবাহ বিধি অনুসারে রক্ত সম্পর্ক সীমার বাইরে বিবাহ করা চলে। বাংলায় কন্যাকে গোত্রান্তরিত করে বিবাহ করা যায়। তাই অনেক সগ্রোত্র বিবাহে বাধাকে

অযৌক্তিক বলে মনে করেন। আবার, গোত্র-প্রবর্তক ঋষিরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং তাঁরা অব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ হ'তে পারেন না। সম্ভবত তাঁরা অব্রাহ্মাণদের পুরোহিত ছিলেন অন্যদিকে, শূদ্রদের মধ্যে কোনও গোত্র-প্রবর প্রচলিত নাই। মেধাতিথি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গোত্র-প্রবর প্রভৃতি সম্পূর্ণ শ্রুতি-স্মৃতি নির্ভর। লৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বর্তমানে Hindu Marriage Disabilited Removeal Act, 1946-এ সগোত্র বিবাহের উপর বিধিনিষেধ অপসারিত হয়েছে।

হিন্দু সমাজে 'সপিন্ড', অর্থাৎ পিন্ডধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিরাই মৃত পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধে পিন্ডদানের আইনগত ও ধর্মীয় অধিকার প্রাপ্ত সুতরাং রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। গৌতম পিতার দিক দিয়ে পাঁচ প্রজন্ম পর্য্যন্ত আন্তঃবিবাহ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন। যজ্ঞবল্ক্য গৌতমের মতকে সমর্থন করেছেন। মনু এ সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট মতামত দেননি। কাপাদিয়া বলেছেন যে, অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সপিন্ড বহির্ভূত বিবাহ কেবলমাত্র পরামর্শমূলক ছিল। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন (Hindu Marriage Act, 1955) পিতৃকুলের পাঁচ প্রজন্ম পর্যন্ত এবং মাতৃকুলের তিন প্রজন্ম পর্যন্ত আন্তঃবিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে যেখানে সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহ প্রথাসিদ্ধ সেখানে তাকে বৈধ বলে উল্লেখ করেছে।

খ্রীষ্টান ও মুসলিম দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারেও গোষ্ঠী বহির্ভুত বিবাহ ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। কেরলের উত্তর মালাবার অঞ্চলের মোপলা মুসলিমরা মাতৃপরিচায়ী বংশধারা অনুসরণ করে। তাদের মধ্যে মাতৃ বংশধারায় বিবাহ নিষিদ্ধ। বংশধারাগত গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ জম্মু ও কাশ্মীরের গুজ্জর মুসলিমদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

## ৬.৫.৩ অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ

বিবাহের মাধ্যমে পাত্র বা পাত্রীর সামাজিক মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধির থেকে বিবাহকে দুটি ধারায় ভাগ করা যায়। একটিকে বলা হয় অনুলোম বিবাহ (Hypergamy) ও অন্যটিকে বলা হয় প্রতিলোম বিবাহ (Hypogamy)।

যখন কোনও উচ্চবর্ণজাত বা একই জাতের মধ্যে-উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত অবর-জাতের (sub-caste) পাত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বা নিম্নমর্যাদা প্রাপ্ত পাত্রীর বিবাহ হয় তাকে অনুলোম বিবাহ বলে। আবার যখন কোনও উচ্চবর্ণজাত বা একই জাতের মধ্যে উচ্চমর্যাদাপ্রাপ্ত অবর-জাতের (sub-caste) পাত্রীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের বা নিম্নমর্যাদা প্রাপ্ত পাত্রের বিবাহ হয় তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। ভারতে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য অনুলোম বিবাহ সমাজস্বীকৃত ছিল। সাধারণত, একই জাত-ভুক্ত-জাতগুলির মধ্যে এই ধরনের নিম্নবর্ণ বা নিম্নমর্যাদাপ্রাপ্ত পাত্রের বিবাহ সর্বদাই নিন্দিত ছিল। উত্তরভারতের রাজপুত ও জাঠ, গুজরাটের আনভিল ব্রাহ্মণ এবং উত্তরপ্রদেশের কান্যাকুব্জ ও সূর্যপুরী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। দেখা গেছে যে, যে সমস্ত অঞ্চলে অনুলোম/প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত সেখানে গোষ্ঠী বা বংশধারার মধ্যে মর্যাদার তারতম্য আছে। অতীতে রাজপুত ও জাঠদের মধ্যে শিশু-কন্যা হত্যার (female infanticide) বিশেষ প্রবণতা ছিল। কারণ হিসেব বলা হয় যে, ঐ সম্প্রদায়গুলির পাত্রের অভাবে কন্যাদের বিবাহ দেওয়া বিশেষ কঠিন ছিল, কারণ তাদের পুরুষেরা অনুলোম বিবাহ করতে পারত, কিন্তু কন্যাদের প্রতিলোম বিবাহ দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে কন্যার বিবাহ প্রভূত বরপণ প্রয়োজন হ'ত। বাংলার কুলীন ব্রহ্মাণদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদাজনিত কারণে প্রভূত বরপণ দাবী করত।

কাপাদিয়া বলেছেন, সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ-ব্যবস্থায় প্রচলন করা হয়েছিল। তাঁর মতে, এই ধরনের বিবাহ-ব্যবস্থা হিন্দু বিবাহ রীতির চেয়ে হিন্দু জাতপাতের স্তরবিন্যাসের সঙ্গে বেশী সম্পৃক্ত।

## ৬.৫.৪ সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহ

সম্পর্কিত ভাই-বোন সাধারণত চার প্রকার হয়ে থাকে-জ্যাঠাতুতো/খুড়তুতো, পিসতুতো, মাসতুতো ও মামাতো। জ্যাঠাতুতো/খুড়তোতো ও মাসতুতো ভাই-বোনকে 'সহগামী' (parallel) ভাইবোন (cousin) বালা হয়। এক্ষেত্রে ভাই-বোনের পিতা বা মাতা সমলিঙ্গ। অন্যদিকে, মামাতো এবং পিসতুতো ভাই-বোনকে 'সঙ্কর' (cross) ভাই-বোন (cousin) বলা হয়। এক্ষেত্রে তাদের পিতা বা মাতা বিপরীত লিঙ্গের।

হিন্দু পুরাণ অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, 'সঙ্কর' ভাই-বোন বিবাহ (cross-cousin Marriage) প্রাচীন হিন্দু সমাজে অনুমোদিত ছিল। মনু অবশ্য এ ধরনের বিবাহকে অনুমোদন করেননি। বৌধায়ন দক্ষিণ ভারতে এ ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেছিলেন। রিচার্ডের মতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থার মধ্যেই মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের বিবাহের উৎস নিহিত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কন্যা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'ত। রিভার্স এবং ঘুরের বিবাহের উৎস নিহিত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কন্যা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'ত। রিভার্স এবং ঘুরের (Rivers and Ghurye) মতে, যে জনগোষ্ঠীতে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যাবস্থা প্রচলিত ছিল সেখানে এই ধরনের বিবাহ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। বলা হয়ে থাকে যে, সম্পর্কিত ভাই বোনের মধ্যে স্নেহ-মমতা বৃদ্ধির জন্যই এ-ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ইরাবতী কার্ভে (Irawati Karve) বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতে আত্মীয়-সম্পর্ক প্রসারের জন্য বিবাহ স্থির করা হয় না। প্রত্যেক বিবাহই নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করে।

সম্পর্কিত ভাই-বোন বিবাহের উৎস ও কারণ যাই হোক্ না কেন বর্তমানে এই প্রথার সপক্ষে ও বিপক্ষে বেশ কিছু মত লক্ষ্য করা যায়। এই মতগুলি জৈবিক, সামাজিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণভিত্তিক। এই প্রথার বিপক্ষে যে মতগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হ'ল ঃ প্রথমত, এই ধরনের বিবাহের ফলে পিতা-মাতার শারীরিক ত্রুটি সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, এর ফলে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গোপন সম্পর্ক সৃষ্টি হ'তে পারে, যা নৈকিত দিক থেকে পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকর। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থা ধর্মবিরোধী। এই প্রথার পক্ষে প্রদত্ত মতগুলি হ'লঃ প্রথমত, এই ধরনের ফলে সম্পত্তি পরিবারের মধ্যেই থাকবে। দ্বিতীয়ত, সম্পর্কিত ভাই-বোনের মধ্যে বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। তৃতীয়ত, যৌথ পরিবারের ভাঙনের ফলে সম্পর্কিত ভাই-বোন বর্তমানে একসঙ্গে বসবাস করে না। যদি সমাজ সংস্কারের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় তাহলে এই ধরনের বিবাহ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিতে ক্ষতি কি?

## ৬.৫.৫ সঙঘ-বিবাহ

সঙঘবিবাহ বলতে একাধিক পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর বিবাহকে বোঝায়। এক অর্থে একে বহুপত্নীকত্ব ও বহুভর্তৃকত্বের সংমিশ্রণ বলা চলে। কোনও কোনও নৃতাত্ত্বিক সঙঘবিবাহকে একগামী বিবাহের পূর্বসূরী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিবর্তনের ধারায় এরকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আদিম সমাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৌনাচরণে সাম্যবাদ লক্ষ্য করা গেলেও তাকে ঠিক সঙঘবিবাহ বলা চলে না। কোনও কোনও অষ্ট্রেলীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বা এস্কিমোদের মধ্যে উৎসবাদির সময়ে স্ত্রী বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তাকে সঙঘ বিবাহ বলা যায় না, কারণ এক্ষেত্রে সামায়িক যৌনচরণের সঙ্গে বিবাহের অন্যান্য দায়-দায়িত্ব যুক্ত থাকেনা। সহবাসকারী

নারী-পুরুষ একই সঙ্গে বসবাস করে না। শুধু অস্ট্রেলীয় বা এস্কিমোই নয় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আদিবাসীদের মধ্যে সঙঘবিবাহ ব্যবস্থা অনুপস্থিত। বরং নীলগিরির টোডা সমাজের মধ্যে কিছু পরিমাণে সঙঘবিবাহ প্রথা গড়ে উঠেছিল। শিশুকন্যা হত্যার (female infanticide) কারণে টোডাদের মধ্যে নারী-পুরুষের হারের বিসম তারতম্য ঘটায় সেখানে বহুভর্তৃকত্ব প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে আইন করে শিশুকন্যা হত্যা বন্ধ করা হ'লে সামাজে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে বহুভর্তৃকত্ব ও বহুপত্নীকত্বের এক মিশ্রিত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সবশেষে বলা যায় যে, সঙঘবিবাহের কোন প্রচলিত সামাজিক বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

## ৬.৫.৬ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি

যে কোনও সমাজেই বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনও কোনও সমাজে বিবাহেচ্ছু নারী-পুরুষ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্বেচ্ছাধীন। আবার অন্য কিছু সমাজে পাত্র বা পাত্রীর বিবাহের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রাচ্যদেশগুলিতে বিবাহ স্থির করার ব্যাপারে মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংশ্লিষ্ট পাত্র বা পাত্রীর কোনও মতামত বা ভূমিকা এক্ষেত্রে থাকে না। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির একটিকে বলে 'আয়োজিত বিবাহ'(Arranged marriage) ও অপরটিকে বলে 'প্রেমজ বিবাহ'(Love marriage)।

ভারতবর্ষের মত-রক্ষণশীল সমাজে যেখানে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান সেখানে বিবাহযোগ্য পুত্র কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে মতামত দেবার কোনও সুযোগ বা অধিকারই নাই। পাশ্চাত্য দেশে নারী-পুরুষ স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রাচ্যদেশগুলিতে যেমন, ভারত, জাপান, চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পাত্রপাত্রীর পিতামাতা বা গুরুজনেরাই বিবাহ স্থির করার ব্যাপার মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংশ্লিষ্ট পাত্র বা পাত্রীর কোনও মতামত বা ভূমিকা এক্ষেত্রে থাকে না। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির একটিকে বলে 'আয়োজিত বিবাহ' (Arranged marriage) ও অপরটিকে বলে 'প্রেমজ বিবাহ' (Love marriage)।

ভারতবর্ষের মত-রক্ষণশীল সমাজে যেখানে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান সেখানে বিবাহযোগ্য পুত্র-কন্যার বিবাহ স্থির করার দায়িত্ব পিতামাতা ও গুরুজনের। বিবাহ স্থির করার ক্ষেত্রে জাত-পাত, ধর্ম, পরিবারিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নিরিখ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের অন্যতম মাপকাঠি হ'ল গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ ও গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা এবং বিশেষ কোনও ধরনের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ স্থির করা। এই বিধিনিষেধগুলি মেনে চলার কারণেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভার পিতা-মাতাও গুরুজনদের হাতে থাকে। তাছাড়া, ভারতের মত দেশে বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষের মেলামেশার সুযোগ অবাধ না থাকায় তাদের পরস্পরকে পরিচিতির সুযোগও কম।

পুত্র-কন্যার বিবাহ স্থির করার ক্ষেত্রে পিতামাতার বিচার্য বিষয়গুলি বিভিন্ন ধরনের। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, 'কন্যা কাময়তে রূপং, পিতা বিদ্যাং, মাতা ধনং'। তবে সাধারণভাবে পিতামাতা পাত্র বা পাত্রীর পরিবারের সুনাম নৈতিক স্তর, আর্থিক অবস্থা, পাত্র-পাত্রীর স্বাস্থ্য, পাত্রীর রূপ, চরিত্র ও সহবত এবং পাত্রের জীবিকা, আয়, চরিত্র প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবার সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত পছন্দের মাপকাঠি জাতপাত বা পণ দেওয়া-নেওয়া নয় বরং চরিত্র, শিক্ষা, বুদ্ধি, ব্যক্তিগত আকর্ষণীয়তা বা মাধুর্য্য ইত্যাদি। দেখা গেছে যে, পাত্র পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে চরিত্র, শিক্ষা, মাধুর্য্য, গৃহকর্মনিপুণতা ও রূপকে অগ্রাধিকার দেয়। অন্যদিকে পাত্রী পাত্রের চরিত্র, শিক্ষা, বয়স এবং জীবিকার উপর গুরত্ব আরোপ করে। রূপ, পারিবারিক পটভূমি ও জাতপাত অপেক্ষকৃত কম গুরুত্ব পায়। পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রীর যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাত্রের কাছে অবাঞ্ছনীয় সেগুলি হ'ল ঃ চঞ্চলমতিত্ব, মদ্যপান বা ধূমপান, নির্বুদ্ধিতা ও স্বল্পশিক্ষা। অন্যদিকে, পাত্রীর পক্ষে অনুরূপ অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ঠগুলি হ'ল ঃ অনৈতিকতা, স্বল্পশিক্ষা, কদাকারত্ব এবং উদ্ধত আচরণ।

ইতিপূবেই বলা হয়েছে যে, আয়োজিত বিবাহ ছাড়া পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের অন্যতম পদ্ধতি হ'ল প্রেমজ বিবাহ (Love marriage)। আধুনিক পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশে নারী-পুরুষ বিবাহ-পূর্ব পরিচয় ও প্রণয়ের মাধ্যমে ভাবী স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচন করে। এক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা, অর্থ অথবা অন্যান্য পারিবারিক প্রয়োজনের চেয়ে পারস্পরিক আকর্ষণ, ভালবাসা ও মমত্বই বেশী গুরুত্ব লাভ করে। এছাড়াও, প্রেমজ বিবাহে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রীর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য অবচেতনে পাত্র-পাত্রীকে প্রভাবিত করে। সেগুলি হ'ল ঃ (১) পিতা-মাতা সম্পর্কে ভাবমূর্তি (২) সমমনোভাবাপন্নতা (৩) সম ও বিসম বৈশিষ্ট্যসম্পন্নতা (৪) পরিচিতি (৫) সমসামাজিক মর্যাদা সম্পন্নতা।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় পাত্রের ক্ষেত্রে তার মাতার এবং পাত্রীর ক্ষেত্রে তার পিতার ভাবমূর্তি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বামী-বা স্ত্রীর মধ্যে পাত্রী/পাত্র তার পিতা বা মাতার সদগুণগুলির প্রতিচ্ছবি খোঁজে এবং সেটি বা সেগুলি খুঁজে পায় তাহলে তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। তৃতীয়ত, পাত্র-পাত্রী, জীবন-সঙ্গী/সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম এবং একই সঙ্গে বিসম বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। যেমন, যদি কোনও পাত্র অমিতব্যয়ী হয় তাহলে সে মিতব্যায়ী পাত্রী পছন্দ করে। আবার যদি কোনও পাত্রী উচ্চশিক্ষিতা হয় তাহলে সে উচ্চশিক্ষিত পাত্রই পছন্দ করে। চতুর্থত, পাত্রী বা পাত্রের পরিচয়ের কোনও পূর্ব যোগসূত্র থাকলে—যেমন, কোনও আত্মীয় বা বন্ধু-বিবাহের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পাত্র বা পাত্রীর-সুবিধা হয়। পঞ্চমত, পাত্র-পাত্রী সাধারণত সমসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিসম্পন্ন পাত্র-পাত্রী পছন্দ করে। দেখা যায় যে, পাত্র-পাত্রী তার নিজ নিজ ধর্ম অঞ্চল, ভাষা ও জাতপাতের মধ্যেই পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন আবদ্ধ রাখে। উদ্দেশ্য হ'ল এর ফলে বিবাহ-পরবর্তী জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া ও মানসিক আদান-প্রদান সহজতর হবে।

আয়োজিত-বিবাহ ও প্রেমজবিবাহের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। আয়োজিত বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের মধ্যে কোনও পরিচয় থাকে না বা সামান্য পরিচয় থাকে এবং বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে খুবই ভাসা ভাসা প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু প্রেমজ বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র এবং পাত্রী পরস্পরের কাছ থেকে সুখ এবং সাহচর্য্য আশা করে। কিন্তু প্রাক্-বিবাহ রোমান্টিকতা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়। অনেকে স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে তফাৎকে মানিয়ে নিতে পারে, আবার অনেকে পারে না, সেক্ষেত্রে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেকে বিবাহ বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয়। পরিবার ভেঙে যায়।

শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে আয়োজিত বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যদিও ভারতে অধিকাংশ বিবাহই স্থিরীকৃত হয় পিতামাতা ও গুরুজনদের দ্বারা, তবুও বর্তমান পাত্র বা পাত্রীর মতামতকে কিছু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শহরে মধ্যবিত্ত সমাজে পাত্র বা পাত্রীকে প্রাক্‌বিবাহ মেলামেশারও সীমিত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তবে পশ্চিমী ধাঁচে মেলামেশার সুযোগ এখনও নেই। গ্রাম ও মফস্বলে অবশ্য চিরাচরিত পদ্ধতিতেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন চলছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন নাগরিক সমাজে স্বীকৃত পদ্ধতি। ভারতীয় সমাজে কোষ্ঠী বিচার করে বিবাহ স্থির করা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের এক পুরোনো পদ্ধতি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কম্প্যুটারে কোষ্ঠী বিচার করে তাতে আধুনিকত্বের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিবাহ স্থির করা আধুনিক শহুরে পরিবারে জনপ্রিয় হয়েছে। এখনও ভারতে অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যা অতি নগন্য। অধিকাংশ বিবাহই গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ। সব শেষে উল্লেখ্য যে, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পদ্ধতিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বর্তমানে

চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, পিতামাতা ও গুরুজনদের দ্বারা আয়োজিত বিবাহ, দ্বিতীয়ত, পাত্র ও পাত্রীর প্রেমজ বিবাহ কিন্তু পিতামাতার দ্বারা অননুমোদিত, তৃতীয়ত, পাত্র ও পাত্রীর প্রেমজ বিবাহ এবং পিতামাতার দ্বারা অনুমোদিত, চতুর্থত, পিতামাতার দ্বারা আয়োজিত বিবাহ এবং পাত্র ও পাত্রীর দ্বারা অনুমোদিত।

এই প্রসঙ্গে আদিবাসীদের (Tribals) মধ্যে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পদ্ধতি আলোচনা করা যেতে পারে। আদিবাসী সমাজে প্রাক্ বিবাহ সম্পর্ক ও প্রেমজ বিবাহ অনুমোদিত থাকলেও বিবাহ প্রধানত স্থিরীকৃত হয় পিতামাতার দ্বারা। অঞ্চলভেদে প্রার্থক্য থাকলেও আদিবাসী সমাজে মোটামুটি ভাবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ক্রয় ও সেবার মাধ্যমে নির্বাচন ঃ আদিবাসী সমাজে ক্রয় করার মাধ্যমে পাত্রী নির্বাচন সবচেয়ে প্রচলিত প্রথা। এক্ষেত্রে পাত্রকে বিবাহের জন্য পাত্রীর পিতাকে কন্যাপণ দিতে হয়। এই কন্যাপণের পরিমাণ অতি সামান্য থেকে বিপুল পরিমাণ পর্যন্ত হ'তে পারে। এবং তা আদিবাসী সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মধ্যপ্রদেশের গোন্দ আদিবাসীরা কন্যাপণ দানের এক বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে পাত্র তার ভাবী শ্বশুরালয়ে কয়েকবছর পাণিপার্থী-পরিচারক হিসেবে বাস করে ও তারপর বিবাহ করে।

দ্বিতীয়ত, যুব-আবাস (Dormitory) ঃ কোনও কোনও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবস্থা আছে যে, যৌবনকাল উপস্থিত হ'লে বিবাহেচ্ছু পাত্র-পাত্রী যুব-আবাসে কিছুদিন বাস করে এবং পরস্পরের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী নির্বাচন করে নেয়। পিতামাতার অনুমোদনও এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায় তাহলে পাত্র-পাত্রী স্বেচ্ছায় পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে। তৃতীয়ত, বন্দী করে বিবাহ করা ঃ নাগা, হো, ভীল, গোন্দ প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে পাত্রীকে বন্দী করে বা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। এটি বর্তমানে প্রথায় পরিণত হয়েছে। গোন্দ, হো প্রভৃতি সমাজে পাত্রীর পিতামাতাই এই প্রথাগত বন্দীত্বের ব্যবস্থা করে দেয়। মধ্যপ্রদেশের কোনও কোনও আদিবাসী সমাজে আনুষ্ঠানিক উৎসবের মাধ্যমে এই পাত্রকে সাধারণত শারীরিক শক্তির প্রদর্শন করে পাত্রী নির্বাচন করতে হয়। হোলির সময় এক নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আচার প্রতিপালিত হয়। এছাড়া, কুকিদের মধ্যে প্রথা আছ যে বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী কিছুদিন একত্রে বাস করবে, তারপর পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। অন্যথায় বিবাহ হবে না এবং পাত্র পাত্রীর পিতাকে অর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

## ৬.৫.৭ বিবাহের বয়স

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সঙ্গে বিবাহের বয়সের অবিচ্ছেদ সম্পর্ক রয়েছে। জাতপাত, ধর্ম, শ্রেণী ও অঞ্চলভেদে কিছু পার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে ভারতবর্ষে নারী-পুরুষের বিশেষত নারীর বিবাহের গড় বয়স খুবই কম। জনগণনার তথ্য ও বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ভারতীয় নারীর বিবাহের গড় বয়স ১৫ বছরেরও কম। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ এই সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতেও এই আন্দোলন অব্যাহত ছিল। যার ফলে ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন (Child Marriage Restruaint Act, 1929) চালু হয়। এই আইন অনুসারে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যুনতম বয়স ১৮ এবং নারীর ন্যুনতম বয়স ১৪ করা হয়। বর্তমান আইন সংশোধনের মাধ্যমে এটিকে যথাক্রমে ২১ এবং ১৮ করা হয়েছে। এই আইন সারা ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু এই আইন যে সর্বদা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে একথা ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, এখনও শিশু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও শিশু-বিবাহ হচ্ছে বলে সংবাদপত্রে প্রায়ই খবর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে শিশু বয়স থেকেই কন্যার বিবাহদানের জন্য পিতামাতার মানসিক প্রস্তুতি থাকে। কোনও কোনও অঞ্চলে নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ দান করা সামাজিক দায় হিসেবে বিবেচিত হয়। কন্যার সতীত্ব ও নিষ্কলুষতা রক্ষা করাও পিতামাতার অন্যতম কর্তব্য ছিল।

একথা উল্লেখ করা দরকার যে, ভারতের সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিন্তু বিবাহের বয়স এত কম নয়। খ্রীষ্টান, পার্শি এবং হিমালয় সন্নিহিত কোনও সম্প্রদায়ে নারীদের ১৫ বৎসর বয়সের উর্দ্ধেই বিবাহ হয়ে থাকে। আবার দেশে শিক্ষা বিস্তারের ফলে, বিশেষত নারী শিক্ষা বিস্তারে, ফলেও বিবাহের বয়স কিছু পরিমাণে উর্দ্ধগামী হয়েছে। শহরাঞ্চলে শিক্ষিত নারী-পুরুষ বর্তমানে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিবাহ করে না। দেখা যাচ্ছে যে, যে অঞ্চলে বা রাজ্যে শিক্ষার হার বেশী সেখানে বিবাহের বয়স উর্দ্ধগামী।

## ৬.৬ হিন্দু বিবাহ

হিন্দু ধর্মের অনুশাসন অনুসারে হিন্দু বিবাহ হ'ল আধ্যাত্মিক ও সাংস্কারিক (Sacramental)। সনাতন হিন্দু সমাজে বিবাহের উদ্দেশ্য তিনটি, যথা, ধর্ম, প্রজ ও রতি। হিন্দু বিবাহ হ'ল 'শরীর-সংস্কার', যার মাধ্যমে পাত্র ও পাত্রীর দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র হয়। সুতরাং, নির্দিষ্ট বয়সে এবং যথাসময়ে প্রত্যেক হিন্দুরই বিবাহ করা উচিৎ। বিবাহের পর স্ত্রীর কর্তব্য হ'ল স্বামীকে তাঁর পুরুষার্থ, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, চরিতার্থ করাতে সহায়তা করা। বিবাহ ব্যতিরেকে কোনও হিন্দুর 'মোক্ষ' লাভ সম্ভব নয়। বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল সন্তান উৎপাদন—বিশেষত পুত্র সন্তান উৎপাদন করা। বলা হয়ে থাকে 'পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্যা', অর্থাৎ পুত্রলাভের জন্যই স্ত্রী গ্রহণ করা হয়। সুতরাং, হিন্দু দর্শন অনুসারে পরিবার এবং সমাজের কল্যাণের জন্য সন্তান ভিন্ন একজন হিন্দুর মৃত্যুর পর মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। বিবাহের তৃতীয় উদ্দেশ্য হ'ল রতিক্রিয়া। হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহের উদ্দেশ্য হিসেবে রতিক্রিয়াকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে তা ন্যুনতম। হিন্দু দর্শন অনুসারে হিন্দু বিবাহ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন সৃষ্টি করে। শুধু জীবৎকালেই নয় মৃত্যুর পরও এই বন্ধন অটুট থাকে; অভঙ্গুর থাকে।

অবশ্য বর্তমানে সনাতন হিন্দু সমাজে পরিবর্তন এসেছে। গত একশত বছরে হিন্দু সমাজ অনেক আধুনিক হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি পরিবর্তন খুবই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানের হিন্দু নারী-পুরুষ আর সামাজিক কর্তব্য পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ করে না। বিবাহ করে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং বিবাহ আর অতীতের মত অভঙ্গুর নয়। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ও সমাজস্বীকৃত। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ বিবাহের পবিত্রতাকে নষ্ট করতে পারেনি। কারণ বিবাহের দায়দায়িত্ব পালনে অপারগ হ'লেই অন্তিম ব্যবস্থা হিসেবে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়। এখনও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও অনুরক্তিকে সমাজে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সফল বিবাহের নিরিখ হিসেবে দেখা হয়। যতদিন পর্যন্ত যৌনাচরনের পরিবর্তে পরস্পরনির্ভরতা ও সন্তান পালন গুরুত্ব পাবে ততদিন পর্যন্ত হিন্দু বিবাহ সাংস্কারিক (Sacramental) বলেই বিবেচিত হবে।

## ৬.৬.১ হিন্দু বিবাহের প্রকারভেদ

প্রাচীন হিন্দুসমাজে বিবাহের আটটি প্রকারের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে চারটি প্রকার ধর্ম অনুমোদিত বা ধর্মীয়, অর্থাৎ পিতামাতা ও পরিবার অনুমোদিত এবং বাকী চারটি ধর্ম-অননুমোদিত বা অধর্মীয় ও পিতামাতা এবং পরিবার দ্বারা অননুমোদিত। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে স্বীকৃত বিবাহ পদ্ধতিগুলি হ'লঃ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজপত্য এবং অবাঞ্ছনীয় বিবাহ পদ্ধতিগুলি হ'ল ঃ অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ।

(১) **ব্রাহ্ম বিবাহ ঃ** এই ধরনের বিবাহে পিতা ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সালঙ্কারা কন্যাকে বেদজ্ঞ পাত্রের হাতে সম্প্রদান করেন।

(২) **দৈব বিবাহ ঃ** এই প্রকার বিবাহে পিতা বিবাহ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণের হাতে সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করেন।

(৩) **আর্য বিবাহ ঃ** এই ধরনের বিবাহে কন্যার পিতা পাত্রের কাছ থেকে গাভী ও ষাঁড় উপহার পাওয়ার পরিবর্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। এই উপহার গ্রহণ কন্যা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য নয়, ধর্মের নির্দেশ পালনের জন্য।

(৪) **প্রাজপত্য বিবাহ ঃ** প্রাজপত্য বিবাহে পিতা পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন এবং উভয়কে ধর্মপথে চলতে উপদেশ দেন।

(৫) **অসুর বিবাহ ঃ** এই প্রকার বিবাহে পাত্র অর্থের বিনিময়ে কন্যার পিতার কাছ থেকে পাত্রী সংগ্রহ করে।

(৬) **গান্ধর্ব বিবাহ ঃ** এই ধরনের বিবাহে পাত্র-পাত্রী পরস্পরের সম্মতিতে বিবাহ স্থির করে এবং পরবর্তীকালে বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা অনুমোদিত হয়।

(৭) **রাক্ষস বিবাহ ঃ** রাক্ষস বিবাহে পাত্রীকে তার অথবা তার পিতামাতার বিনানুমতিতে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা হয়। প্রাচীন ভারতে যখন উপজাতীয় সংঘর্ষের সময় বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করত তখন ঐ বিবাহের বৈধতার জন্য তাকে রাক্ষস বিবাহ বলা হত।

(৮) **পৈশাচ বিবাহ ঃ** যখন কোনও ব্যক্তি কোনও ঘুমন্ত বা অজ্ঞান অথবা প্রতিরোধহীন কোনও নারীর সঙ্গে ভ্রষ্টাচার করে তখন এই ধরনের বিবাহের মাধ্যমে ঐ নারীকে তার স্ত্রী মর্যাদা দেওয়া হয়।

হিন্দু ধর্মে প্রাক্-বিবাহ পবিত্রতা ও সতীত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিবাহ পরবর্তী কালেও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা বৈবাহিক বন্ধনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। হিন্দু ধর্ম অনুসারে কন্যাদান করার অধিকার যথাক্রমে পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় ও মাতার।

## ৬.৬.২ হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি

নিদিষ্ট কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালন হিন্দু বিবাহের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। অঞ্চল, জাত-পাত, সম্প্রদায় গ্রাম-শহর ভেদে তার কিছু তারতম্য ঘটতে পারে কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানের মূল বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকে। আগেই বলা হয়েছে হিন্দুদের কাছে বিবাহ হ'ল সাংস্কারিক (Sacramental)। অর্থাৎ বিবাহ অভঙ্গুর। হিন্দু বিবাহ-বন্ধন সারা জীবনের। হিন্দু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। হিন্দু বিবাহের প্রধান আচার

অনুষ্ঠানগুলি হ'ল **'কন্যাদান'**, অর্থাৎ পিতা কর্তৃক সালঙ্কারা কন্যাকে পাত্রে হাতে সম্প্রদান। মনে করা হয় যে, পিতার পক্ষে কন্যাদান এক পূণ্যকর্ম। **'পাণিগ্রহণ'**, অর্থাৎ কন্যার পিতার কাছ থেকে কন্যার দায়িত্বভার গ্রহণ। **'হোম'**, অর্থাৎ যজ্ঞের মাধমে বিবাহ করা। হিন্দু বিবাহে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বিবাহ সম্পাদিত হয়। **'অগ্নিপরিণত'**, অর্থাৎ অগ্নিকে প্রদক্ষিত করে বিবাহ সিদ্ধ করা। **'সপ্তপদী'** অর্থাৎ অগ্নিকে সাক্ষী রেখে মন্ত্রপাঠ সহ পাত্র-পাত্রী সপ্ত পদ একসঙ্গে চলা। মনে করা হয় যে অগ্নি সাক্ষী রেখে সপ্তপদ বা সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে সারাজীবনের বন্ধু হওয়া যায়। আবার, বাঙ্গালী ও পূর্বভারতীয় হিন্দু সমাজে স্ত্রীর কপালে সিঁদুর দান, এবং দক্ষিণভারতীয় হিন্দু সমাজে স্ত্রীর কণ্ঠে 'মঙ্গলসূত্রম' পরানো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান। এই আচার অনুষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারাই পালিত হয় না, কিছু পরিবর্তনসাপেক্ষে অন্যান্য বর্ণের হিন্দুরাও এই একই বিবাহ পদ্ধতি অবলম্বন করে। হিন্দু আচার অনুষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়।

যদি হিন্দু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পুরুষ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু বিবাহে পিতা সালংকারা কন্যাকে পাত্রের হাতে সমর্পণ করেন, অর্থাৎ কন্যার উপর অধিকার পিতার কাছে থেকে স্বামীর কাছে হস্তান্তরিত হয়, বিবাহের মাধ্যমে কন্যাকে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত, অনুগত ও স্বামীর ইচ্ছানুসারী হ'তে নির্দেশ দেওয়া হয়। হিন্দু নারীর কাছে বিবাহই হচ্ছে প্রথম 'সংস্কার'।

ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে, যেমন কেরলের নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাক্-বিবাহ আচার অনুষ্ঠান বিবাহানুষ্ঠানের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জৈন এবং শিখদের বিবাহের আচার অনুষ্ঠান মোটামুটিভাবে হিন্দুদের মতই, তবে শিখদের ক্ষেত্রে মূল বিবাহানুষ্ঠানে কিছু পার্থক্য আছে। সেখানে পাত্র-পাত্রী অগ্নির পরিবর্তে গুরু গ্রন্থসাহেবকে প্রদক্ষিণ করে। ভারতের কোনও কোনও সমাজে আবার বিবাহে কোনও আচার অনুষ্ঠান নাই। যেমন, হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে কোনও কোনও সমাজে আবার বিবাহে কোনও আচার অনুষ্ঠান নাই। যেমন, হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে কোনও কোনও গোষ্ঠীতে বিবাহের সময় পাত্র পাত্রীর নাকে কেবল একটি নথ পরিয়ে দেয়। এই ধরনের বিবাহকে প্রথানুগ (customary) বিবাহ বলে।

বর্তমানে অবশ্য হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ (Special Marriage Act, 1954) অনুসারে নিবন্ধকরণের (Registration) মাধ্যমেও বিবাহ করা চলে। সেক্ষেত্রে বিবাহের সনাতন আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসরণ করার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবাহের অন্যান্য অনুষ্ঠান, যথা, উপহার ও দান-সামগ্রী আদান প্রদান, অতিথি আপ্যায়ন প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য পালনীয় থাকে।

### ৬.৬.৩ কন্যাপণ

নির্দিষ্ট যে কোন সমাজে যে কোনও বিবাহেই কিছু আর্থিক ও বস্তুগত আদান-প্রদান জড়িত থাকে। কোনও ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে কিছু আর্থিক অথবা এবং দ্রব্যসামগ্রী উপহার দেয়। তাকে বলে কন্যাপণ (Bride-Price) আবার কোনও ক্ষেত্রে পাত্রী পক্ষকে ঐ দায় বহন করতে হয়। তাকে বলে বরপণ বা যৌতুক (Dowry)।

কন্যাপণ দেওয়ার প্রথা সাধারণত, কিছু পিতৃপরিচায়ী আদিবাসী সমাজে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। কন্যাপণের ধরন ও পরিমাণ অবশ্য আদিবাসী সমাজভেদে ভিন্ন হ'তে পারে। আর্থিক পণ ছাড়াও

এক্ষেত্রে অলঙ্কার, বসনভূষন, তৈজসপত্র, শস্য, মদ্য, গাভী ও ছাগল ইত্যাদিও উপহার হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর বাড়ীতে শ্রমদান করে কন্যাপণ হিসেবে।

কন্যাপণ দেওয়ার তাৎপর্য্য হ'ল যে, পিতার কাছ থেকে কন্যার অধিকার পাওয়ার সময় কন্যার পিতাকে তার জন্য কিছু মূল্য ধরে দেওয়া। আদিবাসী সমাজে কন্যাকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ সে সংসারে শ্রমদান করে উৎদানে সহায়তা করতে পারে। সুতরাং, এই সম্পদ কন্যার পিতার পরিবার থকে স্বামীর পরিবারে হস্তান্তরিত হওয়ার সময় কন্যাপণ দেওয়া হয়।

বর্তমানে অবশ্য আধুনিকীকরণের ফলে ও উচ্চবর্ণের প্রভাবের ফলে আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের মধ্যেও কন্যাপণ দেওয়ার প্রথা ক্রমশ কমে আসছে।

### ৬.৬.৪ বরপণ

সাধারণভাবে বরপণ বলতে বোঝায় বিবাহের সময় পাত্রীপক্ষ কর্তৃক পাত্রপক্ষকে বিশেষ কতকগুলি উপহার প্রদান। মনে করা হয় যে, এর ফলে পাত্রীপক্ষ এবং পাত্রপক্ষ উভয়েরই মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পাত্রীপক্ষ উপহার প্রদানের মাধ্যমে পাত্রপক্ষের কাছে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে এবং পাত্রপক্ষ উপহার গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ এবং সম্মান লাভ করে আত্মীয় বন্ধু ও পরিজনের চোখে।

যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, অতীত কালেও বরপণ দানের প্রথা প্রচলিত ছিল। ঋক্‌বেদে ও অথর্ববেদে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রেও বরপণ নিয়ে দরাদরির উল্লেখ আছে এবং তাকে 'পশু-বিবাহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রৌপদী, সীতা, সুভদ্রা, উত্তরার বিবাহের সময়েও হাতী, ঘোড়া, অলঙ্কার প্রভৃতি যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে যুগে যৌতুক দেওয়া 'কন্যাদানের' অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হ'ত এবং তা পাত্রীপক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় দেওয়া হ'ত। মধ্যযুগ থেকেই যৌতুকদানের চরিত্র পরিবর্তিত হ'তে থাকে। মধ্যযুগে বাল্যবিবাহ প্রথা চালু হওয়ার ফলে কন্যার পিতা একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে উদগ্রীব থাকতেন। এজন্য তিনি পাত্রপক্ষের দাবী অনুসারে যৌতুক দিতে রাজী হ'তেন। অতীতে যে যৌতুক স্বেচ্ছদত্ত দক্ষিণা হিসেবে বিবেচিত হ'ত ক্রমশ তা বরপণে রূপান্তরিত হ'তে থাকে। এই সময়ে রাজস্থানের রাজপুতদের মধ্যে বরপণ দান প্রথা বিশেষ প্রসার লাভ করে। অভিজাত পরিবারে কন্যার বিবাহ দানের জন্য পাত্রীর পিতারা উচ্চহারে বরপণ দিতে থাকেন। এইভাবে ত্রয়োদশ/চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বরপণ দানের কুপ্রথা দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ব্রিটিশ শাসনকালে আধুনিকীকরণের ফলে এবং দেশে শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাত্র হিসেবে শিক্ষিত পাত্রের কদর বাড়তে থাকে বিবাহের সময়। বর্তমানে বরপণ বা যৌতুক দান প্রথা নিন্দনীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। প্রাক্-ব্রিটিশ বা ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় সমাজ ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং শিক্ষা বিস্তারের ফলে কৃষি ভিন্ন অন্যান্য বৃত্তিধারী সমাজ ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং শিক্ষা বিস্তারের ফলে কৃষি ভিন্ন অন্যান্য বৃত্তিধারী মানুষের, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবি, প্রশাসক, অধ্যাপক প্রভৃতির কদরও সমাজে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে কন্যার পিতারা এইসব পেশায় নিযুক্ত পাত্রের জন্য উচ্চহারে যৌতুক বলতে বোঝায়, পাত্রীপক্ষ কর্তৃক পাত্রপক্ষের দাবীমতো অর্থ এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী দান করা। বরপণ দান কেবলমাত্র বিবাহকালে কন্যাকে প্রদত্ত যৌতুক সীমাবদ্ধ নয়। পাত্রকে প্রদত্ত যৌতুকে, পাত্রের পিতামাতা ও আত্মীয়দের প্রদত্ত প্রণামী স্বরূপ যৌতুক এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ উৎসবের সময় ও জন্মের সময় প্রদত্ত সামগ্রীও বরপণের অন্তর্ভুক্ত। বরপণ দুই প্রকার হয়ে থাকে—স্থাবর ও অস্থাবর। গহনা, তৈজসপত্র, বস্ত্রাদি, বাহন, নগদ অর্থ অস্থাবর পণ বা যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত এবং জমি, বাড়ী, চাকুরী প্রভৃতি স্থাবর যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। পাত্রের চাকুরী বা পেশা, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষাগত ও

অন্যান্য যোগ্যতার উপর নির্ভর করে যৌতুক বা বরপণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। অঞ্চল, জাতপাত ও সম্প্রদায়ভেদে বরপণের পরিমাণ ও ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে। অন্ধ্রপ্রদেশে রেড্ডী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথা হ'ল কন্যার পিতা জমি ও অলঙ্কার কন্যাকে দিয়ে থাকেন এবং নগদ অর্থ পাত্রপক্ষের প্রাপ্য হয়। উত্তরভারতে যৌতুক হিসেবে প্রদত্ত তৈজসপত্র পাত্রপক্ষের আত্মীয়দের অধিকারে যায়। এই প্রসঙ্গে বরপণ বা যৌতুক ও 'স্ত্রীধনের' মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা যায়। 'স্ত্রীধন' বলতে বোঝায় বিবাহকালে পিতা কর্তৃক কন্যাকে প্রদত্ত অলঙ্কার ও অর্থ এবং বিবাহ পরবর্তীকালে কন্যার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। এই সমস্ত বিষয়ের উপর পাত্রীর স্বামী বা পাত্রপক্ষের অন্য কারও কোনও অধিকার থাকে না। এই সমস্ত বিষয়ের দান-বিক্রীর অধিকার একমাত্র সংশ্লিষ্ট কন্যার। স্ত্রীধন কন্যার কাছে 'বীমা'র ভূমিকা পালন করে, যা আপৎকালে সহায়তা করে।

আধুনিককালে বরপণদান প্রথা সমাজে নানা কু-প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষিতা নারীরা উচ্চশিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র পছন্দ করে এবং পাত্রীর পিতামাতা অনেক ক্ষেত্রেই পাত্র পক্ষের দাবীমতো বরপণ দিতে সমর্থ হয় না; ফলে কন্যা অবিবাহিতা থেকে যায়। অথবা, সাধ্যাতীত চেষ্টা করে পাত্রপক্ষের দাবী মত বরপণ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং হয় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে নয়তো অন্যান্য সামাজিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এমনকি বিবাহের পরও বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কারণে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে বরপণ দাবী করে থাকে। বর্তমানে আমরা অনেক সময়ই বধূহত্যা'র (Dowry death) সংবাদ পেয়ে থাকি।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ১৯৬১সালে বরপণ নিবারণ আইন (Dowry Prohibition Act, 1961) চালু করা হয়েছে এবং ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে তা সংশোধন করে কঠোরতর করা হয়েছে। বর্তমান বিবাহের সাতবছরের মধ্যে বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে পাত্রীপক্ষ ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮(ক) ধারায় পুলিসের কাছে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ করতে পারে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে পাত্র এবং তার পরিবারের সংশ্লিষ্টদের কারাদন্ড হ'তে পারে।

অবশ্য একথা ঠিক নয় যে বরপণ ছাড়া কোনও বিবাহই অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। দেশে অনেক শিক্ষিত ও উদারমনোভাবাপন্ন মানুষ আছেন যাঁরা বিনা বরপণেই বিবাহ করছেন বা পুত্রের বিবাহ দিচ্ছেন। যাঁরা এই প্রথার মধ্যে কোনও ত্রুটি দেখতে পাননা তারাই বরপণ গ্রহণ করছেন। কেউ কেউ আবার পিতামাতার দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এই প্রথার কু-প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে, এমনকি মুসলিম খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও বরপণ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত হয়েছে। বহু সংসারেই বরপণ অশান্তি সৃষ্টি করছে এবং হয় বধূহত্যা নয়তো বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে।

## ৬.৬.৫ হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইন

আইন এবং সমাজ ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই আইন প্রণীত হয়, আবার আইনও অনেকসময় সমাজ পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। অষ্টাদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবা ফুলে হিন্দুসমাজ সংস্কারের যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সেই সময় থেকেই হিন্দুবিবাহ পদ্ধতির সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ণ শুরু হয়। তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু বিবাহের বিভিন্ন সংস্কারমূলক আইন পাস হয়। এই আইনগুলি হ'ল নিম্নরূপঃ

(১) **হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন, ১৮৫৬ (The Hindu Widows Remarraige Act, 1856) ঃ** সনাতন হিন্দু বিবাহ বিধি অনুসারে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। একজন হিন্দু নারীর জীবনে একবারই বিবাহ সম্ভব ছিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবা ফুলে প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন চালু হয়। এই আইন অনুসারে যে কোনও হিন্দু নারী স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে পারে এবং এই দ্বিতীয় বিবাহ-জাত সন্তানেরা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। যদি দ্বিতীয় বিবাহকালে কন্যা অপ্রাপ্তবয়স্কা থাকে তাহলে কন্যার পিতা, মাতা, পিতামহ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অথবা নিকটতম আত্মীয়ের অনুমতি প্রয়োজন হবে। অন্যথায় ঐ বিবাহ অসিদ্ধ বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় বিবাহের পর কন্যার প্রথম স্বামীর পরিবার থেকে কোনও খোরপোষের দাবী থাকবে না।

(২) **বাল্য বিবাহ নিবারণ আইন, ১৯৯২ (The Child Marriage Restraint Act, 1929) ঃ** এই আইনের দ্বারা বাল্যবিবাহ রোধ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু রদ করার চেষ্টা হয়নি। এই আইনের মাধ্যমে পুরুষের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যুনতম বয়স স্থির করা হয় ১৮ বৎসর এবং নারীর ক্ষেত্রে ঐ বয়স স্থির করা হয় ১৪ বৎসর। এই আইন অনুসারে উপরোক্ত ন্যূনতম বয়সের নীচে বিবাহ স্থির করা, অনুষ্ঠিত করা এবং সুযোগ সৃষ্টি করা আইন অনুসারে দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু ঐ বিবাহ আইনের চোখে অসিদ্ধ নয়। ১৯৭৮ সালের সংশোধনের মাধ্যমে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর এবং নারীর ন্যূনতম বয়স ১৮ বৎসর করা হয়েছে। এই আইন ভঙ্গের অপরাধ অ-প্রগ্রাহ্য এবং এই আইন ভঙ্গ করলে পাত্র, পাত্রের পিতামাতা, অভিভাবক ও পুরোহিতের তিনমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হ'তে পারে। পাত্রীর কোনও সাজা হবে না। এই আইনে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার একবছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা দরকার। একবছর পার হয়ে গেলে আর কোনও অভিযোগ করা যায় না।

(৩) **হিন্দু বিবাহ-অক্ষমতা দূরীকরণ আইন, ১৯৪৬ (The Hindu Marriage Disabilities Removal Act, 1946) ঃ** ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, হিন্দুদের বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ চলে না। এই আইন স-গোত্র এবং স-প্রবর সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ আইন সিদ্ধ করে। অবশ্য হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ চালু হওয়ার সাথে সাথে এই আইন বাতিল হয়ে যায়।

(৪) **বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ (The Special Marriage Act, 1954) ঃ** বিশেষ বিবাহ আইন বলে আন্তঃধর্মীয় বিবাহ আইনসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে বিবাহ একজন বিবাহ-নিবন্ধক (Marriage Registrar) এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বিবাহের একমাস পূর্বে নিবন্ধকের কাছে নোটিশ দিতে হয়। পাত্র বা পাত্রীকে নিবন্ধকের অফিস যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার অধিবাসী হ'তে হয়। এই এক মাসের মধ্যে যে কেউ এই বিবাহ সম্বন্ধে আপত্তি দাখিল করতে পারে। নোটিশ দেওয়ার তিনমাসের মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত না হ'লে পুনর্বার নোটিশ দিতে হয়। বিবাহের সময় দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়।

(৫) **হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ (The Hindu Marriage Act, 1955) ঃ** হিন্দু বিবাহ আইন জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাতীত সারা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইনে 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা অনুসারে জৈন, শিখ, বৌদ্ধ এবং তপশিলী জাতিভুক্ত ব্যক্তিদেরও বোঝায়। হিন্দু বিবাহ আইন হিন্দু বিবাহের কতকগুলি মাপকাঠি স্থির করে দিয়েছে। এগুলি হ'ল ঃ (ক) বিবাহের সময় পাত্র বা পাত্রীর কোনও জীবিত স্ত্রী বা স্বামী থাকবে না (খ) পাত্র বা পাত্রী জড়বুদ্ধি বা উন্মাদ হবে না (গ) পাত্রের বয়স ১৮ বৎসরের উর্দ্ধে এবং পাত্রীর বয়স ১৪ বৎসরের উর্দ্ধে হ'তে হবে। অবশ্য ১৯৭৮ সালের সংশোধনী অনুসারে বিবাহের ন্যুনতম বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর

এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর করা হয়েছে। (ঘ) পাত্র-পাত্রী নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতায় পড়বে না যদি না সামাজিক প্রথা তা অনুমোদন করে (ঙ) পাত্র-পাত্রী সম্পর্কের আওতাভুক্ত হবে না যদি না সামাজিক প্রথা তা অনুমোদন করে। (চ) সেখানে পাত্রের বয়স ২১ বৎসরের কম এবং পাত্রীর বয়স ১৮ বৎসরের কম সেখানে তাদের অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হবে। অভিভাবকের একটি তালিকাও আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা, পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, ভ্রাতা, জেষ্ঠতাত/ খুল্লতাত, মাতামহ, মাতামহী, মাতুল। এই আইনে বিবাহের কোনও নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারে।

(৬) **বরপণ নিবারণ আইন, ১৯৬১(The Dowry Prohibition Act, 1961) ঃ** এই আইন পাস করার সময় লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে গভীর মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই আইন অনুসারে ২০০০ টাকা পর্যন্ত উপহার গ্রহণ আইনসিদ্ধ। এর বেশী উপহার গ্রহণ করলে ৬ মাসের কারাদন্ড অথবা ৫০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয়েই হ'তে পারে। তবে পুলিশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে পারে না। এই আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কে কোনও অভিযোগের ভিত্তিতেই তা করতে পারে। মুসলিমদের প্রতি এই আইন প্রযোজ্য নয়।

উপরোক্ত আইনগুলি যে দেশের বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত কু-প্রথা দূর করতে পেরেছে এমন নয়। তবে এই আইনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক সচেতনতা এনেছে। সমাজের মানুষ আইনকে স্বীকার না করলে কোনও আইনেরই সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়। মানুষ যত দ্রুত আইনগুলি সম্বন্ধে সচেতন হবে তত দ্রুত সামাজিক কু-প্রথা দূরীভূত হবে।

## ৬.৭ মুসলিম বিবাহ

মুসলিম বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে মুসলিম সামাজিক স্তর বিন্যাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। একথা মোটামুটিভাবে সকলের জানা আছে যে, মুসলিম সমাজ দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ঃ শিয়া এবং সুন্নী। মহম্মদ এর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত (ইম্মামত); অন্য পক্ষের মত ছিল জনগণের দ্বারা উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হওয়া উচিত (জাম্মাত)। এই মতভেদ থেকেই শিয়া এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রথা ও আচার ব্যবহার পালনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ভারতবর্ষে সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।

এছাড়া ভারতবর্ষে মুসলিমরা তিনটি স্তরে বিভক্ত—(১) 'আশরাফ', যার অর্থ হ'ল সম্মানীয়; (২) 'আজলাফ', যার অর্থ হ'ল পরিচ্ছন্ন বৃত্তিধারী; (৩) 'আরজল', যার অর্থ হ'ল অপরিচ্ছন্ন বৃত্তিধারী।

ভারতের মুসলিম সামাজিক স্তরবিন্যাসে আরব, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থান থেকে আগত অভিবাসীদের বংশধররা সবচেয়ে উচ্চস্থানে অবস্থিত। সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি 'আশরাফ' স্তরভূক্ত। মনে করা হয় যে, 'সৈয়দ'রা নবীর কন্যা ফতিমার বংশধর। সুতরাং, তাঁরা সবচেয়ে সম্মানিত স্থানের অধিকারী। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে 'শেখ'। এঁরা 'আনসারী'দের বংশধর বলে মনে করেন। আনসারী কথাটির অর্থ হ'ল যাঁরা নবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এঁরা মক্কা ও মদিনা থেকে ভারতে অভিবাসী হয়েছিলেন। তৃতীয় স্তরে রয়েছে মুঘল ও পাঠানেরা।

এঁরা সামাজিক মর্যাদায় একই স্তরভূক্ত। মুঘল আক্রমণের সময় যাঁরা এদেশে এসে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছেন তাঁরা মুঘল নামে পরিচিত। এঁদের বিভিন্ন উপগোষ্ঠী হ'ল চুঘতাই, উজবেক, তাজিক প্রভৃতি। অনুরূপভাবে পাঠান অভিবাসীরাও পাঠান হিসেবে পরিচিত; যেমন, ইউসুফজাই, লোদি,গনি ইত্যাদি। পরবর্তী স্তরে আছে ধর্মান্তরিত হিন্দু, যেমন, জোলা (তাঁতি), ভিস্তি (জলবাহক), মিরাসি (বাজনদার), দর্জি, ইত্যাদি। সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে অপরিচ্ছন্ন বৃত্তিধারী, যেমন ভাঙ্গী (মেথর) প্রভৃতি।

শিয়া কিংবা সুন্নীই হোক, অথবা আশরাফ, আজলাফ ও আরজলই হোক এদের প্রত্যেকের মধ্যেই গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ প্রচলিত। যদিও গোষ্ঠী বর্হিভূত বিবাহ রীতিবিরুদ্ধ নয়। সুন্নীদের মধ্যে পাত্রের সামাজিক নিম্নস্তরে বিবাহ বাতিলের অন্যতম কারণ হ'তে পারে। কিন্তু শিয়াদের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত নাই।

মুসলিম বিবাহকে বলা হয় 'নিকাহ'। হিন্দু বিবাহের সঙ্গে মূসলিম বিবাহের পার্থক্য হ'ল হিন্দু বিবাহ সংস্কারিক (Sacramental) কিন্তু মুসলিম বিবাহ চুক্তিভিত্তিক (contractual)। মুসলিম বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল নিয়ন্ত্রিত যৌনচারণ, শৃংখলাবদ্ধ পারিবারিক জীবনযাপন, সন্তানোৎপাদন, পরিবারের বিস্তৃতি সাধন এবং সন্তানের ভরনপোষণ। বিবাহ মুসলিম সমাজে এক ধর্মীয় কর্তব্য বা আত্মনিয়োজন বা 'ইবাদাত'। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, যিনি এই ধর্মীয় পথ অনুসরণ করেন পরকালে তিনি পুরস্কৃত হন, যিনি করেন না। তিনি পাপী। সুতরাং, মুসলিম বিবাহ একই সঙ্গে চুক্তিমূলক ও ধর্মীয়।

ঐশ্লামিক আইনে বিবাহের কোনও ন্যূনতম বয়স স্থির করে দেওয়া নাই। তবে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে বিবাহের পর স্বামী সহবাস করতে নিষেধ আছে। অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বয়ঃসন্ধি কালের পরেই স্বামী-সহবাস করা যেতে পারে। বর্তমানে বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন অনুসারে পাত্র ও পাত্রীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ বৎসর ও ১৮ বৎসর। এতদসত্ত্বেও কম বয়সে বিবাহ মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত।

## ৬.৭.১ মুসলিম বিবাহের আচার অনুষ্ঠান পদ্ধতি

মুসলিম বিবাহের দু'টি প্রধান উপাদান হ'ল ঃ (ক) বিবাহের পাত্র-পাত্রী কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব দান ও অনুমোদন (খ) যৌতুক বা 'মোহর' স্থিরীকরণ।

বিবাহের আয়োজন করা পিতামাতার দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। অতীতে পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রীর মতামতের কোনও অবকাশ ছিল না। আধুনিক কালে পাত্র মতামত প্রকাশের সুযোগ পেলেও পাত্রীর ক্ষেত্রে সে স্বাধীনতা এখনও আসেনি। বিবাহের আসরে দু'জন সাক্ষী এবং মৌলভীর (পুরোহিত) উপস্থিতিতে পাত্র বিবাহের প্রস্তাব করে এবং পাত্রী অনুমোদন করে। একে বলা হয় নিয়মানুগ বিবাহ বা 'শাহী নিকাহ'। বিবাহের প্রস্তাবের পরে অন্য কোন সময়ে অনুমোদন দেওয়া হ'লে তাকে নিয়ম বহির্ভূত বিবাহ বা 'ফাসিদ' বলে। 'ফাসিদ' বিবাহের উদাহরণ হ'ল, বিবাহের প্রস্তাব অনুমোদনের সময় সাক্ষীর অনুপস্থিতি, কোনও পুরুষের পঞ্চম বিবাহ, কোনও নারীর **'ঈদ্দত'**-এর সময় বিবাহ, (ঈদ্দত বলতে বোঝায় বিবাহ-বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর কোনও নারীর পুনর্বিবাহের পূর্বে তিনবার রজঃস্বলা হওয়ার সময়কাল), অন্য ধর্মাবলম্বী নারীকে মুসলিম পুরুষের বিবাহ ইত্যাদি। ধর্মগ্রন্থ অনুসারণকারী (কিতাবিয়া) নারীকে, যেমন খ্রীষ্টান বা ইহুদী নারীকে বিবাহ 'শাহী' বিবাহ, কিন্তু পৌত্তলিক নারীকে বিবাহ 'ফাসিদ' বিবাহ। কিন্তু মুসলিম নারীর অন্য ধর্মাবলম্বী নারীকে মুসলিম পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই বিবাহ 'বাতিল' বলে গণ্য হবে। 'বাতিল' (void) বিবাহের অন্যান্য উদাহরণগুলি হ'ল বহুভর্তৃকত্ব রক্তের

সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ। বাতিল বিবাহে স্বামী-স্ত্রী উপর কোনও অধিকার বা দায়িত্ব বর্তায় না। এই বিবাহজাত সন্তানরাও অবৈধ বলে বিবেচিত হয়। 'ফাসিদ' বিবাহে বিবাহ সম্ভোগের পূর্বে বা পরে যে কোনও পক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। সম্ভোগের পরে বিচ্ছেদ হ'লে স্ত্রী মোহর পাবে এবং সন্তানেরা বৈধ সন্তান হিসেবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

মুসলিম বিবাহ কাজীর দ্বারা কোরান পাঠের মাধ্যমে 'নিকাহনামা' প্রস্তুত করা হয়। নিকাহনামার মাধ্যমে পাত্রের পাত্রীকে দেয় যৌতুক বা 'মোহর'(Mehr) স্থির করা হয়। 'মোহর' বলতে বোঝায় বিবাহকালে পাত্র পাত্রীকে অর্থ বা অন্য কোনও স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। একে কন্যাপণ হিসেবে অভিহিত করা যাবে না। মুসলিম আইন অনুসারে এই যৌতুক (Dowry) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান। এর উদ্দেশ্য হ'ল স্বামীকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা থেকে বিরত রাখা এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। মোহরের পরিমাণ কত হবে তার কোনও নির্দিষ্ট উর্দ্ধসীমা নাই। পাত্রের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে তা স্থির করা হয়। তবে এর ন্যুনতম পরিমাণ হ'ল দশ দিরহ্যাম (Dirhams)। মোহর দানের পদ্ধতিও শিথিল। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তা দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ করা দরকার যে, মোহর দান মুসলিম বিবাহের অবিচ্ছেদ্য প্রথা। এ ব্যতীত মুসলিম বিবাহ সামাজিক ও আইনগত বৈধতা লাভ করে না।

মুসলিম বিবাহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বহুপত্নীকত্ব। ইসলাম ধর্ম অনুসারে একজন মুসলিম পুরুষ একই সঙ্গে চারটি স্ত্রী গ্রহণের অধিকারী। তবে তাকে সব স্ত্রীর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে হবে। অতীতে এই প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এর প্রভাব কমে এসেছে। বিশেষত শিক্ষিত ও শহুরে মুসলমানরা প্রায় কেউই একাধিক বিবাহ করে না।

ইসলাম ধর্ম 'সহগামী' ভ্রাতা-ভগ্নী (parallel cousin) এবং 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নীর(cross-cousin) মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করে। জ্যাঠাতুতো বা খুড়তুতো ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ প্রাধিকারমূলক (Preferential) বিবাহ বলে মনে করা হয়। তবে বর্তমানে এই ধরনের বিবাহের সংখ্যাও ক্রমহ্রাসমান। তার কারণ হ'ল পরিবার বহির্ভুত নারীকে বিবাহ করলে যৌতুক (Dowry) পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের ফলে এবং শিক্ষাবিস্তারের ফলে নতুন মানুষ ও পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়। তৃতীয়ত, যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের ফলে সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নীর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

## ৬.৮ বিবাহ বিচ্ছেদ

বিবাহ সংক্রান্ত কোনও আলোচনাই বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আলোচনা ব্যতীত অসম্পূর্ণ। এই অংশে আমরা বিবাহ -বিচ্ছেদ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই বর্তমান। যদিও তার পদ্ধতি সমাজভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কথা অনস্বীকার্য সে সকল বিবাহই সুখী ও সুন্দর হয় না। কেউ একে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেয়। কেউ বা চেষ্টা করে স্বামী সঙ্গে মানিয়ে চলার। আবার অনেকে এ অবস্থা মেনে নেয় না এবং বিবাহ ভেঙ্গে দেয়। কেউ স্বামী বা স্ত্রী-কে ত্যাগ করে, কেউ বা বিবাহ-বিচ্ছেদ করে। স্বামী-স্ত্রী পরিত্যাগ করা আইনের চোখে সিদ্ধ নয়। দেখা যায় যে, নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যেই স্বামী বা স্ত্রী পরিত্যাগের প্রবণতা বেশী। অন্যদিকে উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা

আইনসঙ্গত ভাবেই বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষপাতী। পরিত্যাগ করার প্রবণতা স্বামীদের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। পরিত্যাগই হোক বা বিচ্ছেদই হোক, এর ফলে পরিত্যক্ত বা বিচ্ছিন্ন স্বামী বা স্ত্রী সামাজিক অবমাননার সম্মুখীন হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ দু'প্রকার হ'তে পারে—প্রথমত, বিচার বিভাগ নির্দেশিত বিচ্ছেদ (Judicial Seperation)। এর ফলে বিচারালয়ের নির্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত পুনর্বিবাহ করা চলে না, তবে আলাদা বসবাস করা চলে। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ বিবাহ-বিচ্ছেদ যার অর্থ হ'ল সমস্ত পূর্ব বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান (Divorce) ঘটা। এতদ্বারা স্বামী বা স্ত্রী তার বিবাহপূর্ব অবস্থায় ফিরে যায় এবং পুনর্বিবাহ করতে পারে।

## ৬.৮.১ হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইন

তত্ত্বগতভাবে হিন্দুবিবাহ সাংস্কারিক (Sacramental) এবং অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু প্রাচীন ভারতেও বিবাহ বিচ্ছেদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চার প্রকার বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত ছিল। সেগুলি হল ঃ অসুর বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ, পৈশাচ বিবাহ এবং রাক্ষস বিবাহ। এগুলিকে তিনি অধার্মিক বিবাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া চরিত্রহীনতা, নিরুদ্দেশ, জাতিচ্যুতি, যৌন-অক্ষমতা, প্রাণহানির আশঙ্কা ও বিশ্বাসঘাতকতার করণেও বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত ছিল। তবে সর্বক্ষেত্রেই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অনুমতির প্রয়োজন ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে স্বামীকে যৌতুক ফেরৎ দিতে হ'ত এবং স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ত। তবে যেহেতু সে সময়ে, অধিকাংশ বিবাহই হ'ত 'ব্রহ্ম' বিবাহ বা ধার্মিক বিবাহ তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল অকল্পনীয়।

পরবর্তীকালে বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে সমাজের ধারনা পরিবর্তিত হ'তে থাকে এবং বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০-১৯৫০ সালের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে যেমন কোলাপুর, বরোদা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি, বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। ১৯৫৫ সালের বিশেষ বিবাহ আইন বিবাহ বিচ্ছেদের যুক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করে। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনে বলা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব হ'তে পারে; যেমন (১) যৌন অক্ষমতা (২) উন্মাদতা (৩) ৭বৎসর বা তদূর্দ্ধে নিরুদ্দেশ (৪) সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থতা (৫) ধর্ষণ (৬) সমকামীতা (৭) পশ্বাচার। এছাড়া ব্যভিচার এবং/অথবা নিষ্ঠুরতার কারণেও বিবাহ-বিচ্ছেদ পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করা যায়। পারস্পরিক অনুমতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য অপেক্ষার সময় ছয় মাস মাত্র।

সবশেষে বলা যায়, এখনও হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদকে সু-নজরে দেখা হয় না। দেখা যায় যে, সংঘটিত মোট বিবাহের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ হচ্ছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজের ধার্মিক মনোভাবই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মানিয়ে চলার প্রবণতা বজায় রেখেছে। সুতরাং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান হিন্দু সমাজে এখনও অক্ষুন্ন।

## ৬.৮.২ মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ

মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'তে পারে দুই পন্থায়। একটি হ'ল মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯, অনুসারে, অন্যাটি হ'ল বিচারালয়ের বিনা মধ্যস্থতায়। এক্ষেত্রে স্বামী তার ইচ্ছানুসারে স্ত্রীকে 'তালাক' দিতে পারে অথবা স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিতে 'খুলা' অথবা 'মুবারত' হ'তে পারে। 'খুলা' এবং 'মুবারতের' পার্থক্য হ'ল প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব করতে পারে এবং দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে স্বামী

বা স্ত্রী যে কেউই বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব করতে পারে। 'তালাক' দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী মৌখিকভাবে উচ্চারণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে অথবা 'তালাকনামা' দাখিল করে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। 'তালাক' প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য হ'তে পারে। অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক তৎক্ষণাৎ প্রযুক্ত হয়। তালাক প্রত্যাহার ঘোষিত বা অঘোষিত হ'তে পারে। তালাক দেওয়ার পদ্ধতি হ'ল ঃ (১) তাল্লাক-ই আহসান ঃ স্ত্রী রজঃস্বলা থাকাকালীন (তুহ্‌র) তালাক উচ্চারণ এবং তৎপরে তিনমাস স্ত্রী-সহবাস না করা। শিয়ারা এই প্রকার তালাক স্বীকার করে না। মদ্যপ অবস্থায় বা ভীতি প্রদর্শন করে তালাক উচ্চারণ গ্রহণযোগ্য নয়। (২) তালাক ই-হাসানঃ ধারাবাহিকভাবে তিনমাস পর পর স্ত্রী রজঃস্বলা থাকাকালীন তালাক উচ্চারণ এবং ঐ সময় অর্থাৎ তিনমাস স্ত্রী সঙ্গমে বিরত থাকা (৩) তালাক-ই-আল বিদর ঃ স্ত্রীরজঃস্বলা থাকাকালীন তিনবার তালাক উচ্চারণ।

এছাড়া মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ (Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939) অনুসারে বিচারালয়ের রায়ের ভিত্তিতেও বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'তে পারে। স্বামী দু'বছর ধরে ভরণপোষণ না করলে, সাত বৎসর বা তার বেশী সময় জেলে বন্দী থাকলে, স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে, স্বামী দু'বছরের বেশী উন্মাদ হ'লে, সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে, শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার করলে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করে বিচারলয়ের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে।

মুসলিম আইন অনুসারে কোনও ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাৎক্ষনিক বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে পারে। কোনও ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তার স্ত্রী যদি 'ইদ্দত' কাল পূর্ণ হওয়ার আবার বিবাহ করতে পারে। আবার কোনও অন্যধর্মাবলম্বী নারী ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ করে কোনও মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করার পর পুনধর্মান্তরিত হ'লে ঐ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

## ৬.৯ সারাংশ

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। নারী-পুরুষের দীর্ঘস্থায়ী যৌন সম্পর্ক এবং সন্তানের জন্মদান ও লালন-পালনের সমাজস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হ'ল বিবাহ। বিবাহ নারী-পুরুষের সামাজিক দায়িত্ব পালনের সূচনা করে। বিবাহ সম্পত্তির উত্তরাধিকার চিহ্নিত করে। বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার সৃষ্টি হ'তে পারে। সুতরাং, বিবাহ হ'ল সমাজব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আইন ও সমাজস্বীকৃত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহ বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে; যথা, একগামী বিবাহ, ও বহুগামী বিবাহ। দু'প্রকার—বহুপত্নীকত্ব ও বহুভর্তৃকত্ব।

প্রত্যেক সমাজেই বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু বাধানিষেধ থাকে। হিন্দু সমাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; যথা গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ ও গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে পাত্র বা প্রাত্রীর সামাজিক মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহকে দু'টি ধারায় ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় অনুলোম বিবাহ ও অন্যটিকে বলা হয় প্রতিলোম বিবাহ। প্রাচীন হিন্দু সমাজে সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নী যথা, সহগামী ও সঙ্কর, বিবাহ বলতে একাধিক পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর বিবাহকে বোঝায়। কিন্তু বিবর্তনের ধারায় এরকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনও সামাজে পিতামাতা ও গুরুজনদের উপর ভার থাকে কোথাও পাত্র-পাত্রী স্বনির্বাচনের মাধ্যমে বিবাহ করে। সাধারণভাবে পাত্র বা পাত্রীর পরিবারের

সুনাম নৈতিক স্তর, আর্থিক অবস্থা, পাত্র-পাত্রীর স্বাস্থ্য, রূপ, চরিত্র জীবিকা ও সহবতের উপর নির্ভর করে বিবাহ স্থির হয়। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে আয়োজিত বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। আদিবাসীদের সমাজে প্রাক্‌বিবাহ সম্পর্ক ও প্রেমজ বিবাহ অনুমোদিত থাকলেও মূলত পিতা-মাতা ও গুরুজন বিবাহ স্থির করে। যে পদ্ধতিগুলিতে আদিবাসীদের মধ্যে বিবাহ স্থির হয় সেগুলি হ'ল ঃ ক্রয় ও সেবার মাধ্যমে, যুব-আবাসে বাস করার মাধ্যমে, বন্দী করে, শক্তির পরিচয় দিয়ে বিবাহ করা প্রভৃতি। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সঙ্গে বিবাহের বয়সের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ভারতে বিবাহের গড় বয়স নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে খুবই কম। সামাজিক আন্দোলনের ফলে ১৯২৯ সালে বাল্য-বিবাহ নিবারণ আইন চালু হয়। এই আইন অনুসারে (পরবর্তী সংশোধন সহ) বর্তমানে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর এবং নারীর ন্যুনতম বয়স ১৮ করা হয়েছে। কিন্তু এই আইন যে সর্বদা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে একথা ঠিক নয়।

হিন্দু ধর্ম অনুসারে হিন্দু বিবাহ সাংস্কারিক। হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য তিনটি ঃ ধর্ম, প্রজ ও রতি। বর্তমানে অবশ্য এর কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বিবাহ হয় নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন স্বীকৃত। তবে এখনও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও অনুরক্তিকে সফল বিবাহের নিরিখ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এখনও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও অনুরক্তিকে সফল বিবাহের নিরিখ হিসেবে গণ্য করা হয়। হিন্দু বিবাহ আট প্রকারের যথা, ব্রহ্মা, দৈব, আর্য, প্রাজপত্য, অসুর গান্ধর্ব এবং পৈশাচ। হিন্দু বিবাহে অঞ্চল, জাত-পাত, সম্প্রদায় ইত্যাদি ভেদে কিছু তারতম্য ব্যতীত নির্দিষ্ট কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান অবশ্য পালনীয়, যথা, কন্যাদান, পাণিগ্রহণ, হোম, অগ্নি পরিণয়, সপ্তপদী, সিঁদুর দান, মঙ্গলসূত্রম গ্রহণ প্রভৃতি। এই আচার-অনুষ্ঠান বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কোথাও আবার প্রথানুযায়ী বিবাহ প্রচলিত। বর্তমানে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন এসেছে। বিবাহ-কালে বরপক্ষের দ্বারা কন্যাপক্ষকে দেয় উপহার সামগ্রীকে কন্যাপণ বলা হয়। কন্যাপণ দেওয়ার প্রথা সাধারণত কিছু পিতৃপরিচারী আদিবাসী সমাজে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে কতকগুলি উপহার প্রদান। এই প্রথা অতীতকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও আধুনিককালে বরপণদান প্রথা সমাজে নানা কু-প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এছাড়া সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে হিন্দু-বিবাহ প্রথা সংস্কারের উদ্দেশ্য বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে।

মুসলিম বিবাহ অন্যদিকে, চুক্তি ভিত্তিক। মুসলিম বিবাহকে বলা হয় 'নিকাহ'। মুসলিম বিবাহের উদ্দেশ্য হ'ল নিয়ন্ত্রিত যৌনাচারণ শৃংখলাবদ্ধ পরিবারিক জীবনযাপন, সন্তানোৎপাদন, পারিবারিক বিস্তৃতিসাধন এবং সন্তানের ভরণপোষণ। ঐশ্লামিক আইনে বিবাহের কোনও ন্যূনতম বয়স স্থির করে দেওয়া নেই। তবে বর্তমানে বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন অনুসারে পাত্র ও পাত্রীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ বৎসর ও ১৮ বৎসর। মুসলিম বিবাহের দু'টি প্রধান উপাদান হ'ল বিবাহের পাত্র-পাত্রী কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব দান ও অনুমোদন এবং মোহর স্থিরীকরণ। বিবাহ কাজীর দ্বারা কোরান পাঠের মাধ্যমে ও নিকাহনামা প্রস্তুতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দু'জন সাক্ষী উপস্থিত থাকে। মুসলিম বিবাহের বৈশিষ্ট্য হ'ল বহুপত্নীকত্ব। ইসলাম ধর্মে 'সহগামী' ও 'সঙ্কর' ভ্রাতা ভগ্নী বিবাহ অনুমোদিত।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় বিবাহেই বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত। প্রধানত বিংশ শতাব্দীতেই হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আইনানুমোদিত হ'তে থাকে। বর্তমানে হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে প্রধানত সাতটি করণে

বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'তে পারে, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ হ'তে পারে দু'টি পন্থায়। একটি হ'ল 'তালাক' প্রদানের মাধ্যমে ও দ্বিতীয়টি হ'ল মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ অনুসারে। আবার, যদি কোনও ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং তার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে তাহ'লেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। তাছাড়া অন্য ধর্মবলম্বী নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিবহ করার পর পুনধর্মান্তরিত হলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে ধরে নিতে হবে।

## ৬.১০ অনুশীলনী

১। সংজ্ঞা নির্দেশ করুন ঃ একগামীত্ব, বহুপত্নীকত্ব ও বহুৎর্তৃকত্ব (দশ লাইনে লিখুন)

২। গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ ও গোষ্ঠীবহির্ভূত বিবাহ কাকে বলে?

৩। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি সম্পর্কে রচনা লিখুন।

৪। হিন্দু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি কি?

৫। মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে একটি টিকা লিখুন।

৬। নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ঠিক কিংবা ভুল নির্দেশ করুনঃ

(ক) ভারতে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যুনতম বয়স ১৮ বৎসর। (ঠিক/ভুল)।

(খ) নিম্নবর্ণের পাত্রীর সঙ্গে উচ্চবর্ণের পাত্রের বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হয় (ঠিক/ভুল)

(গ) মুসলিম বিবাহে মোহর স্থিরীকরণ অবশ্য পালনীয় (ঠিক/ভুল)।

(ঘ) বরপণ দেওয়া আইনত দন্ডনীয়। (ঠিক/ভুল)

(ঙ) তালাক এবং খোল মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদের একমাত্র পদ্ধতি (ঠিক/ভুল)

৭। হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইন কি কি?

## ৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী


১. Kapadia K.M. : Marriage and Family in India, OUP, Bombay, 1973.

২. Baber, RE : Marriage & Family McGraw Hill, New York, 1939

৩. Fonseecea, Mabel : Family & Marriage in India, Sachin Publications, jaipur, 1980

৪. Ahmed, Imtiaz (ed) : Family, Kinship & Marriage among Muslims in India, New Delhi, 1976.

৫. Ahuja Ram : Indian Social System, Rawat Publications, Jaipur, 1993

৬. পরিমলভূষণ কর : সমাজতত্ত্ব, রাজ্যপুস্তক পর্যদ, ১৯৭৪।

# একক ৭ ❑ আত্মীয়তার বন্ধন

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ আত্মীয়তার বন্ধনের মূল ধারণা

৭.৩.১ বংশক্রমাগমের নীতি **(Rules of Descent)**

৭.৪ আত্মীয়-গোষ্ঠী **(Kin-Group)**

৭.৪.১ বংশধারা **(Lineage)**

৭.৪.২ গোত্র **(Clan)**

৭.৪.৩ সম্পৃক্ত বহুজন-গোষ্ঠী **(Phratries)**

৭.৪.৪ অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠী **(Moieties)**

৭.৫ আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা **(Kinship Terminology)**

৭.৬ বংশক্রমাগমের কার্যাবলী **(Functions of Descent)**

৭.৬.১ বিবাহের নিয়মাবলী **(Marriage Rules)**

৭.৬.২ উত্তরাধিকারের পদ্ধতি **(Rules of Inheritence)**

৭.৬.৩ আবাসন সংক্রান্ত নীতি **(Rules of Residence)**

৭.৬.৪ পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা **(Patrilineal System)**

৭.৬.৫ মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা **(Matrilineal System)**

৭.৭ ভারতে আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যবস্থা

৭.৭.১ আত্মীয়-গোষ্ঠী

৭.৭.২ আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা

৭.৭.৩ বিবাহ পদ্ধতি

৭.৭.৪ আনুষ্ঠানিক উপহার বিনিময়

৭.৭.৫ পূর্বাঞ্চলে আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যবস্থা

৭.৮ সারাংশ

৭.৯ অনুশীলনী

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

## ৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- আত্মীয়তার বন্ধনের তাৎপর্য
- আত্মীয়তার বন্ধনের মূল ধারণা
- বংশক্রমাগমের নীতিসমূহ ও
- ভারতে আত্মীয়তার বন্ধনের প্রকৃতি

## ৭.২ প্রস্তাবনা

আত্মীয়তা বলতে রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি বন্ধনকে বোঝায়। পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক। অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বৈবাহিক সম্পর্ক ভিত্তিক। সেই হিসেবে প্রত্যেক মানুষই তার জীবনে দু'টি পরিবারে বাস করে—একটি হল পালয়িতৃ পরিবার ও অপরটি হ'ল জন্মদাতৃ পরিবার। এই দু'টি পরিবারের সদস্যরাই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এবং আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে আচরণবিধি, যথা, সম্মান প্রদর্শন, স্নেহবর্ষণ, দূরত্ব বজায় রাখা, ঘনিষ্ঠ হওয়া, ইত্যাদি, সুনির্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে শিশুর সামাজিকীকরণে আত্মীয়দের বৃহৎ ভূমিকা থাকে। আত্মীয় সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার বন্ধন পৃথিবীর সমস্ত দেশে ও সমাজে দেখতে পাওয়া যায়, যদিও তার ধরন দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন হতে পারে। নৃতত্ত্ববিদরা আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে আদিম সমাজে আত্মীয় সম্পর্কের ধারণার উদ্ভব ঘটল এবং মানব সমাজকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আত্মীয়তার বন্ধন কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আদিম সমাজে আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যেই মানুষের সমাজ জীবন অতিবাহিত হ'ত। তার জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অতি ক্ষুদ্র অংশই আত্মীয় সম্পর্কের দ্বারা পূরণ হয়।

ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ দেশ বহু ধর্ম, বহু ও বিচিত্র সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশ; দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতিও বিচিত্র ও বহুধা। সুতরাং, আত্মীয় সম্পর্কের ধরনের মধ্যেও বৈচিত্র্য বর্তমান। এই বৈচিত্র্যকে বর্তমান এককের স্বল্প পরিসরে বিধৃত করা দুঃসাধ্য। মোটামুটিভাবে, এই এককে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মীয় সম্পর্কের ধরনের উপর কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু, এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য অঞ্চলে, যথা, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কোনও কোনও এলাকায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য বর্তমান।

## ৭.৩ আত্মীয়তার বন্ধনের মূল ধারণা

পরিবারের পরেই আত্মীয় সম্পর্ক মানুষের উৎসবে, ব্যসনে এমনকি দৈনন্দিন জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ শুধু প্রয়োজনের সময়ই আত্মীয়দের সাহায্য গ্রহণ করে না; বরং নিয়ত যোগাযোগ রেখে চলে। সেই

অর্থে বলা যায়, আত্মীয়-সম্পর্ক হ'ল পারিবারিকবন্ধনের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক সম্পর্ক। মার্ডক (Murdock) আত্মীয় সম্পর্ককে a structured system or relationship in which Kin are bound to one another by complex interlocking ties. বলে বর্ণনা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, আত্মীয় সম্পর্ক দু'প্রকারের হয়, যথা, রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক (consanguinal) এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ভিত্তিক (affinal)। সাধারণভাবে আমরা একে যথাক্রমে আত্মীয় বা জ্ঞাতি ও কুটুম্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। মনে রাখতে হবে যে, জৈবিক সম্পর্কের চেয়ে সামাজিক স্বীকৃতি হ'ল আত্মীয়তার বন্ধনের মূল ভিত্তি।

আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে আবার স্তরভেদ আছে; যথা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, নিকট আত্মীয়, তৃতীয় পর্যায়ের আত্মীয় এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যে সমস্ত মানুষ ব্যক্তির (ego) পালয়িতৃ পরিবার এবং জন্মদাতৃ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলা হয়। যেমন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা। আবার, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি দ্বিতীয় স্তর, অর্থাৎ নিকট আত্মীয় স্তরভুক্ত। তৃতীয় পর্যায়ের আত্মীয়ের সংজ্ঞা হ'ল যারা নিকটাত্মীয়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; যেমন, প্রপিতামহ, পিতামহর ভ্রাতা প্রভৃতি। আর প্রপিতামহের পিতা, মাতামহীর পিতামহ প্রভৃতি হ'ল দূরসম্পর্কে আত্মীয়ের উদাহরণ।

## ৭.৩.১ বংশক্রমাগমের নীতি (Rules of Descent)

পরস্পর নির্ভর সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আত্মীয়-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সমাজস্থিত প্রতিটি মানুষই কোনও না কোনও সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভিত্তিক গোষ্ঠীর সদস্য। এই গোষ্ঠী দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের চেয়ে বিস্তৃততর। যে নীতির মাধ্যমে ব্যক্তির রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়-সম্পর্ক নির্ধারিত হয়, তাকে বলে বংশক্রমাগমের নীতি। এবং রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত এই গোষ্ঠীকে বলে বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী (descent group)। উর্দ্ধতর প্রজন্ম থেকে নিম্নতর প্রজন্মে বংশক্রমাগমের মোটামুটি ভাবে ছয়টি ধারা আছে। প্রথমত, পিতৃপরিচায়ী ধারা ঃ এই ব্যবস্থায় বংশক্রমাগম পিতার থেকে পুত্রে সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয়ত, মাতৃপরিচায়ী ধারা ঃ এই ব্যবস্থায় বংশক্রমাগম মাতার থেকে কন্যায় সঞ্চারিত হয়। তৃতীয়ত, যুগ্ম-পরিচায়ী ধারা (bilineal) ঃ এই ব্যবস্থায় বংশক্রমাগম পিতা ও মাতা উভয় দিকেই সঞ্চারিত হ'তে পারে। যেমন, স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার একদিকে এবং অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার অন্যদিকে সঞ্চারিত হতে পারে চতুর্থত, সমোদ্ভুত ধারা (cognatic) ঃ এক্ষেত্রে বংশক্রমাগম, পিতা ও মাতা উভয়দিকেই সমানভাবে সঞ্চারিত হতে পারে। পঞ্চমত, সহগামী ধারা (Parallel) ঃ এই ব্যবস্থা অনুসারে বংশক্রমাগম পিতা থেকে পুত্রে এবং মাতা থেকে কন্যায় সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বংশক্রমাগম লিঙ্গভিত্তিক। ষষ্ঠত, 'সঙ্কর' ধারা (cross) ঃ এক্ষেত্রে বংশক্রমাগম পিতা থেকে কন্যায় এবং মাতা থেকে পুত্রে সঞ্চারিত হয়। এ ধরনের ব্যবস্থা অবশ্য খুবই দুর্লভ।

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পিতৃ বা মাতৃ পরিচায়ী ধারা চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত, যৌথ বংশক্রমাগম হিসেবে; দ্বিতীয়ত, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধারা হিসেবে; তৃতীয়ত, সম্পর্কের দ্যোতনা হিসেবে; চতুর্থত, উর্দ্ধতন ও অধস্তন প্রজন্ম নির্দেশ করতে। এই রীতি-পদ্ধতিগুলি সবই, তৃতীয়টি ব্যতীত, পরিস্থিতি-ভিত্তিক। এক্ষেত্রে কোনও সমাজের রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, মিথষ্ক্রিয়ার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়।

বংশক্রমাগমের ধারার এক 'যৌথ' চেতনা সর্বদা কাজ করে। বংশের সদস্যরা ধর্মীয় আচরণ অনুষ্ঠান পালনের জন্য, কুলদেবতার পূজার জন্য অথবা পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। বংশক্রমাগমের ধারার মধ্যে

কর্তৃত্বের কাঠামো নিহিত থাকে। সাধারণত, বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তৃত্বের অধিকারী হ'ন এবং যৌথ সম্পত্তির দেখাশোনা করেন। ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব বংশক্রমাগমে তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। কোনো কোনও সমাজে বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হিসেবেও কাজ করে। গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ বিবাদের মীমাংসা করে বা অন্য সমতুল গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের সময় ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে।

বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর সামাজিক কার্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক বংশক্রমাগমের আলোচনা সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু আত্মীয়-সম্পর্ক শুধু রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক নয়, বৈবাহিক সম্পর্ক ভিত্তিকও বটে। যখন সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা ঐদিক থেকে আত্মীয়-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন তখন তাঁরা দুই পরিবারের মৈত্রীবন্ধনের দিক থেকে বিষয়টিকে আলোচনা করেন। লুই ডুমন্ট (Louis Dumont) বংশক্রমাগমের আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তা। দেখা যায় যে, পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থাতেও মাতামহ, মাতামহী, মাসী এবং বিশেষত মামা ব্যক্তির উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। একে বলা হয় 'সৌজন্যমূলক সন্তানত্ব'। (complementary filiation)। মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় এক্ষেত্রে ব্যক্তির পিতার দিকের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ককে বোঝায়। পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় ব্যক্তির (ego) মাতার গোষ্ঠীর তার পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক ভিত্তিক গোষ্ঠী যা দু'টি পারিবারিক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। এঁর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সব সমাজেই ব্যক্তি তার পিতা এবং মাতা উভয়েরই সন্তান; শুধু বংশক্রমাগম সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারিত হয়।

## ৭.৪ আত্মীয়-গোষ্ঠী (Kin-group)

দেখা গেল যে, আত্মীয় সম্পর্কের মাধ্যমে প্রজন্মের স্তর, উত্তরাধিকারের ধারা, সম্পর্কের দ্যোতনা নির্ধারিত। এই কাঠামোর মধ্যেই ব্যক্তির অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সুতরাং, আমরা এবার উক্ত বিষয়গুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

### ৭.৪.১ বংশধারা (Lineage)

বংশাধারাকে (Lineage) সম্প্রসারিত পরিবার বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি একটি রক্তের সম্পর্কভিত্তিক একপক্ষীয় বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী যার সদস্যরা কোনও একজন নির্দিষ্ট পূর্বপুরুষের অধস্তন প্রজন্ম হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে। বংশধারা বলতে প্রজন্মের নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশকে বোঝায়। বংশধারা পিতৃপরিচায়ী বা মাতৃপরিচায়ী উভয়ই হ'তে পারে তবে সবক্ষেত্রেই তা গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ সাপেক্ষ।

একই বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা পরস্পরের ভ্রাতা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আনুগত্য বোধ করে। একই বংশের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা পরিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যেমন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পূজা, শ্রাদ্ধ, ইত্যাদি একত্রিত হয় এবং সহযোগিতা করে। সাধারণত তাদের একই কুলদেবতা থাকে এবং তারা একই ধরনের পারিবারিক রীতিনীতি ও অনুশাসন মেনে চলে। তাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সহযোগিতাও বর্তমান থাকে।

তবে বংশধারা অনন্তকাল ধরে একই অঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল গোষ্ঠী হিসেবে অবস্থান করে না, ক্রমশ বিভক্ত হয়ে পড়ে। যদি ভারতের গ্রাম অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, পূর্বপুরুষের জমি ক্রমশ পরবর্তী প্রজন্মের শরিকদের মধ্যে বিভাজিত হয়ে গেছে এবং পূর্বপুরুষের বাড়ীও উত্তরপুরুষের মধ্যে

বিভাজিত হয়েছে অথবা উত্তরপুরুষের কেউ অন্যত্র গৃহনির্মাণ করে পৃথগন্ন হয়েছে। তাদের উত্তরপুরুষেরা আবার পুনরায় পৃথক হয়েছে। আবার, কোনও ব্যক্তির নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে তার সম্পত্তির অংশ অন্যান্য শরিকদের অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অতীতে ভারতের সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক হওয়ার কারণে বংশধারার বন্ধন অধিকতর দৃঢ় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনকালে দেশের ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটার ফলে তা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে শিল্পায়ন ও নগরায়নের কারণে তা আর গভীর বন্ধন হিসেবে পরিগণিত হয় না। এতদসত্ত্বেও বংশধারাগত সম্পর্ক অন্যান্য আত্মীয়-সম্পর্কের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গভীরতর এবং নিকটতম বলে বিবেচনা করা হয়।

## ৭.৪.২ গোত্র (Clan)

বংশধারার ইতিবৃত্তি নির্দিষ্ট। কিন্তু গোত্র সম্পর্ক অনির্দিষ্ট। গোত্র (clan) বলতে বোঝায় এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যরা মনে করে যে তারা কোনও পৌরাণিক পূর্বপুরুষের বংশধর। অর্থাৎ, সেই পূর্বপুরুষ ঐ গোষ্ঠীর আদিপুরুষ। ভারতবর্ষের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, এখানে 'গৌতম', 'কাশ্যপ', 'ভরদ্বাজ', 'বাৎস', 'ঘৃতকৌশিক' প্রভৃতি গোত্র দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা মনে করে যে, তাদের বংশের বা গোষ্ঠীর আদিপুরুষ উক্ত কোনও ঋষি। সুতরাং, গোত্র-গোষ্ঠী বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর তুলনায় বৃহত্তর। বংশধারা ক্রমশ, অত্যন্ত ধীরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিভাজিত হ'তে থাকে এবং গোত্র-গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।

গোত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রত্যেক ব্যক্তিই গোত্র-নামের উত্তরাধিকারী হয় এবং এই উত্তরাধিকার এক পাক্ষিক, অর্থাৎ পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় ব্যক্তি পিতার গোত্রের উত্তরাধিকারী হয় এবং মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় ব্যক্তি মাতার গোত্রের উত্তরাধিকারী হয়। কোনও অবস্থাতেই উভয় গোত্রের উত্তরাধিকারী হয় না। গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা গোত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। Lowie বলেছেন যে, By convention most contemporary English speaking scholars define the clan as unilateral exogamous group. হিন্দু সমাজের একই জাতের মধ্যে বিবাহ অবশ্য কর্তব্য হলেও একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত নয়।

গোত্র-গোষ্ঠীকে এক অর্থে সম্প্রসারিত বংশধারা বলা যেতে পারে। গোত্রভুক্ত আত্মীয়তা এতই বিস্তৃত হয় যে প্রকৃতপক্ষে গোত্রনাম ভিন্ন পরস্পরের মধ্যে বংশানুক্রমিক আত্মীয় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। লিন্টন (Linton) দেখিয়েছেন যে, চীনে একই গোত্র-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংখ্যা দুই থেকে তিন লক্ষ পর্য্যন্ত রয়েছে। ভারতবর্ষেও অনুরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। আবার গোত্র-গোষ্ঠী এমন কতকগুলি কার্যসম্পাদন করতে পারে যা পরিবার পারে না; যেমন, বহিঃ আক্রমণ থেকে গোষ্ঠীকে রক্ষা করা, রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করা অর্থনৈতিক সংগঠন গঠন করা বা ধর্মীয় নিয়ম-নীতি স্থির করা।

গোত্র-গোষ্ঠী পৃথিবীর সব দেশে ও সব কালেই দেখতে পাওয়া যায়। অতীতের আদিম সমাজে, অস্ট্রেলিয়ায় এর অস্তিত্ব ছিল; তেমনই আধুনিক চীন, গ্রীস, রোম, ভারত প্রভৃতি দেশেও এর অস্তিত্ব বর্তমান।

## ৭.৪.৩ সম্পৃক্ত বহু-জন গোষ্ঠী (Phratries)

সম্পৃক্ত বহুজনগোষ্ঠী (Phratires) বলতে মর্গান (Morgan) কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত দুই বা ততোধিক গোত্র-গোষ্ঠীকে (clan) বুঝিয়েছেন। Lowie বলেছেন যে In ancient Athens a 'Phratrica' was one of three political divisions of the tirbe (Phyle), kinship originally determining membership. সম্পৃক্ত বহুজনগোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকতেও পারে কিংবা না থাকতেও পারে।

### ৭.৪.৪ অর্দ্ধ-জন গোষ্ঠী (Moieties)

ব্যুৎপত্তিগতভাবে অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীর (moieties) অর্থ হল অর্দ্ধ-উপজাতি। কোনও উপজাতি যখন দু'টি সহযোগী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় তখন তাকে অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠী বলা হয়। কোনও কোন সমাজতত্ত্ববিদের মতে, অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ অবশ্য প্রচলিত। আবার কারও কারও মতে, এটি কেবলমাত্র দ্বৈত সত্তা সম্পন্ন গোষ্ঠী যা গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহভিত্তিক হ'তেও পারে অথবা না হ'তেও পারে। আলাস্কার টিংটিসদের মধ্যে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, এশিয়ার অনেক অঞ্চল এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীদের মধ্যেও গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। Lowie দেখিয়েছেন, টিংটিসদের মধ্যে দু'টি অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠী আছে; একটিকে উনি বলেছেন বায়স বা দাঁড়কাক (Raven) অন্যটিকে নেকড়ে (Wolf)। একটি অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি অপর অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিকে কখনই তার সম্পত্তি প্রদান করে না। প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর গৃহনির্মাণ, সন্তানের কান ফুঁড়ে দেওয়া প্রভৃতি করে দেয় দ্বিতীয়োক্ত গোষ্ঠী। এগুলি উভয় অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীর সহযোগিতার নির্দশন।

কোনও কোনও অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীর মধ্যে আবার গোষ্ঠীসাপেক্ষ বিবাহ প্রচলিত। যেমন, নীলগিরির টোডারা দু'টি অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীতে বিভক্ত হ'লেও তাদের মধ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত জাতভিত্তিক গোষ্ঠীসাপেক্ষ বিবাহ অনুমোদিত। আবার দেখা যায় যে, নাগাল্যাণ্ডের আঙ্গামী নাগাদের দুটি অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠী—পেজোমা (Pezoma) এবং পেফুমা (Pefuma) দু'টি গোত্র-গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পূর্বে এদের মধ্যে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে পূর্বতন ব্যবস্থা শিথিল করে গোষ্ঠীসাপেক্ষ বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠীর বহু শাখা-প্রশাখা থাকতে পারে যাদের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক বর্তমান। একাধিক গোত্রগোষ্ঠী সংযুক্ত হয়ে দু'টি সম্পৃক্ত বহুজন গোষ্ঠী (Phratries) সৃষ্টি করতে পারে, কিছু গোত্র গোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে; অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠী ও তার শাখা প্রশাখা নূতনভাবে সৃষ্ট হ'তে পারে। সবশেষে অর্দ্ধ জন-গোষ্ঠী সৃষ্টিতে জনবিন্যাসের এক বড় ভূমিকা থাকে।

## ৭.৫ আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা (Kinship terminology)

আত্মীয় সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সম্বোধনের বা আত্মীয় সম্পর্ক উল্লেখের ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার মাধ্যমেই সমাজে আত্মীয়-সম্পর্ক নির্ধারিত ও প্রকাশিত হয়। সাধারণত, একই স্তরের আত্মীয় সম্পর্ক বোঝাতে একই ধরনের সম্বোধনের ভাষা ব্যবহার করা হয় এবং সেই অনুসারে আত্মীয়ের ভূমিকা পালিত হয়।

আত্মীয় সম্বোধনের জন্য কোনও ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যক্তিনামে সম্বোধন করা হয়, কোনও ক্ষেত্রে আত্মীয় সম্পর্ক-সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। কোথাও বা উভয়ের সংমিশ্রণ করা হয়, যেমন, মঞ্জুর মা, অশোকের বাবা ইত্যাদি। টাইলর (Tylor) একে Tehnonymy বলে উল্লেখ করেছেন। মার্ডক (Murdock) আত্মীয় সম্বোধনের ভাষাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা ব্যবহার পদ্ধতি ঃ আত্মীয় সম্পর্কের ভাষা প্রয়োগের সময় সর্বদাই ব্যক্তির (ego) দিক থেকে সম্পর্ক নিরূপণের জন্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ, 'আমি' এখানে মুখ্য। 'আমি' স্ত্রী বা পুরুষ দুই'ই হ'তে পারে। আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা দু'প্রকার হ'তে পারে—সম্বোধনের ভাষা

(terms of address) এবং সম্পর্ক উল্লেখ বা নির্দেশের ভাষা (terms of reference)। আবার কোনও কোনও ভাষা সম্বোধন ও উল্লেখ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন, 'কাকা' বা 'ভাই' শব্দটি বহু ধরনের সম্পর্কের উল্লেখের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আবার সম্বোধন করতেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ত, আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার গঠন ঃ আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা প্রাথমিক, বর্ণনামূলক এবং বুৎপত্তিগত হ'তে পারে। আত্মীয় সম্পর্কসূচক প্রাথমিক ভাষা হ'ল সেই ধরনের ভাষা বা কোনও নির্দিষ্ট সম্পর্ককে বোঝায় এবং অন্য কোনও সম্পর্ককে বোঝায় না, যেমন, জ্যাঠামশাই, বেয়াই মশাই, শ্যালক ইত্যাদি। বর্ণনামূলক ভাষা হ'ল সেই ধরনের শব্দ ব্যবহার যা দুই বা ততোধিক শব্দসংযোজনের মাধ্যমে আত্মীয় সম্পর্ক নির্দেশ করে, যেমন, ভ্রাতৃবধূ, ভগ্নীপতি, মাসতুতো বোন ইত্যাদি। বুৎপত্তিগত ভাষা প্রাথমিক ভাষার থেকে উদ্ভূত, যেমন, মাতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি। তৃতীয়ত, আত্মীয়-সূচক ভাষা ব্যবহারের পরিধিঃ এক্ষেত্রে আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা নির্দিষ্ট বা শ্রেণীভুক্তমূলক হ'তে পারে। লিঙ্গ, প্রজন্ম বা বংশধারার ভিত্তিতে আত্মীয়-সম্পর্ক বোঝাতে সম্বোধনের কোনও নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হ'তে পারে, যেমন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, প্রভৃতি। শ্রেণীভুক্ত আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা একাধিক আত্মীয়-স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন 'দাদু' বলতে পিতামহ এবং মাতামহ উভয়কেই বোঝায়। শ্রেণীভুক্ত শব্দ, লিঙ্গ, প্রজন্ম, বয়স, রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতিরেকেই ব্যবহৃত হ'তে পারে।

## ৭.৬ বংশক্রমাগমের কার্যাবলী [Functions of descent]

আগেই বলা হয়েছে যে, পরস্পর নির্ভর সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আত্মীয়-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সমাজস্থিত প্রতিটি মানুষই কোনও না কোনও সহযোগী ও ঘনিষ্ঠসম্পর্ক ভিত্তিক গোষ্ঠীর সদস্য। যে নীতির মাধ্যমে ব্যক্তির রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে আত্মীয়-সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তাকে বংশক্রমাগমের নীতি এবং রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত এই গোষ্ঠীকে বলে বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী। বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর কতকগুলি নীতিভিত্তিক নির্দিষ্ট কার্যধারা আছে। এবারে সেগুলি আলোচনা করা যাক।

### ৭.৬.১ বিবাহের নিয়মাবলী [Marriage rules]

বংশক্রমাগমের মাধ্যমে ব্যক্তি এক নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যরূপে গৃহীত হয়, যে গোষ্ঠীর তার জন্মের পূর্বেও অস্তিত্ব ছিল এবং যে গোষ্ঠীর তার মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকবে। বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে এক পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে, সে সম্পর্ক যত ক্ষীণ বা দূর-সম্পর্কের হোক না কেন এবং তারা পরস্পর ভ্রাতা বা ভগ্নী হিসেবে পরিগণিত হয়। বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী সেইজন্য, কিছু ব্যতিক্রম ব্যাতীত, গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ভিত্তিক হয়। প্রত্যেক বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীতেই বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ থাকে। কে কাকে বিবাহ করতে পারবে অথবা কার প্রতি কে কন্যাদান করতে পারবে সে সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি বর্তমান থাকে। চৈনিক সমাজে কয়েকশত পদবি-সম্বলিত গোষ্ঠী দেখা যায়, যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। ভারতবর্ষেও দেখা যায় যে, 'সগোত্র' বিবাহ নিষিদ্ধ।

### ৭.৬.২ উত্তরাধিকারের পদ্ধতি [Rules of inheritance]

অধিকাংশ সমাজেই বংশক্রমাগনের সঙ্গে উত্তরাধিকারের পদ্ধতির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, কোনও কোনও ধরনের সম্পত্তি পিতার থেকে পুত্রে বর্তায় এবং কোনও কোনও সম্পত্তি মাতার

থেকে কন্যা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। ভারতের প্রায় সর্বত্রই স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পুত্রের প্রাপ্য। অন্যদিকে বিবাহকালে কন্যাকে প্রদত্ত অর্থ ও অলঙ্কার কন্যার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। অবশ্য বধুমাতা শ্বশ্রুমাতার কাছে থেকেই কিছু অলঙ্কার উপহার হিসেবে পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি ব্যতীত পেশাগত দক্ষতা, গোষ্ঠী নেতৃত্ব, পারিবারিক গোপন তথ্য, বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতির উত্তরাধিকার আত্মীয়-সম্পর্কের ভূমিকা ও মানদন্ডের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এগুলি আবার ব্যক্তির 'আরোপিত' এবং 'অর্জিত' মর্যাদার উপরও নির্ভর করে। যদিও মনে করা হয় যে, 'আরোপিত' মর্যাদা একটি আদিম, উপজাতীয় এবং প্রাক-আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি এবং আধুনিক, সভ্য ও শিল্পায়িত সমাজের পক্ষে অনুপযুক্ত তবুও বলা যায় যে, উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানকালেও 'আরোপিত' মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

## ৭.৬.৩ আবাসন সংক্রান্ত নীতি [Rules of residence]

আবাসন সংক্রান্ত নীতি, বিশেষত বিবাহের পরে স্বামী/স্ত্রীর বাসস্থান আত্মীয় সম্পর্কের মানদন্ড স্থির করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এমনকি আত্মীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। যখন বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রী তদের নিজস্ব বাসস্থান স্থির করে তখন তাকে দম্পতি-আবাসিক [Neo-local] ব্যবস্থা বলা হয়। আধুনিক শিল্পায়িত ও নগরায়িত সমাজে এই ধরনের ব্যবস্থা বেশী দেখা যায়। যখন বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বাসগৃহে বাস করতে থাকে তখন তাকে পতি-আবাসিক (Patrilocal) ব্যবস্থা বলা হয়। অন্যদিকে যখন বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর বাসগৃহে বাস করতে থাকে তাকে পত্নী-আবাসিক (Matrilocal) ব্যবস্থা বলা হয়। আবাসন সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে উত্তরাধিকারের পদ্ধতির সমন্বয় নাও থাকতে পারে। তবু মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, পতি-আবাসিক ও দম্পতি-আবাসিক ব্যবস্থার সঙ্গে পিতৃ-পরিচায়ী ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। অন্যদিকে মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থার সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি আবাসিক ব্যবস্থারই সমন্বয় সাধন করা সম্ভব।

## ৭.৬.৪ পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা [Patrilineal System]

পিতৃপরিচায়ী বংশক্রমাগমে জন্মের পর পুত্রসন্তান পিতৃপুরুষের বংশধর রূপে বিবেচিত হয় এবং পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। অন্যদিকে, কন্যাসন্তান পিতার পরিবারে অতিথিরূপে বিবেচিত হয় এবং বিবাহের পর তার স্বামীর বংশক্রমাগমের অন্তর্ভুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর গৃহে বাস করে; অর্থাৎ পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থার বাসস্থান পতি-আবাসিক।

পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় একই বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর সদস্যরা পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানে যৌথভাবে যোগদান করে, একই কুলদেবতার পূজা করে, একই প্রয়াত পিতৃপুরুষের তর্পণ করে এবং সম্পর্কের নৈকট্য অনুসারে উর্দ্ধতন প্রজন্মের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাধিকারী হয় অথবা অশৌচ পালন করে। তাছাড়া, তারা যৌথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। জমি, বাড়ি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় পুরুষ বংশধররা। কন্যার বিবাহের সময় তাকে বস্ত্র, অলঙ্কার, অর্থ প্রভৃতি উপঢৌকন দেওয়া হয়। (এখানে অবশ্য স্বাধীনোত্তর কালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বাবস্থার কথা বলা হচ্ছে)। পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় বয়স অনুসারে প্রতি প্রজন্মের মধ্যে কর্তৃত্বের বিভাজন করা থাকে। সম্পত্তির দেখাশোনা, বিবাদ মীমাংসা করা প্রভৃতির দায়িত্ব থাকে বয়োজ্যেষ্ঠদের উপর। তাদের কর্তৃত্ব বয়ঃকনিষ্ঠরা মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

পিতৃ-পরিচায়ী ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা গৌণ। তার ভূমিকা কন্যা, স্ত্রী এবং মাতার। এই ব্যবস্থায় কন্যার অনূঢ়া থাকা বা বৈধব্যকে অমঙ্গলজনক এবং অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। বিবাহপূর্বকালে নারী পিতৃগৃহে অতিথি এবং বিবাহোত্তর কালে স্বামীগৃহে, অন্তত প্রথম সন্তানের জন্ম পর্য্যন্ত, বহিরাগত।

দক্ষিণ ভারতের পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা অবশ্য উত্তরভারতের মত এতটা পিতৃতান্ত্রিক নয়। সেখানে কন্যা বিবাহপরবর্তী কালেও পিতার পরিবারের সঙ্গে আর্থিক ও মানসিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সময় পিতার পরিবারের সহায়তা পায়। দক্ষিণ ভারতের পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থাতেও ভাগ্নে-ভাগ্নীর উপর মামার প্রভাব যথেষ্ট এবং বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে মামার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কোনও কোনও সমাজতত্ত্ববিদ্ বিবাহকালে কন্যাকে প্রদত্ত যৌতুক ও উপঢৌকনদানকে কন্যার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা উত্তরাধিকার নয় বরং বিবাহকালে পাত্রপক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'বরপণ'। অবশ্য হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬) কন্যা সন্তানকেও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহিতা কন্যারা ভ্রাতাদের অনুকূলে তাদের অধিকার ত্যাগ করছে।

### ৭.৬.৫ মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা [Matrilineal System]

মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় বংশক্রমাগত মাতা থেকে কন্যায় সঞ্চারিত হয় একথা আগেই বলা হয়েছে। তবে বাস্তবে মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত নয়। বংশক্রমাগত পিতৃপরিচায়ী অথবা মাতৃপরিচায়ী যা-ই হোক্ না কেন প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষরাই। কেবলমাত্র আদিম সমাজেই পুরুষ ও নারীর যৌথ নিয়ন্ত্রণ দেখতে পাওয়া যায়। ফলত, মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় আবাসন ব্যবস্থা জটিল ও সমস্যাপূর্ণ। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির তার সন্তানের উপর কোনও অধিকার থাকে না যেহেতু বংশক্রমাগম মাতৃপরিচায়ী। আবার অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী তার পিতার গৃহেই বিবাহোত্তরকালেও বসবাস করে। আবার, যে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী সঙ্গেই বসবাস করে সেক্ষেত্রেই তার স্ত্রীর সম্পত্তির উপর অধিকার না থাকার দরুন সম্পত্তির দেখাশোনার ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ করে। অনেক সময় পিতার ভূমিকা এবং মামার ভূমিকার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা এখনও রয়েছে।

## ৭.৭ ভারতে আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যবস্থা আলোচনা করার আগে বলে নেওয়া ভাল যে, ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। বহু ভাষা বিবিধ সংস্কৃতি, বিচিত্র আচার-বিচার সমন্বিত মানুষের দেশ। সুতরাং, আত্মীয়তার বন্ধনের ধরন সারা ভারতের, বলাই বাহুল্য এক রকমের নয়, সুতরাং, ভারতে আত্মীয়তার বন্ধনের প্রকৃতি আলোচনা করার আগে ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

ইরাবতী কার্ভে তাঁর গ্রন্থে আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে আলোচনায় ভারতকে চারটি ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। (ক) উত্তর ও মধ্য ভারত, যে অঞ্চলে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে মূলত সংস্কৃত থেকে (খ) দক্ষিণ ভারত, যে অঞ্চলের মূল ভাষা দ্রাবিড় এবং (গ) পূর্বাঞ্চল, যেখানে অষ্ট্রিক বা মুণ্ডরি ভাষা প্রচলিত। বর্তমানের রাজ্য

ভিত্তিক অঞ্চলে বিভাজন এই রকম ঃ উত্তর ভারত—উত্তর প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড, কাশ্মীর ও আসাম। মধ্য ভারত—গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, এবং উড়িষ্যা। দক্ষিণ ভারত—কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ। পূর্বাঞ্চল—মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও ত্রিপুরা।

আমরা আমাদের আলোচনা মূলত সীমাবদ্ধ রাখবো উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। একথাও মনে রাখা দরকার যে, ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পার্থক্যের কারণে উত্তরভারতেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বর্তমান। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এতদ্‌সত্ত্বেও তার মধ্যে কিছু ঐক্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আত্মীয়তার বন্ধনের চারটি বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করব, যথা, আত্মীয়-গোষ্ঠী, আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা, বিবাহ-পদ্ধতি ও উপহার বিনিময় প্রথা।

## ৭.৭.১ আত্মীয়-গোষ্ঠী

উত্তর-ভারত সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা গেছে যে, পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা ও জাতপাত আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মোটামুটিভাবে উত্তর ভারতের আত্মীয়তার বন্ধন বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী ঘিরে গড়ে উঠেছে। উত্তর ভারতে প্রধানত পিতৃপরিচায়ী বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর অর্থ হ'ল বংশক্রমাগম পিতার থেকে পুত্রে সঞ্চারিত হয়। একই বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা, যারা পরস্পরের আত্মীয়রূপে বিবেচিত হয়, পরিস্থিতি অনুসারে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে অথবা কলহে অবতীর্ণ হয় কিংবা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। তারা অর্থনৈতিক বিষয়ে এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে পরস্পরের সহযোগিতা করে। যেহেতু পারিবারিক জমি-জায়গা একই গ্রামে বা কাছাকাছি অঞ্চলে থাকে, সুতরাং তারা ভৌগলিকভাবে পাশাপাশি বাস করে। এই পরিস্থিতিতে তারা পরস্পরকে অর্থ, শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আদান-প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করে। এর ফলে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। বিবাদ-মীমাংসার ক্ষেত্রে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠরা মধ্যস্থতা করেন। আবার সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, যেমন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতির সময় তারা একত্রিত হয়। পারিবারিক বিপদের সময় পরস্পরকে সহযোগিতা করে। তবে একই বংশনুক্রমিক গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু সহযোগিতার সম্পর্কই থাকে না; দ্বন্দ্ব-কলহের সম্পর্কও থাকে। এটি ঘটে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়কে ঘিরে। মদন (T.N. Madan) দেখিয়েছেন যে, কাশ্মীরের গ্রামে ভ্রাতৃবিবাদ কেমন করে যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন এনেছিল এবং পরবর্তী প্রজন্মে এই বিবাদ তীব্রতর হয়েছিল। অবশ্য কাশ্মীরের এই চিত্র উত্তর ভারতে সর্বত্র কম- বেশী বর্তমান।

উত্তরভারতে সম্পত্তি উত্তরাধিকার পিতার কাছ থেকে পুত্র বর্তায়। অর্থাৎ এখনে পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা বর্তমান। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কারণেই পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, বংশোদ্ভূত শরিকরা একই অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার ভোগ করে এবং সেই অধিকার রক্ষার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে। আবার, বংশগত সম্পত্তির অধিকতর অংশ লাভের জন্য কলহ ও দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। প্রধান দেখিয়েছেন যে, মীরাট এবং দিল্লীর আশেপাশের কিছু অঞ্চলে জমির মালিকরা বংশের বাইরে জমি হস্তান্তর করতে পারে না। বংশের মধ্যেই জমির অধিকার বজায় রাখার জন্য পরস্পর সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়।

উত্তরভারতে আত্মীয় সম্পর্ক নির্ধারণে 'গোত্র' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তরভারতে সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ও অননুমোদিত। সুতরাং গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ অবশ্য কর্তব্য। উত্তরভারতের হিন্দু সমাজে আত্মীয়-সম্পর্ক স্ব-জাতের লোকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তার কারণ স্ব-জাতের মধ্যে বিবাহ হিন্দুসমাজে অবশ্য কর্তব্য। উত্তর ভারতে হিন্দুসমাজে জাতপাতের বিভক্তিকরণ ঘটেছে প্রধানত বৃত্তি বা পেশাকে ঘিরে। ফলে সম-বৃত্তির বা সমপেশাধারী ব্যক্তিরা পরস্পরকে সহায়তা করে। আবার এক্ষেত্রে আত্মীয়-সম্পর্ক এই অবরজাতের (sub-caste) লোকেদের নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

মোটামুটিভাবে অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্য বাদ দিলে উত্তরভারতে আত্মীয়-গোষ্ঠীর সাধারণ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হ'ল ঃ (১) ব্যক্তির (ego) বয়ঃকনিষ্ঠ আত্মীয়দের স্বনামে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের সম্পর্ক-নাম্নে সম্বোধন করা হয় এবং সম্পর্ক-নামের শেষে হিন্দীভাষী অঞ্চলে 'জি যোগ করা হয়; যেমন, চাচাজি, দাদাজি ইত্যাদি। বাংলায় 'জি'র বদলে 'মশাই' শব্দটি ব্যবহার করা হয়; যেমন, মেসোমশাই, পিসেমশাই ইত্যাদি। (২) ঊর্ধ্বতন প্রজন্মের সব সন্তানরাই ভ্রাতা কিংবা ভগ্নী হিসেবে সম্বোধিত হয়। (৩) ভ্রাতা বা ভগ্নীর সন্তান নিজের সন্তানতুল্য বলে বিবেচিত হয় (৪) সম-প্রজন্মের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়ঃকনিষ্ঠরা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখে। (৫) প্রতি প্রজন্মের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকে। (৬) বিবাহের পর পুত্রবধূ শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রাখে। সন্তান জন্মের পর অবশ্য সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। (৭) যৌথ পরিবারের নিকটতম আত্মীয় ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়রাও, যেমন মাতার দিক দিয়ে আত্মীয় (Uterine Kin) এবং স্ত্রী দিক দিয়ে আত্মীয় (affinal kin), গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—এরা রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় নয় কিন্তু প্রয়োজনের সময় এরা সহযোগিতা করে। সাধারণ বাংলায় এদের কুটুম্ব বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতের চারটি প্রদেশের আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যবস্থার মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র দেখতে পাওয়া যায়। যদিও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা হেতু তার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য বর্তমান; যেমন, কেরলে মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা প্রচলিত।

উত্তরভারতের মত দক্ষিণ ভারতেও একই বংশধারার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। পতি-আবাসিক ব্যবস্থা তাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাঞ্জোরের ব্রাহ্মণদের পিতৃপরিচায়ী বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ডুমন্ট (Dumont) মাদুরাই-এর প্রমালাই কল্লারদের (Pramalai Kallar) আলোচনার সময় **'কুট্টম'** এর উল্লেখ করেছেন; যার অর্থ হ'ল পিতৃপরিচায়ী পতি-আবাসিক গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ ভিত্তিক আত্মীয়-গোষ্ঠী। কুট্টমের সদস্যরা এক বা একাধিক গ্রামের অধিবাসী হ'তে পারে। প্রতি কুট্টুম তার পূর্বপুরুষের নামানুসারে হয়। এই পূর্বপুরুষ আবার তাদের গোষ্ঠীপতিও বটে। তার জ্যেষ্ঠপুত্র কুট্টুম-নামের উত্তরাধিকারী হয় এবং গোষ্ঠীপতি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কুট্টুমের সদস্যদের আত্মীয়-সম্পর্ক প্রকাশিত হয় যেমন, ফসল কাটার সময় কুট্টুমের সদস্যরা সমবেতভাবে কুট্টমের মন্দিরে পূজা করে। আবার, যেহেতু জমির অধিকার কুট্টুমের পুরুষদের সেহেতু দেখা যায় যে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা বা শরিকরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কলহ-বিবাদে অবতীর্ণ হয়। এই শরিকদের বলা হয় **'পঙ্গালী'** (Pangali) আর, মাতার দিক দিয়ে অথবা স্ত্রীর দিক দিয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ আত্মীয়-গোষ্ঠীকে বলা হয় **'মামা-মচ্ছিনান'** (mama-machchinan)। ভগ্নীর বিবাহসূত্রে এবং পিসীর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ আত্মীয়দেরও এই অভিধায় ফেলা হয়। এদের সঙ্গে সম্পর্ক সবসময়েই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মধুর হয়।

যদিও দক্ষিণ ভারতে প্রধানত পিতৃপরিচায়ী এবং পরি-আবাসিক ব্যবস্থা বর্তমান (যেমন নাম্বুদ্রিরা), কিন্তু কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে, যেমন নায়াররা, মাতৃপরিচায়ী ও পত্নী-আবাসিক ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোনও কোনও গোষ্ঠী উভয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ টোডাদের কথা উল্লেখ করা যায়। কোনও কোনও গোষ্ঠী বহুপত্নীকত্ব প্রথা অনুকরণ করে, যেমন নাম্বুদ্রিরা। কোনও কোনও গোষ্ঠী বহুভর্তৃকত্ব প্রথা অনুসরণ করে, যেমন আসারি ও নায়াররা। আবার টোডারা উভয় প্রথাই অনুসরণ করে। আসারি (Asaari) গোষ্ঠী বহুভর্তৃক পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা অনুসরণ করে। নায়ার (Nayar) গোষ্ঠী বহুভর্তৃক মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা অনুসরণ করে এবং নাম্বুদ্রি (Namboodri) গোষ্ঠী বহুপত্নীক মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থা অনুসরণ করে। পিতৃপরিচায়ী যৌথ পরিবারের মত দক্ষিণভারতে মাতৃপরিচায়ী যৌথ পরিবারও দেখতে পাওয়া যায়। মাতৃপরিচায়ী যৌথ পরিবারকে বলা হয় **'তারওয়াদ'** (Tarwad)। এ ধরনের পরিবার ত্রিবাঙ্কুরের নায়ারদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তারওয়াদের বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রথমত, তারওয়াদের সম্পত্তি যৌথ পরিবারের সকল নারী ও পুরুষের সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, অবিবাহিত পুত্রেরা মাতার তারওয়াদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিবাহিত পুত্রেরা স্ত্রীর তারওয়াদের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত, পরিবারের সর্বোজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্য তারওয়াদ সম্পত্তি দেখাশোনা করার অধিকারী। তাকে বলা হয় **'কর্ণাবন'** (Karnavan)। চতুর্থত, 'কর্ণাবন' সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকারী। তার মৃত্যুর পর পরবর্তী সর্বজোষ্ঠ ব্যক্তি **'কর্ণাবন'** হয়। পঞ্চমত, তারওয়াদ অতি বৃহৎ হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে **'তাবাজিস'** (Tavazis) তৈরী হয়। 'তাবাজিস' হ'ল সেই গোষ্ঠী যা পরিবারের নারীরা, তাদের সন্তান এবং বংশধরদের নিয়ে গঠিত হয়। ১৯১২ সালের আইন প্রণয়নের পরে অবশ্য তারওয়াদ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে এবং এই ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন এসেছে।

## ৭.৭.২ আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা

আত্মীয়-সম্পর্কের অন্যতম নিরূপক হ'ল আত্মীয়-সম্বোধনের ভাষা। উত্তরভারতের আমরা তাকে বর্ণনামূলক ভাষা বলতে পারি। কার্ভে এবং জি.এস. ঘুরে উত্তরভারতের আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। ইরাবতী কার্ভে আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার একটি তালিকা তৈরী করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, আত্মীয়-সম্পর্ক নিরুপণে ও নিয়ন্ত্রণে ভাষা কিভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরভারতের বিভিন্ন ভাষার আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে ঘুরে আত্মীয়-সম্পর্কের ঐহিত্যগত আইনগত দিকগুলি তুলে ধরেছেন।

উত্তর ভারতের আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে ভাষার মাধ্যমে আত্মীয়সম্পর্কের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সেইজন্য একে বর্ণনামূলক বলা হয়। ইংরাজী ভাষায় 'Uncle', 'aunty', 'cousin', grandfather' প্রভৃতি শব্দবন্ধ বয়স, পিতৃপরিচায়ী, মাতৃপরিচায়ী নিরপেক্ষ। কিন্তু উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তা ভাষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট। যেমন, খুড়তুতো ভাই, অর্থাৎ পিতার কনিষ্ঠতর ভ্রাতার পুত্র, অথবা, মামাতো বোন, অর্থাৎ মাতার ভ্রাতার কন্যা। আরও নির্দিষ্ট করে আত্মীয়-সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়, যেমন, বড়পিসী, মেজ জ্যেঠামশাই, ছোটমামা, রাঙা কাকা প্রভৃতি। এক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট হ'ল পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য উত্তরভারতে 'সহগামী' ও 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নীদের সম্বোধনে নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন, আপন ভ্রাতার পুত্রকে ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাইপো এবং কন্যাকে ভ্রাতুষ্পুত্রী বা ভাইঝি বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ভগ্নীর পুত্রকে ভাগ্নে এবং কন্যাকে ভাগ্নী বলে উল্লেখ করা হয়। ভাইপো এবং ভাইঝি ব্যক্তির (ego) একেই বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর সদস্য, আর ভাগ্নে এবং ভাগ্নী অন্য বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর সদস্য। উত্তর ভারতের আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ভাষার শব্দবন্ধ আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে আচরণবিধি নির্দেশসূচক। যেমন, 'দেওর-বৌদি' সম্বন্ধ

প্রীতি-পরিহাস সম্পর্ক নির্দেশক, 'ভাশুর-ভাদ্রবৌ' সম্বন্ধ দূরত্ব-সম্পর্ক বজায় রাখা নির্দেশ করে, 'শ্বশুর-পুত্রবধূ' সম্বন্ধ সম্ভ্রম নির্দেশক ইত্যাদি।

দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষাগুলি আত্মীয় সম্পর্কে বোঝাতে কিছু নির্দিষ্ট কাঠামোর নির্দিষ্ট শব্দবন্ধ ব্যবহার করে। ডুমন্টের (Dumont) মতে এর দু'টি বৈশিষ্ট্য আছে; যথা, (১) এখানে 'সহগামী' ও 'সঙ্কর' ভ্রাতা/ভগ্নীর মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং (২) এটি শ্রেণীভুক্তমূলক। এবার এ সম্বন্ধে ক্রমন্বয়ে আলোচনা করা যাক।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে 'সহগামী' শব্দটি সমলিঙ্গের ব্যক্তির সন্তানদের সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন, দুই ভ্রাতার সন্তানরা 'সহগামী' ভ্রাতা/ভগ্নী; অন্যদিকে দুই ভগ্নীর সন্তানরাও 'সহগামী'। আবার 'সঙ্কর' শব্দটি বিপরীত লিঙ্গের, অর্থাৎ ভ্রাতা ও ভগ্নীর সন্তানদের পরস্পরের সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতে এই দুই ধরনের সম্পর্কের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন করা হয়। কারণ 'সহগামী' ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ যেহেতু তারা একই বংশক্রমাগমের সদস্য। কিন্তু 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত। এই পার্থক্য নির্দেশ এতই সুচারু যে সংশয়ের কোনও অবকাশ নাই। তামিল ভাষায় সহগামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'আন্নান' (Annan) এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাম্বি (Tambi) বলে উল্লেখ করা হয় এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে আক্কা (Akka) ও কনিষ্ঠা ভগ্নীকে তাঙ্গাচি (Tangachi) বলে উল্লেখ করা হয়। 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নীরা ভ্রাতা-ভগ্নীরূপে স্বীকৃত নয়। সেক্ষেত্রে মামার পুত্র ও কন্যাকে যথাক্রমে মামা-মগন (Mama-magan) ও মামা-মগল (mama-magal) এং পিসীর পুত্র ও কন্যাকে যথাক্রমে অট্টাই-মগন (attai-magan) ও অট্টাই-মগল (attai-magal) বলে উল্লেখ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে আত্মীয়-সম্বোধনের ভাষার সঙ্গে বিবাহ-ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে। এটি নির্দিষ্ট করে দেয় কার সঙ্গে কার বিবাহ সম্ভব; অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির (ego) নিজ প্রজন্মের পুরুষরা হয় ভ্রাতা অথবা সম্ভাব্য শ্যালক এবং নারীরা হয় ভগ্নী অথবা সম্ভাব্য স্ত্রী।

'সহগামী' এবং 'সঙ্কর' আত্মীয়ের মধ্যে বিভাজনের সঙ্গে আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার শ্রেণীভুক্তকরন আলোচনা করলে দক্ষিণ ভারতের আত্মীয় সম্পর্কের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতে ব্যক্তির (ego) নিজ-প্রজন্মের সব ভ্রাতা ও ভগ্নী, 'সহগামী' ভ্রাতা-ভগ্নী এবং পিতার 'সহগামী ভ্রাতা-ভগ্নীর পুত্র/কন্যারা একটি শ্রেণীভুক্ত এবং 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নী এবং বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা অন্য শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীকে বলা হয় মামা-মচ্ছিনান (mama machchinan)। যারা এই দুই শ্রেণীর কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয় তারা আত্মীয় হিসেবে স্বীকৃতই নয়। তামিল ভাষায় প্রথমোক্ত শ্রেণীকে পঙ্গালি (Pangali) বলে উল্লেখ করা হয়, যার অর্থ হ'ল 'শরিক'। 'পঙ্গালি' শব্দটিকে আবার সাধারণভাবে অথবা নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে সেই শ্রেণীর ভ্রাতাদের বোঝায় যাদের যৌথ সম্পত্তিতে অধিকার নাই। এদের বলা হয় 'মুরেই' (muraei)। আর নির্দিষ্ট অর্থে 'পঙ্গালি' বলতে বোঝায় সেই শ্রেণীর ভ্রাতাদের যারা সম্পত্তির অংশীদার।

উপরোক্ত বিভাজন উর্দ্ধতন ও অধস্তন প্রজন্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উর্দ্ধতন প্রজন্মে একটি শ্রেণী পিতার সঙ্গে যুক্ত। যেমন পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যাদের যথাক্রমে চিত্তাপ্পা (chittapa) ও সিনাপ্পা (sinappa) বলে উল্লেখ করা হয় এবং মেসোমশাই, যাকে পেরিয়াপ্পা (Pereiyappa) বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে মামা (মামন বা manan) পিসেমশাই, শ্বশুর প্রভৃতি বৈবাহিক সম্পর্কে নিকটাত্মীয় অন্য শ্রেণীভুক্ত।

অধস্তন প্রজন্মের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তামিল ভাষায় কন্যাকে 'মগল' (magal) এবং পুত্রকে 'মগন' (magam) বলে উল্লেখ করা হয়। 'সহগামী' ভ্রাতা-ভগ্নীর সন্তানরাও ঐ একই সম্বোধনে ভূষিত হয়। অন্যদিকে

পুত্রবধূ, তামিলে যাকে বলাহয় 'মুরুমগল' (marumagal) এবং জামাতা, তামিল ভাষায় 'মুরুমগন' (murumagam), দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নীর সন্তানরাও এই শ্রেণীর কারণ তাদের সঙ্গে ব্যক্তির (ego) সন্তানদের বিবাহ সম্ভব।

আত্মীয়-সম্পর্কের এই শ্রেণীভুক্তিকরণ বৈবাহিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি 'ক' বাবু 'খ' বাবুর বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয় হয় এবং 'খ' বাবু 'গ' বাবুর বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয় হয় তাহলে 'ক' বাবু 'গ' বাবুর শ্রেণীভুক্ত ভ্রাতা বা 'মুরেই পাঙ্গালি' (murei pangali) হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক আত্মীয়কেই এই দুই শ্রেণীর কোনও একটি অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে।

দক্ষিণভারতে আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বয়স এবং লিঙ্গভিত্তিক আত্মীয় সম্পর্কের শ্রেণীবিভাজন। তামিল ভাষায় জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা/ভগ্নী এবং 'সহগামী' ভ্রাতা/ভগ্নীকে 'আন্নান' ও আক্কা বলে উল্লেখ করা হয় এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা/ভগ্নীকে যথাক্রমে 'তাম্বি' ও 'তাঙ্গাচি' বলা হয়। তেমনই, পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা/ভগ্নীকে যথাক্রমে 'পেরিয়াপ্পা' ও 'পেরিয়াম্মা' এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা/ভগ্নিকে 'চিত্তাপ্পা'ও 'সিনাপ্পা' বলে উল্লেখ করা হয়। লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণী বিভাজনে দেখা যায় পিতামহ/মাতামহ বা পৌত্র/দৌহিত্র সম্পর্ক কোনও বিভাজন করা হয় না। তামিলে পৌত্র/দৌহিত্র উভয়েই 'পেরান' (Peran) এবং পৌত্রী/দৌহিত্রী উভয়েই 'পেথি' (Peththi) বলে উল্লেখিত হয়। অন্যদিকে পিতামহ/মাতামহ 'তাতা' (tata) এবং পিতামহী/মাতামহীকে 'পত্তি' (patti) বলে উল্লেখ করা হয়।

সবশেষে একথা মনে রাখার দরকার যে, উপরে উল্লেখিত সাধারণ নিয়ম ব্যতীত অঞ্চলভেদে আত্মীয় সম্বোধনের ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান এবং সেগুলির ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার প্রভূত সুযোগ আছে।

## ৭.৭.৩ বিবাহ পদ্ধতি

প্রতিটি বিবাহের মাধ্যমেই নতুন আত্মীয়-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সুতরাং আত্মীয়তার বন্ধনের আলোচনায় বিবাহ সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতির আলোচনা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। উত্তরভারতে বিবাহের নীতি-পদ্ধতি নঞর্থকভাবে স্থিরীকৃত। অর্থাৎ, কার সঙ্গে কার বিবাহ অনুমোদিত নয় তার দ্বারা কার সঙ্গে কার বিবাহ সম্ভব স্থিরীকৃত হয়।

উত্তরভারতে কোনও ব্যক্তি তার বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করতে পারে না। এখানে শাস্ত্র অনুসারে ও হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে পিতৃকুলের পাঁচ প্রজন্ম এবং মাতৃকুলের তিন প্রজন্ম পর্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ। তার পরবর্তী প্রজন্মে বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী গোত্র-গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। গোত্র-গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু বাধানিষেধ আছে। ইরাবতী কার্ভে দেখিয়েছেন যে, উত্তর-ভারতে চার গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিয়মানুসারে কোনও ব্যক্তি তার পিতার গোত্র, মাতার গোত্র, পিতার মাতার গোত্র এবং মাতার মাতার গোত্রে কোনও কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না। এর অর্থ হ'ল সগোত্রের বাইরেও গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত। উত্তর ভারতে আর একটি বিবাহ পদ্ধতি হ'ল গ্রাম বহির্ভূত বিবাহ পদ্ধতি। একটি গ্রামে সাধারণত এক বা দুই বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করে। একই গ্রামের মধ্যে বসবাসকারী পাত্র ও পাত্রী ভ্রাতা ও ভগ্নী হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং, তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

উত্তরভারতে বিবাহ-পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল জাত ও অবর-জাতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মর্যাদার তারতম্য। স্থানীয় ভাষায় একে **'বিরাদরি'** (Biradari), **খানদান** (Khandan) বা **ভাই-বন্ধ** (Bhai-bandh) ইত্যাদি বলে বর্ণনা

করা হয়। এগুলি গোষ্ঠীর বা গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারের মর্যাদাসূচক। দেখা যায় যে, সাধারণত, নিম্নমর্যাদাসম্পন্ন কন্যার পরিবারের সঙ্গে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পাত্রের বিবাহ হয়। উত্তরপ্রদেশের সরযূপুরী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা বহুল প্রচলিত। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই উত্তরভারতে পিসীর কন্যাকে বিবাহ নিষিদ্ধ। এরই সঙ্গে আরও একটি নিয়ম প্রচলিত। সেটি হ'ল যে ব্যক্তির পিসীর যে পরিবারের বিবাহ হয়েছে তার ভগ্নীর সেই পরিবারে বিবাহ দেওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে মাতার দিক দিয়ে 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ, নিষিদ্ধ। উত্তরভারতে বিবাহ-পদ্ধতির কাঠামোর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মদন (T. N. Madan) বিবাহদানেচ্ছু পরিবারগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণী পরস্পর কন্যাদান এবং কন্যাগ্রহণ করে। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণীতে কন্যাদান করে এবং তৃতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণী থেকে কন্যা গ্রহণ করে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে তারতম্য আছে। উচ্চস্তরে কন্যাদান করে পাত্রীপক্ষ সমাজে মর্যাদা লাভ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে কন্যাপক্ষ পাত্রপক্ষকে 'বরপণ' দিয়ে সমাজে ও গোষ্ঠীতে ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জন করে।

যে ক্ষেত্রে উত্তরভারতে বিবাহ-পদ্ধতি নঞর্থক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে দক্ষিণভারতে বিবাহ-পদ্ধতি সদর্থকভাবে স্পষ্ট করে স্থিরীকৃত। অর্থাৎ, এখানে কার সঙ্গে কার বিবাহ সম্ভব এবং কোন্ ক্ষেত্রে বিবাহ প্রাধিকারমূলক তা নির্দিষ্ট। প্রাধিকারমূলক বিবাহ-পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) দক্ষিণ ভারতে অনেক জাতের মধ্যেই ব্যক্তির জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর কন্যার সঙ্গে বিবাহে প্রাধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য নায়ারদের মত মাতৃপরিচায়ী গোষ্ঠীতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। (২) দ্বিতীয় প্রাধিকারমূলক বিবাহ পদ্ধতি হ'ল পিতার ভগ্নীর কন্যার সঙ্গে বিবাহ এই ক্ষেত্রে কন্যাদানকারী পরিবার পরিবর্তে কন্যাগ্রহণে রাজী থাকে বা আশা করে। অবশ্য তার জন্য দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির পরিবর্ত বলা যেতে পারে। তামিলনাড়ুর কল্লার (Kallar), কর্ণাটকে হবিক ব্রাহ্মণ (Habik Brahman), অন্ধ্রের রেড্ডি গোষ্ঠীর মধ্যে এই ব্যবস্থাই একমাত্র অনুমোদিত। এই ব্যবস্থায় পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে কিছুটা মর্যাদার তারতম্য থাকে। যখন এক পরিবারের ভ্রাতা-ভগ্নীর সঙ্গে অপর পরিবারের ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ হয় তখন তাদের সন্তানেরা 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নী হিসেবে বিবেচিত হয় ফলে তাদের মধ্যে বিবাহে কোনও বাধা থাকে না এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাধিকারমূলক বিবাহ-পদ্ধতির প্রয়োগের প্রশ্ন থাকে না।

উপরোক্ত বিবাহ-পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দক্ষিণভারতে আত্মীয়-সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা আছে। বিবাহ মোটামুটিভাবে প্রাথমিক পরিবারের বাইরে আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ধরনের বিবাহের উদ্দেশ্য হ'ল আত্মীয়তার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করা। সুতরাং, এই ধরনের বিবাহে মাতামহী ও শ্বশ্রূমাতা একই ব্যক্তি হয় নারীর ক্ষেত্রে। আবার যদি কন্যার মাতার ভ্রাতার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয় তাহলে মাতামহী ও স্বামীর পিতামহী একই ব্যক্তি হয়। এই ধরনের বিবাহ আরও প্রমাণ করে যে, দক্ষিণ ভারতে গ্রাম বহির্ভূত বিবাহ-পদ্ধতির অস্তিত্ব নাই। বৈবাহিকসূত্র সম্পর্কিত আত্মীয়রা একই গ্রামে বসবাস করে এবং পরস্পরকে সামাজিকভাবে সহায়তা করে ও মেলামেশা করে—উত্তরভারতে একটি দুর্লক্ষ্যণীয়।

অবশ্য দক্ষিণ ভারতেও কোনও কোনও সম্পর্কের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে। যেমন, কোনও জাতের মধ্যে নিয়ম আছে যে, ব্যক্তির জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর কন্যার সঙ্গে বিবাহ অনুমোদিত, কিন্তু কনিষ্ঠা ভগ্নীর কন্যার সঙ্গে বিবাহ অনুমোদিত নয়। কোনও বিধবা তার মৃত স্বামীর জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করতে পারবে না; এবং অবশ্যই কোনও ব্যক্তি তার নিজ পরিবারের মধ্যে অথবা নিজ বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করতে পারবে না।

## ৭.৪.৪ আনুষ্ঠানিক উপহার বিনিময়

পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উপহার প্রদান ও গ্রহণ আত্মীয়-সম্পর্কের গভীরতা ও ধারা নির্দেশ করে। উত্তরভারতে সাধারণত কন্যাপক্ষ তাদের অপেক্ষাকৃত নিম্ন মর্যাদার কারণে উপহার প্রদান শুরু করে। এই উপহার প্রদান শুরু বিবাহের সময় এবং তৎপরবর্তীকালে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপহার দান করা হ'তে থাকে। বাংলায় দেখা যায় যে, বিবাহের সময় 'গায়ে হলুদের তত্ত্ব', বৌভাতের তত্ত্ব', 'ফুলশয্যার তত্ত্ব' প্রভৃতি নামে কন্যাপক্ষ পাত্রপক্ষকে উপহার প্রদান করে। বিবাহ পরবর্তীকালে এই উপহার প্রদান চলতে থাকে; যেমন, 'পূজার তত্ত্ব', 'জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব' প্রভৃতি। পাত্রপক্ষের তরফেও বিবাহের সময় 'গায়ে হলুদের তত্ত্ব' পাঠানো হয়, কিংবা 'বাসরশয্যা তোলার জন্য' শ্যালিকা প্রভৃতিকে মিষ্টিমুখ করার জন্য অর্থ দেওয়া হয়। তবে সবক্ষেত্রেই উপহার প্রদানের ভার বা দায় কন্যাপক্ষকেই বেশী বহন করতে হয়। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, উপহার প্রদান বা গ্রহণ একটি সমাজ স্বীকৃতি প্রথা।

আবার ডুমন্ট দেখিয়েছেন যে, উপহার বিনিময় প্রথায় মামার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মেয়ার (Mayer) মালবের গ্রামে উপহার বিনিময় প্রথার আলোচনায় বলেছেন যে মামার দেওয়া উপহারকে বলা হয় **'মামেরা'** (mamera)। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মামা ভগ্নীর সন্তানদের উপহার দিয়ে থাকে। শুধু আনন্দানুষ্ঠানেই নয় শোকের অনুষ্ঠানেও আত্মীয়দের ভূমিকা থাকে। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় শ্রাদ্ধাধিকারীকে পাগড়ী বাঁধার অধিকার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ জামাতার। আবার **'শয্যাদান'** অনুষ্ঠানে শয্যাগ্রহণ করার অধিকার জামাতার। যেহেতু মর্যাদায় পাত্রপক্ষ উচ্চতর সেহেতু এই অধিকার জামাতার। বাংলাতেও কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামীকে (জামাতাকে) সম্মান হিসেবে উপহার দেওয়া প্রচলিত আছে। এই ধরনের একপক্ষীয় উপহার দান প্রথা উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশেও প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থাগুলি উত্তরভারতে আত্মীয় সম্পর্কের দ্যোতক।

দক্ষিণভারতে উপহার বিনিময়প্রথাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) বৈবাহিক সম্পর্কের সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে উপহার বিনিময় (২) নিজ পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে উপহার বিনিময়। কখনও কখনও ব্যক্তি উভয় দিক থেকেই উপহার পেয়ে থাকে। আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে বিবাহের কারণ ব্যক্তি একই সঙ্গে উপহার দাতা ও গ্রহীতার ভূমিকায় অবস্থান করে। তামিলনাড়ুর প্রমালাই কাল্লারদের উপহার বিনিময় প্রথার আলোচনার সময় ডুমন্ট দেখিয়েছেন যে, পাত্রের পিতা কন্যার পিতাকে কিছু অর্থ-উপহার দেয়। তাকে বলা হয় **'পরিসম্'** (Parisam)। কন্যার পিতা তার দ্বিগুণ অর্থ-তার সঙ্গে যোগ করে কন্যাকে অলঙ্কার তৈরী করে উপহার দেয়। এই প্রথা বিবাহের পর অন্তত তিন বৎসরকাল প্রচলিত থাকে। এক্ষেত্রেও উপহার বিনিময় হ'লেও কন্যার পিতাকে অধিকতর দায় বহন করতে হয়। আবার সন্তান জন্মের পর আর এক দফা উপহার প্রদান হয়। আবার বিবাহের পর নবদম্পতি যখন নূতন সংসার পাতে তখন নূতন সংসারের সমস্ত তৈজসপত্র কন্যার পিতা কন্যাকে দান করে। তাকে বলা হয় **'ভেরে পোনাসির'** (Vere Pona Sir)। এর অর্থ হ'ল পৃথক হওয়ার জন্য উপহার। অপেক্ষাকৃত কম হ'লেও দক্ষিণ ভারতে পাত্রপক্ষের কন্যাপক্ষকে উপহার দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

আবার বিবাহকালে পাত্রপক্ষের বাড়ীতে এবং কন্যাপক্ষের বাড়ীতেও উপস্থিত আত্মীয়দের কাছ থেকে অর্থ উপহার গ্রহণ করা হয়। তাকে বলা হয় **'ময়'** (moy)। কোনও একজন ব্যক্তি এই অর্থ-উপহারদাতার নাম ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে। এই উপহার প্রদানের মধ্যে পারস্পরিকতা বর্তমান। ভবিষ্যতে অর্থ-উপহার বা 'ময়' পাবার আশায় অথবা 'ময়' প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে অর্থ উপহার দেওয়া হয়। প্রমালাই কাল্লারদের মধ্যে অর্থ উপহার দেওয়ার প্রথম অধিকার মামার। সাধারণত সংগৃহীত অর্থ বিবাহের ভোজে ব্যয়িত হয়।

অন্তঃগোষ্ঠী উপহার প্রদান ব্যবস্থায় মামার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান জন্মের পর মামা বিভিন্ন সময়ে ভগ্নীর সন্তানকে উপহার দিয়ে থাকে। প্রমালাই কাল্লারদের মধ্যে প্রথা হ'ল যে মামা ভগ্নীর সন্তান জন্মের পর তাকে জমি বা অর্থ উপহার দেবে। এই উপহার দান প্রথা কন্যাপক্ষের পাত্রপক্ষের প্রতি উপহারদানের দায়বদ্ধতা নির্দেশ করে।

সব শেষে বলা যায় যে, দক্ষিণভারতে আনুষ্ঠানিক উপহার দানের প্রথার মধ্যে স্বল্প হ'লেও পারস্পরিকতা বর্তমান। উত্তরভারতে তা কেবল একপক্ষীয়।

## ৭.৭.৫ পূর্বাঞ্চলে আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যবস্থা

ভারতের পূর্বাঞ্চলে বর্ণহিন্দু অপেক্ষা উপজাতীয়র সংখ্যা বেশী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপজাতি হ'ল গারো, খাসি, সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি। এই উপজাতীয়রা প্রধানত বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কোনও কোনও অঞ্চলে এবং মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় বসবাস করে। এদের আত্মীয়তার বন্ধন ব্যবস্থার মধ্যে কোন্য ঐক্য নাই। মুন্ডারী ভাষাভাষী লোকেরা পিতৃপরিচায়ী ও পতি-আবাসিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে। অন্যদিকে গারো এবং খাসিদের মধ্যে মাতৃপরিচায়ী ও পত্নী-আবাসিক ব্যবস্থা প্রচলিত। আমরা এখানে পূর্বাঞ্চলের এই মাতৃপরিচায়ী দুই উপজাতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে পারি।

**(ক) গারো ঃ** গারোরা মূলত মেঘালয় রাজ্যে বসবাস করে। গারোদের মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় সংসার নারী-নিয়ন্ত্রিত। মাতা, তার কন্যা এবং জামাতাকে নিয়ে একটি সংসার (household) গঠিত হয়। কন্যার স্বামী, যাকে বলা হয় **'নোক্‌মা'** (nokma), সংসারের ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। অবিবাহিত পুত্র-কন্যারা মাতার সংসারে বাস করে। একজন ব্যতীত অন্যান্য বিবাহিতা কন্যারা নিজস্ব সংসারে বাস করে। এই মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থাকে গারো ভাষায় বলা হয় **'মাচং'** (machong)। 'মাচং' এর সদস্যরা কোনও এক আদি মাতার সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়। বংশক্রমাগম এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। কিন্তু সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রনের ভার পুরুষের হাতেই ন্যস্ত থাকে।

গারোরা দু'টি সম্পৃক্ত বহু-জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। (Phartries)। তাদের নাম হচ্ছে **'মারাক'** (marak) এবং **'সাংমা'** (Sangma)। এদের মধ্যে কোনও আন্তঃবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। বিবাদ-মীমাংসা আত্মীয়-গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পাদিত হয়। মোড়ল বা 'নোক্‌মা' এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

বিবাহের পর আবাসন ব্যবস্থা পত্নী-আবাসিক। বিবাহের পর জামাতা শ্বশুরবাড়ীতে বসবাস করে এবং শ্বশুরের 'নোক্‌রম' (nokrom) হিসেবে পরিচিত হয়। শ্বশুরের মৃত্যুর পর 'নোক্‌রম' শাশুড়ীকে বিবাহ করে এবং মাতা ও কন্যা উভয়েরই স্বামী হিসেবে পরিচিত হয়। তবে শাশুড়ীকে বিবাহ নিতান্তই একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কারণ শ্বশুরের মৃত্যুর পর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জামাতার। কন্যার বিবাহের পূর্বে স্বামীর মৃত্যু হ'লে মৃত স্বামীর পরিবারের অনুমতি ব্যতীত পুনর্বিবাহ করা যায় না। সম্পত্তি 'মাচং' এর বাইরে হস্তান্তরিত করা যায় না। তা মাতার থেকে কন্যায় বর্তায়। পরিবারের কিছু পুরুষ সদস্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভগ্নীর পরিবারে বাস করে এবং দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে। তাকে বলা হয় **'নোক্‌পান'** (nokpan)। এই ব্যবস্থায় মামার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভগ্নীর সন্তানদের উপর তার প্রভাব অসীম। গারো সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ দুর্লভ। তবে ব্যভিচারের ফলে কখনও কখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

**(খ) খাসি ঃ** গারোদের মতো খাসিরাও মাতৃপরিচায়ী উপজাতি। তারা মাতৃপরিচায়ী বংশক্রমাগত অনুসরণ করে। উত্তরাধিকার মাতার থেকে কন্যায় বর্তায়। আবাসন ব্যবস্থা পত্নী-আবাসিক। খাসিদের মধ্যে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত। খাসিদের আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা শ্রেণীভুক্ত। তারা বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর আত্মীয়দের এবং 'সহগামী', আত্মীয়দের একই শব্দবন্ধে সম্বোধন করে। খাসি নিয়মানুসারে মাতার দিকের 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহ অনুমোদিত। তবে বৈধব্যের পর স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ (Levirate) বা স্ত্রী মৃত্যুর পর স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ (Sororate) অননুমোদিত। এদের মধ্যে বহুপত্নীকত্ব ও বহুভর্তৃকত্ব ও অনুলোম/প্রতিলোম বিবাহ অপ্রচলিত। তবে রক্ষিতা রাখার প্রচলন আছে। রক্ষিতার সন্তানেরা তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, যদি সে কোনও সম্পত্তির অধিকারী হয়। খাসি সমাজে পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় (Ultimogeniture) সে পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে এবং পূর্বপুরুষের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে। কনিষ্ঠা কন্যা সম্পত্তির অধিকাংশের উত্তরাধিকারিণী হয়। অন্যান্য কন্যারা মাতার মৃত্যুর পর কিছু পরিমাণ সম্পত্তি লাভ করে। বিবাহিতা কন্যারা সন্তান জন্মের পর নিজের সংসার স্থাপন করে। খাসিদের মধ্যে আদর্শ পরিবার হ'ল বৃদ্ধা মাতা, তার কন্যা এবং তার সন্তানরা। স্বামী অথবা ভ্রাতা ঐ পরিবারের অন্তভূক্ত।

## ৭.৮ সারাংশ

আত্মীয়তার সম্পর্ক বলতে রক্তের মাধ্যমে অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট বন্ধনকে বোঝায়। আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে আচরণবিধি সুনির্দিষ্ট। শিশুর সামাজিকীকরণে আত্মীয়দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয়তার বন্ধন সব দেশ ও কালেই দেখা যায়, তবে দেশ, কাল, সমাজ ও অঞ্চলভেদে তার কিছু বৈচিত্র্য আছে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। জৈবিক সম্পর্কের চেয়ে সামাজিক স্বীকৃতি আত্মীয়তার বন্ধনের মূল ভিত্তি।

ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুসারে আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে স্তরভেদ আছে, যথা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, নিকটাত্মীয়, তৃতীয় স্তরের আত্মীয় এবং দুরসম্পর্কের আত্মীয়। যে নীতির মাধ্যমে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে আত্মীয় নির্ধারিত হয় তাকে বলে বংশক্রমাগমের নীতি এবং এই গোষ্ঠীকে বলে বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী। উর্দ্ধতন প্রজন্ম থেকে নিম্নতর প্রজন্মের বংশক্রমাগমের ছয়টি ধারা আছে। বংশক্রমাগমের ধারার মধ্যে এক যৌথ চেতনাকাজ করে। অবশ্য আত্মীয়-সম্পর্ক শুধু রক্তের সম্পর্কভিত্তিক নয়, বৈবাহিক সম্পর্কভিত্তিকও বটে। বংশধারা বলতে প্রজন্মের নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশকে বোঝায়। তবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মস্তরে তা বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। বংশধারার ইতিবৃত্ত নির্দিষ্ট কিন্তু গোত্র অনির্দিষ্ট। একই গোত্রভূক্ত ব্যক্তিরা কোনও অনির্দিষ্ট পূর্বপুরুষের বংশধর বলে নিজেদের মনে করে। গোত্রগোষ্ঠীকে এক অর্থে সম্প্রসারিত বংশধারা বলা যেতে পারে। পৃথিবীর সব দেশে ও কালে এর অস্তিত্ব বর্তমান। সম্পৃক্ত বহুজন গোষ্ঠী বলতে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মিলিত দুই বা ততোধিক গোত্র-গোষ্ঠীকে বোঝায়। আর কোনও উপজাতি যখন দু'টি সহযোগী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় তখন তাকে অর্দ্ধজনগোষ্ঠী বলে।

আত্মীয়-সম্পর্কের আকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আত্মীয়-সম্বোধনের ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্বোধনের ভাষা দু'প্রকার হয়—সম্বোধনের ভাষা ও সম্পর্ক উল্লেখের ভাষা।

বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর কতকগুলি নীতিভিত্তিক নির্দিষ্ট কার্যধারা আছে। প্রথমত বিবাহের নিয়মাবলীর মাধ্যমে বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধই আরোপ করে। দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকারের পদ্ধতির দ্বারা

সম্পত্তির অধিকারীত্ব স্থির হয়। তৃতীয়ত, বিবাহের পর আবাসন পতি-আবাসিক বা পত্নী-আবাসিক হ'তে পারে। চতুর্থত, বংশক্রমাগম পিতৃপরিচায়ী বা মাতৃপরিচায়ী হ'তে পারে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও আত্মীয়তার বন্ধন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভারতের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে আত্মীয়তার বন্ধনের প্রকৃতিও বিচিত্র। উত্তরভারত, দক্ষিণ ভারত ও পূর্বাঞ্চলে এ বিষয়ে পার্থক্য আছে। উত্তরভারতের আত্মীয়তার বন্ধন পিতৃপরিচায়ী, বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা ও বিবাদ-কলহ উভয়ই বর্তমান। দক্ষিণ ভারতেও প্রধান পিতৃপরিচায়ী, পাত-আবাসিক ব্যবস্থা প্রচলিত। তবে কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃপরিচায়ী, পত্নী-আবাসিক ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তরভারতে ভাষা ব্যবহার নির্দিষ্ট, বর্ণনামূলক এবং আচরণবিধি নির্দেশক। দক্ষিণভারতে আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা ব্যবহারের সময় 'সহগামী' ও 'সঙ্কর' ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এখানে ভাষা শ্রেণীভুক্তমূলকও বটে। শ্রেণী বিভাজন শুধু ব্যক্তির নিজ প্রজন্মের আত্মীয়দের মধ্যেই নয় উর্দ্ধতন এবং অধস্তন প্রজন্মের এমনকি বৈবাহিক ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। আত্মীয় সম্পর্কের বয়সও লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন দক্ষিণ ভারতের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

বিবাহের ক্ষেত্রে উত্তরভারতে বিবাহ-পদ্ধতি নঞর্থকভাবে স্থিরীকৃত। কার সঙ্গে কার বিবাহ সম্ভব নয় তার দ্বারা কার সঙ্গে কার বিবাহ সম্ভব স্থিরীকৃত হয়। উত্তরভারতে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত। কন্যাপক্ষের চেয়ে পাত্রপক্ষ মর্যাদার উচ্চতর বলে মনে করা হয়। দক্ষিণভারতে বিবাহ পদ্ধতি সদর্থকভাবে স্থিরীকৃত হয়। এখানে তিনটি প্রাধিকারমূলক বিবাহ ব্যবস্থা অনুমোদিত। দক্ষিণ ভারতে বিবাহ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হ'ল মোটামুটিভাবে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থা আবদ্ধ রেখে আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করা।

আনুষ্ঠানিক উপহার বিনিময় প্রথা আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। উত্তরভারতে প্রধানত, কন্যাপক্ষ পাত্র পক্ষকে বিবাহকালে এবং বিবাহপরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে উপহার প্রদান করে। এই ব্যবস্থা প্রধানত একপক্ষীয়। দক্ষিণভারতে উপহার বিনিময় প্রথাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে উপহার বিনিময় এবং নিজ পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে উপহার বিনিময়। এখানে উপহার বিনিময় প্রথা মোটামুটিভাবে উভয়পক্ষীয়। দক্ষিণভারতে উপহার প্রদান ব্যবস্থায় মামার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে-উপজাতীয় মানুষের সংখ্যা বেশী এবং বহুধরনের উপজাতি এখানে বাস করে। এদের আত্মীয়তার বন্ধন-ব্যবস্থার মধ্যে কোনও ঐক্য নাই। কোনও কোন উপজাতি পিতৃপরিচায়ী ও পতি-আবাসিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে। আবার কোনও কোনও উপজাতির মধ্যে মাতৃপরিচায়ী ও পত্নী-আবাসিক ব্যবস্থা প্রচলিত। এদের মধ্যে গারো এবং খাসি উপজাতি প্রধান। গারো এবং খাসিদের মাতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় মাতা, কন্যা, তার সন্তানেরা এবং কন্যার, পিতা, স্বামী অথবা ভ্রাতা সংসার স্থাপন করে। পরিবারের পুরুষের ভূমিকা শুধু সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের। সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতার থেকে কন্যায় বর্তায়। এদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ দুর্লভ।

## ৭.৯ অনুশীলনী

১। আত্মীয়তার বন্ধন কাকে বলে?

২। বংশক্রমাগমের নীতি বলতে কি বোঝায়? বংশক্রমাগমের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

৩। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে আত্মীয়-গোষ্ঠীর সম্পর্কের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করুন।

৪। ভারতের পূর্বাঞ্চলে গারোদের পরিবার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৫। টিকা লিখুন ঃ

(ক) উত্তর ভারতে আত্মীয় সম্বোধনের ভাষা

(খ) পিতৃ পরিচায়ী ব্যবস্থা

(গ) বংশধারা

(ঘ) গোত্র

(ঙ) দক্ষিণ ভারতে বিবাহ-পদ্ধতি

৬। নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ঠিক কিংবা ভুল নির্দেশ করুন

(ক) পিতামহ মাতামহী প্রভৃতি আত্মীয় সম্পর্কের তৃতীয় স্তরভুক্ত। (ঠিক/ভুল)।

(খ) বংশক্রমাগমের মোটামুটিভাবে ছয়টি ধারা আছে (ঠিক/ভুল)।

(গ) পিতৃপরিচায়ী ব্যবস্থায় মাতামহ, মাতাবহী, মামা প্রভৃতির ব্যক্তির উপর কোনও প্রভাব নাই (ঠিক/ভুল)।

(ঘ) 'কুটুম' বলতে মাতৃপরিচায়ী, পত্নী-আবাসিক, গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ বোঝায় (ঠিক/ভুল)।

(ঙ) উত্তর ভারতে দেওর বৌদি সম্পর্ক, দূরত্ব-সম্পর্ক বজায় রাখা নির্দেশ করে (ঠিক/ভুল)।

(চ) তামিল ভাষায় সহগামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'আন্নান' বলে। (ঠিক/ভুল)।

(ছ) হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে পিতৃকুলের পাঁচ প্রজন্ম এবং মাতৃকুলের তিন প্রজন্ম পর্য্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ (ঠিক/ভুল)।

(জ) 'ভেরে পোনা সির' কথাটির অর্থ হ'ল, পৃথক হওয়ার জন্য উপহার (ঠিক/ভুল)।

## ৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Irawati Karve : Kinship organisation in India, Asia, Publishing House, Bombay 1965

২। Ram Ahuja : Indian Social System, Rawat Publications, Jaipur, 1993.

৩। Leela Dube : sociology of Kinship, Popular Prakashan, Bombay, 1974.

# একক-৮ ❑ ভারতের সামাজিক স্তরবিন্যাস

গঠন :

৮.১ উদ্দেশ্য
৮.২ প্রস্তাবনা
৮.৩ ভারতের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগ
৮.৪ ভারতের জাতপাতের বৈশিষ্ট্য
৮.৫ জাত-পাত ও বর্ণ
৮.৫.১ বর্ণের উৎপত্তি
৮.৫.২ বর্ণ ও জাতপাতের সম্পর্ক
৮.৫.৩ যজমানি ব্যবস্থা
৮.৫.৪ জাত ও অবর-জাত
৮.৬ তপশিলী জাত
৮.৬.১ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন
৮.৬.২ বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থা
৮.৬.৩ বাস্তব পরিস্থিতি
৮.৭ প্রভাবশালী জাত
৮.৭.১ প্রভাবশালী জাতের কাজ
৮.৮ জাত-সচলতা
৮.৯ জাতপাত ও রাজনীতি
৮.৯.১ জাতপাতের রাজনীতি ঃ ইংরেজ শাসনের ফল
৮.৯.২ জাতপাতের রাজনীতির প্রক্রিয়া
৮.১০ আধুনিক ভারতের শ্রেণী ব্যবস্থা
৮.১০.১ ভারতের শ্রেণী কাঠামো
৮.১১ অনগ্রসর শ্রেণী
৮.১২ সারাংশ
৮.১৩ অনুশীলনী
৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

## ৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি

- ভারতের সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারবেন ;
- জাতপাত ও শ্রেণী ভারতীয় সমাজে কি ভূমিকা পালন করে তা বুঝতে পারবেন ;

● অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থান কোথায় তা জানতে পারবেন।

## ৮.২ প্রস্তাবনা

মানব সমাজের আদিকাল হ'তে সামাজিক স্তরবিন্যাস রয়েছে। প্রথম দিকে মানুষকে বয়স ও লিঙ্গের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ করা হ'ত। পরে, সভ্য সমাজে, মানুষ আরো জটিল ধরনের স্তরবিন্যাস করল, যার মূল ভিত্তি হ'ল অর্থনৈতিক বৈষম্য। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন রকম স্তরের জন্ম দিল। আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তা, হ'লে দেখব যে, বিভিন্ন ধরনের স্তরবিন্যাস মানব সমাজে ছিল। প্রাচীন সমাজে ছিল ক্রিতদাস প্রথা। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে যে ত্রিমাত্রিক স্তরবিন্যাস ছিল তাকে estate system বলা হয়। আধুনিক সমাজে আমরা মূলত দু'টি শ্রেণী পাই, পুঁজিপতি শ্রেণী, যাদের মধ্যে রয়েছে বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী আর শ্রমিক শ্রেণী। সব সমাজে, এমনকি আধুনিক ভারতে এই দুই শ্রেণী মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এবার আসুন, আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপ নিয়ে আলোচনা করি। এই আলোচনায় আমরা আধুনিক ভারতে সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

## ৮.৩ ভারতের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে যে কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে কতকগুলি ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ যেখানে ক্ষমতা, সম্পদ, সামাজিক মূল্যায়ন এবং মানসিক সন্তোষের ব্যাপারে অসম বন্টন রয়েছে।

আমরা সামাজিক স্তরবিন্যসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

১) এটা সামাজিক, অর্থাৎ এখানে আমরা প্রাকৃতিক অসমতার কথা বলছি না। সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া অসাম্যের কথা বলছি।

২) এটা প্রাচীন। সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সমস্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে পাওয়া যেত।

৩) এটি সর্বব্যাপী। সমস্ত দেশে সামাজিক অসাম্য লক্ষ্য করা যায়।

৪) এর নানা রূপ রয়েছে।

৫) এটি জীবনের সমস্ত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের অসম বন্টনের ফল। এখানে আমরা জীবন ধারণের সুযোগ (life chances) এবং জীবন রীতির (life style) তারতম্য দেখতে পাই।

জীবন ধারণের সুযোগের অর্থ হ'ল মৃত্যুর হার, বাঁচার হার, দৈহিক ও মানসিক রোগ, সন্তানহীনতা, দাম্পত্য কলহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ।

জীন রীতির অর্থ হ'ল কোন্ ধরনের বাড়িতে এবং পল্লীতে একজন থাকবে, কি ধরনের বিনোদন একজন উপভোগ করবে, সন্তানদের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক কিরকম ইত্যাদি।

আধুনিক ভারতে সামাজিক স্তরবিন্যাস মূলত দু'টি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। প্রথমত, জাতপাত প্রথা-যা ভারতীয় সমাজে আদিকাল থেকে আছে এবং সমস্ত ভারতীয়দের, বিশেষ করে হিন্দুদের, চেতনায় রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ আধিপত্যের সময় থেকে গড়ে ওঠে একটা নতুন সামাজিক বিজ্ঞান যা আমরা শ্রেণী ব্যবস্থা বলি।

ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা বৈদিক যুগ বা তারও আগে থেকে ভারতের সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমান ভারতে একমাত্র হিন্দুরা জাতপাত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। Anthropological Survey of India-র মতে, ভারতে ৭,৩০০ জাতপাত রয়েছে। এই জাতগুলি মূলত চারটি বর্ণে বিভক্ত-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর পর অন্য কোনও লোকগণনায় ভারতের জাতপাত গণনা হয় নি। কিন্তু ১৯৫১ সাল থেকে তপসিলী জাতের লোকসংখ্যা গণনা হ'তে থাকে।

২০০১ সালের লোকগণনায় বিভিন্ন জাতের লোকসংখ্যার গণনা হবে না। সামাজিক কল্যাণ মন্ত্রক এই গণনা চাইলেও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক-এর বিরোধীতা করছে এই আশঙ্কায়, যে এতে সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে।

(২) আমরা দেখেছি যে, আদিকাল থেকে ভারতে জাতপাত ব্যবস্থা নামক একটি স্তরবিন্যাস রয়েছে। কিন্তু এটি শুধুমাত্র সনাতন হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আধুনিক ভারতে এটা নতুন ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে যা ইংরেজ আমলে গোড়াপত্তন হয়। সেটা হ'ল শ্রেণী। আধুনিক সমাজ, সব দেশেই, যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, চিন বা অস্ট্রেলিয়ায়, শ্রেণী বিভক্ত। এর মূল ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক, বিশেষত উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা। যারা উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক, তাদের বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণী বলা হয়। বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যারা কৃষির জমির মালিক তারা কৃষকশ্রেণীর মধ্যে পড়ে, যেমন পড়ে ভাগচাষী ও ক্ষুদ্রচাষী। যারা কারখানায় কাজ করে দৈনিক বেতনের উপর নির্ভর করে তারা শিল্প শ্রমিক এবং কৃষি ক্ষেত্রে যারা দিন মজুর তারা গ্রামীণ সমাজের ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নানা ধরনের পেশার মানুষ দেখা যায়। ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক থেকে শুরু করে করণিক, ছাত্র, অধ্যাপক, ইত্যাদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এরা শ্রমিক বা ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর মতো কারখানায় বা মাঠে কায়িক শ্রম করে না। এরা বৌদ্ধিক শ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে। আধুনিক ভারতে এদের প্রত্যেকের একটি ভূমিকা রয়েছে।

**অনুশীলনী-১**

১) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সামাজিক স্তরবিন্যাসে পাওয়া যাবে না?

১) ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ।

২) অর্থনৈতিক বৈষম্য।

৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য।

৪) কোনটাই নয়।

২) নিম্নলিখিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে কোন্ রূপটি শুধুমাত্র ভারতে পাওয়া যায়?

১) শ্রেণী ব্যবস্থা।

২) বর্ণ বৈষম্য।

৩) জাত ব্যবস্থা।

৪) কোনটাই নয়।

৩) আধুনিক ভারতে কী কী ধরণের সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়?

## ৮.৪ ভারতের জাতপাতের বৈশিষ্ট্য

ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হয়। এই ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে দুবে বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজের বিভাজন ও উপবিভাজন জটিল এবং বিভ্রান্তিকর। এগুলি বেশি সরলীকরণ করতে গেলে সামাজিক বাস্তবতার বিকৃতি ঘটবে। ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ এবং সামাজিক নিয়মাবলী সমাজ ব্যবস্থার একটি ছক দিয়েছে। কিন্তু এগুলো থেকে যা হওয়া উচিত তা পাওয়া যায়, যা আসলে আছে সে সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না।

তবুও ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা থেকে এতই আলাদা এবং স্বতন্ত্র যে অনেক বিদেশী এই ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেছেন। জাতপাত ব্যবস্থা সর্ম্পকে আলোচনা আদিকালে গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনীসের ''ইন্ডিকা'' গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই থেকে অনেক বেশী পর্যটক ও পণ্ডিত জাতপাত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু কেউ এর বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। মেগাস্থিনীসের মতে, দুই জাতের মধে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং (একমাত্র দার্শনিক জাত ছাড়া) বৃত্তি পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ। সমাজতত্ত্ববিদ, ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, জাতি হচ্ছে একটি পদমর্যাদা গোষ্ঠী (Status group)। শুধু তাই নয়, হ্বেবারের মতে, জাতগোষ্ঠী হচ্ছে সেই নৃকুল সম্প্রদায় যা সামাজিকভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। এরা রক্তের সম্পর্কে বিশ্বাস করে এবং গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ ও সামাজিক মেলামেশা বর্জন করে।

এই দু'টি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা সম্পর্কে পাশ্চাত্য পর্যটক বা পণ্ডিতদের সঠিক ধারণা নেই। শেষ অবধি একজন ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদকে এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে হয়েছে। গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে (Ghurye) তাঁর Caste and Race in India গ্রন্থে জাতপাত ব্যবস্থার ছয়টি বৈশিষ্ট্য দেখান। ঘুরে বর্ণিত জাতের এই বৈশিষ্ট্যগুলি এখন সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। এগুলি হ'ল ঃ

১) বিভিন্ন অংশে সামাজিক বিভাজন (Segmental division of society)।

২) ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ (Hierarchy)।

৩) সামাজিক মেলামেশা এবং খাদ্যের আদান-প্রদানে বিধিনিষেধ (Restrictions on feeding and Social intercourse)।

৪) সমাজের বিভিন্ন অংশের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার ও অযোগ্যতা (Civil and religious disabilities and privileges of different sections.)।

৫) বৃত্তি বাছাইয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতাহীনতা (Lack of unrestricted choice of occupation)

৬) বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ (Restrictions on marriage) ঃ

জাতপাত ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন অংশে সামাজিক বিভাজন। প্রত্যেকটা জাতের সদস্যপদ জন্মের উপর নির্ভর করে। এক জনের পদমর্যাদা বিত্তের উপর নির্ভর করে না। বরং তার জাতের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। ঘুরে দেখিয়েছেন যে, একজন ব্রাহ্মণ সেনাপতি এবং একজন মারাঠা সেনাপতির মধ্যে সেনাবাহিনীতে সমতা থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা দুটি আলাদা পদমর্যাদা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা হওয়া সম্ভব নয়। এর থেকে একটা কথা পরিষ্কার। জাতপাত সমাজের অসাম্যের ভিত্তির উপর গড়া। প্রতি জাতের

(caste) এক সামাজিক মর্যাদা আছে যা অন্য জাতের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে তুলনায় ঠিক করা হয়। এই জাতের মধ্যে অসংখ্য অবর-জাত (sub-caste) রয়েছে যাদের পদমর্যাদা সেই ভাগগুলির সঙ্গে তুলনা করে ঠিক করা হয়। বাংলাদেশে যেমন ব্রাহ্মণ-জাত (caste) আছে। এর মধ্যে কতকগুলি অবর-জাত (sub-caste) যেমন, কুলিন, রাঢ়ি, বারেন্দ্র ইত্যাদি রয়েছে। এই ভাগগুলি ব্রাহ্মণ জাতের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও তাদের মধ্যে পযমর্যাদার তারতম্য রয়েছে। এইভাব হিন্দু সমাজের প্রতিটি স্তরে বিভাজন লক্ষ্য করা যায়।

ঘুরে আরো দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি জাতের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন জাতের ''পঞ্চায়েত'' ছিল এবং এই পঞ্চায়েত তাদের সদস্যদের অপরাধের বিচার করত এবং তাদের দন্ডিত করত। বিভিন্ন জাতের আইনের প্রশাসনের মধ্যে তফাতের ফলে তাদের নৈতিক মান দন্ডের মধ্যেও তফাৎ হ'ত।

বিভিন্ন জাতের ধর্মও আলাদা ছিল। বিভিন্ন জাত, যেমন দাক্ষিণাত্যের কোমতি, কামশালা বা মধ্যদেশের আহির, উত্তর প্রদেশের আহেরিয়া, বাহেরিয়া, বা নাই এবং গুজরাটের বৈশ্যদের নিজস্ব দেবতা ছিল।

বিবাহ এবং মৃত্যুজনিত আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জাতের মধ্যে তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণেরা উপপত্নী এবং বিধবা বিবাহ বরদাস্ত করে না। কিন্তু নীচু জাতগুলির মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। কোনও কোনও জাতের ক্ষেত্রে মদ্যপান দোষের নয় কিন্তু ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল।

মৃত্যুর ক্ষেত্রে জাতের লোকেদেরই দায়িত্ব থাকে মৃতদেহকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে গিয়ে দাহ করার।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে ঘুরে বলেছেন, বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকেও জাতগুলি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ। একটা থেকে আর একটা জাতের সুনির্দিষ্ট তফাৎ আছে। অনুরূপ মত প্রকাশ করেন ম্যাক্স হ্বেবার।

জাতপাত ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ। ভারতের সর্বত্র আমরা দেখি যে, হিন্দু সমাজের জাতি ভেদপ্রথায় ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ রয়েছে।

এই শ্রেণীবিভাগের সর্বোচ্চ স্থানে আছে ব্রাহ্মণ। একমাত্র দক্ষিণ ভারতে কারিগর জাতগুলি ব্রাহ্মণদের বশ্যতা অস্বীকার করে সমাজে উচ্চস্থান দাবী করেছিল এবং কমলান বলে একটি জাতি নিজেদের ব্রাহ্মণদের সমান পদমর্য়াদা দাবী করে। ভারতের সর্বত্র জাতপাত ব্যবস্থায় যে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ রয়েছে তার ফলে কোনও একটি জাতের অবস্থান কোথায় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না এই কারণে যে, কোনও জাতের সর্বগ্রাহ্য অবস্থান নেই। কোন্ জাতের কি অবস্থান তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে।

জাতপাতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে **সামাজিক মেলামেশা এবং খাদ্যের আদানপ্রদানে বিধিনিষেধ।** প্রথমে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ভারতের জাতপাত ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতের মধ্যে মেলামেশা নির্ভর করে (১) ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগে তাদের অবস্থান কোথায় ও (২) পবিত্রতা বা অপবিত্রতার উপর। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে ভারতের জাতগুলিকে পাঁচটা সমষ্টিতে ভাগ করা যায়। প্রথমে আছে দ্বিজ জাত; দ্বিতীয়ত, সেই জাতগুলি যাদের কাছে দ্বিজ জাত ''পাকা'' অর্থাৎ রান্না করা খাদ্য খেতে পারে; তৃতীয়ত, সেই সব জাত যাদের হাতে দ্বিজ জাতেরা শুধু জল গ্রহণ করতে পারে এবং চতুর্থত, সেই সব জাত যারা অস্পৃশ্য এবং দ্বিজ জাতেরা জলগ্রহণ করতে পারে না এবং পঞ্চমত, সেই সব অস্পৃশ্য জাত যাদের ছোঁয়ায় অন্য হিদু জাতেরা অপবিত্র হয়।

বাংলায় ভাগটা একটু অন্য রকম। এখানে দু'টি জাত আছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। শূদ্রদের চারটি ভাগ রয়েছে। প্রথমত, যারা সৎ শূদ্র, নবশাখ এবং কায়স্থ; দ্বিতীয় গোষ্ঠী হচ্ছে জলচল শূদ্র, যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জল নিতে পারে; তৃতীয়ত, আছে জলব্যবহার শূদ্র, যাদের হাত থেকে ব্রাহ্মণরা জল নিতে পারে না। শেষে আছে অস্পৃশ্য শূদ্র, যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা বা অন্য কোনও জাত জল নিতে পারে না কারণ এদের ছোঁয়া মানুষকে অপবিত্র করে।

পবিত্রতা বা অপবিত্রতা মেলামেশা সুগম করে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দাক্ষিণাত্যে এই পবিত্র-অপবিত্র ধারণাকে হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উত্তর ভারতে চামার বা ডোমের ছোঁয়া লাগলে একজন উচ্চবর্ণের পবিত্রতা নষ্ট হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু বা পশ্চিমের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্যের ছায়া মাড়ালে একজন উচ্চবর্ণের পবিত্রতা খর্ব করে। তাই এই সব জায়গায় উচ্চবর্ণের সঙ্গে অস্পৃশ্যের দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নানারকম জটিল নিয়মকানুন তৈরী হয়েছে।

পবিত্র-অপবিত্র ধারণাটা খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও মানা হয়। সব খাদ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—কাঁচা আর পাকা। কাঁচা খাদ্য জল দিয়ে রাঁধা হয় কিন্তু পাকা খাদ্যে রান্নার জন্য শুধুমাত্র ঘি ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতে শুধু দ্বিজরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য আদান-প্রদান করতে পারে এবং দ্বিজ নয়, কিন্তু উচ্চ জাতের হাতে পাকা খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। বাংলায় পাকা খাবার নিজের জাত এবং ময়রা জাতের কাছ থেকে গ্রহণ করা যায়। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে এবং গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে শুধুমাত্র নিজের জাত ছাড়া অন্য কোনও জাতের কাছ থেকে খাবার গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং, এখানে কাঁচা বা পাকা খাদ্যের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। এ সব জায়গায় কোনও জাত তার থেকে নীচু জাতের কাছ থেকে রান্না করা খাবার গ্রহণ করে না। জলের ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয় না। সব জাত কিন্তু ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে রাঁধা খাবার গ্রহণ করে।

জাতের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাত-সমাজে বিভিন্ন অংশের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার ও অযোগ্যতা। জাত-সমাজের অধিকারগুলি আমরা প্রথমে আলোচনা করব। হিন্দু সমাজের সর্বোচ্চ জাত হিসাবে ব্রাহ্মণেরা সমাজে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করা তাদের একচেটিয়া অধিকার।

অতীতে ব্রাহ্মণেরা কোনও নীচু জাতকে অভিবাদন জানাত না বরং কোনও নীচু জাতের কেউ তাকে অভিবাদন জানালে সে আশীর্ব্বাদ করত। সে ছিল রাজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজা এবং ব্রাহ্মণ ও গোরক্ষা ছিল রাজার প্রধান কর্তব্য।

অস্পৃশ্যদের অবস্থা ব্রাহ্মণদের একেবারে বিপরীত ছিল। উত্তরভারতে তাদের অপবিত্রতার জন্য অস্পৃশ্যদের গ্রামের বাইরে থাকতে হ'ত। তামিল অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের জন্য বিভিন্ন জায়গা সংরক্ষিত থাকত। একটা গ্রামে ব্রাহ্মণদের জন্য একটা অঞ্চল, প্রধান জাতের লোকেরা (dominant caste) একটা অঞ্চলে থাকত, শূদ্ররা একটি অঞ্চলে এবং অস্পৃশ্যরা অন্য একটি অঞ্চলে বাস করত।

অস্পৃশ্যরা হিন্দু সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত অংশ। তাদের কোনও অধিকার নেই; আছে শুধু কর্তব্য। অস্পৃশ্যরা সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিতে নিয়োজিত। তাদের পেশার মধ্যে আছে চামড়ার কাজ, শবদাহ, মদ চোলাই ইত্যাদি, যেগুলি সবচেয়ে অপবিত্র কাজে বলে গণ্য করা হয়।

এই অপবিত্র জাতগুলির কোনও ধর্মীয় বা নাগরিক অধিকার নেই। অস্পৃশ্যরা গ্রামের কূপ থেকে জল নিতে পারবে না, কারণ তাদের ছোঁয়ায় কূপ অপবিত্র হবে। তারা মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে যেতে পারে না, কারণ তাদের স্পর্শ মন্দিরের শুচিতা নষ্ট করবে।

এইসব অসুবিধা ছাড়া অস্পৃশ্যদের উপর কোনও কোনও অঞ্চলের এমন বিধি আরোপ করা হয়েছিল যা অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে। মারাঠাদের দেশে একজন মহারকে মাটির পাত্র গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় চলতে হ'ত। তারা রাস্তায় থুতু ফেলতে পারত না, কারণ তা উচ্চজাতির পায়ে লেগে তাদের অপবিত্র করতে পারে, শুধু তাই নয়, নিজের পায়ের ছাপ মোছার জন্য তাদের একটা কাঁটা গাছ মাটির ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হত। পাঞ্জাবে মেথরদের নিজেদের পরিচয় চেঁচিয়ে জানাতে হ'ত এবং হাতে করে একটা ঝাঁটা নিয়ে ঘুরতে হ'ত। গুজরাটে অস্পৃশ্যদের শিং পড়তে হ'ত।

জাতপাত ব্যবস্থার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বাধীনভাবে কেউ নিজের বৃত্তি বাছাই করতে পারত না। সব পেশার উত্তরাধিকার পিতা থেকে পুত্রের হাতে যেত। একজন ব্রাহ্মণের ছেলে লেখাপড়া শিখবে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবে, ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবে। একজন কামার জাতের ছেলেকে লোহার কাজ শিখতে হবে। এটা সাধারণ চিত্র হ'লেও কিছু বৃত্তি ছিল যেগুলি সব জাতের কাছে মুক্ত, যেমন সামরিক কর্ম, কৃষি কর্ম ও বাণিজ্য। ঘুরে দেখিয়েছেন যে, বৃত্তি বাছার ব্যাপারে যে স্বাধীনতার অভাব ছিল তা দু'ভাবে কাজ করত। প্রথমত, কোনও জাত তার সদস্যদের এমন বৃত্তিগ্রহণ করতে দিত না যা সেই জাতের লোকেদের পক্ষে অসম্মানজনক। দ্বিতীয়ত, অন্য জাতগুলিও নিজেদের জাত-ব্যবসায়ে অন্য কোনও জাতের লোকেদের আসতে দিতে নারাজ ছিল। একটা উদাররণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। একজন কামার কখনোই চামড়ার কাজ করবে না কারণ চামড়ার কাজ তাকে অপবিত্র করবে এবং যেহেতু চর্মকাররা অস্পৃশ্য তার ফলে যে কামার পরিবার এই অশুচিকর কাজ করবে তার সম্মানহানি হবে; তার সদস্যদের জাত থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। আবার চামররা কখনও অন্যজাতের লোকেদের তাদের জাত ব্যবসায় হাত দিতে দেবে না, কারণ তাদের একচেটিয়া ব্যবসাতে অন্য কোনও জাতের লোকে ঢুকলে চামারদের রুটি-রুজিতে টান পড়বে।

সবশেষে, জাত ব্যবস্থার আর একটি **বৈশিষ্ট্য হল বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।** বিবাহ সাধারণত জাত-সাপেক্ষ হয়। সমাজতত্ত্ববিদদের ভাষার একে caste endogamy বলা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে জাতের (caste) ধারণা অবর-জাতের (sub-caste) মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিবাহের ক্ষেত্রে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার শুধু একটা ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে পরিণয়ের মাধ্যমে সম্পর্ক করে না। যদি পাত্রীর পরিবার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয় তবে পাত্রের পরিবারকে বারেন্দ্র হ'তে হবে। কুলীন শুধু কুলীন পরিবারেই বিবাহ করতে পারে।

অবশ্য সব সময় বিবাহ গোষ্ঠী-সাপেক্ষ হয় না। বর্ণের বাহিরে দুই ধরনের বিবাহ হতে পারে। অনুলোম বিবাহে একজন উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের নারীকে বিবাহ করতে পারে, এটি সমাজস্বীকৃত। নীচু জাতের পুরুষ যদি উঁচু জাতের মহিলাকে বিবাহ করে তবে একে প্রতিলোম বিবাহ বলা হয়। এই ধরনের বিবাহে সমাজের সমর্থন থাকে না।

যে কোনও জাতের বিবাহ অনুষ্ঠানে অন্য জাতের বিশেষ ভূমিকা থাকে। উত্তর প্রদেশে নাপিতেরা ঘটকের কাজ করে এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠানে তারা একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

**অনুশীলন-২**

১) জাতপাত ব্যবস্থার কী কী বৈশিষ্ট্য ঘুরে তুলে ধরেছেন?

২) নিম্নলিখিত কোন্ বৈশিষ্ট্য জাতপাতব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নয়?

১) ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ।
২) পবিত্র-অপবিত্র ধারণা।
৩) বিভিন্ন জাতের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক।
৪) কোনটাই না।

## ৮.৫ জাত ও বর্ণ

জাতপাত ব্যবস্থার শ্রম বিভাজনের ফল। ঘুরে দেখালেন যে, মূল জাতগোষ্ঠীগুলির নাম তাদের বৃত্তি থেকে এসেছে। ব্রাহ্মণ মানে যে পূজার্চনা করে এবং ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করে। ক্ষত্রিয় হ'ল সেই সব জাত যাদের উপর যুদ্ধ করা ও রাজ্য শাসনের দায়িত্ব রয়েছে। বৈশ্য হ'ল যারা বাণিজ্য ও কৃষিকর্মে ব্যস্ত। শূদ্ররা মূলত কারিগরি বৃত্তিতে নিয়োজিত। এছাড়া রয়েছে অস্পৃশ্য জাতগুলি যারা অশুচিতর কাজ করে।

### ৮.৫.১ বর্ণের উৎপত্তি

জাতপাত ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে ঋক্‌বেদের পুরুষ শূক্তে একটি ব্যাখ্যা আছে। আদি পুরুষের মুখ থেকে নির্গত হন ব্রাহ্মণেরা, তাঁর বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, তাঁর উরু থেকে বৈশ্য এবং পদ হ'তে শূদ্র। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই শূক্তে জাতের কথা বলা নেই। আছে বর্ণের কথা।

বর্ণ কি? ভৃগুর মতে, বর্ণের অর্থ হ'ল দেহের রঙ। ব্রাহ্মণেরা ফর্সা (সিত), ক্ষত্রিয়রা লাল (লোহিত), বৈশ্যদের দেহ হলুদ (পীতক) এবং শূদ্ররা কালো (অসত) বর্ণের আর একটি অর্থ হ'ল 'বৃত্তি বাছার ক্ষমতা।' প্রাচীন ভারতে বর্ণ ছিল সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। প্রথম তিনটি বর্ণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, ছিল দ্বিজ, অর্থাৎ যাদের দু'বার জন্ম হয়। একমাত্র এদেরই উপবীত ধারণ করার অধিকার রয়েছে। একমাত্র শূদ্রদের দ্বিজত্ব প্রাপ্তির অধিকার নেই।

প্রাচীনকালে বর্ণ বদল করা যেত। কোনও ব্যক্তি, তার ক্ষমতা অনুযায়ী এক বর্ণ থেকে আর এক বর্ণে যেতে পারত। পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু তিনি যোদ্ধার বৃত্তি গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন। আবার ''ভগবত পুরাণের'' মতে গার্গ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, বর্ণ ছিল আধুনিক যুগের শ্রেণীর মতো।

### ৮.৫.২ বর্ণ ও জাতপাতের সম্পর্ক

বর্ণ ও জাতের মধ্যে তফাৎ আছে। বর্ণভিত্তিক সমাজে বৃত্তি বাছার অধিকার ছিল। কিন্তু জাত জন্মের উপর ও পরিবারের উপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে বৃত্তি বাছার অধিকার নেই। সেনার্টের মতে, এই দুই সংগঠন পরে মিলে গিয়ে এক হয়ে যায়। বর্তমান কালে বর্ণের শুধু তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। দুবের মতে, বর্ণের কোনও কার্যকর ভূমিকা বর্তমানে নেই।

বর্তমানে বর্ণাশ্রমের কাজ হচ্ছে একটি জাতের অবস্থান নির্ণয় করা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাত সমাজের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করে তা এই বর্ণ-নক্সার মাধ্যমে জানতে পারি। তবুও এই মডেল থেকে সামাজিক বস্তুসত্য পুরোপুরি বোঝা যায় না। শুধু তাই নয়, সব জায়গায় বর্ণভিত্তিক সমাজ সমান বিস্তৃতি লাভ

করেনি। দক্ষিণ ভারতে দেশজ ও খাঁটি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য পাওয়া যায় না। কোনও জাতের ভারতের এক জায়গায় একরকম পদমর্যাদা আর অন্য এক জায়গায় ভিন্ন পদমর্যাদা। অনেক সময় একটা জাতের ব্যবস্থা ঠিক নির্ণয় করা যায় না এবং তার ফলে পণ্ডিত মহল, রাজ দরবার এবং আধুনিক আদালতে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছে।

বর্ণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে দুবে বলেন যে, বর্ণ ব্যবস্থার সীমিত ব্যবহার আজও রয়েছে। বর্ণ ব্যবস্থা আরোপিত সামাজিক অবস্থানের সূচক; কোন্ বর্ণের মানুষ কি কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেয়; আচার-ব্যবহারের মানদন্ড নির্দেশ করে দেয়। বর্তমান ভারতে বর্ণ-আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেষ্টা হয়েছে।

## ৮.৫.৩ যজমানি ব্যবস্থা

ভারতের সাবেকী সমাজব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল 'যজমানি ব্যবস্থা'। 'যজমানি' বলতে সমাজে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায়। যজমানি ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আচার-বিচারগত সমস্ত সম্পর্কই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় উচ্চজাতের মানুষরা সেবাগ্রহীতা ও নিম্ন-জাতের লোকেরা সেবা দাতার ভূমিকা পালন করে। উচ্চজাতের সেবা করা পরিবর্তে তারা অর্থ এবং/অথবা দ্রব্যাদি লাভ করে থাকে। রাজপুত, ভূমিহার, জাঠ, কাম্মা, লিঙ্গায়েত, রেড্ডী, প্যাটেল প্রভৃতি ভূস্বামী শ্রেণীর লোকেরা সেবাগ্রহীতার স্তরে থাকে এবং ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), প্রামাণিক, ছুতোর, কামার, ভিস্তি, মুচি প্রভৃতিরা সেবাদাতার ভূমিকায় থাকে।

যজমানি সম্পর্ক সাধারণত পরিবারভিত্তিক হয় এবং বংশপরম্পরায় এই সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকে। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন, জন্ম, বিবাহ, পূজা, মৃত্যু, নির্দিষ্ট সেবা-গ্রহীতা নির্দিষ্ট সেবাদাতাকে আহ্বান করতে বাধ্য থাকে এবং সেবাদাতাও সেবাদান করতে বাধ্য থাকে। এর পরিবর্তে প্রাপ্য অর্থ ছাড়াও অতিরিক্ত উপহার লাভ করে। আবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সময় তারা পরস্পরকে সাহায্য করে। সুতরাং, যজমানি ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা, আদানপ্রদান এবং সহযোগিতা বিদ্যমান।

আবার অন্যদিকে, এই ব্যবস্থার মধ্যে অবদমন, শোষণ এবং সংঘর্ষও পরিলক্ষিত হয়। সেবাদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ক্ষমতার ও অর্থের দুস্তর ব্যবধান থাকে। ফলে, ধনী ও ক্ষমতাশালী সেবা-গ্রহীতা দরিদ্র সেবাদাতাকে শোষণ করে। তবে বর্তমানে শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা, প্রবাসন ও অভিবাসন, নগরায়ন, বাণিজ্যের বিস্তৃতি প্রভৃতির ফলে যজমানি ব্যবস্থা ক্রমক্ষীয়মান।

## ৮.৫.৪ জাত ও অবর-জাত

বর্ণ-ব্যবস্থার একটা তাত্ত্বিক মূল্য হিন্দু সমাজে থাকলেও স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে জাত (caste) ও অবর-জাতের (sub-caste) ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ঘুরের মতে, অবর-জাত (sub-caste) প্রকৃত জাত; এর মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল গোষ্ঠী সাপেক্ষবিবাহ। অনেক সময় অবর-জাত জাতের একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়; যথা, ব্রাহ্মণ হ'ল একটি বর্ণের এবং জাতের (caste) নাম। কিন্তু বাংলায় কুলীন ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাঢ়ি ব্রাহ্মণ হচ্ছে এই জাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। এইগুলি হচ্ছে অবর-জাত (sub-caste)। জাত ও অবর-জাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত গবেষণা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ঘুরে, রিস্‌লে, অ্যাদ্রিয়ান মেয়ার, ক্যথলীন গাউ, ইরাবতি কার্ভে প্রমুখ দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত রয়েছেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, হিন্দু সমাজের ক্রমবর্ধমান বিভাজন চলছে। এক একটা জাতের মধ্যে শুধু তৈরী হচ্ছে না, অবর-জাতগুলির ভিতরেও বিভাজন চলছে। কেতকারের মতে, হিন্দুরা তিনহাজার জাতে

বিভক্ত; বেশির ভাগ জাত আবার অবর-জাতে বিভক্ত। ব্লান্ট দেখিয়েছেন যে, জাতে বিভাজনগুলি ১৮৯১ সালের আদামসুমারীতে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। জাঠ এবং আহির জাত প্রত্যেকে ১৭০০ অবর-জাতে বিভক্ত এবং কুর্মীদের ১৫০০ অবর-জাত রয়েছে।

অবর-জাতের উৎপত্তি কিভাবে হয় তা নির্মলকুমার বসুর কলু বা তেলী জাতের বর্ণনা থেকে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। উনি দেখিয়েছেন যে, বাঙলা, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে তেলীদের সামাজিক পদ সর্বত্র সমান নয়। সেখানে ঘানির তারতম্য থেকে অবর-জাতের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া খাওয়াদাওয়া বৈবাহিক আচার ব্যবহারের মধ্যেও শাখায় শাখায় তারতম্য লক্ষিত হয়। বিভিন্ন শাখা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উড়িয়া, বিহারী, বাঙালী প্রত্যেকের শিল্পকলা স্বতন্ত্র এবং তারা নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। নিজেদের শাখার মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা করে। নিজের শাখায় মধ্যে সর্ববিধ বৈবাহিক সম্পর্ক সঙ্কুচিত রাখা, প্রতি অবর-জাতের সাধারণ লক্ষণ।

নির্মলকুমার বসু এই কলু জাতের বিভিন্ন শাখার পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, শিল্প সরঞ্জামের রূপ ও ব্যবহার ভেদে এবং সামাজিক ও আহার সম্পর্কের মাধ্যমে অবর-জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এই গবেষণা ঘুরে ও অন্যান্য গবেষকদের মত সমর্থন করে যে, হিন্দু সমাজ ক্রমাগত অসংখ্য অবর-জাতে ভাগ হচ্ছে, ফলে (miscegenation) নতুন জাত তৈরী হয়েছে।

### অনুশীলনী-৩

১) বর্ণ কাকে বলে?
২) বর্ণ ও জাতের মধ্যে তফাৎ কি?
৩) 'যজমানি ব্যবস্থা' কি?

## ৮.৬ তপশিলীজাত

আমরা দেখেছি যে, ভারতের জাতপাত ব্যবস্থায় চারটি জাত স্বীকৃত। এরা হ'ল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কিন্তু আদিকাল থেকে আর একটা গোষ্ঠী রয়েছে যারা এই চতুর্বর্ণাশ্রমের বাইরে। এদের নানারকম নামকরণ হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে এদের depressed classes বলা হ'ত। Simon Commission এই জাতগুলিকে Scheduled Caste বলে আখ্যা দেন। মহাত্মা গান্ধী এদের 'হরিজন' বলে ডাকতেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান Simon Commission এর পরিভাষা ব্যবহার করে এদের Scheduled Caste হিসাবে গণ্য করে এদের একটি তালিকা বানায়। এই তালিকাভুক্ত জাতগুলি সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পায়।

কারা এই তপশিলী জাত? এরা হচ্ছে জাত-বিভক্ত সমাজের সর্বনিম্নস্তরের জাত, যারা অন্য চার বর্ণের কাছে অস্পৃশ্য। চামার, ডোম, মুচি, চন্ডাল প্রভৃতি জাত এদের মধ্যে পড়ে। কোনও কোনও জায়গায়, যেমন দাক্ষিণাত্যের তামিলদেশে, এদের ছায়া মাড়ানো হ'লেও অন্যজাতের হিন্দুরা অপবিত্র হবে। ঘুরের মতে, পবিত্রতার ধারণা হচ্ছে অস্পৃশ্যতার ধারণা ও প্রয়োগের কারণ। উনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, অস্পৃশতার শিকড় রয়েছে এই ধর্মগ্রন্থ বর্ণিত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে। ''পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে'' পরিষ্কার বলা আছে যে, যে ব্যক্তি কোনও বলির অনুষ্ঠান করবে সে কোনও শূদ্রের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। কোনও শূদ্র সেই বলির ঘরে থাকতে

পারবে না এবং যে দুগ্ধ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হবে তা শূদ্রের দ্বারা দোওয়ানো হবে না। ধর্মগ্রন্থের এই ধরনের বিধিনিষেধ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অস্পৃশ্যতা প্রথা প্রাচীন ভারতের একটি সামাজিক প্রথা শুধু ছিল না, এর পেছনে ধর্মীয় সমর্থন ছিল।

প্রাচীন ভারতে ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অস্পৃশ্যতার সমর্থন মেলে আইন প্রণয়নেও। ধর্মসূত্র লেখকদের মতে, চন্ডালরা সবচেয়ে ঘৃণিত প্রতিলোম বিবাহের ফসল-ব্রাহ্মণ মহিলার সঙ্গে শূদ্র পুরুষের মিলনের ফলে হ'ল চন্ডাল। কৌটিল্যও মনে করতেন যে, এদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ করা উচিত এবং তাদের পূর্বপুরুষদের পেশা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এইসব মিশ্র বিবাহের সন্তানরা পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না বলে কৌটিল্য মনে করতেন।

মনু চন্ডাল এবং শিবপাচদের সমান চোখে দেখতেন এবং তাদের গ্রামের বাইরে থাকবার নির্দেশ দেন। শিবপাচরা মৃতের আবরণ বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে, ভাঙ্গা বাসনে খাবে, লোহা দিয়ে গহনা গড়াবে এবং কুকুর ও গাধাকে তাদের সম্পদ বলে গণ্য করবে। তারা ফাঁসির আসামীকে ফাঁসি দেবে এবং বেওয়ারিশ লাশের সৎকার করবে। তারা দিনের বেলা গ্রাম বা নগরে ঢুকতে পারত না। এরা পরে ডুম্বা বা ডোম হিসাবে পরিচিতি পায়।

চন্ডালদের কথা শুধু গ্রন্থ বা মনুর লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। জাতকের গল্পেও তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানেও চণ্ডালদের বর্ণনা করা হয়েছে। উজ্জয়িনীর কাছে বা তক্ষশীলায় তারা গ্রাম বা নগরের কাছে থাকত। তাদের জাতবৃত্তি ছিল ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা।

পর্যটক আলুবিরুণীর লেখনীতেও চণ্ডালদের কথা পাওয়া যায়। তিনি দুই ধরনের জাতের লোকের কথা বলেছেন যারা জাত ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে না। প্রথম শ্রেণীর লোক হ'ল 'অন্ত্যজ', যাদের গ্রামের বাইরে থাকতে হ'ত, যেমন নাবিক, জেলে, শিকারী প্রভৃতি পেশার লোকজন।

অন্য শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে চণ্ডাল ও ডোম পড়ে। এই দুই শ্রেণীর লোকেরা গ্রামের আবর্জনা পরিষ্কার করবার কাজ করত। ডোমের আর একটা কাজ ছিল-সেটা হ'ল গান বাজনা করা।

আমরা চণ্ডালদের কথা শেষ করব বাংলায় এদের অবস্থার উল্লেখ করে। বাংলার চন্ডালেরা নমশূদ্র হিসাবে পরিচিত। ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে যখন জাতের নাম ও জাতের অবস্থান নিয়ে গবেষণা হয় এবং তা লিপিবদ্ধ হয় তখন বাংলার চণ্ডালরা ছিল পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম জাত, যার সংখ্যা ছিল কুড়ি লক্ষ। নমশূদ্রের সামাজিক অবস্থা নীচু ছিল। তাদের একটা অস্পৃশ্য জাত হিসাবে গণ্য করা হত। তাদের আটটি বিভাজন ছিল। এই জাতগুলি নিজেদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া বা বিবাহ করত। এরা কৃষিজাত বা মাঝির কাজে পটু। এদের নিজস্ব নাপিত আছে। পতিত ব্রাহ্মণেরা এদের পূজার্চনার ভার নেয়। ১৯২১ সাল থেকে এরা নমঃশূদ্র হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে এবং ১৯৩১ সালে তাদের সংখ্যা একুশ লক্ষে দাঁড়ায়। এরা সরকারী তপশীলের অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিবঙ্গে ১৯৫১ সাল থেকে ডোম, যারা চন্ডাল হিসাবেও পরিচিত, একটি অপবিত্র জাত হিসাবে প্রকাশ পায়। ১৯৫১ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১,১০,০০০। এরা এখন নৌকা চালানো, কৃষিকাজ প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত। কোনও কোনও ডোম ব্যবসা-বাণিজ্য, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ প্রভৃতিতেও নিয়োজিত। কিন্তু তাদের নিম্নতর জাতের

মধ্যে গণ্য করা হয়। তাদের কাজ মূলত মৃতদের সৎকার ও আবর্জনা পরিষ্কার, সমাজের অন্য জাতের কাছেও তাদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে। পাঞ্জাবের চুরহা, রাজস্থানের ভাঙ্গি মেহতর, বাংলার হাড়ি, উড়িষ্যার হাড্ডি, প্রভৃতি জাত একই ধরনের। এবং তারাও অস্পৃশ্য।

উত্তরভারতেই শুধু অস্পৃশ্যতার চর্চা ছিল না, দাক্ষিণাত্যে তা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এখানে অস্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালে মানুষ অপবিত্র হয়ে যাবে এই একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। মারাঠামাহার, তেলুগু মালা এবং তামিল পরায়ন এমনই অস্পৃশ্য জাত। এরা অপবিত্র ও অস্পৃশ্য। ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে মাহারদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৫৬ হাজার লক্ষ মালাদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার এবং পরায়নদের সংখ্যা ২০ লক্ষ ২৬ হাজার ছিল। এইসব জাতের লোকেরা মাঠে ঘাটে জন মজুর খাটে, মৃত গবাদি পশুর সৎকার করে। গ্রামে গ্রামে সীমানা নিয়ে কোনও বিবাদ হ'লে এরা সেই বিবাদ মেটাতে একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য তারা বাজনাও বাজায়। এইসব অপরিহার্য কাজ সত্ত্বেও এই জাতগুলির সদস্যদের বর্ণহিন্দুদের  ধারে কাছে যাবারও সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ, untouchability বা অস্পৃশ্যতা unapproachability অর্থাৎ, দূরত্ব বজায় রাখার পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।

## ৮.৬.১ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন

এমন একটা অমানবিক প্রথা খুব স্বাভাবিকভাবে বার বার সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বুদ্ধ থেকে গান্ধী অবধি অনেক মনীষী এর সংস্কার সাধন করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা খুব একটা সফল হন নি। যুগ যুগ ধরে এই প্রথা চলে এসেছে। রাষ্ট্র তাকে সমর্থন করেছে অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে নানারকম আইন প্রণয়ন করে। ধর্মীয় অনুশাসন রাষ্ট্রের কাজ সমর্থন করে।

দেশজ মানুষদের সবচেয়ে পশ্চাদপদ শ্রেণী হচ্ছে এই অস্পৃশ্যরা। এই ধরনের স্তরবিন্যাস নজিরবিহীন। খুব স্বাভাবিক যে, সমাজ সংস্কারকরা এই প্রথার অবলুপ্তির চেষ্টা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে নানা ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয় যার মধ্যে একটা ছিল অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন এবং এই অংশে আমরা এই আন্দোলনগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমরা দেখি যে, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন অস্পৃশ্যদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিলেন। এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন জ্যোতিবা ফুলে। ১৮৭৩ সালে তিনি পুণায় সত্যসাধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সমাজসংস্কারক ও বই এর মাধ্যমে জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৮৫১ সালে ফুলে পুণার অস্পৃশ্যদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফুলের আন্দোলন তৎকালীন সমাজের খুব একটা সমর্থন পায় নি। রানাডে বা কোলহাপুরের মহারাজার মত কিছু ব্যক্তি তাঁকে সমর্থন করেন। তাঁর দাবি ছিল সব জাতের লোককে স্থানীয় সরকারে ও সংগঠনে জায়গা দিতে হবে।

১৯২৪ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং তাদের আন্দোলনকে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে পরিচালনা করেন। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, অস্পৃশ্যদের ভারতের জীবনযাত্রা থেকে আলাদা করে রাখলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কখনই সফল হবে না। তিনি এদের হরিজন, অর্থাৎ হরি বা ঈশ্বরের সন্তান, বলে অভিহিত করেন। ১৯৩২ সালে তিনি সর্বভারতীয় হরিজন সেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

অস্পৃশ্যদেরই একজন, ডঃ আম্বেদকর ছিলেন অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের আর এক নেতা। সারা জীবন তিনি এই গোষ্ঠীর মুখপাত্র ছিলেন ও তাদের ন্যূনতম অধিকারের জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত All-India Depressed Classes Federation এদের ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। আম্বেদকরের

নেতৃত্বে জলের অধিকারের জন্য যে মহার সত্যাগ্রহ হয় তা অস্পৃশ্যদের সমান অধিকার পাবার সংগ্রামে এক মূল্যবান অবদান। আম্বেদকর মনে করতেন যে, ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করলে সাধারণ মানুষের অবস্থা ভাল হ'তে পারে না। তাই তিনি অস্পৃশ্যদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে বিভিন্ন সংগঠনেও একটা বড় ভূমিকা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় আন্দোলনের নেতারা হিন্দু সমাজকে একটি যুক্তিপূর্ণ ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা জাতপাত ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকরণ চেয়েছিলেন এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা এই অন্যায়গুলির বিলোপসাধনে হিন্দু শাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। সেগুলিকে সময় উপযোগী ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা হিন্দু সমাজের অন্যায় অবিচারের বিলোপসাধনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

গান্ধীজীর সর্বভারতীয় হরিজন সেবক সঙ্ঘ হরিজনদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করে যার মধ্যে ছিল বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়। এছাড়া মেথরদের জন্য নানা ধরনের সমবায় সমিতি, যেমন ঋণদানের সমবায়, বাসস্থানের সমবায়, প্রতিষ্ঠিত হয়।

আম্বেদকরের All India Depressed Classes Federation এই শ্রেণীর লোকজনদের উপর যে নানা ধরনের বিধিনিষেধ ছিল তার বিরুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল মন্দিরে যাবার অধিকার না থাকা, সরকারী বিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার না থাকা, সার্বজনীন কূপ ব্যবহার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পৃথক থাকবার ব্যবস্থা। সরকারী পর্যায়ে অস্পৃশ্যতা দূর করবার চেষ্টা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্যাপারে কিছু করেনি এবং সেই জন্য আম্বেদকর অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের দ্বারা নিন্দিত হন। ১৯৩৫ সালের সংবিধানে অবশ্য অস্পৃশ্যদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু সেটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বিভেদকামী বলে সমালোচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর প্রভৃতির রাজারা অস্পৃশ্যদের কাছে সমস্ত মন্দির খুলে দেবার আদেশ দেন। ১৯৩৭ সালে যে কংগ্রেস সরকারগুলি ক্ষমতায় এসেছিল তারা এই জাতগুলির উন্নয়নকল্পে কিছু কিছু কাজ করে। বম্বের কংগ্রেস সরকার Bombay Harjan Temple Worship (Removal of Disabilities) Act প্রণয়ন করে। তাদের মন্দিরের অছি পরিষদকে হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। হরিজনদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু করল উত্তর প্রদেশের সরকার ও বিহার সরকার। অন্য কংগ্রেস শাসিত প্রদেশেও এই সব সুযোগ সুবিধা চালু করা হয়।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলি কেন সংগঠিত হয়েছিল? প্রথমত, এই ধরনের অমানবিক ও অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও সচেতন ভারতীয়দের স্বাভাবিক একটা উষ্মা ছিল যা অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। দ্বিতীয়ত, অস্পৃশ্যরাও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল এবং এটা ছিল সেই সময়কার সাধারণ গণতান্ত্রিক সচেতনতার অংশ। সেই সময় একটা নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যার ভিত্তি ছিল মানব সমতা। এর ফলে মধ্যযুগের ভারতের—যে ব্যবস্থা বংশপরম্পরা ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে—সেই ব্যবস্থা এই ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করে। চতুর্বর্ণাশ্রমের জাত-চেতনার বদলে আসে নতুন শ্রেণীর চেতনা। চতুর্থত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলে উদার গণতান্ত্রিক চেতনা জন্ম নেয় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে। অস্পৃশ্য শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব তৈরী হয় এবং তারা সংগঠিত হয় এই অন্যায় উৎপীড়িক ব্যবস্থাকে ভাঙতে। পঞ্চমত, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য দরকার ছিল সমস্ত জাত ও সম্প্রদায়ের একটি গণতান্ত্রিক আঁতাত; কারণ দেশের স্বাধীনতাই তাদের পূর্ণ বিকাশের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম। স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে এদের মধ্যে এই ধরনের আঁতাত তৈরী হয়। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অস্পৃশ্যতা দূর করতে সাহায্য করে।

## ৮.৬.২ বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থা

আমরা দেখেছি যে, অস্পৃশ্যদের নিজেদের অধিকার বলবৎ করার জন্য বহু আন্দোলন করতে হয়েছিল এবং তার ফলে তারা কিছু কিছু অধিকার অর্জন করেছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অস্পৃশ্যতা চর্চা নিষিদ্ধ এবং এটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ভারতের সংবিধানের ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে সে অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করা হ'ল ও অস্পৃশ্যতা চর্চা দণ্ডনীয় অপরাধ। (untouchability is abolished and its practice is forbidden. The enforcement of any disability arising out of ''untouchability'' shall be an offence in accordiance with the law). সংবিধানের এই ধারাকে বাস্তব রূপায়িত করার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে untouchability (offences) Act, 1955 প্রণয়ন করেন। এই আইন অনুযায়ী দোকানে, জলাশয় প্রভৃতি জায়গায় অস্পৃশ্যতা চর্চা করলে এটি আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং ছয় মাসের কারাদন্ড, কিম্বা ৫০০ টাকার জরিমানা অস্পৃশ্যতার চর্চার ন্যূনতম দণ্ড। এছাড়া অন্য যারা অস্পৃশ্যতা চর্চা করতে চায় না তাঁদের নিগ্রহ করলেও সেই নিগ্রহকারীকে দণ্ড ভোগ করতে হবে।

সরকার তপশিলী জাতের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যা কাজ করেছেন তা Commissioner For Scheduled Castes and Tribes এর বার্ষিক প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। ১৯৫১ সাল থেকে Scheduled Caste Commissioner-এর প্রতিবেদেন দেখা যায় যে, এই তপশিলী জাতের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থ বরাদ্দ ছাড়া সরকার এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তার মধ্যে আছে পাঠরত ছাত্রদের জন্য আবাসন তৈরী, চাকুরীর ক্ষেত্রে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সংরক্ষণ চালু করা ইত্যাদি। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের ফল দেখা যায় কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের পরিসংখ্যানে। শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে তপশিলী জাতের জন্য যে সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তাতে ফল ফলেছে। সরকার তপশিলী জাতের জন্য ২২$^{১}/_{২}$% আসন শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ করেছেন এবং একই হারে সরকারী চাকুরী সংরক্ষণ করেছেন।

## ৮.৬.৩ বাস্তব পরিস্থিতি

কিন্তু শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্র বাদ দিলে সামাজিক ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতা দূর করা কতটা সম্ভব? দেশাইয়ের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের বদল জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করবে এবং তার সঙ্গে দরকার শিক্ষার প্রসার এবং প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন। স্বাধীন ভারতের সরকার এই সব ব্যবস্থা নিয়েছে। তবুও অস্পৃশ্যতা দূর করতে সক্ষম হয় নি। ঘুরে সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, শুধু আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে উদ্যোগ নিলে অস্পৃশ্যতা দূর হবে না। তার জন্য চাই জন সমর্থন। সাধারণ লোকে অস্পৃশ্যদের প্রতি সরকারের এই বদান্যতা মেনে নেয় নি। অস্পৃশ্যরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যে চেষ্টা করেছে তা উচ্চ জাতের প্রতিরোধে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতার পরেও অস্পৃশ্যতাকে দূর করা যায় নি। যে প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তাকে আইন প্রণয়ন করে শুধু বন্ধ করা যায় না। তার জন্য দরকার সার্বিক শিক্ষা এবং আমূল সমাজ পরিবর্তন। অস্পৃশ্যতা ততদিন দূর হবে না যতদিন না গ্রামের প্রভাবশালী জাতের ক্ষমতা ভাঙা যাবে এবং অস্পৃশ্যরা শিক্ষিত হয়ে প্রশাসনে ক্ষমতাশালী পদগুলি অলংকৃত করলে হয়তো নিজেদের জাতের অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। কিন্তু তার জন্য তাঁদের নিরসল সংগ্রাম করতে হবে।

## ৮.৭ প্রভাবশালী জাত

ভারতের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জাত পরস্পরের উপর নির্ভর করে বাস করে। কিন্তু এদের মধ্যে কিছু জাত রয়েছে যারা বর্ণাশ্রমের মানদন্ডে কৌলিন্য না করলেও গ্রাম্যসমাজ ব্যবস্থায় একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই জাতগুলি গ্রাম সমাজে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং গ্রামীণ সমাজজীবনে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদ শ্রীনিবাসের মতে, এরা হচ্ছে dominant caste, বাংলায় আমরা এদের প্রভাবশালী জাত বলতে পারি।

একটি জাতকে প্রভাবশালী বলা যায় যখন সেটা অন্য জাত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং অন্য জাতের উপর অধিকতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করে।

প্রভাবশালী জাতের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় ১) সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ২) অর্থনৈতিক ক্ষমতা। ৩) রাজনৈতিক ক্ষমতা। ৪) পাশ্চাত্য শিক্ষা ৫) শাস্ত্রীয় মতে সামাজিক অবস্থান। এবার এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা যাক ঃ

প্রভাবশালী জাতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। গ্রামীণ সমাজে সংশ্লিষ্ট জাতের সদস্যরা সব চেয়ে বেশি। কোনও কোনও জায়গা আবার বিভিন্ন জাতের নামে পরিচিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটা জাতের সদস্যদের সঙ্গে অন্য জাতগুলির সম্পর্ক বদলে দেয়। যেখানে একটি জাতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেখানে জাতের স্বার্থে লড়বার জন্য লোকের অভাব হয় না। একটি জাত যত দলে ভারি হয় তত তার ক্ষমতা বেশি হয়।

প্রভাবশালী জাতের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে। শ্রীনিবাস বলেছেন যে, ব্রাহ্মণেরা এককালে মহীশূরের রামপুরায় প্রভূত পরিমাণে জমির মালিক ছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা জমির মালিকানা হারায়। তাদের স্থলে কৃষকেরা, যারা শুধু জমির মালিক হয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। ত্রিশের দশকে তারা শিক্ষার মূল্য বুঝতে পেরে নিজেদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেয় এবং ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনের ফলে তাদের সঙ্গে কৃষক নেতা এবং সরকারী আমলাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

প্রভাবশালী জাতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের আগে আমরা বলেছি যে, রামপুরার কৃষক জাতের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের নেতাদের যোগাযোগ ছিল। এই ধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগের ফলে প্রভাবশালী জাতের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান বিহার, উত্তরপ্রদেশে প্রভৃতি জায়গায় আমরা দেখি যে, প্রভাবশালী জাতগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। কৃষক নেতা টিকায়েত বা বিহারের লালুপ্রসাদ যাদব এই জাতগুলির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। এদের ক্ষমতার উৎস জাতভাইদের সমর্থন।

পঞ্চমত, প্রভাবশালী জাতগুলি শিক্ষাকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে, গুরুত্ব দেয়। এর কারণ শিক্ষার মাধ্যমে এই জাতগুলির ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতা সম্ভব।

ষষ্ঠত, শাস্ত্রীয় মতে, সামাজিক অবস্থান প্রভাবশালী জাতের আর একটি বৈশিষ্ট্য। রামপুরার প্রভাবশালী জাত পর্যালোচনা করতে গিয়ে শ্রীনিবাস বলেছেন যে, যদিও ব্রাহ্মণেরা বা লিঙ্গায়েতরা সংখ্যার দিক থেকে প্রভাবশালী নয় বা বিত্তবানও নয়, তবুও তারা তাদের শাস্ত্রমতে সামাজিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে প্রভাবশালী হয়েছে।

শ্রীনিবাসের মতে, যদি একটা জাতের এই কয়টি বৈশিষ্ট্য থাকে বা সেই জাত আধিপত্যের বেশিরভাগ মাপকাঠি পূরণ করে তবে সেই জাত নিরঙ্কুশ প্রভাব (decive dominance) ভোগ করে।

### ৮.৭.১ প্রভাবশালী জাতের কাজ

প্রভাবশালী জাত গ্রামীণ সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর একটা মুখ্য কাজ হ'ল বিবাদ মেটানো। সাধারণত, নির্বাচিত পঞ্চায়েতের এই সব কাজ করা উচিত। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে এর ভূমিকা নগণ্য। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সাবেকি গ্রাম পঞ্চায়েত ও জাত পঞ্চায়েত। সাবেকি গ্রামসভা সাধারণ অপরাধ বা বিবাদের নিষ্পত্তি করে। জাতের সভা শুধু জাত সম্পর্কে বিবাদগুলির বিচার করে। প্রত্যেক জাতের নিজস্ব পঞ্চায়েত আছে যা এই জাতভিত্তিক বিবাদগুলি মেটায়। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জাত পঞ্চায়েতে প্রভাবশালী জাতের প্রতিনিধিরা একটা মুখ্য ভূমিকাপালন করে। অনেক সময় প্রভাবশালী জাতের পঞ্চায়েতের কাছে অন্য প্রভাবহীন জাতের অভ্যন্তরীণ বিবাদ মেটানোর আর্জি আসে।

**অনুশীলনী-৪**

১) তপশিলী জাতের সঙ্গে প্রভাবশালী জাতের তফাৎ কী?

২) প্রভাবশালী জাত কী কী কাজ করে?

## ৮.৮ জাত সচলতা

জাতপাত সম্পর্কে ভাবলে আমাদের সামনে একটি স্থবির সামাজিক সংগঠনের চিত্র ফুটে ওঠে। যুগ যুগ ধরে এই ধারণা ছিল যে, জাতপাত ব্যবস্থা বদলায় না। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ শ্রীনিবাস তাঁর একাধিক বই ও প্রবন্ধে দেখালেন যে, জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে সচলতা রয়েছে। এই ঘটনাকে তিনি Sanskritization নামে অভিহিত করলেন। বাংলায় একে সংস্কৃতকরণ বলা হয়।

সংস্কৃতকরণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি ''নিচু'' হিন্দুজাত বা অবর-জাত বা অন্য কোনও সমষ্টি তার লোকাচার, শাস্ত্র, আদর্শ এবং জীবনযাত্রা অন্য উচ্চজাত বা দ্বিজজাতের জীবনযাত্রার অনুকরণে বদল করে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, একটা জাত এক বা দুই পুরুষ ধরে তার যা সামাজিক অবস্থান তার থেকে উচ্চ অবস্থান দাবি করে।

দ্বিতীয়ত, যদি এই দাবি অন্য জাত মেনে নেয় তবে সেই জাতের উচ্চাভিমুখী সচলতা (upward mobility) হয়। তৃতীয়ত, শুধুমাত্র অবস্থানের বদল হয়, সামাজিক গঠন অটুট থাকে। চতুর্থত, সংস্কৃতকরণ শুধুমাত্র হিন্দু জাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। উপজাতিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চমতঃ, এর নানা মডেল লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মডেল দেখা যায়।

সংস্কৃতকরণের দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রথমতঃ, সংস্কৃতকরণ শাস্ত্রীয় ও সামাজিক পদমর্যাদার সমতা আনে। দ্বিতীয়ত, উচ্চজাতে বিবাহ দেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

এই প্রক্রিয়াগুলির এবার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

(১) আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে কিছু প্রভাবশালী জাত রয়েছে। এই জাতগুলির শাস্ত্রীয় পদমর্যাদা খুব একটা উঁচু না হ'লেও তাদের সামাজিক প্রভাব যথেষ্ট বেশি। যখন একটি জাত সামাজিক স্তরে

নিজেদের উন্নীত করে তখন তাদের শাস্ত্রীয় পদমর্যাদার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। যেমন, গুজরাটের পাতিদার সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়দের সমগোত্রীয় বলে নিজেদের দাবি করে। এই জাতগুলি নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য নিজেদের জীবন রীতি, শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান সব কিছু বদলে ফেলে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে যে অনুষ্ঠানগুলি করা হয় (rites de passage) যেমন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে পুরোহিতদের পৌরহিত্য করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। বৈদিক মতে উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং বৈদিক ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় ধ্যান ধারণা সম্পর্কে এই উচ্চাভিলাষি জাতের সদস্যরা জ্ঞান অর্জন করে।

(২) সংস্কৃতকরণের ফলে উচ্চবর্ণে বিবাহ দেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। উচ্চাভিলাষি জাতের সদস্যরা নিজেদের মেয়েদের উচ্চবর্ণে বিবাহ দিয়ে নিজেদের সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এর ফলে, একদিকে যেমন নিম্নবর্গীয় জাতে কন্যার অভাব লক্ষ্য করা যায়, উচ্চবর্ণে বিবাহযোগ্য পুরুষের অভাবও লক্ষ্যণীয়। এই ধরনের উচ্চবর্ণে বিবাহ দেবার প্রবণতা গুজরাটের পাতিদারদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কন্যাদের উচ্চবর্ণে বিবাহ দেবার ফলে কন্যাদানকারী জাতের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং শেষে সেই জাতের সদস্যরা উচ্চবর্ণের সদস্যদের সঙ্গে সমতা দাবি করে। প্রাক-ইংরেজ ভারতে সংস্কৃতকরণের ফলে বেশ কিছু জাত সামাজিক কৌলিন্য লাভ করে এবং এই ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রথমে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রথা ধরা যাক। প্রাক-ইংরেজ ভারত মূলত কৃষিপ্রধান অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। এইসময় প্রচুর পরিমাণে উর্বর জমি পাওয়া যেত। জমির মালিক সাধারণত উচ্চ জাতের ছিলেন। তাঁরা কখনোও নিজের হাতে জমিতে চাষ করতেন না। তাঁরা নিচু জাতের লোকেদের দিয়ে চাষ করাতেন। যেহেতু চাষাবাদের জন্য শ্রমিকের অভাব ছিল, সেজন্য কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা এখনকার থেকে তুলনামূলকভাবে ভাল ছিল। জমির মালিকেরা বেশি অত্যাচারী হ'লে এদের শ্রমিকদের হারানোর ভয় থাকত।

ষ্টাইনের (Stein) মতে, সামন্ততান্ত্রিক ভারতে সামাজিক সচলতা নির্ভর করত স্থানীয় সচলতার উপর। জমির প্রাপ্তি, বন্যা, খরা, মহামারী, অতিরিক্ত করের বোঝা-এই কারণগুলির ফলে অভিবাসন (migration) ঘটত। তিনি আরও মনে করেন যে, মধ্যযুগের ভারতে পারিবারিক সচলতার সুযোগ এত ছিল যে, যৌথ সচলতার প্রয়োজন ছিল না।

এই সময় আমরা দেখি যে, সেই সব জাতের আত্মপ্রকাশ ঘটে যারা পরে প্রভাবশালী জাত হিসাবে প্রকাশ পায়; যেমন, দাক্ষিণাত্যে কৃষক জাত যেমন নায়ার, কাম্মা, রেড্ডি, ওকালিগ্গা ও মারাঠা। গুজরাটের পাতিদার জাতও এদের মধ্যে পড়ে। এদের মধ্যে ক্রমাগত বিভাজন হ'ত এবং তার ফলে যে অবর-জাত গুলি তৈরী হ'ত তারা প্রত্যেকে নিজেদের কৌলিন্য জাহির করত। কোনও অবর জাতের সদস্যরা হয়ত নিজের বৃত্তি বদলে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করল। উচ্চজাতের অনুকরণে নিজেদের জীবন ধারা পাল্টে সেই অবর-জাতকে অন্য অবর-জাতের তুলনায় উচ্চতর অবর-জাত হিসাবে দাবি করল। ইংরেজ আমলে এই অবর-জাতগুলি সংগঠিত হয়ে জাত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

মধ্যযুগের ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সংস্কৃতকরণে সাহায্য করত। শ্রীনিবাসের মতে, কয়েক শতক ধরে বিভিন্ন বর্ণের উত্থান ও পতন ঘটেছিল। সমাজব্যবস্থাটা খুবই খোলামেলা ছিল। ক্ষত্রিয় বর্ণে বিভিন্ন নৃকুল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ছিল; যেমন, শক এবং পল্লব। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবার জন্য একটা জাতের কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রথমত, সেই জাতের একটা সামরিক পরম্পরা থাকতে হ'ত। অর্থাৎ, তাদের সদস্যদের

সেনাবাহিনীতে কাজ করতে হ'ত। দ্বিতীয়ত, সংখ্যার দিক থেকে তাদের প্রভাবশালী হ'তে হ'ত। তৃতীয়ত, জমির মালিকানা থাকার দরকার ছিল।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবার পর এই জাতকে নিজেদের জীবন ধারা ক্ষত্রিয়দের অনুকরণে সংস্কার করতে হ'ত এবং ক্ষত্রিয় হিসাবে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হ'ত। এদের ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হ'ত এবং প্রয়োজনে ব্রাহ্মণ তৈরী করতে হ'ত। গৌড় নৃপতি বল্লাল সেন যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ তৈরী করেছিলেন। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই ধরণের সামাজিক সচলতা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাক ইংরেজ ভারতে জাত-পাত ব্যবস্থার শীর্ষ স্থানে ছিলেন রাজা। তিনি হিন্দু বা মুসলমান হ'তে পারতেন। বিভিন্ন জাতের পদমর্যাদা নির্ণয় করবার অধিকার রাজার ছিল এবং জাতের পদমর্যাদা সম্পর্কে বিবাদের নিষ্পত্তি রাজা করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র আইনটাকে ব্যাখ্যা করতেন। সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতকরণের প্রভাব বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধে, শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন যে, এই ধরণের সচলতার ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় ভারতীয় সমাজে। এইবার আসুন, এই প্রভাবগুলি কি তা দেখি।

প্রথমত, সংস্কৃতকরণের বলি হয় মহিলারা। নিচু জাতিগুলির জীবনধারা, লোকাচার, শাস্ত্রীয় রীতি-নীতি মহিলাদের সম্পর্কে উদার। কিন্তু যখন একটি জাত সামাজিক কৌলিন্য পাবার আশায় উচ্চজাত, যেমন ব্রাহ্মণকে, অনুসরণ করে, তখন তারা সেই জাতের রীতি-নীতি, জীবনযাত্রার অনুসরণে নিজেদের পাল্টায়। এই উচ্চজাতের আচরণবিধি ও জীবনযাত্রা অনেক সময় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা খর্ব করে।

নিচু জাতের মধ্যে যেমন বাল্যবিবাহ না দিলেও চলে, মহিলাদের তালাক দেবার অধিকার রয়েছে এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। কিন্তু উচ্চজাত, যেমন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল এবং বিধবাদের বিবাহ দেবার কোনও রীতি ছিল না। একটি উচ্চাভিলাষি জাতের কর্তারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় মহিলাদের সম্পর্কে যে নীতি ছিল সেই নীতি অনুসরণের ফলে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা খর্ব হ'ত।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতকরণ দাম্পত্য জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চজাতের মধ্যে দাম্পত্য জীবন যেরকম, উচ্চাভিলাষি জাতের মধ্যে সেই রীতিগুলি সংক্রামিত হয়। উচ্চজাতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে অসাম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করেন ও স্বামীর আগে খাদ্য গ্রহণ করেন না। স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে নানা ব্রত পালন করে। এই রকম নানা ধরনের সংস্কার উচ্চ জাতের মধ্যে পাওয়া যায়।

বিধবাদের ক্ষেত্রে উচ্চজাতের মধ্যে অনেক কঠিন নীতি পালন করা হয়। বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার দেওয়া হয় না। তাদের অশুভ বলে মনে করা হয় এবং তাদের নানা রকম কঠিন শাস্ত্রীয় আচার, যেমন উপবাস, পূজার্চনার মধ্যে দিন কাটাতে হয়।

তৃতীয়ত, আত্মীয়তার ব্যাপারে সংস্কৃতকরণে বংশের উপর জোর দেওয়া হয়। পূর্বপুরুষদের উপাসনা করে তাদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত তর্পণ করা ও পিণ্ডদান করা ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চজাতের পুরুষদের কর্তব্য। তাই উচ্চজাতের মধ্যে পুত্রের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংস্কৃতকরণে তাই পুত্র সন্তান লাভ করা একটি ধর্মীয় প্রয়োজন বলে মনে করা হয় কারণ পুত্রের পিন্ডদান ছাড়া একজন ব্যক্তি নরকে পতিত হবে বলা ধারণা প্রচলিত ছিল। 'পুৎ' নামক নরক থেকে যে মুক্ত করে সেই পুত্র। একই সঙ্গে কন্যার গুরুত্ব হ্রাস পায়। তার কারণ হচ্ছে কন্যাদান বা বিবাহ

দিতে হয় একই জাতের পুরুষের সঙ্গে এবং সেইরকম সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ পাওয়া খুব কঠিন হয়। এছাড়া পণপ্রথার ফলে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

চতুর্থত, সংস্কৃতকরণের ফলে নতুন নতুন ধ্যানধারণা এবং মূল্যবোধ উচ্চাভিলাষি জাতের সদস্যদের আয়ত্ত করতে হয়। বৈদিক ধ্যানধারণা, যেমন কর্ম, ধর্ম, পাপ, মায়া, সংস্কার, মোক্ষ উচ্চাভিলাষি জাতের সদস্যদের মুখে মুখে শোনা যায়। ধর্মীয় উৎসবের সময় হরিকথা অনুষ্ঠিত হয়, যেমন দশেরা, রামনবমী, শিবরাত্রি ইত্যাদি।

ইংরেজ রাজত্বে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এবং সাক্ষরতার বৃদ্ধির ফলে নিচু জাতগুলির মধ্যেও বৈদিক ও লৌকিক ধর্মীয় ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পাশ্চাত্য প্রযুক্তি, যেমন রেল, ছাপাখানা, বেতার ও বিমান এই ধরনের ধ্যানধারণার প্রসারে সাহায্য করেছে।

ইংরেজরা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক সংগঠন ও মূল্যবোধ ভারতে আনে; যেমন, সংসদীয় গণতন্ত্রে এই মুল্যবোধ আত্মস্থ করে উচ্চাভিলাষি জাত ভোট বাক্সের সাহায্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিজের সামাজিক উন্নতি ঘটাচ্ছে। বিহারে যেমন যাদবেরা দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য লড়াই করে লালুপ্রসাদ যাদবের নেতৃত্বে জয়ী হয়েছে।

পঞ্চমত, সংস্কৃতকরণের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যকরণের (Westernisation) একটা সম্পর্ক ছিল। ইংরেজ ভারত দখল করার পর অনেক সামাজিক অন্যায় দূর করবার চেষ্টা করে। বিদেশীদের সমালোচনার ফলে শিক্ষিত ভারতীয় বা নিজেদের সমাজ সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। এর থেকে জন্ম নেয় ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ প্রভৃতি সংগঠন এবং এই সংগঠনগুলিকে নেতৃত্ব দেয় উচ্চজাত। এর ফলে, একটা নতুন জাতপাত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যেখানে নব ক্ষত্রিয়রা রয়েছে শীর্ষস্থানে, ব্রাহ্মণেরা দ্বিতীয় স্থানে এবং অন্য জাতেরা শেষ স্তরে।

আমরা দেখেছি যে, সংস্কৃতিকরণের ফলে একটি জাতের পদমর্য্যাদা অন্য জাতের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে জাত সামাজিকভাবে প্রভাবশালী নয় তারা যদি সামাজিক কৌলিন্য দাবি করে তবে তা প্রভাবশালী জাতের আধিপত্যের পরিপন্থী হয়। তাই তারা ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং গ্রামীণ সমাজে স্থিতাবস্থা রাখার জন্য বিবিধ উপায়ে এদের সামাজিক সচলতা চেষ্টায় বাধা দেয়। পূর্ব উত্তর প্রদেশের সেনাপুর গ্রামের একটি নিচু জাত হচ্ছে নোনিয়া। তারা যখন সবাই উপবীত ধারণ করে তখন ক্ষত্রিয় জমিদারেরা তাদের প্রহার করে এবং তাদের উপবীত ছিঁড়ে নোনিয়াদের জরিমানা করে। এই ধরনের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জাত সচলতায় বাধা দেওয়ার ঘটনা ভারতের অন্যত্র ঘটেছে।

এই ব্যাপারে হরিজন বা অস্পৃশ্যদের উপর অত্যাচার সব চেয়ে বেশি হয়। ১৯৩০ সালে রামনাদের কাল্লাররা আদি দ্রাবিড়দের উপর কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করে যা অমান্য করার ফলে তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাদের শস্য ও সম্পত্তি বিনষ্ট করা হয় এবং গবাদি পশু লুঠ করা হয়।

**অনুশীলনী-৫**

১) সংস্কৃতকরণ কী? এই প্রক্রিয়াটি আলোচনা করুন।

২) সংস্কৃতকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৩) সামাজিক কাঠামোর উপর সংস্কৃতকরণের প্রভাব কিরূপ?

## ৮.৯ জাতপাত ও রাজনীতি

বর্তমানে আমরা জাতপাত ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব। জাতপাতের রাজনীতি যে ভারতের রাজনীতিতে একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে তা সবার জানা। বিশেষ করে হিন্দি বলয়, অর্থাৎ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ও রাজস্থানে রাজনীতির উপর জাতপাত ব্যবস্থার প্রভাব প্রকট। দাক্ষিণাত্যের জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি পরম্পরা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

রাজনীতি কি? কোঠারীর মতে, রাজনীতি হ'ল ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিযোগিতা। এই ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য হচ্ছে কতকগুলি লক্ষ্য এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমান এবং উত্থিত মিশ্র শক্তিগুলিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান অবস্থাকে সংহত করা। রাজনীতিতে সংগঠনের একটি ভূমিকা রয়েছে। সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই হয়। জাত এখানে একটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (pressure group) হিসাবে কাজ করে। কোঠারীর মন্তব্য যে, জাতপাতবাদ (casteism) আসলে জাতের রাজনীতিকরণ এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। জাত ও রাজনীতি একে অপরের কাছে এসে দু'টিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতারা জাতকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের একটি হাতিয়ার হিসাবে পরিচালনা করেন। তাঁরা জাতের মধ্যে এমন একটি ক্ষমতার উৎস পেয়েছেন যা দিয়ে মানুষকে সহজেই চালনা করা যায়।

জাতপাত ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ অঙ্গ। তার কতকগুলি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য কোঠারী তুলে ধরেছেন। প্রথমতঃ ইহজাগতিক দিক (secular aspect)। এই ব্যাপারে দুটো দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রশাসনিক দিক (governmental aspect) দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দিক (Political aspect)।

প্রশাসনিক দিক নিয়ে আলোচনা করতে হ'লে আমাদের জাতের পঞ্চায়েতব্যবস্থা, গ্রাম্য ন্যায়ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রাক ব্রিটিশ ভারতে জাত পঞ্চায়েতের প্রচুর ক্ষমতা ছিল। জাতের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ রীতিনীতি রক্ষার ব্যাপারে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

জাতের রাজনৈতিক দিকটি আধুনিক ভারতে খুব গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জাত আনুগত্য, বা অন্তঃজাত রেষারেষি, ইত্যাদি কারও অজানা নয়। রাজনৈতিক দলগুলি এর সুবিধা গ্রহণের জন্য অন্য জাতের জায়গায় সেই জাতের ভোট প্রার্থীকে নির্বাচনে দাঁড় করায়।

জাতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একীকরণ (integration aspect)। জাতপাত ব্যবস্থা শুধু এক ব্যক্তির সামাজিক স্থান নির্ণয় করে না। তাকে অর্থনৈতিক ও বৃত্তিগত ভূমিকাও দেয়। এর ফলে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামাজিক মান যাই হোক না কেন, জাত ব্যবস্থায় স্থান পায়। এটি একটি বিশেষ ধরনের সংহতি যার ভিত্তি হচ্ছে ক্ষুদ্র সমষ্টি ও বিশেষ সমষ্টিগত আনুগত্য এবং যেখানে বৃহত্তর আনুগত্য শুধুমাত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত আনুগত্য থেকে উৎপন্ন হয়।

জাতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল চেতনা (Consciousness)। জাত চেতনা বিভিন্ন আন্দোলনে প্রকাশ পায়। যেমন সংস্কৃতকরণের (Sanskritization) জন্য আন্দোলন, দক্ষিণ ভারতের অব্রাহ্মণ আন্দোলন, ইত্যাদি।

### ৮.৯.১ জাতপাতের রাজনীতি ঃ ইংরেজ শাসনের ফল

শ্রীনিবাস তাঁর ''Caste in Modern India'' নামক প্রবন্ধে দেখালেন যে, আধুনিক ভারতের জাতপাতের

রাজনীতি ইংরেজ শাসনের ফসল। আধুনিক ভারতের ইতিহাস ইংরেজ শাসন থেকে শুরু হয়। প্রাক আধুনিক ভারতে বিভিন্ন জাতের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল, কারণ প্রত্যেক জাত আর একটা জাতের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই নির্ভরশীলতার কারণ ছিল বৃত্তিগত বিশেষত্ব (occupational specialization)। আবার বিভিন্ন জাত অন্য জাতের সেবার জন্য প্রতিযোগী ছিল। তাই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হ'ত। প্রাক ইংরেজ ভারতে প্রত্যেক জাতের ভৌগোলিক অঞ্চল বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক সীমানার মাধ্যমে নির্ধারিত হ'ত। ব্রিটিশ শাসন এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থেকে জাত-কে মুক্ত করল। রাস্তা, পোষ্ট অফিস, খবরের কাগজ এবং ছাপাখনার দৌলতে বিভিন্ন জাতের পক্ষে সংগঠিত হওয়া সহজ হ'ল। ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত নতুন ন্যায়ালয় জাতপাত ব্যবস্থাকে বড় ধাক্কা দিল। কারণ তারা সবাইকে একই মানদণ্ডে বিচার করত।

ইংরেজরা জাতের সামাজিক বিভাজন ক্ষমতা জানত। তাই তাদের নিচু জাতের পৃষ্ঠপোষকাতে শুধুমাত্র মানবিক কারণে করা হ'ত এটা মেনে নেওয়া কঠিন। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের আগে ভারতের সেনাবাহিনীতে উচ্চজাতের আধিপত্য ছিল। বিদ্রোহে এই জাতের সৈন্যরা একটা মুখ্য ভূমিকা নেয়। তার পর থেকে সেনাবাহিনীতে নিচু জাত বেশিমাত্রায় নেওয়া শুরু হয়। তাদের শাসন বজায় রাখার জন্য ইংরেজরা সচেতনভাবে জাতের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতীয় জাতিয়তাবাদী আন্দোলন দিন দিন জোরদার হচ্ছিল। তাই ইংরেজরা জাত সচেতনতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে সুপারিশ করতে থাকে এবং তার ফলে আমরা দেখি যে, জাতভিত্তিক নির্বাচনক্ষেত্র পরবর্তীকালে ইংরেজরা চালু করবার চেষ্টা করেছিল।

যত বেশি শাসককুল থেকে সাধারণ মানুষের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, তত বেশি একটা জাতের রাজনৈতিক তৎপরতা, দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের অব্রাহ্মণ আন্দেলন একশ বছরের বেশ পুরনো। ব্রাহ্মণ বিদ্বেষকে পুঁজি করে এই আন্দোলন গত শতাব্দী থেকে চলছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, কর্ণাটক প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রাজ্যে যেমন জাতপাতের রাজনীতি প্রকট, তেমনি উত্তরভারতের রাজ্যগুলি, যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানও জাতপাতের রাজনীতির কবলে।

## ৮.৯.২ জাতপাতের রাজনীতির প্রক্রিয়া

রাজনীতির সঙ্গে জাতপাতের সম্পর্ক আলোচনার দুইটি পর্যায়ে করা যায়। প্রথমত, ক্ষমতার লড়াই প্রথম দিকে প্রভাবশালী জাতের (entrenched caste) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন নেতৃত্ব উচ্চ জাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই নেতারা ইংরেজ আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এই সম্প্রদায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবার জন্য যা যা গুণাগুণ দরকার, সেগুলি আয়ত্ত করেছিল। কিন্তু এই জাতগুলির আধিপত্য অন্য জাতগুলির মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্ট করে। তারা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নামে। কোঠারী যাদের 'উঠতি' জাত (ascendant caste) বলেন, সেই জাতগুলি শুধুমাত্র সামাজিক কাঠামোতে কাজ করতে রাজি ছিল না। তারা প্রভাবশালী জাতের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল। সুতরাং, প্রথম দিকে জাত রাজনীতিতে একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত হ'ল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতগুলির ক্ষমতালিপ্সা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার চাহিদা সঙ্গতির মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ফলে আন্তঃজাত বিবাদের বদলে জাতের অন্তরকলহ বা প্রতিযোগিতা দেখা যায়। জাতের অন্দরে নেতৃত্বের মধ্যে কলহ, দলাদলি, এবং বহুজাত বা বহুদলের মধ্যে আঁতাত দেখা যায়। নিজেদের অবস্থা জোরদার করবার জন্য ক্ষমতাভোগকারী জাত অন্য জাতের থেকে কিছু লোককে ক্ষমতার ভাগ দেয়। ফলে জাতপাত ব্যবস্থার ক্ষমতা কাঠামো আরো জটিল হয়।

প্রক্রিয়াটি শেষ অবধি তিনটি রূপ ধারণা করে। প্রথমত, একটা অধিপতি প্রবরের (dominant elite) জন্ম হয় এরা বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এসেছে এবং একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এদের মধ্যে রয়েছে। এদের একটা ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং বিভিন্ন সম্পর্কের বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে একই ধরনের মানসিকতা প্রতিফলিত হয়। এই ধরনের প্রবর গঠন বিশেষ স্বার্থ প্রতিফলিত করে এবং সংগঠিত সমাজের অংশর প্রতিনিধিত্ব করে। একই সঙ্গে জনসাধারণকে নিজেদের মতো করে বদলানোর সুযোগ দেয় এবং আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে দেয়।

দ্বিতীয়ত, নতুন সংগঠন গড়বার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাত খোলাখুলিভাবে ইহজাগতিক হয়। এর বিভিন্ন রূপ আছে। (ক) জাত-সদস্যদের সংঘ, যেমন হোস্টেল ও ক্লাব; (খ) জাত 'সংগঠন'-যেগুলি আরও অনেক বিস্তৃত এবং জেলা, এমন কি রাজ্যস্তরেও এই সংগঠনগুলি আছে ; (গ) আমেলজাত (caste federation) যেগুলি একটা নয়, কয়েকটা জাত মিলে গঠিত। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে গড়া জাত-সংগঠনগুলি চিরাচরিত জাত থেকে এদের তফাৎ করে। এদের উদ্দেশ্য মূলত, তাদের সদস্যদের জন্য চাকুরী, ইত্যাদি অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ করা বা উচ্চজাত বা শাসক জাতের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

তৃতীয়ত, এই সংগঠনগুলির পাশাপাশি আরো কিছু দল গড়ে ওঠে যাদের জাত সমাজে একটা খাড়া অবস্থান রয়েছে। এদের মাধ্যমে প্রবর এবং তাদের বিভিন্ন সমর্থনের ভিত্তি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়।

**অনুশীলনী-৬**

১) রাজনীতি কী?

২) রাজনীতিতে জাত-সংগঠনের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩) জাতের উপর ইংরেজ শাসনের কী প্রভাব দেখা গেছে?

## ৮.১০ আধুনিক ভারতের শ্রেণী ব্যবস্থা

আমরা দেখেছি যে ভারতের সমাজব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের স্তরবিন্যাস হচ্ছে জাতপাত। আর এক ধরনের স্তরবিন্যাসও রয়েছে; সেটা হচ্ছে শ্রেণী। প্রচলিত ধারণা হ'ল জাতপাত ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণী পাশ্চাত্য সমাজের বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদেরা, যেমন মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স্, হ্বেবার প্রমুখ। পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় হ্বেবার শ্রেণীর বিশ্লেষণ করেছেন। মার্ক্সের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব এবং হ্বেবারের শ্রেণী ও পদমর্যাদা গোষ্ঠী (Status group) এখন সমাজতত্ত্বে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

কে. এল শর্মার মতে, জাতপাত এবং ক্ষমতার সঙ্গে ভারতে শ্রেণী ব্যবস্থার সহাবস্থান রয়েছে। শুধুমাত্র জাতপাত বা শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভারতের সমাজব্যবস্থাকে বোঝা যায় না। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতে সচলতা এবং অভিবাসন একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। তিনি ভারতে চারটে শ্রেণীর উল্লেখ করেন। সেগুলি হ'ল কৃষিভিত্তিক, শিল্প ভিত্তিক, ব্যবসায়ী ও পেশা বা বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণী।

### ৮.১০.১ ভারতের শ্রেণী কাঠামো

বর্তমান ভারতের শ্রেণী কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখতে পাই, যে মূলত তিন ভাগে এই শ্রেণীগুলিকে ভাগ করা যায়।

১) **শিল্পভিত্তিক শ্রেণী ঃ** এই ভাগে আমরা বৃহৎ শিল্পপতি, ব্যবস্থাপক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীকে ফেলতে পারি।

২) কৃষিভিত্তিক শ্রেণী ঃ এই ভাগে আমরা বড় চাষি, মাঝারি চাষি, ক্ষুদ্র চাষি এবং কৃষি মজুরদের ফেলতে পারি।

৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঃ ১ নং ও ২ নং তালিকায় যে শ্রেণী রয়েছে তারা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত। কিন্তু এই বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীগুলি আপাতদৃষ্টিতে কোনও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত না হ'লেও সমাজ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই তিন ধরনের শ্রেণী ছাড়া চতুর্থ একটি শ্রেণী রয়েছে যাদের আমরা অনগ্রসর শ্রেণী বলব। এই শ্রেণীকে ঠিক শ্রেণী বলা যায় না, অথচ এরা রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এবার আসুন এই শ্রেণীগুলির সঙ্গে পরিচয় করা যাক।

**১) ভারতের শিল্পভিত্তিক শ্রেণী ঃ**

ভারতবর্ষের শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজব্যবস্থায় নতুন কিছু শ্রেণীর জন্ম হয়। এ কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। মূলত তিনটে শ্রেণীর কথা আপনারা আগে পড়েছেন। এগুলি যথাক্রমে হ'ল ঃ

১) বৃহৎ শিল্প পতি, বাণিজ্যিক এবং অর্থ লগ্নিকারী পুঁজিপতি-এদের এককথায় বুর্জোয়া বলা যেতে পারে। এরা সাধারণত বৃহৎ কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, বা অর্থলগ্নিকারী সংস্থা এবং বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক হন, যেমন টাটা, গোয়েঙ্কা, সিঙঘানিয়া, আম্বানি, বিড়লা প্রভৃতি।

২) আধুনিক কলকারখানায় কর্মরত কর্মী, যেমন—ঝাড়ুদার, কুলির মত অদক্ষ কর্মী এবং বিভিন্ন শিল্পের দক্ষ কর্মীদের আমরা শ্রমিকশ্রেণী বলতে পারি। পুঁজিগত গোষ্ঠীর কতগুলি মানসিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ঃ তাঁরা যে সমাজে বাস করেন, সে সমাজকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। সে জন্য তাঁরা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা চান যেখানে ব্যবসা করা বৈধ। প্রত্যেক ব্যবসায়ী বাজার চান, বিশেষ করে সংরক্ষিত বাজার। তবেই তাদের পক্ষে দ্রব্য বিক্রি করা সম্ভব। তাঁরা শ্রমমূল্য কম খরচে কিনতে চান এবং শ্রমিকদের আনুগত্য চান। তাঁরা অর্থ ঠিক মত পরিচালনা চান। তাঁরা সম্পত্তির অধিকার চান। তাঁরা সরকারে নিজেদের বন্ধুস্থানীয় লোকেদের চান এবং সরকারী আইন কানুন ব্যবসার অনুকূলে চান। তাঁরা আইন কানুনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি চান যাতে ব্যবসার অনুকুল পরিবেশ তৈরী হয়। তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে। তাঁরা মনে করেন যে, অবাধ বাণিজ্য সবার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক সংগঠন এর পরিপন্থী। তাঁরা কিছু ধর্মীয় আদর্শে বিশ্বাস করেন যা ব্যবসার অনুকুল। সাম্প্রতিককালে তাঁরা নানা জনহিতৈষীকর সংগঠনের মাধ্যমে জনসেবা করছেন।

ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ভারতের শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে। প্রাক্-ইংরেজ ভারতে বণিক গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু তাঁদের নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হ'ত। রাজনৈতিক অনৈক্য, নানা ধরনের শুল্ক, নানা ধরনের মুদ্রা, যার মূল্যের অসাম্য ছিল এবং সরকারে কর নীতি এই লগ্নির সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং ব্যবসা একটা সীমিত অঞ্চলের মধ্যে সীমবদ্ধ থাকে। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে মানুষের মনের মধ্যে বিরূপ ধারণা ব্যবসায়ীদের সমাজে একটা নিচু স্থান দিয়েছিল।

ইংরেজ আমলে অবস্থার দখল শুরু হয়। প্রথমত, ইংরেজ বণিকদের কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং এজেন্সি কোম্পানী (agency house) নতুন নতুন ব্যবসার দিগন্ত খুলতে লাগল। কয়লা খনি, ব্যাঙ্ক, জাহাজ ব্যবসা ইত্যাদিতে ইংরেজরা অগ্রণী ভূমিকা নিল। ভারতীয়দের মধ্যেও ইংরেজদের সহযোগিতায় নব্য ধনী, ব্যবসায়ী, মুৎসুদ্দি, প্রভৃতির উদ্ভব ঘটল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষে দ্রুত শিল্পায়ন শুরু হয়। রেল যোগাযোগের প্রসার শিল্পায়নকে সাহায্য করে। কিন্তু প্রথম থেকে ভারতের শিল্পায়ন ইংরেজদের স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই কিছু কিছু শিল্পে ইংরেজরা আগ্রহ দেখায়; যেমন, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নীল, চা এবং কফি প্রভৃতি। এছাড়া সুতাকল ও চটকলেও ইংরেজদের আধিপত্য ছিল।

১৮৮০ সাল থেকে ভারতে দ্রুতগতিতে শিল্পায়ন হ'তে থাকে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের বণিক শ্রেণীর উন্নয়ন হয়। প্রথম দিকে ভারতীয়রা বস্ত্র শিল্প এবং ইস্পাত শিল্পে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সূতাকাল প্রতিষ্ঠা করেন একজন পার্শী, কোওয়াসজী নানাভয় দাভের এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে টাটাদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম নয়, নতুন ধারণা, মূল্যবোধ পার্শী এবং হিন্দু ব্যবসায়ীদের অনুপ্রাণিত করে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি কারণ হ'ল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং ইংলণ্ডের শাসক বুর্জোয়াদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্দোলনে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উপর তাদের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পায়। ইংরেজদের মতে, ভারতের বণিকেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে বণিক সভা (Chamber of Commerce) গঠন করে।

স্বাধীন ভারতে ভারতের বণিক মহল নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে কখনও কংগ্রেস আবার কখনও অন্য দলকে দিল্লির মসনদে বসাতে চেয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের সমাজের অন্য গোষ্ঠী, যেমন, কৃষক বা শ্রমিকদের সঙ্গে কখনও দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে, আবার কখনও আপসের পথ ধরতে হয়েছে।

আমরা দেখলাম যে, ভারতের বণিক শ্রেণীর ইংরেজ আমলে প্রসার ঘটেছিল; বর্তমান ভারতের শাসক শ্রেণীর মধ্যে বণিক শ্রেণী অন্যতম। ভারতের বণিক শ্রেণীর কাজের মধ্যে জাতপাত, ধর্ম, পরিবার প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে। মিলটন সিঙ্গার মাদ্রাজ (চেন্নাই) শহরের ১৯ জন শিল্পপতির উপর গবেষণা করে যে তথ্য পেয়েছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন তা সারা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

সিঙ্গারের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় শিল্পপতিরা পাশ্চাত্য শিল্পপতিদের মতো নিজেদের ধর্মীয় এবং সামাজিক পরম্পরাকে ব্যবসার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পপতিদের মতো ভারতীয় শিল্পপতিরা জোট কোম্পানী; (holding company), পরিচালক এজেন্সি (Managing Agency) এবং কোম্পানীর সর্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত করার ফলে বিভিন্ন কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করেন। আধুনিক ব্যবসায় তাঁরা তাঁদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্জিত মুলবোধ ও ধ্যানধারণা কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগান। শিল্পে মর্যাদা এবং স্তরবিভাগের পার্থক্য রয়েছে। এখানে মর্যাদার মান নির্ণয় করে শিক্ষা, কি ধরনের শ্রম করা হয়, অর্থাৎ কারখানায় যন্ত্রপাতি চালানো না কি দপ্তরে বসে টাইপ করা ইত্যাদি। ভারতীয় শিল্পের স্তরবিন্যাস ইউরোপের শিল্পের মতো।

এই শিল্পপতিরা ধর্ম, জাতপাত বা পরিবারকে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হ'তে দেয় নি। বরং তাঁরা এগুলিকে তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন।

যৌথ পরিবারের অনেক নিয়মকানুন শিল্প সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে আছে যৌথ পরিবারের অর্থে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদান, শিল্পে লগ্নিকরা এবং পুত্র, ভাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে শিল্পে নিয়োগ করা।

তামিলনাড়ুতে বণিকজাত, যেমন চেট্টিয়াররা শিল্পে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু শিল্পে কোনও একজাতের আধিপত্য নেই। সব জাত ব্যবস্থাপনা, ইঞ্জিনিয়ারিং বা দক্ষ কারিগরী বিভাগে কাজ করতে পারে। শিল্পের বিস্তৃতি ঘটলে একটি কোম্পানী বিভিন্ন জাত থেকে ব্যবস্থাপক, নির্দেশক বা শ্রমিক নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। যেসব কারখানা চিরাচরিত বৃত্তির উপর নির্ভরশীল সেখানে কিছু কারিগরের জাতের ভিত্তিতে নিয়োগের সুযোগ থাকে।

ভারতের শিল্পপতিরা ব্যক্তিগত জীবন এবং ব্যবসায়িক জীবন পৃথক রাখেন। কর্মক্ষেত্রে চিরাচরিত ধর্মীয় বা জাতপাতগত বিধিনিষেধ খাটে না। সিঙ্গার মনে করেন যে, ভারতের শিল্পপতিরা পাশ্চাত্যের শিল্পপতিদের মতো শিল্প পরিচালনার মধ্যে মোক্ষ খোঁজেন।

কিন্তু শিল্পপতি হয়ে বা ব্যবসা করে ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। যদিও শিল্পপতিদের মর্যাদা স্বাধীনতার পরে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবু তাঁরা লোকচক্ষে শোষক হিসাবে পরিচিত। কমিউনিষ্টদের শিল্পপতিদের কার্যকলাপের তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে তাদের খলনায়ক হিসাবে পরিচয় দেওয়া, সবই তাদের চিরাচরিত নিচু অবস্থানকে বারবার মনে করিয়ে দেয়। ভারতীয় সমাজে সাবেকি ও আধুনিকত্ব সমাজের সবক্ষেত্রে সহাবস্থান করছে। শিল্পপতি মহলেও চিরাচরিত আচরণ, (যেমন, পূজা, দপ্তরে ধর্মীয় ছুটি পালন) এর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মানসিকতার (যেমন পুত্রকে বিদেশে শিক্ষাদান বা কারখানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার) মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান ভারতে সব থেকে ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর মধ্যে বণিক মহল অন্যতম। ইংরেজ আমলে তাদের প্রকাশ ও বিকাশ হ'লেও স্বাধীতার আগে তারা পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে নি। আজ তাঁরা ভারতের শাসক শ্রেণী। বিভিন্ন বণিক সভার সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারিত হয়। সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে বণিকমহল সুকৌশলে তাদের মতামতকে জনমত হিসাবে প্রচার করে এবং সেই 'জনমত' সরকারের নীতি প্রভাবিত করে। সুতরাং, এ কথা বলা ভুল হবে না যে, ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**খ) ভারতের ব্যবস্থাপক শ্রেণী ঃ**

আধুনিক শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক (manager) এর একটা মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। তাই ব্যবস্থাপক শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে অনেকে আলোকপাত করেছেন। James Burnham প্রথম ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে ফারাক দেখা যায় তার উল্লেখ করেন। তারপর থেকে ব্যবস্থাপকদের উপর বিভিন্ন দেশে প্রচুর গবেষণা হয়। শুধু তাই নয়, সাহিত্যেও ব্যবস্থাপকেরা একটি স্থান করে নেন। শংকরের উপন্যাস, 'সীমাবদ্ধ' এমনই একটি উপন্যাস যা ব্যবস্থাপকদের সমাজ বিশ্লেষণ করে।

আমরা এই শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। ১) বেশিরভাগ ব্যবস্থাপক মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কেরল বা পাঞ্জাব থেকে আসেন। কিছু ব্যবস্থাপক পাকিস্তানে যে এলাকা পড়েছে সেগুলি থেকেও আসেন। ২) বেশিরভাগ ব্যবস্থাপক প্রবাসী, অর্থাৎ তাঁরা যে রাজ্যে জন্মেছিলেন, সে রাজ্যের বাইরে থাকেন। ৩) তাঁরা যে রাজ্যে জন্মেছেন, সে রাজ্যের ভাষায় কথা বলেন না। ৪) বেশিরভাগ ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ এবং উচ্চজাতের অব্রাহ্মণ। বণিক শ্রেণী (অর্থাৎ মাড়ওয়ারী বা বানিয়া) থেকে নগণ্য সংখ্যক ব্যবস্থাপক আসেন। ৫) বেশিরভাগ ব্যবস্থাপক মধ্যবিত্ত বা

উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হয়। ৬) উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবস্থাপকদের প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি আছে। ৭) তাঁদের দু'টি স্তরের মধ্যে দিয়ে নিয়োগ করা হয়। প্রথম ধাপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ ব্যবস্থাপক পদপ্রার্থী হন। দ্বিতীয় ধাপে এই প্রার্থীদের মধ্যে থেকে কিছু নিয়োগ করা হয়। সংগঠনে যোগ দেবার পর কিছু ব্যবস্থাপকদের পদোন্নতি অন্যদের থেকে দ্রুতগতিতে হয়। ৮) আমলাতন্ত্রের আধিকারিকদের সঙ্গে ব্যবস্থাপকদের সামাজিক দিক অনেক মিল আছে। শুধু আমলাতন্ত্রে নিম্ন মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারী নিয়োগ নীতির জন্য। ৯) বৃহৎ শিল্পপতিদের সন্তানদের মধ্যে খুব কম ব্যবস্থাপক পাওয়া যায়। ১০) ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকদের সঙ্গে ব্যবস্থাপকদের মিলের থেকে অমিল বেশি। ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকেরা বেশিরভাগ গ্রাম্য করিগর, ইত্যাদি। ইঞ্জিনীয়ার ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক অশিক্ষিত।

সাংগঠনিক সংস্কৃতির তারতম্যের উপর ব্যবস্থাপক শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে তফাৎ দেখা যায়। পিতৃতান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে ধ্যানধারণার তফাৎ, চাকুরীতে পদোন্নতি, কাজের ধরন, ইত্যাদি অনেক রকম তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। একটি পিতৃতান্ত্রিক সংগঠনে সাধারণত ব্যক্তিগত আনুগত্য দাবি করা হয় এবং বৃত্তিগত কার্যগুলিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে নিয়মকানুনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত আনুগত্য নয়, সাংগঠনিক আনুগত্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পিতৃতান্ত্রিক সংগঠনে ব্যবস্থাপকরা কম বয়সে উচ্চপদ অধিকার করেন। বেশিরভাগ ব্যবস্থাপক সাধারণত প্রশাসনিক কাজ করেন এবং তাঁদের মূল্যবোধ এবং নিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে এই সংস্কৃতির ছাপ থাকে। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি বেশী বয়সী ব্যবস্থাপকেরা অলংকৃত করেন। এঁরা আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে সংগঠন চালান এবং কম বয়সে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী হন। তাদের সাংগঠনিক জীবন আমলাতান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা এবং তাঁদের মূল্যবোধ এই আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রতিফলিত করে।

ব্যবস্থাপক শ্রেণী শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পপতিরা শিল্পসংগঠন তৈরি করে কিন্তু ব্যবস্থাপকেরা এই সংগঠন চালায়। ব্যবস্থাপনার চাকুরী আজ খুব লোভনীয়। কারণ একজন ব্যবস্থাপক শুধু ভাল বেতন পান না, সমাজে সম্মানও পান। তাই ব্যবস্থাপনাবিজ্ঞান পড়বার জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এত উৎসাহ।

**গ) ভারতের শ্রমিক শ্রেণী**

ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব উনবিংশ শতকে। ইংরেজরা তাঁদের জাতীয় স্বার্থে রেল চালু করেছিলেন ভারতবর্ষের সুদুর প্রান্ত থেকে কাঁচামাল সরবরবাহ করবার জন্য। সুকোমল সেনের মতে, রেল তৈরীর সময়ে যে শ্রমিকেরা কাজ করে তারাই আধুনিক ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বসুরী।

ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবের পিছনে কতকগুলি কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, উনবিংশ শতকের শেষ অর্ধে ভারতে শিল্পায়ন আরম্ভ হয়। চিরাচরিত হস্তশিল্পগুলি ইংরেজদের স্বার্থে ধ্বংস হয় এবং বেকার কারিগরেরা প্রথম দিকে চাষাবাদে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। পরে, যখন রেলপথ নির্মিত হয় এবং কিছু কিছু শিল্প অপরিকল্পিতভাবে গজিয়ে ওঠে তখন সর্বনিম্ন শ্রেণীর একাংশকে কারখানায় চাকুরী করতে দেখা যায়। কিন্তু প্রথমত, এই কারিগরেরা শিল্পে ঢোকার পর তাদের কারিগরি বিদ্যা হারায় এবং প্রথম দিকে তাঁরা কোনও শিল্পের কাজ জানতেন না। দ্বিতীয়ত, যাঁরা শিল্পে নিয়োজিত হ'তেন তাঁরা কৃষিকাজ থেকে তাঁদের গ্রাম্য কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস নিয়ে শিল্পে আসতেন। এর ফলে ভারতে একটা শ্রমিক শ্রেণী জন্মায়, যে শ্রেণীর মধ্যে কোনও আধুনিক ধ্যানধারণা নেই।

প্রথম থেকে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী কতগুলি সমস্যায় ভুগছিল। প্রথমত, অধিকাংশ শ্রমিকের হতদরিদ্র অবস্থা এবং খুব নিম্নমানের জীবনযাত্রা ছিল। দ্বিতীয়ত, এই অমানবিক অবস্থার ফলে ইংরেজদের অন্য উপনিবেশ, যেমন গায়ানা, মরিশাস প্রমুখ জায়গায় ভারতীয় শ্রমিক রপ্তানী করা সহজ হ'ল। তৃতীয়ত, বিদেশে অভিবাসন ছাড়াও ভারতীয় ধনতন্ত্রের একপেশে সম্প্রসারণের ফলে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনও ঘটালো।

প্রথম দিকে কারখানার শ্রমিকের খুব অভাব ছিল। নানারকম পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে শিল্পে নিয়োগ হ'ত। ভারতীয়রা শিল্পে কাজ করতে শুরু করে তাদের জমি থেকে উৎখাত হওয়ার জন্য। বিভিন্ন শিল্পের মালিকেরা কিছু দালালদের উপর শ্রমিক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়। এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল; যেমন, সর্দার, মিস্ত্রি চৌধুরী, মুকাদাস ইত্যাদি। সে শুধু নিয়োগ কর্তা ছিল না; সে শ্রমিকদের প্রধান ছিল। তাঁর দু'টো কাজ ছিল। প্রথমত, যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ এবং তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা। এই দুটো কাজ তাকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছিল। এবং স্বাভাকিভাবে সে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রমিকদের যথেচ্ছ শোষণ করত।

আস্তে আস্তে এই ব্যবস্থার বদল হ'ল। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারখানার চাকুরী অর্থ রোজগারের একটি সম্মানজনক উপায় বলে স্বীকৃত হল এবং শ্রম-বাজারে চাকুরীর উমেদার বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দিল। ফলে দালাল শ্রেণীর বিলুপ্ত ঘটল এবং নিয়োগের কাজ বৃহৎ সংস্থাগুলিতে ব্যবস্থাপকবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত স্নাতকদের তত্ত্বাবধানে এল। এখন একটি কারখানায় চাকুরী পেতে গেলে নানা রকমের প্রভাব খাটাতে হয়। এর কারণ হচ্ছে বৃহৎ সংগঠিত শিল্পে শ্রমিকের শুধু চাকুরীর নিরাপত্তা আছে তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেতন কাঠামো, ইত্যাদিও অনেক উন্নত হয়েছে। তাই শিল্পে কাজ পাওয়া কঠিন হ'লেও শিল্পে চাকুরী লোভনীয়। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি হ'ল—

প্রথমত, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বেতন কাঠামোয় তফাৎ রয়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি সবচেয়ে ভাল বেতন দেয়। তারপর ভাল বেতন দেয় ব্যক্তিগত মালিকানায় চালিত বড় কোম্পানীগুলি। ক্ষুদ্র ও অসংগঠিত শিল্পে বেতন সবচেয়ে কম।

দ্বিতীয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ অপ্রীতিকর এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। শ্রমিকদের অনেক সময় বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করতে হয়। কারখানা পরিদর্শকেরা অনেক সময় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন না বা নেন না।

তৃতীয়ত, চাকুরীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে তফাৎ রয়েছে। যে সব শ্রমিক বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তাঁদের চাকুরীর নিরাপত্তা আছে এবং তাঁদের চাকুরী তাঁদের কাছে একটা বৃত্তি। এই বৃত্তিতে প্রতি বছর যেমন বেতন বাড়ে, তেমনি পদোন্নতির সম্ভাবনাও থাকে এবং প্রভিডেন্ড ফাণ্ড, বোনাস ছুটি প্রভৃতি তাদের চাকুরীর সুযোগ সুবিধার মধ্যে আছে।

কিন্তু বেশিরভাগ শ্রমিকের কোনও কাজের নিরাপত্তা নেই। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের উপর অধিকাংশ শ্রমিকের চাকুরী নির্ভর করে।

চতুর্থত, বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকদের সামাজিক বৃত্তও আলাদা। চার ধরনের শ্রমিক দেখা যায়। ১) সংগঠিত শাখার শ্রমিক। ২) অসংগঠিত শাখার শ্রমিক যাদের আইনকানুনের রক্ষাকবচ নেই। ৩) অদক্ষ দিন মজুর। ৪) স্বনিযুক্ত কর্মী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে নানা রকমের বিভাজন আছে। প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকদের থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমিকেরা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সংগঠিত ক্ষেত্রে কিছু কিছু আইনী রক্ষাকবচ থাকলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে এগুলি মানা হয় না। তাই আমরা দেখি যে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু শ্রমিকের নিয়োগ বেশি হয়। এদের নগণ্য মজুরীতে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হয়। সংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন সুযোগ ও সুবিধা, যেমন ন্যূনতম মজুরী, প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য বীমা, অসুখ বা অন্য প্রয়োজনে ছুটি ইত্যাদি এরা ভোগ করে না।

ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে উপরে উল্লেখিত বিভাজন থাকলেও তারা একটি শ্রেণী বলে গণ্য হয়। তাদের সঙ্গে শিল্পপতি বা পুঁজিপতিদের সাধারণত বৈরি সম্পর্ক দেখা যায়। শ্রমিক কারখানায় কাজ করে কতকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য। যেমন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক মর্যাদা, ভাল কাজের, পরিবেশ, অবসর বিনোদন, ইত্যাদি। কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করতে গেলে তাকে সংঘবদ্ধ হ'তে হয়। তাই তারা শ্রমিক সংঘ (Trade Union) গড়ে। Clegg এর মতে, একটি ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ হচ্ছে কর্মচারীদের একটি জোট যার উদ্দেশ্য হ'ল নিয়োগ কর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা যাতে বেতন এবং কর্মচারীদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি হয়। এই নিয়ন্ত্রণ তিন ভাবে হ'তে পারে (১) শ্রমিক সংঘের একতরফা নিয়ন্ত্রণ; (২) মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের সংঘের যৌথ দরকষাকষি; (৩) রাষ্ট্রের বিদ্ধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ। উটকিনের মতে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অর্থনৈতিক সংগ্রামের বিদ্যালয়, যে বিদ্যালয়ের সর্বহারা (শ্রমিক) শ্রেণীকে তাঁদের শ্রেণী স্বার্থ চিনতে শিখিয়েছিল।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভারতের শিল্পায়নের হাত ধরে এগিয়েছে। প্রথম দিকে এই শ্রমিক সংঘগুলি স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু ১৯৬২ সালে Indian Trade Unions Act পাশ হয়। এই আইন অনুসারে একটা শিল্প সংস্থায় যে কোন সাত জন শ্রমিক মিলে একটি শ্রমিক সংঘ গড়তে পারে। বর্তমান ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। ভারতবর্ষে আজ কতকগুলি সর্বভারতীয় শ্রমিক মহাসংঘ (Federation) আছে যারা শ্রমিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে। তার মধ্যে রয়েছে Indian National Trade Union Congress (INTUC), All India Trade Union Congress-(AITUC), Hind Mazdoor Sabha (HMS), United Trade Union Congress (UTUC), Centre For Indian Trade Unions (CITU) ইত্যাদি।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পীঠস্থান হ'ল মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ। কোনও কোনও শিল্প, যেমন বস্ত্র, লোহা বাগিচাশিল্প, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে অতি ক্ষমতাশালী শ্রমিক সংঘ রয়েছে। যদিও প্রাক স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীন ভারতে শ্রমিক আন্দোলন একটা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকা নেয়, তবুও কিছু কিছু সমস্যা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

সব শ্রেণীর মতো ভারতে শ্রমিক শেণী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তারাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। বর্তমান ভারতেও তারা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তাদের শ্রেণী স্বার্থের সুরক্ষার জন্য আন্দোলনে অনেকবার নেমেছে। জয় ও পরাজয় দুই-ই হয়েছে। এখন শ্রমিক শ্রেণী ভারতের

একটি শক্তিশালী শ্রেণী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে এই শ্রেণীর প্রতি নজর দিতে হয়। তাই আমরা দেখি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠন আছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে শ্রমিক ঐক্য নষ্ট হয়েছে। অনেকসময় বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মধ্যে সংঘাতের কুফল সাধারণ শ্রমিকের উপর পড়েছে।

**অনুশীলনী-৭**

১) ব্যবস্থাপক শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর কী তফাৎ?

২) বর্তমান ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর কী কী বৈশিষ্ট্য আছে?

৩) ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যাগুলির ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

**ঘ) ভারতের কৃষিভিত্তিক শ্রেণী**

ইতিপূর্বে আপনি শিল্পভিত্তিক শ্রেণীর সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছেন। ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে শিল্পভিত্তিক শ্রেণীর অবস্থান। এটা ঠিক যে, শিল্পাঞ্চলের শ্রেণীগুলি ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে খুব প্রভাব ফেলে। কিন্তু ভারতের জনসাধারণের সিংহভাগ বাস করেন গ্রামে এবং তাঁদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নগরকেন্দ্রিক শিল্পভিত্তিক শ্রেণীর থেকে কিছু কম নয়। গ্রামাঞ্চলে মূল বৃত্তি হচ্ছে কৃষি এবং কৃষির সঙ্গে কিছু শ্রেণী জড়িয়ে আছে। আসুন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করি।

কৃষি ক্ষেত্রে একজন লোক কোন্ শ্রেণীর তা নির্ভর করে জমির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক তার উপর। কৃষিক্ষেত্রে স্তর বিন্যাসের উপর নানা জনের নানা মত। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাংলার গ্রামাঞ্চলে তিনটে শ্রেণীর কথা বলেন। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে জমির মালিক ও তত্ত্বাবধায়ক কৃষক। দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষক এবং কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ফেলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে বর্গাদার কৃষিশ্রমিক, অফিস বা শিক্ষাক্ষেত্রে চাকুরে (service holder) এবং অন্যান্য পেশার লোক রয়েছেন। শাহ, দুটো শ্রেণীর কথা বলেছেন; মালিক কৃষক এবং মালিক-ভাড়াটে কৃষক শুধু জমির মালিক। বাকিরা গ্রামীণ সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শাহের বিশ্লেষণের ভিত্তি জমির মালিকানা।

ড্যানিয়েল থরনার (Daniel Thorner) একটি কৃষি শ্রেণীর মডেল খাড়া করেছেন যা সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। থরনার কৃষি শ্রেণীগুলিকে মূলত তিনভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হ'ল (ক) মালিক (খ) কিষাণ এবং (গ) মজদুর।

(ক) মালিক হচ্ছে বৃহৎ ভূস্বামী, যাদের প্রধান আয়ের উৎস কৃষি জমি। মালিকেরা নিজেদের স্বার্থে জমির খাজনার হার বেশি রাখে এবং কৃষি মজুরদের বেতম কম দেয়। তাঁরা প্রজাদের, উপ-প্রজাদের এবং বর্গাদারদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে। এদের মধ্যে আবার দু'টি ভাগ রয়েছে।

(১) বৃহৎ ভূস্বামীরা হচ্ছে মালিক শ্রেণীর একাংশ, যারা বৃহৎ ভূখণ্ডের মালিক। তাঁরা সাধারণত অনাবাসী হন এবং জমির উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

(২) ধনী ভূস্বামীরা মালিক শ্রেণীর একাংশ। বৃহৎ ভূস্বামীদের সঙ্গে মিল এইটুকু যে, দুই শ্রেণী প্রচুর জমির মালিক; কিন্তু অমিলও রয়েছে। যদিও ধনী ভূ-স্বামী শ্রেণী মাঠে কাজ করেনা তবুও তাঁরা কৃষি পরিচালনায় এবং জমির ধান উন্নয়নে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান।

(খ) কিষাণ শ্রেণীর সদস্যরা কৃষিকর্মে লিপ্ত এবং জমির মালিকানা তাদের হাতে। কিন্তু তাদের জমির উপর অধিকার মালিকদের থেকে আইনগত বা প্রথাগত ভাবে নিকৃষ্ট। তাদের মধ্যে আবার দু'টি ভাগ রয়েছে।

প্রথমত, ক্ষুদ্র ভূস্বামী, যাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট জমি আছে। জমি চাষ করার জন্য তারা পরিবারের বহির্ভূত কৃষি জমি মজুর নিয়োগ করে না। প্রজাদের কাছ থেকে কোনও খাজনা পায় না।

দ্বিতীয়ত, অবস্থাপন্ন প্রজা কৃষক, এই শ্রেণী বেশ অবস্থাপন্ন এবং তাদের ভাড়া নেওয়া জমিতে তারা কিছু উদ্বৃত্ত ফসল ফলাতে পারে। তাদের প্রজাস্বত্ত্ব অধিকার মোটামুটি নিরাপদ।

(গ) মজুর শ্রেণী ঃ যারা অপরের জমিতে কাজ করে জীবিকা অর্জন করে। এদের তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) গরিব প্রজা কৃষকদের অবস্থাপন্ন প্রজা-কৃষকদের থেকে আর্থিক অবস্থা নিম্নমানের এবং প্রজাস্বত্ত্ব অধিকার নিরাপদ। তাদের জমির ফসল পরিবার পালন করবার জন্য যথেষ্ট নয় এবং কৃষি আয়ের থেকে অনেক সময় দিনমজুরীর আয় বেশি হয়।

(২) বর্গাদার ঃ যারা অনেক সময় প্রজা এবং বর্গারভিত্তিতে জমি চাষ করে। তাদের জমি না থাকলেও নিজস্ব চাষের উপকরণ, অর্থাৎ লাঙল, বলদ ইত্যাদি রয়েছে।

(৩) কৃষি শ্রমিক, যাদের নিজস্ব কোনও কৃষি উপকরণ ও জমি নেই এবং পরের জমিতে দিনমজুরী করে অর্থ উপার্জন করে।

এই নক্সা ছাড়া ধানাগারে একটি মডেল তৈরী করেছেন। সেখানে তিনি পাঁচটা বর্গের কথা বলেছেন। এগুলি হচ্ছে জমিদার, ধনী কৃষক, মধ্যম কৃষক, দরিদ্র কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিক। এগুলি যথাক্রমে থরনারের মালিক, ধনী ভূস্বামী ক্ষুদ্র জমির মালিক এবং স্বচ্ছল প্রজা, দরিদ্র প্রজা এবং ভূমিহীন কৃষি মজুরের সঙ্গে তুলনীয়।

ভারতের কৃষি ব্যবস্থা অসাম্যে ভরা। যে মডেলই আমরা ব্যবহার করি না কেন, সেই মডেল আমাদের ভারতের গ্রামাঞ্চলের অসাম্যের চিত্রটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থা তদন্তের জন্য একটা কমিটি কমানো হয়।

**সারণী নং ৮.১**

| **জমির আয়তন** | **মোটকৃষি জমির কতটা** | **মোট কৃষকদের কত ভাগ মালিক** |
|---|---|---|
| ১ একরের কম | ১% | ১৭% |
| ১-২$^{১}/_{২}$ একরের কম | ৪.৬% | ২১% |
| ২$^{১}/_{২}$-৫ একর | ৯.৯% | ২১% |
| ১০-২৫ একর | ৩২.৫% | ১৬% |
| ২৫ একরের বেশি | ৩৪% | ৫.৬% |

**সূত্র ঃ** *Report of the Agricultural Labour Enquiry, Rural Manpower and Occupational Structure, 1954.*

এই কমিটিতে যে সমীক্ষা চালিয়ে ছিল তা থেকে কতকগুলি চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যায়। যেমন ১ একরের কম জমি, যা মোট জমির এক শতাংশ, তা চাষ করে কৃষি ক্ষেত্রের ১৭% মানুষ কিন্তু ২৫ একরের উপর জমি, যা মোট কৃষি জমির ৩৪%, তা চাষ করে ৫.৬% কৃষিজীবী (সারণী-১)। আরও দেখা গেছে যে, মালিক অধিকৃত খামারের আয়তন ১১.৩৭ একর, ভাড়াটে অধিকৃত খামার আয়তন ৭.৭৪ একর, কৃষি মজুরদের খামার ২.৮৬ একর এবং চাষী নয় এমন ব্যক্তির খামারের আয়তন ৩.১০ একর। মোট জমির ৫১% জমি মালিক দ্বারা অধিকৃত। ৩৭ শতাংশ প্রজাদের বা ভাড়াটের দ্বারা, কৃষি শ্রমিক ৮% ও কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত নয় এমন শ্রমিকেরা ৪% জমি অধিকার করেছে।

কৃষিক্ষেত্রে এই স্তর বিন্যাসের ফলে এবং জমির অতিমাত্রায় অসম বন্টনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা মার খাচ্ছে। থরনারের মতে, ভারতের কৃষিক্ষেত্রে আইনগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের জটিলতার ফলে উৎপাদনশীলতা নিম্নমানের। কয়েক শতক ধরে এই সম্পর্কগুলি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে দেয় নি। এটাই হচ্ছে সেই depressor যার কথা থরনারের লেখায় পাই। যদি এই ধারণা কৃষকদের মধ্যে থাকে যে নিম্নজাতই শুধু কায়িক পরিশ্রম করবে এবং উচ্চজাতের লোকেরা তার সুফল ভোগ করবে তবে চাষীরা কেন উৎপাদনে বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হবে? ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে শুধুমাত্র উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে চলবে না। দরকার কৃষি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। ইংরেজ আমল থেকে সাধারণ কৃষকেরা এই পরিবর্তনের জন্য লড়াই করেছেন। তেভাগা, নকশালবাড়ি, আরও কত আন্দোলন হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু সরকার, সে যে প্রদেশেরই হোক না কেন, এই আন্দোলনগুলিকে নির্মমভাবে দমন করা ছাড়া আর কিছু করে নি। ভূমি সংস্কার ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্গা নথি ভুক্ত করার মাধ্যমে এই শ্রেণীকে কিছু অধিকার দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ভারতীয় গ্রামে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়নি। তাই পরিবর্তন না হ'লে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে না এবং ডঃ স্বামীনাথনের সাবধান বাণী, যে ভারত খুব শীঘ্রই খাদ্য সংকটে ভুগবে তা দুর্ভগ্যজনকভাবে সত্যে পরিণত হবে।

## অনুশীলনী-৮

১) নিম্নলিখিত কোন্ বর্গের লোক কৃষি শ্রেণীর নয়?

(ক) জোতদার, (খ) খেতমজুর, (গ) ডাকপিয়ন, (ঘ) কোনটাই নয়।

২) গ্রামাঞ্চলে কোন্ কোন্ শ্রেণী কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত? এব্যাপারে থরনারের মতামত আলোচনা করুন।

৩) শিল্পভিত্তিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষিভিত্তিক শ্রেণীর কী তফাৎ?

### (ঙ) ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী

বর্তমান অংশে আপনি এমন একটি শ্রেণীর সঙ্গে পরিচিত হবেন যার সদস্যরা বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে যুক্ত ; যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, গবেষক, করণিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। এঁরা কোনও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। কিন্তু তাঁরা সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁদের আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ফেলি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞাদান অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিদেশে বুথ, হজস্কিন, এরিক অলিন রাইন প্রমুখ পণ্ডিতেরা এবং ভারতে বিনয় ঘোষ, বি. বি. মিশ্র প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী মধ্যমস্থান অধিকার করে আছে। এককালে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে বোঝাত। কিন্তু বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে আর বুর্জোয়া শ্রেণীকে বোঝান না।

ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা যাবে না; কারণ সেই শ্রেণী দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটা ভাগ হ'ল বুর্জোয়া। এদের মধ্যে পাওয়া যায় বৃহৎ শিল্পপতি, বণিক, প্রমুখ। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। দ্বিতীয় ভাগটিকে আমরা পাতি বুর্জোয়া বা ছোট বুর্জোয়া বলতে পারি। এরা শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু এরা উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয় নি। হজস্কিনের মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধনিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর অদ্ভুত মিশ্রণ। মানসিক দিক থেকে তারা শ্রমিকদের থেকে আলাদা। বুথের একটি উদাহরণ এক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও একজন কেরাণী এবং একজন কারখানার শ্রমিকের মধ্যে বেতনের পার্থক্য নগণ্য, তবুও মানসিক দিক থেকে তাদের মধ্যে অনেক তফাৎ। বিয়ন ঘোষ, বুথ ও হজস্কিনের মতামত মেনে নিয়েছেন বি. বি. মিশ্র। তাঁর মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের একটা মাঝারি স্তর যার মধ্যে নানা ধরনের বৃত্তি দেখা যায় এবং যাদের ব্যবহার একই ধরনের হয়। এই স্তরের লোকেরা কতগুলি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিশ্বাস করে এবং সেগুলি তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রকাশ পায়। এরিক অলিন রাইটের মনে করেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তিন ধরনের রণকৌশল অবলম্বন করতে পারে। (১) তারা প্রধান শোষক শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে; (২) তারা প্রধান শোষক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মেলাতে পারে, কিংবা (৩) প্রধান শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। এককথায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি দোদুল্যমান শ্রেণী। তারা শ্রেণীস্বার্থের উপর নির্ভর করবে কোন্ সময় তার রণকৌশল কী হবে।

এবারে আমরা ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে পরিচিত হই।

বি. বি. মিশ্র ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এগারোটা বর্গে ভাগ করেছেন। নিম্নলিখিত সমষ্টিগুলি মধ্যবিত্ত স্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ঃ

১) আধুনিক বণিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বণিক, দালাল ও মালিক, (বৃহৎ পুঁজিপতি) যারা পাইকারি ব্যবসা করে, উৎপাদন করে বা আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত।

২) বেশিরভাগ বেতনভুক্ত উচ্চপদাধিকারী কর্মচারী, যেমন ব্যবস্থাপক, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি কর্মীবর্গ, যারা ব্যাঙ্ক, ব্যবসা বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত।

৩) বিভিন্ন সংগঠনের (যেমন বণিকসভা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিকসংঘ) উচ্চপদাধিকারী আধিকারিকবৃন্দ।

৪) জনপালক কৃত্যক (নির্বাহী ও বিচারক) বিভাগে কর্মরত আধিকারিক (সর্বোচ্চ পদগুলি বাদ)।

৫) মূল পেশাগুলির (যেমন উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, উচ্চস্তরের লেখক ও শিল্পীবৃন্দ, পুরোহিত) সদস্য।

৬) মধ্যম পর্যায়ের কৃষক, যারা কৃষিক্ষেত্রে বিনা রোজগারের আয়ের উপর নির্ভরশীল।

৭) উচ্চবিত্ত দোকানদার, হোটেসের মালিক, ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক, এবং যৌথ কোম্পানীর আধিকারীকগণ।

৮) গ্রামীণ উদোক্তা, যারা বাগিচা শিল্পে নিয়োজিত।

৯) উচ্চ শিক্ষাগ্রহণরত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

১০) করণিক এবং অন্যান্য আপিস কর্মচারী।

১১) স্কুল শিক্ষক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী।

ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজ আমলের ফসল। মধ্যযুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। ভারতের কুটিরশিল্প খুব উন্নত ছিল। পেশাদারী নৈপুণ্য ছিল। বণিক শ্রেণী বিভিন্ন সংঘে সংগঠিত ছিল। তাদের এই সংঘগুলির বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। আদিকাল হ'তে, ভারতবর্ষে একটি অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। বিদেশীরা ভারতের স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার উৎকর্ষের প্রশংসা করেছেন। তবুও মধ্যযুগের ভারতে ধনতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। তার কতকগুলি কারণ আছে।

(১) রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বণিকদের অনুকূলে ছিল না। রাজপুরুষ ও পুরোহিত মহল অনেক সময় বণিকদের বিরুদ্ধাচরণ করত। এখানকার পুগ (guild) ব্যবস্থার পেছনে রাজনৈতিক সমর্থন ছিল না। তাই স্থায়িত্ব খুব কম ছিল। জাতপাত ব্যবস্থাও এখানে একটি নেতিবাচক ভূমিকা পালন করত। অনেক সময় রাজা ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় জাতপাত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করত এবং বণিক সংঘের বিরুদ্ধে উচ্চজাতদের ক্ষেপিয়ে তুলত। রাজা নিজে বা রাজপরিবারের লোকজনও ব্যবস্থা করতেন। ফলে তারা নিজেদের স্বার্থে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতেন।

২) আদর্শগত দিক থেকেও অবস্থাটা বণিকদের বিরুদ্ধে ছিল। পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণী ব্যবসাকে ঘৃণার চোখে দেখত। বেশিরভাগ বণিক শিক্ষিত ছিল না। তাদের জ্ঞান মূলত জাগিতক ছিল। পিতৃ-পিতামহের কাছে শেখা জ্ঞান তারা ব্যক্তিগত ও বণিক জীবনে কাজে লাগাতো; পিতার পেশা পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করত। ফলে পেশাগত নৈপুণ্য (occupational specialization) হ'ত। শিক্ষা বা গবেষণার ভিত্তিতে এই নৈপুণ্য হ'ত না। এই নৈপুণ্যের ভিত্তি ছিল উত্তরাধিকার।

মিশ্রর মতে, মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ার উন্নয়ন হওয়া জাত-সংগঠনের স্থবিরত্ব এবং আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচারিতার ফলে তা হয় নি। মধ্যবিত্ত সমাজ জাতপাতের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছিল। জাতপাত জমিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ ছিল এবং উত্তরাধিকার নির্ভর করত জাতের বাধ্যবাধকতা পূরণ করার উপর।

ইংরেজ আমলে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। ইংরেজরা ভারতে তাদের নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এনেছিল যেগুলি স্থানীয় অবস্থা বুঝে কিছুটা বদল করেছিল। ইংরেজরা ভারতে এমন এক শ্রেণী তৈরী করেছিল যা তাদের মতো হবে এবং তাদের দেশ শাসন করতে সাহায্য করবে। মিশ্র সঠিকভাবে বলেছেন যে, ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল অনুকরণকারী শ্রেণী। এই শ্রেণী নতুন মূল্যবোধ বা পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল না। হিন্দুদের চিরকাল শিল্পের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং ইরেজ সরকারের প্রশাসনিক প্রযোজনের ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কুক্ষিগত ছিল এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে ইংরেজরা প্রশাসনিক কৃত্যকের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করে। শিক্ষিত ভারতীয়রাও প্রশাসনিক কৃত্যকে যোগ দিয়ে ক্ষমতার অধিকারী হ'তে চাইতেন। ফলে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইউরোপীয়দের হাতে ছিল। ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণীর আস্তে আস্তে উন্মেষ ঘটেছিল।

শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে ভারত মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টির দিকে এগোতে লাগলো। যদিও এই শ্রেণীর মধ্যে নানারকম পেশার ও মানসিকতার লোক ছিল তবুও তাদের আচার, ব্যবহার, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ ও চিন্তার মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষিত পেশাগুলির লোকেরা, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল ইত্যাদি গোষ্ঠী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সিংহভাগ দখল করে আছে।

**অনুশীলনী-১০**

১) মধ্যবিত্ত শ্রেণী কাকে বলে?

২) ভারতের কোন্ কোন্ শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়?

৩) আধুনিক ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব কীভাবে হয়?

৪) আধুনিক ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কী ভূমিকা পালন করছে?

## ৮.১১ অনগ্রসর শ্রেণী

অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদ শ্রেণীর ধারণা সমাজতাত্ত্বিক নয়, সাংবিধানিক। ভারতের সংবিধানের ''মৌলিক অধিকার'' (Fundamental Rights) পরিচ্ছেদে অনগ্রসর শ্রেণীর কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়। সংবিধানের ১৫(৪) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যদিও রাষ্ট্র কারো বিরুদ্ধে লিঙ্গ, ধর্ম, জন্মস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য করবে না তবুও রাষ্ট্র সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণীগুলি এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে। আবার ১৬(৪) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যদিও রাষ্ট্রীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সবাইকে সম অধিকার দেবে তবুও রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণ চালু করতে পারে।

যদিও সংবিধানের জনকেরা backward classes বা অনগ্রসর শ্রেণীর কথা বলেছেন, কোন্ গোষ্ঠীগুলিকে এই বর্গে ফেলা হবে তা তাঁরা নির্দিষ্ট করেননি। ফলে এ নিয়ে যেমন ভারতীয় রাজনীতিতে জল ঘোলা হয়েছে, সমাজতত্ত্ববিদরাও বিভ্রান্ত বোধ করেছেন।

অনগ্রসর শ্রেণী কাকে বলা হবে তার জন্য ভারত সরকার দ্বারা দু'টি কমিশন বসানো হ'ল অনুন্নত শ্রেণীকে চিহ্নিত করার জন্য এবং তাদের আর্থ-সামাজিক কী কী ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য। কমিশন জাতপাতের ভিত্তিতে অনুন্নত শ্রেণীকে চিহ্নিত করার কথা বলে। তারা জাতগত মর্যাদার মাপকাঠিতে যে সব জাত নিম্নবর্গে অবস্থান করছে তাদের অনুন্নত হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ২৩৯৯টি জাতকে অনগ্রসর হিসাবে ঘোষণা করে যার মধ্যে ৮৩৭টির বেশি অনগ্রসর এই জাতগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ খারিজ করে দেন এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণী নেওয়া উচিত-এই বলে রায় দেন। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক মাপকাঠিকে প্রধান মাপকাঠি হিসাবে বেছে নেবার সমর্থনে রায় দেন। সুপ্রিমকোর্ট সংরক্ষণের ঊর্দ্ধসীমা ৫০%-এ বেঁধে দেয়। কিন্তু, বেশিরভাগ রাজ্য সরকার জাতকে অনগ্রসরতার নির্দশন হিসাবে মেনে নেয় এবং সেইভাবে সংরক্ষণের কাজ চলতে থাকে। যেসব রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণ আন্দোলন অনেক আগে থেকে ছিল সেখানে জনসাধারণের সিংহভাগকে জাতের ভিত্তিতে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করা হয়। যেমন, কর্ণাটকে এই ভাবে ৯০% জনসাধারণকে অনগ্রর হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তামিলনাড়ুতে ১৯৮০ সালে সরকার অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষণের পরিমাণ ৩১% থেকে ৫০% করে এবং একটি কমিশন গঠন করে।

১৯৭৯ সালে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বিন্দেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে গঠিত হয় দ্বিতীয় অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন, যা ''মণ্ডল কমিশন'' বলে পরিচিত। ১৯৮০ সালে তার রিপোর্ট দাখিল করা হয়। কালেলকর কমিশনের মতো মণ্ডল কমিশনও জাতকেই অনুন্নতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে।

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের দু'টি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। প্রথমত, ৩৭৪৩টি জাত-গোষ্ঠীকে অনগ্রসর জাত

হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু অহিন্দু গোষ্ঠীকেও এর বৃত্তে আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য কমিশন ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ সুপারিশ করেছে। জাতীয় স্তরে তফশিলী জাতের জন্য ১৫% আর তফশিলী উপজাতির জন্য ৭.৫% হারে সংরক্ষণ নীতি চালু ছিল। কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মোট সংরক্ষণের ৫০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

মণ্ডল কমিশনের এই সুপারিশ বিতর্কের ঝড় তোলে। সমাজবিজ্ঞানীরা বরাবরই জাতভিত্তিক সংরক্ষণের বিরোধীতা করে এসেছেন। অনেক আগে আগে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ, নির্মলকুমার বসু সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ চালু করার বিরোধীতা করেছেন। তিনি যে সময় লিখেছেন সে সময় কালেলকর কমিশন গঠন হয়েছিল। I. P. Desai এর মত এ ব্যাপারে আরো প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে ঃ ১) অনগ্রসর শ্রেণীর ভিত্তি জাতপাতকে করলে অনগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলনের বিরোধীতা করা হয়, কারণ এই আন্দোলনগুলি জাতকে মানতে রাজি ছিল না। ২) সংবিধানে সমতার নীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জাতভিত্তিক সংরক্ষণ এই নীতির বিরোধী। আঁদ্রে বেতেই মনে করেন যে, অনগ্রসর শ্রেণীর সমস্যা হচ্ছে অসম সমাজ সাম্য অর্জন করা। উনি আরও দেখান যে, ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অনগ্রসরতাকে সমষ্টির বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে, ব্যক্তির নয়। অনগ্রসর শ্রেণীকে অসম সমাজে সাম্য অর্জন করবার জন্য সাহায্য করা উচিত। কিন্তু উৎকর্ষ নীতি ও ক্ষতিপূরণ নীতির মধ্যে ভারসাম্য রাখা উচিত।

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ বা তা খারিজ করার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী বা রাজীব গান্ধীর সরকার কোনও পদক্ষেপ নেয় নি। তারপর একরকম আচমকাই ১৯৯০ সালে শ্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তাঁর সরকারের সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশরগুলি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। তার ফলে উচ্চ জাতের মধ্যে এক প্রচণ্ড ক্ষোভ দানা বাঁধে।

মণ্ডল কশিনের সুপারিশকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শেষ অবধি সুপ্রীম কোর্টে যায়। ১৯৯৪ সালে উচ্চতম ন্যায়ালয় তার রায়ে যা বলেন তার মূল বিষয়গুলি হ'ল ঃ ১) কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে অনুন্নত জাতগুলোর জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ আইনসিদ্ধ ২) সমস্তটা মিলিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ৫০ শতাংশের বেশি হবে না। ৩) অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চতর অংশ (creamy layer) সংরক্ষণের সুবিধা পাবে না, ৪) অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যে আরও ১০% এর কথা বলা হয়েছে তা বেআইনি এবং ৫) পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রথা (বেআইনি)।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের এই রায় বিতর্কে যবনিকা টানে নি। বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংবিধান সংশোধিত করে কিছু কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহ পায়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদালতের রায়ের প্রথমটি ছাড়া বাকি সমস্ত ক্ষেত্রকেই পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে অনুন্নতিকে সামাজিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

**অনুশীলনী-১১**

১) অনগ্রসর শ্রেণী কী? এই বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২) মণ্ডল কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি কি কি?

## ৮.১২ সারাংশ

এই এককে আমরা আধুনিক ভারতের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিশ্লেষণ করলাম। আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে মূলত, দুই ধরনের স্তরবিন্যাস রয়েছে। এগুলি যথাক্রমে জাত ও শ্রেণী। আমরা জাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম যে, জাতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, বিবাহের ক্ষেত্রের বিধিনিষেধ, বৃত্তি বাছাইয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতা না থাকা ইত্যাদি। আমরা দেখলাম যে, জাত ও বর্ণের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। বর্ণের মূলত তত্ত্বগত তাৎপর্য রয়েছে কিন্তু আসল সামাজিক গোষ্ঠী হ'ল, জাত, পরিবার, বংশ ও আত্মীয়গোষ্ঠী। তপশিলী জাত আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম যে, যদিও তারা সাংবিধানিক কতকগুলি অধিকার লাভ করেছে, অস্পৃশ্যতা এখনও দূর হয় নি। তফশিলী জাতগুলি এখনও দারিদ্র্য ও অবহেলার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু প্রভাবশালী জাত গ্রামাঞ্চলে আসল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। জাতপাত ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল যে, এটা একটা নিশ্চল ব্যবস্থা যা ভারতে শতাব্দীর পর শতাবদী অপরিবর্তিত ভাবে বিরাজমান। কিন্তু শ্রীনিবাস আবিষ্কার করলেন যে জাতের মধ্যেও সচলতা রয়েছে যার নাম উনি দেন Sanskritization বা সংস্কৃতকরণ। সর্বশেষ, আমরা দেখি যে, আধুনিক ভারতে জাতপাত আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে উঠেছে; জাতপাতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক কাঠামাকে প্রভাবিত করছে।

জাতপাত ছাড়া আমরা আধুনিক ভারতে শ্রেণীবিন্যাসের ওপরেও আলোকপাত করেছি। আমরা দেখেছি মার্ক্স ও হ্বেবর শ্রেণী সম্পর্কে কী বলেছেন, তাদের ধারণার মধ্যে কী তফাৎ। এছাড়া আমরা আধুনিক ভারতে চারটি শ্রেণীর কথা বলেছি। প্রথমত শিল্পভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে আমরা বুর্জোয়া, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক ও শ্রেণী হিসাবে তাদের মধ্যে কী তফাৎ। কৃষিক্ষেত্রের শ্রেণীর সম্পর্কে নানা জনের নানা মত হ'লেও থরনারের মালিক, কিষাণ ও মজদুর শ্রেণীর মডেল সব থেকে গ্রহণযোগ্য। এখানেও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে যুক্ত না থাকলেও একজন উৎপাদন ব্যবস্থায় যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। অনগ্রসর শ্রেণীর উৎস সংবিধান থেকে। পঞ্চাশ বছরেও এর প্রকৃতি পরিষ্কার হ'ল না। তবুও এখন পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, মূলত কৃষিভিত্তিক জাতগুলিকেই অনগ্রসর জাতের মধ্যে ফেলা হয়েছে।

## ৮.১৩ অনুশীলনী

১) ভারতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

২) ভারতের জাত-পাতের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩) তপশিলীজাত সম্পর্কে নাতি দীর্ঘ রচনা লিখুন।

৪) অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল। বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি কি?

৫) সংস্কৃতকরণ কাকে বলে? সামাজিক কাঠামোর উপর সংস্কৃতকরণের প্রভাব কিরকম?

৬) জাতপাতের রাজনীতি কি ইংরেজ শাসনের ফল?

৭) সংক্ষেপে লিখুন

ক) যজমানি প্রথা

খ) জাত ও অবর-জাত

গ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী

ঘ) অনগ্রসর শ্রেণী

ঙ) ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন

## ৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জী


1. Melvin M.Tunin : Social Stratification : The Forms and Functions of the Equality, Prentice Hall, New Delhi, 1981.
2. S.C. Dubey : Indian Society, National Book Trust, India, New Delhi, 1992
3. G.S. Ghurye : Caste and Race in India.
4. P.N.Prabhu : Hindu Social Organisation, Popular Prakasan, Bombay.
5. A. R.Desai : Social Background of Indian Nationalism, Popular Prakasan, 1984.
6. M.N. Srinivas : The Dominant Caste and other Essays, OUP, 1987.
7. M.N. Srinivas : Social Change in Modern India, Orient Longman, Calcutta, 1984
8. Rijni Kottari : Caste in Indian Politics, Orient Longman, Calcutta.
9. K.L.Sarma : Social Stratification and Mobility, Rawat Publication, Jaipur, 1994
10. নির্মলকুমার বসু ঃ হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬।

# একক ৯ ❐ উপজাতিয় সমাজব্যবস্থা

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ ভারতীয় উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্য

৯.৪ উপজাতি পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক

৯.৪.১ জ্ঞাতি সম্পর্ক

৯.৪.২ উপজাতি বিবাহ

৯.৫ উপজাতি সমাজে মহিলার মর্যাদা

৯.৬ আদিম অর্থনীতির প্রকৃতি

৯.৬.১ লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন

৯.৬.২ উপজাতি সমাজে সম্পত্তি

৯.৬.৩ ভারতের আদিম উপজাতির অর্থনৈতিক জীবন

৯.৭ আইন ও ন্যায়

৯.৮ সংঘ ও শয়নকক্ষ

৯.৮.১ ভারতে উপজাতি গোটুল

৯.৯ সারাংশ

৯.১০ অনুশীলনী

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

## ৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন

- ভারতের উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্য কি কি।
- উপজাতি সমাজের বিবাহ, পরিবার ও জাতি সম্পর্কের ধরন
- আদিম অর্থনীতির প্রকৃতি
- আদিম সমাজে আইন ও ন্যায়ের স্বরূপ

## ৯.২ প্রস্তাবনা

বর্তমান এককে আপনি ভারতবর্ষের উপজাতি সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবেন। ভারতীয় সমাজের এক উল্লেখযোগ্য উপাদান হ'ল এই উপজাতিরা। এরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আন্দামানের অরণ্য থেকে বিহারের মালভূমি, উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকা-সর্বত্র তাদের বাস। বেশভূষা, ধর্ম প্রভৃতিতে এদের মধ্যে বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। কোনও কোনও উপজাতি সামাজিক দিক থেকে বেশ উন্নত। আবার অনেক উপজাতি আদিম স্তরে পড়ে আছে। কিন্তু এরা সবাই ভারতীয়। আসুন, এদের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হই।

## ৯.৩ ভারতীয় উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্য

সারা বিশ্বে উপজাতি সমাজের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত, উপজাতি সমাজ হয় মাপে ছোট; আইনগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকে সীমাবদ্ধ এবং তাদের নীতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, জীবনবীক্ষা ইত্যাদি এই সমাজানুগই হয়ে থাকে। তাদের যোগাযোগের ভাষাও হয় সাধারণত অলিখিত। এই ভাবে উপজাতি সমাজ বিশেষ উপজাতিকেন্দ্রিক প্রকৃতির হয়। কখনও দেখা যায়, উপজাতি সমাজে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মূলত জীবন ধারণ ভিত্তিক হ'লেও বাইরের ব্যবসা, বাণিজ্য বা বিনিময়ের প্রচলন থাকে। অনেক উপজাতি সমাজে গতিহীন ভারসাম্যের পরিবর্তে গতিশীল ভারসাম্য থাকে। উপজাতি সম্প্রদায়ের আরম্ভ বা শেষ কোথায় এবং কোথায় আধুনিক মানব সমাজের শুরু সে বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। আধুনিক মূল্যবোধের প্রসার, দ্রুত শিল্পায়ন, নগর উন্নয়ন, ইত্যাদির ফলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার সীমান্তরেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়েছে।

ভারতের উপজাতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, সমাজতত্ত্ববিদ এ, আর, দেশাই তুলে ধরেছেন। এগুলি হ'ল ঃ

১) এই উপজাতিরা সভ্যতার থেকে দূরে জঙ্গল বা পাহাড়ি এলাকায় থাকে।

২) এরা নেগ্রিটো, মঙ্গোল বা অষ্ট্রালয়েড জাতের হয়।

৩) এরা একই ধরনের উপজাতীয় উপভাষায় কথা বলে।

৪) এরা আদিম ধর্ম, অর্থাৎ সর্বপ্রাণবাদে (animism) বিশ্বাস করে। এই ধর্ম ভূত ও অশরীরীর পূজা।

৫) এরা আদিম পেশা, যেমন শিকার, জঙ্গল থেকে খাদ্য আহরণ, ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন ধারণ করে।

৬) এরা মূলত মাংস খায়।

৭) এরা নগ্ন থাকে কিম্বা গাছের ছাল বা পাতা ব্যবহার করে।

উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে গেলে তাদের সঙ্গে জাতভিত্তিক সমাজের তুলনা করা যায়। জাতভিত্তিক সমাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা উপজাতির মধ্যে নেই। প্রথমত, উপজাতি সমাজব্যবস্থা সাম্যের ভিত্তিতে রচিত। জাতভিত্তিক সমাজে অসাম্য প্রকট। দ্বিতীয়ত, জাতভিত্তিক সমাজ ক্রিয়ার বিনৈপুণ্যের (specialization) উপর রচিত বিভিন্ন কাজের মর্যাদা। উপজাতি সমাজে নৈপুণ্য মূলত বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক,

এর ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার তারতম্য হয় না। তৃতীয়ত, জাতভিত্তিক সমাজের ভিত্তি হ'ল স্তরবিন্যাস। উপজাতি সমাজে কোনও স্তরবিন্যাস নেই। চতুর্থত, উপজাতি সমাজে মহিলারা সামাজিকভাবে পুরুষের সমান মর্যাদা পায়। জাতভিত্তিক সমাজে মহিলারা সামাজিক দিক থেকে পুরুষের সমান নয়। পঞ্চমত, ট্রাইব বা উপজাতিদের মধ্যে লেখাপড়ার চল না থাকলেও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে। জাতভিত্তিক সমাজে জ্ঞানকে কিছু মানুষ কুক্ষিগত করে রাখে। এই জ্ঞানে সবার অধিকার নেই। ষষ্ঠত, উপজাতিদের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পত্তি (private) সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই যা জাত ব্যবস্থায় আছে।

যখনই একটি উপজাতি জাতভিত্তিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখনই তাদের জীবন সম্পর্কে ধারণা অনেকটা পাল্টে যায়। (১) জ্ঞাতি সম্পর্কের গুরুত্ব হারায়; (২) অর্থের গুরুত্ব উপজাতি সমাজে অনেক বৃদ্ধি পায়; (৩) পরের প্রতি নৈতিক কর্তব্যের বদলে ব্যক্তিস্বার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। (৪) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের সম্পত্তির ধারণার বদলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার জন্মায়। পুরাতন মূল্যবোধ, পরম্পরা ও সংগঠনগুলি গুরুত্ব হারায়।

**অনুশলীনী - ১**

১) ভারতের উপজাতি সমাজের কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

২) ভারতীয় উপজাতি সমাজের সঙ্গে জাতভিত্তিক সমাজের কী তফাৎ?

৩) জাতভিত্তিক সমাজভূক্ত উপজাতির কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

## ৯.৪ উপজাতি পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক

সাধারণভাবে 'পরিবার' বলতে বোঝায় একই সঙ্গে বসবাসকারী কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টি। চলিত অর্থে 'পরিবারের' অর্থ হ'ল বিবাহ, আত্মীয়তা বা পিতৃমাতৃসূত্রে আবদ্ধ এক সামাজিক গোষ্ঠী। সকল সম্প্রদায়েরই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সব স্তরেই এই পরিবার নামক সার্বজনীন সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থান।

নৃতত্ত্ববিদরা ভারতের উপজাতি সমাজে পরিবারের সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা মূলত সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হয়েছে। যে পরিবারে একজন জন্মগ্রহণ করে ও বড় হয় তাকে আমরা family of orientation পালায়িতৃ পরিবার বলি। এই পরিবার আমাদের সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর এবং বিবাহের পর আমরা যে পরিবার স্থাপন করি তাকে আমরা family of procreation বা জন্মদাতৃ পরিবার বলতে পারি।

উপজাতি সমাজে আমরা মূলত দু'ধরনের পারিবারিক গঠন পাই। প্রথমে আমরা দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার (nuclear family) দেখতে পাই যা স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অবিবাহিত সন্তান নিয়ে গঠিত। এই ধরনের পারিবারিক গঠন আমরা অনেক ভারতীয় উপজাতি; যেমন খাড়িয়াদের মধ্যে পাই।

আর এক ধরনের পরিবার হচ্ছে যৌথ পরিবার (Joint family)। এখানে একাধিক দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার, যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে, তারা একই গৃহে বাস করে। এ পরিবার দু'ধরনের হ'তে পারে। পত্নী আবাসিক—

যেমন নায়ারদের মধ্যে পত্নী আবাসিক যৌথ পরিবার রয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এবং মধ্যভারতের উপজাতিদের মধ্যে পতি আবাসিক যৌথ পরিবার (Patrilocal joint family) দেখা যায়।

যদি প্রাথমিক পরিবারগুলি শুধুমাত্র আত্মীয়তার ভিত্তিতে একজোট হয় তাহলে আমরা আরো বৃহৎ গোষ্ঠী পাই যাকে বলে গোত্র-গোষ্ঠী (clan)। যদিও পরিবার দ্বি-পাক্ষিক গোষ্ঠী, বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী হচ্ছে এক পাক্ষিক গোষ্ঠী। টোডা উপজাতির মধ্যে গোষ্ঠী পিতৃপরিচায়ী বা মাতৃপরিচায়ী হ'তে পারে।

যদি বেশ কয়েকটা গোত্র-গোষ্ঠী আরো বৃহৎ সমষ্টি তৈরী করে তাকে সম্পৃক্ত বহুজন গোষ্ঠী (Phratry) বলে। টোডা সমাজ দু'টি সম্পৃক্ত বহুজন গোষ্ঠীতে বিভক্ত।

আর একটা গোষ্ঠী রয়েছে হিন্দুদের মধ্যে যাকে গোত্র বলা হয়। সংস্কৃতি অন্বয়ের ফলে এই গোত্র অনেক উপজাতীর মধ্যে গৃহীত হয়। বাইগা এমন একটা উপজাতি যারা গোত্রর সংগঠন গড়েছে। তাদের মধ্যে একে 'গোট' বলা হয়। যারা কাল্পনিক একই ঋষি হতে উদ্ভূত তারা একটি গোত্রের সদস্য। গোত্রের সামাজিক মূল্য এই যে এক গোত্রের লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিবাহ করতে পারে না।

এছাড়া উপজাতিদের মধ্যে বহুপত্নীকত্ব (polygyny) এবং বহুভর্তৃকত্ব (polyandry) পাওয়া যায়। ভারতীয় উপজাতি সমাজে বহুপত্নী বিবাহপ্রথা বহু জায়গায় পাওয়া যায় এবং বহুপত্নী বিবাহভিত্তিক পরিবার (polygynous family) সাধারণ ব্যাপার। এখানে একজন পুরুষ বহু স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং সব স্ত্রীর সন্তান ঐ পুরুষের ঔরসজাত হয়। বহুপতি বিবাহ ভিত্তিক পরিবারে বহু পুরুষ একজন রমনীকে বিবাহ করে এবং তার ভিত্তিতে একটি পরিবার গঠিত হয়। উত্তরপ্রদেশের খাসাদের মধ্যে এই ধরনের ব্যবস্থা দেখা যায়।

## ৯.৪.১ জ্ঞাতিসম্পর্ক

জ্ঞাতিসম্পর্ক একটা সামাজিক সম্পর্ক যা আসল বা মিথ্যা রক্তের সম্পর্কের উপর রচিত। জ্ঞাতি সম্পর্ক মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক। মাতৃ ও পিতৃকূলের আত্মীয় মিলে একজনের জ্ঞাতিবর্গ। দু ধরনের জ্ঞাতি রয়েছে- নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি (lineal kin) ও দূর সম্পর্কের (collateral kin)। একজনের নিকট আত্মীয় হচ্ছে তাঁর বাবা, পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদি। একজনের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হচ্ছে এদের আত্মীয়, যেমন জ্যেঠা, কাকা, ইত্যাদি।

সাধারণত, দু-ধরনের জ্ঞাতি সম্পর্কের পরিভাষা প্রচলিত আছে। মরগ্যান বিশ্লেষণাত্মক (classificatory) ও বর্ণনাত্মক (descriptive) ব্যবস্থার কথা বলেন। বিশ্লেষণাত্মক পরিভাষায় সব লোককে এক ধরনের নামে ডাকা হয়, যেমন কাকা ইত্যাদি। বর্ণনাত্মক ব্যবস্থাতে ব্যক্তির সঙ্গে ঠিক যে সম্পর্ক তাই উল্লেখ করা হয়। পিতা যেমন বর্ণনাত্মক সম্পর্ক। রিভার্স একটা তৃতীয় ধরনের পরিভাষার উল্লেখ করেন। এখানে, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নাম ধরে ডাকা হয়।

আদিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের আচার আচরণ রয়েছে যা আত্মীয় ও কুটুম্বের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এগুলি হল (১) এড়ানোর সম্পর্ক (Avoidance); ২) ঠাট্টার সম্পর্ক(joking relationship); ৩) সন্তানের পরিচয়ে

পরিচিতি বা টেকনোনিমি (teknonymy); ৪) পিসিপ্রধান আত্মীয়তা (amitate); ৫) মাতুলকেন্দ্রিক আত্মীয়তা (avunculate) এবং ৬) পিত্রাচার (couvade)।

**১) এড়ানোর সম্পর্ক (Aviodance)** । সব সমাজে পুত্রবধূ (daughter-in-law) ও শাশুড়ির (mother-in-law) মধ্যে এড়ানোর সম্পর্ক রয়েছে। আবার, অনেক সময় জামাই ও শ্বশুর/শাশুড়ির মধ্যেও এড়ানোর সম্পর্ক রয়েছে। এই আচরণের ব্যাখ্যা অনেক নৃতত্ত্ববিদ, যেমন টাইলর, ফ্রেজার, ফ্রয়েড, লওই, টার্নার-হাই, এবং র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দিয়েছেন।

**২) ঠাট্টার সম্পর্ক (Joking relationship)**। এড়ানোর সম্পর্কের ঠিক উল্টো হচ্ছে ঠাট্টার সম্পর্ক। হোপি এবং ট্রেবিয়ান দ্বীপের উপজাতিদের মধ্যে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদরা এই ধরনের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদরা ভারতের ওরাঁও ও বাইগা উপজাতির মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক দেখতে পান। ঠাট্টার সম্পর্ক হচ্ছে একজনের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা যার ফলে তার সঙ্গে নানা রকম ঠাট্টা, তামাসা, এমন কি আদিরসাত্মক রসিকতা চলে। জামাইবাবু ও শ্যালিকার মধ্যে ঠাট্টার সম্পর্ক অনেক সমাজে আছে। আবার মামার স্ত্রী, অর্থাৎ মামীর সঙ্গে ভাগ্নের ঠাট্টার সম্পর্ক থাকলে বোঝা যায় যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির উপর ভাগ্নের অধিকার আছে। এই ধরনের সম্পর্ক মাতৃতান্ত্রিক হোপি ও ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপের উপজাতিদের মধ্যে পাওয়া যায়।

ভারতের আদিবাসী সমাজে পিতামহ/পিতামহী ও নাতি/নাতনীদের মধ্যে ঠাট্টার সম্পর্ক দেখা যায়। শরৎচন্দ্র রায় ওরাঁওদের মধ্যে পিতামহ ও নাতনীর বিবাহ দেখেছিলেন। ভেরিয়ার এলউইন বাইগাদের মধ্যে নাতি ও মাতামহীর বিবাহ প্রত্যক্ষ করেছেন।

একটি ঠাট্টার সম্পর্ক যখন একপেশে হয়, তখন এটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নেয়।

**৩) টেকননিমি (Teknonymy)** ঃ খাসি, প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে একজন তার ছেলে বা মেয়ের পরিচয়ে পরিচিত হয়। একে বলে টেকননিমি। ধরুন একজন গৃহবধুর সন্তানের নাম রাম। তাকে গ্রামের লোকেরা 'রামের মা' বলে ডাকবে, টাইলরের মতে এই সম্পর্ক মহিলাদের আগেকার সামাজিক আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করে।

**৪) পিসিপ্রধান আত্মীয়তা (Amitate)** ঃ যদি আত্মীয়দের মধ্যে পিসি প্রধান ভূমিকা পালন করে তা হলে একে পিসি প্রধান সম্পর্ক বা এমিটেট (amitate) বলব। যদি একজন ব্যক্তির জীবনে ক) পিসির প্রধান ভূমিকা থাকে; খ) তার পিসির প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতা থাকে যা পিতার ক্ষেত্রেও থাকে না; গ) সে যদি তার ভাইপোদের নিজের সম্পত্তি দেয়; ঘ) যদি বাবার জন্য কাজ না করে সে ব্যক্তি পিসির জন্য কাজ করে তাহ'লে এই সম্পর্ককে পিসিপ্রধান আত্মীয়তা বলা হয়।

এই ব্যবস্থা থাকার কারণ হিসাবে অনেক নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, কিছু কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত।

**৫) মাতুলকেন্দ্রিক আত্মীয়তা (Avunculate)** ঃ যে আত্মীয়তা সম্পর্কে মামার স্থান প্রধান তাকে আমরা Avunculate বলি। মাতুলকেন্দ্রিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ ক) ভাগ্নের জীবনে বাবার থেকে মামার স্থানের প্রাধান্য রয়েছে। খ) মামার প্রতি ভাগ্নের বিশেষ দায়বদ্ধতা রয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে বাবার প্রতি দায়বদ্ধতার

থেকে বেশি; গ) ভাগ্নে মামার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; ঘ) বাবার জন্য কাজ না করে মামার জন্য ব্যক্তি কাজ করে। মাতুলকেন্দ্রিক সম্পর্ক মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পাওয়া যায়।

**৬) পিত্রাচার (Couvade)**ঃ কোনও কোনও সমাজে, যেমন খাসি এবং টোডার মধ্যে এক অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। যখন কোনও বিবাহিত মহিলা অসুস্থ হয় বা সন্তানসম্ভবা হয়, তখন সে, স্ত্রী যা যা আচার পালন করে, সেই আচরণগুলি তার স্বামীকেও পালন করতে হয়। স্ত্রীর মতো স্বামীও রোগীর মতো আচরণ করে, পথ্য খায়, বাড়ির বাহিরে যায় না। খাসি স্ত্রীর স্বামী তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জামা কাপড় ধুতে পারে না বা ঝরনা পারাপার করতে পারে না। একে আমরা পিত্রাচার (couvade) বলি। পিত্রাচারের নানান ব্যাখ্যা রয়েছে। ম্যালিনোস্কির মতে পিত্রাচার বিবাহ সম্পর্ককে আরো স্থিতিশীল করে এবং সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসাকে নিশ্চিত করে। ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন পিত্রাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতিত্বের ব্যবহার।

**অনুশীলনী—২**

১) পরিবার কাকে বলে? তার বৈশিষ্ট্য কী?

২) দম্পতিকেন্দ্রিক ও যৌথ পরিবারের মধ্যে কী তফাৎ?

৩) জ্ঞাতিত্ব কাকে বলে?

৪) জ্ঞাতিত্বের বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করুন।

### ৯.৪.২ উপজাতি বিবাহ

বিবাহ হচ্ছে একটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত যৌন সম্পর্ক যাতে দুই বা দুইয়ের বেশি পুরুষ ও মহিলা থাকবে। উপজাতীয় ভারতে বিভিন্ন রকমের বিবাহ প্রথা রয়েছে।

ক) নিষিদ্ধ বিবাহ ঃ সব সমাজে একটি আত্মীয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। ভারতের উপজাতি যেমন গোন্দ, বাইগা, হো, নাগা ইত্যাদির মধ্যেও এই নিষেধাজ্ঞা দেখা যায়। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, কোনটাই সন্তোষজনক নয়। তবে উপরিউক্ত উপজাতিগুলিতে গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ প্রচলিত (exogamy) এর উল্টো প্রথা, হ'ল গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ (endogamy)। টোডাদের দু'টি মূল বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে, **তারথারল ও টিইভালিওলে গোষ্ঠীসাপেক্ষ বিবাহ প্রচলিত।** কিন্তু তাদের অংশ বা sub গুলিতে গোষ্ঠীবহির্ভূত বিবাহ প্রচলিত। ভিলদের মধ্যেও এই ধরনের ভাগ আছে—**উজালে ভিল, ওমেলে ভিল,** যাদের গোষ্ঠী সাপেক্ষ বিবাহ হয়। কোরওয়াদের মধ্যে প্রতিবেশীর যাদুবিদ্যার ভয় তাদের গোষ্ঠীসাপেক্ষ বিবাহমুখী করে তোলে।

অনেক ক্ষেত্রে কোনও এক জ্ঞাতিকে বিবাহ করা অনেকে পছন্দ করে। মামাতো বা পিসতুতো ভাইবোন বিবাহ করাকে নৃতত্ত্ববিদরা cross-cousin marriage বলেন। গোন্দ, খাড়িয়া ও ওরাঁওদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহের প্রচলন আছে।

অনেক উপজাতির মধ্যে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করবার জন্য নানা ব্যবস্থা আছে। এক মহিলা একসঙ্গে অনেক ভাইকে বিবাহ করার প্রথা টোডাদের মধ্যে চালু আছে। একে বহু ভ্রাতৃ **পতিবিবাহ** বল হয়। এই প্রথা—যেখানে

একজন মহিলা স্বামীর ভাইদের স্ত্রী হয়—তাকে **levirate** বলে। যেখানে অনেক বোন এক পুরুষের স্ত্রী হয় তাকে **sororate (শ্যালিকাবিবাহ)** বলে। এই প্রথা সেই উপজাতিদের মধ্যে আছে যারা **স্ত্রীপণ, কন্যাপণ** বা **স্ত্রীমূল্য (bride price)** দেয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার ছোট বোনকে সেই পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। Liverate ও Sororate প্রথা বিবাহকে দু'টি পরিবারের বন্ধন হিসাবে স্বীকার করে।

সারা বিশ্ব জুড়ে বহুবিবাহ প্রথা পাওয়া যায়। মার্ডকের ২৫০ জন নমুনার মধ্যে ৭৮% পরিবার বহুবিবাহভিত্তিক। উপজাতীয় ভারতেও বহুবিবাহ পাওয়া যায়। বহুবিবাহের দু'টি রূপ পাওয়া যায়—**বহুপত্নীকত্ব (polygyny)** ও বহুভর্তৃকত্ব (Polyandry)।

নাগা, গন্ড, বাইগা, টোডাদের মধ্যে এক পুরুষ বহু স্ত্রীকে বিবাহ করে। একে **বহুপত্নীকত্ব (polygyny)** বলা হয়।

টোডা, টিয়ান কোটা, খাসি ও লাডাখি বোটাদের মধ্যে **বহুভর্তৃকত্ব (polyandry)** প্রচলিত। কাশ্মীর থেকে আসাম অনেক উপজাতির মধ্যে বহুভর্তৃকত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতে বহুপতিবিবাহ দু'ধরনের হয়। যেখানে অনেক ভাই এক স্ত্রীকে বিবাহ করে। যেমন খাসি ও টোডা; একে **ভ্রাতৃত্বমূলক বহুভর্তৃপ্রথা** (adelphic or fraternal polyandry) বলে। আবার টোডাদের মধ্যে যে প্রথা তাতে স্বামীদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকে না। যখন এক মহিলা তার এক স্বামীর সঙ্গে থাকে, তার উপর অন্যদের কোন দাবী থাকে না।

নৃতত্ববিদ Westermark বহুপতি বিবাহকে মহিলাদের অভাবের ফলে হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু কোনও কোনও সমাজে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি। টোডাদের মধ্যে সম্পত্তি এবং লিঙ্গের বৈষম্য দিয়ে এই প্রথাকে ব্যাখ্যা করা হয়।

বর্তমান সভ্য সমাজে একগামীতা সাধারণ নিয়ম। ভারতের আদিবাসী সমাজব্যবস্থায় খাসি, সাঁওতাল এবং কাদার উপজাতিগুলি একগামী। এদের মধ্যে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলার বিবাহ হয়। অত্যাধিক স্ত্রীপণের ফলে অনেক উপজাতি, যেমন হো একগামী হ'তে বাধ্য হয়েছে।

ভারতের উপজাতি সমাজে বিবাহকে একটা ধর্মীয় আচরণ বলে মনে করা হয় না। এটি একটা **চুক্তি (contract)**। কিন্তু অনেক উপজাতি হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের প্রথায় বিবাহ উদযাপন ছাড়া কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও করে, যেমন হো উপজাতি।

নৃতাত্বিক গবেষণা থেকে **আট** রকমের বিবাহের কথা জানা যায়। ক) পরীক্ষামূলক বিবাহ। খ) বলপূর্বক অধিকারে বিবাহ। গ) পরীক্ষা করে বিবাহ। ঘ) ক্রয় করে বিবাহ। ঙ) সেবার মাধ্যমে বিবাহ। চ) বিনিময়ের মাধ্যমে, ছ) বিবাহ দুপক্ষের সম্মতিযুক্ত বিবাহ এবং পালিয়ে গিয়ে বিবাহ। জ) অনধিকার প্রবেশের মাধ্যমে বিবাহ।

এবার আসুন, এগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক—

**ক) পরীক্ষামূলক বিবাহ ঃ** পরীক্ষামূলক বিবাহ কুকি সমাজে চালু আছে। একজন যুবককে তাঁর ভাবি শ্বশুর তাঁর মেয়ের সঙ্গে কিছুদিন থাকতে দেয়। এই সময়ের মধ্যে যদি মনের মিল হয় তবে যুবক ও যুবতীর মধ্যে

বিবাহ হবে। মনের মিল না হ'লে যুবক ও যুবতীর বিবাহ হয় না এবং যুবক যুবতীর অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়।

**খ) বলপূর্বক অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিবাহ ঃ** অনেক উপজাতি, যেমন নাগা, হো, গোন্দ ইত্যাদির মধ্যে এই বিবাহ প্রথা চালু আছে। কিন্তু ভারতীয় দন্ডবিধির প্রয়োগের ফলে এই প্রথা বিলুপ্তির পথে। তবে বর্তমানে এই প্রথা অনেক জায়গায় প্রতীকি রূপ ধারণ করেছে।

শারীরিক অধিগ্রহণ ছাড়া আনুষ্ঠানিক অধিগ্রহণও হয়। খাড়িয়া এবং বীরহোরদের মধ্যে যদি কোনও যুবক কোনও যুবতীকে পছন্দ করে এবং অন্য কোনও উপায়ে বিয়ে করতে সক্ষম না হয়, তবে কোনও জায়গায় সেই যুবতী কপালে তেল ও সিঁদুর দিলে সেটাকে বিয়ে বলে সবাই স্বীকার করে।

**গ) পরীক্ষা করে বিবাহ ঃ** অনেক উপজাতির মধ্যে বিবাহের জন্য একজন যুবককে পরীক্ষা দিতে হয়। যে যুবক তার সাহস প্রদর্শনের মাধ্যমে মেয়েদের মন জয় করতে পারবে সে যে কোনও মেয়ের পাণিপ্রার্থী হ'তে পারবে। ভিলদের মধ্যে এই প্রথা এখনও চালু আছে।

**ঘ) ক্রয় করে বিবাহ ঃ** অনেক উপজাতির মধ্যে ক্রয়ের মাধ্যমে বিবাহ দেখতে পাওয়া যায়। নাগাদের মধ্যে যেমন কন্যাপণ (bride price) দেওয়ার রীতি প্রচিলিত আছে। Lowie-র মতে একে কখনোই স্ত্রী কেনা-বেচা বলা চলে না। এর একটি প্রতীকিমূল্য আছে। রেঙমা নাগারা কন্যাপণে কোনও আর্থিক মূল্য ধার্য করে না। তাই তারা কন্যাপণ হিসাবে যা ঠিক হয় তার দশটাকা কম দেয়। এখানে কন্যার সম্মানটা বড়, অর্থিক মূল্যটা নয়। কিন্তু সব উপজাতির মধ্যে এই ধরনের নৈতিক চিন্তা দেখা যায় না। হো উপজাতিতে অত্যধিক কন্যাপণের মূল্য হওয়ায় বলপূর্বক অধিগ্রহণ প্রথা চালু হয়েছে।

**ঙ) সেবা করে বিবাহ ঃ** অনেক সময় কণ্যাপণের আর্থিক মূল্য এত বেশি যে অনেক বিবাহযোগ্য যুবকের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গোন্দ বা বাইগারা তাদের ভাবি শ্বশুরদের কাছে চাকর হিসাবে কিছুদিন থাকে এবং কয়েকবছর পর তাদের মেয়েকে বিয়ে করে। গোন্দরা একে **লামানাই** এবং বাইকারা এই প্রথাকে লামসেন বা **ঘারিয়া** বলে। এই প্রথা বীরহোরদের মধ্যেও পাওয়া যায়। এখানে ভাবি জামাইকে শ্বশুর কন্যাপণের টাকা ধারা হিসাবে দেয় এবং শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে চাকর হিসাবে শ্বশুর বাড়িতে থাকে।

**চ) বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ ঃ** কন্যাপণ দেওয়া সম্ভব না হ'লে আর একটা প্রথার মাধ্যমে বিবাহ করা যায়। উপজাতীয় ভারতে সর্বত্র বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ হয়। এই প্রথায় দু'টি পরিবার মেয়ে বিনিময় করতে রাজি হয়। খাসিদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ।

**ছ) দু'পক্ষের সম্মতিযুক্ত বিবাহ ও পালিয়ে গিয়ে বিবাহ ঃ** অনেক সময় অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া বিবাহ হয়। বিবাহে ইচ্ছুক ছেলে ও মেয়ে যদি অভিভাবকদের সম্মতি না পায়, তা হ'লে তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর সাধারণত অভিভাবকরা যুবক-যুবতীর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

**জ) 'অনাদার' বা অনধিকার প্রবেশের মাধ্যমে বিবাহ ঃ** আমরা দেখেছি যে, অনেক সময় একজন যুবক তার পছন্দসই যুবতীকে জোর করে বিয়ে করে। কিন্তু বীরহোর বা হোরেদের মধ্যে এর উল্টো প্রথাও প্রচলিত আছে। হোরা যাকে 'অনাদার' বলে। এইখানে যদি কোনও যুবতী কোনও যুবককে পছন্দ করে কিন্তু সহজে বিয়েতে সম্মত করাতে পারছে না তখন সে তার ভাবি শ্বশুর বাড়িতে জোর করে থাকবে। সেই যুবতীকে নানা অপমান, লঞ্ছনা বা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তবুও যদি সে বিবাহে ব্রতী হয়ে এগুলি সহ্য করে তাহ'লে শেষ অবধি বউ হিসাবে ভাবি শ্বশুরকুল তাকে মেনে নেয়।

ভারতের আদিবাসী সমাজে বিধবাবিবাহ অনেক উপজাতির মধ্যে পাওয়া যায়। সম্পত্তি পাওয়ার জন্য সেমা নাগা যুবকেরা তাদের মৃত বাবার বিধবাদের বিবাহ করে।

মধ্য ভারতে মৃত দাদার স্ত্রীকে বিয়ে করার প্রথা চালু আছে। এর একটা কারণ অত্যাধিক কন্যাপণ।

ভারতীয় উপজাতি সমাজে কুমারী মেয়েরা বিবাহের আগে স্বাধীনভাবে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। মধ্য ভারতে বিবাহের আগে যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এর ফলে কোনও মেয়ে সন্তানসম্ভবা হ'লে তাকে সেই পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় যার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে যে সন্তানসম্ভবা হয়েছে।

বিবাহের বাইরে যৌন সম্পর্ক বা পরকীয়া প্রেম কিন্তু অনেক সময় ঘোর অশান্তি ডেকে আনে। মারিয়াদের মধ্যে খুন ও আত্মহত্যার কারণ হ'ল পরকীয়া প্রেম। তবে সব আদিবাসীদের মধ্যে তা দেখা যায় না। খাসিদের মধ্যে একজন স্ত্রীকে **(রন্তি)** যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে কঠোর নিয়ম পালন করতে হবে। কিন্তু কন্যা **(ধন্তি)** হিসাবে সে অন্য পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে। ফলে তারা বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে না। শ্বশুরবাড়িতে বহুপতিদের মধ্যে তার যা চাপ সহ্য করতে হয়, বাপের বাড়িতে তা অনেকটা প্রশমন হয়।

উপজাতি সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ পাওয়া সহজ। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। বিবাহিত দম্পতি যখন বিবাহিত জীবন যাপন করতে অনিচ্ছুক হয়, তখন তারা বিবাহিত সম্পর্ক ভাঙ্গার জন্য সমাজের দ্বারস্থ হতে পারে। খাসিরা ব্যভিচার, বন্ধ্যাত্ব এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবের জন্য বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়। কিন্তু শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী মধ্যে মতৈক্যের মাধ্যমে বিচ্ছেদ সম্ভব। বিবাহ বিচ্ছেদ নেওয়ার অনুষ্ঠানটা প্রকাশ্যে হওয়া চাই। সন্তানদের দায়িত্ব মা পায়। লুশাইদের মধ্যে খুব সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'তে পারে। যদি স্বামী-স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, তবে তাকে কন্যাপণের বাকি অংশটা দিতে হবে, যদি তা বকেয়া থাকে। কিন্তু যদি স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলে প্রমাণিত হয়, তা হ'লে তাকে স্বামীকে কন্যাপণ ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিবাহবিচ্ছেদকারীদের পুনর্বিবাহ সম্ভব।

আদিবাসী সমাজে শিশুসন্তানদের সম্পর্কে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অনুশাসন চলে না। হিন্দুদের মধ্যে সন্তান, বিশেষ করে পুত্র সন্তান প্রজনন, ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। উপজাতিদের মধ্যে সন্তানের আগমন অতিমাত্রায় আনন্দের। খাসিদের মতো বহুভর্তৃক (Polyandrous) সমাজে শিশুরা মায়েদের থেকে বেশি আদর পায়। তার কারণ হ'ল এই সমাজে মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা কম।

ভারতের সব আদিবাসী সমাজে দত্তক (adoption) নেবার প্রথা চালু আছে। লুশাই, কুকি, খাসিদের মধ্যে এই প্রথা দেখতে পাওয়া যায়।

মাতৃতান্ত্রিক খাসিদের মধ্যে পরিবারে যদি কোনও মহিলা সদস্য না থাকে, তবে পুরুষেরা অন্য পরিবারের মেয়েকে নিজেদের কন্যা হিসাবে বেছে নিতে পারে। সেই কন্যা সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে এবং পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

**অনুশীলনী—৩**

১) বিবাহ কাকে বলে?

২) গোষ্ঠীসাপেক্ষ ও গোষ্ঠীবহির্ভূত মধ্যে কী তফাৎ?

৩) বহু বিবাহ কাকে বলে? তার কী কী প্রকার লক্ষ্য করা যায়?

৪) আদিবাসী সমাজে কী কী প্রকারে বিবাহ করা যায়।

৫) বিবাহবিচ্ছেদ কাকে বলে? উপজাতি সমাজে তালাক কেন হয়?

৬) বিধাবাবিবাহ সম্পর্কে উপজাতি সমাজে কী কী রীতি চালু আছে?

৭) উপজাতি সমাজে শিশুদের কী অবস্থা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

## ৯.৫ উপজাতি সমাজে মহিলার মর্যাদা

উপজাতি সমাজে মহিলাদের পদমর্যাদা নির্ভর করে আইনগত মর্যাদা, সমাজে অংশগ্রহণ করাবর সুযোগ, আসল ব্যবহার ও কাজের চরিত্রের উপর। ম্যালিনোস্কির মতে, মহিলাদের মর্যাদার সংজ্ঞা দিতে গেলে দুই লিঙ্গের কর্তব্য এবং দুই লিঙ্গর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কী কী সামাজিক প্রতিকার রয়েছে তার তালিকা করতে হবে।

উপজাতি সমাজে মহিলাদের মর্যাদা নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার উপর। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের মর্যাদা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে আলাদা হবে। এবার আসুন, আমরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের মর্যাদার বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।

যদি আমরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পর্যালোচনা করি, তবে আমরা দেখব পত্নী-আবাসিক বাসস্থান, মাতৃতান্ত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার, প্রভৃতি মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। খাসি সমাজে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে। তার ফলে ধর্মীয় বা ইহজাগতিক, সব ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়; যেমন, তাদের ঈশ্বর একজন মহিলা। তাদের আদিম পুর্বসূরী একজন মহিলা। মায়ের থেকে বংশপরম্পরায় নির্ধারিত হয়। সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে মায়ের কাছ থেকে মেয়েরা পায়। একজন পুরুষের রোজগার বিবাহের আগে তাঁর মায়ের কাছে যায় ও বিবাহের পরে তাঁর স্ত্রীর কাছে। মাতৃআবাস কিন্তু স্থায়ী অবস্থা নয়। ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক জীবনেও মহিলাদের প্রাধ্যন্য থাকে।

গারোদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনেক বৈশিষ্ট্য থাকলেও খাসি সমাজে ও গারো সমাজে মহিলার অবস্থার অনেক তফাৎ আছে। খাসি সমাজে মহিলাদের অবস্থা গারো সমাজের থেকে অনেক উন্নত। গারো সমাজে পুরুষ তার স্ত্রী সম্পত্তি নিজের খুশিমত ব্যবহার করতে পারে। বিধবা মহিলাদের পুনর্বিবাহের উপর নানা বিধিনিষেধ রয়েছে। যেমন, একজন বিধবাকে তাঁর স্বামীর কোনও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিয়ে করতে হবে যদি সেই পুরুষ তা চায়। ফলে আমরা দেখি যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজেও মহিলাদের মর্যাদা দিক থেকে মহিলারা পুরুষদের থেকে প্রাধান্য পায়। গারো সমাজে মহিলারা শুধুমাত্র উত্তরাধিকারের মাধ্যম। এবার আসুন, আমরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করি।

সব পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতে মহিলাদের মর্যাদা বিভিন্ন নিষেধের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক টোডা উপজাতির মধ্যে মহিলাদেরকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়। তাই তাদের পবিত্র গোশালাতে মহিলাদের প্রবেশ বন্ধ। এবং দুগ্ধ সংক্রান্ত কোনও কাজ মহিলাদের করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মহিলাদের মর্যাদা নীচু। টোডা সমাজব্যবস্থাতে তাদের যথেষ্ট সমাদর করা হয়। গোন্দদের মধ্যে মহিলাদের কোনও কোনও ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন, বিবাহের ব্যাপারে তারা স্বয়ংবরা হ'তে পারে। কিন্তু আবার কোনও কোনও ব্যাপারে তাদের পদমর্যাদা পুরুষদের থেকে নীচু। তারা বিয়ের পর স্বামীদের জন্য মাঠে মজুরী করে। থারুরা তাদের

সুন্দরী স্ত্রীদের দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়। মধ্যভারতের উপজাতিগুলির মধ্যে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে। তার মানে এই নয় যে, মহিলাদের মর্যাদা ভাল। বরং অনেক সময় তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

এই উদাহরণগুলি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, উপজাতি সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলা যায় না। তাদের মর্যাদা এক সমাজ থেকে আর এক-সমাজে, সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক রীতি নীতির উপর নির্ভর করে। তবুও সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা দরকার। যে কোনও সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদা তাদের সন্তান জন্ম ও সন্তান পালন করার কাজের উপর নির্ভর করে। সে জন্য ঘোষণা করা হয়। মজুমদার ও মদন সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের উপজাতি সমাজে মহিলাদের মর্যাদাকে ভারতীয় নৃকুলবিদ্যার দিক থেকে বুঝতে হবে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহিলাদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যে সব নিয়ম জারি করেছে তা উপজাতি মহিলা বা নিচু জাতের মহিলাদের ক্ষেত্রে খাটে না।

## ৯.৬ আদিম অর্থনীতির প্রকৃতি

আদিম অর্থনীতিগুলি মূলত জীবিকা নির্বাহ ভিত্তিক অর্থনীতি (subsistence economics)। তাদের মধ্যে যা উৎপাদন হয় তাই ভোগ করা হয়। বর্তমান আদিম অর্থনীতিগুলির সঙ্গে প্রাক্ ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক সংগঠনের মিল দেখা যায়। Thurnwald বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংগঠনের একটা তালিকা করেছেন। সেগুলি হ'ল ঃ

১) সমমাত্রিক শিকারী পুরুষ ও সংগ্রাহক নারীর সমাজ। উদাহরণ ঃ কাদার, চেকু, খাড়িয়া, কোবওয়া।

২) সমমাত্রিক শিকারী, ফাঁদপাতা শিকারী এবং কৃষক। কামার, বাইগা এবং বীরহোররা এই ধরনের কাজ করে।

৩) মাত্রা বিভক্ত সমাজ, যার ধাপে ধাপে আসে যথা, শিকারী, ফাঁদপাতা শিকারী, কৃষক ও কারিগর।

৪) পশুপালক, যেমন টোডা ও ভিল উপজাতি।

৫) মাত্রা বিভক্ত শিকারী ও পশুপালক; এই বর্গটি ভারতের উপজাতির মধ্যে পাওয়া যায় না।

৬) জাতভিত্তিক বিভাজিত গবাদি পশু উৎপাদক ও ব্যবসায়ী। উদাহরণ ঃ হিমালয় অঞ্চলের ভোটিয়া যারা ইয়াক ও জিবু (ইয়াক ও গরুর শংকর) উৎপাদন করে ও বাণিজ্য করে। তারা শীতকালে সমতলে আসে এবং গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে ফিরে যায়।

৭) সামাজিক মাত্রা বিভক্ত পশুপালক, শিকারী ও কারিগর।

আদিম অর্থনীতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, প্রকৃতিকে আদিম মানুষ ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারে না। প্রযুক্তিগত বিদ্যার অভাবে আদিম উপজাতিগুলি প্রকৃতির অনেক দান ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারে না এবং নষ্ট করে। অতি কষ্টে জীবন ধারণের উপকরণ উৎপাদিত হয়। খুব কম সময় অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। দ্বিতীয়ত, আদিম উপজাতিদের মধ্যে টাকা পয়সা ব্যবহারের চল নেই। ব্যাঙ্ক ও ঋণ সভ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর তারা ব্যবহার করছে। সাধারণত নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক

সম্পর্ক পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে হয়। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে লাভ-লোকসানের ধারনা তাদের নেই। চতুর্থত, উপজাতির অর্থনীতি সমবায় বা যৌথ শ্রম ভিত্তিক। পঞ্চমত, তাদের উদ্ভাবন ক্ষমতা কম। সেজন্য উপজাতি সমাজ স্থিতিশীল। ষষ্ঠত, নিয়মিত হাট বা বাজার উপজাতি সমাজে থাকে না। ফলে বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন, চাহিদা ও যোগান আদিম অর্থনীতিতে থাকে না। সপ্তমত, বিনৈপুণ্য (specialization), যার ভিত্তি হচ্ছে বিশেষ কিছু প্রযুক্তিবিদ্যা তা, কোনও উপজাতি সমাজে পাওয়া যায় না। তবে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন আছে।

## ৯.৬.১ লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রমবিভাজন

সব উপজাতি সমাজে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন দেখা যায়। মহিলা ও পুরুষের কাজের প্রকারভেদ আছে। যেমন, পুরুষেরা শিকারে বের হয়। কিন্তু মহিলারা বাড়িতে রান্না করে ও শিশুদের লালনপালন করে। মহিলাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্টগুলি অনেক সময় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাদের অপবিত্র বলে চিহ্নিত করে। যেমন, রজঃস্রাব, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি। মেয়েদের পুরুষেদের থেকে দুর্বল মনে করা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের কাজ পুরুষেরা করে না। কিন্তু মহিলারা পুরুষদের অনেক কাজ করে থাকে। খাদ্য সংগ্রহ, কৃষিকাজ, মাছ ধরা, ঝুড়ি তৈরী, কাপড় ও মৃৎপাত্র তৈরী মহিলাদের কাজ। কিন্তু তারা বৃহৎ পশু শিকার করতে যায় না, গাছ কাটে না বা কামার/ছুতোর হয় না। যাদুবিদ্যায় পুরুষ ও স্ত্রীরা পারদর্শিতা দেখাতে পারে।

শিল্পায়নের প্রভাব উপজাতি সমাজের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের উপর পড়েছে। উপজাতি পুরুষেরা লোহা ও ইস্পাত কারখানা, চা বাগান, কয়লা খনি, প্রভৃতিতে কাজ করে। মহিলা শ্রমিকেরাও কয়লা খনি, অভ্র খনি, চা বাগান ইত্যাদি শিল্পে কাজ করে। উপজাতি সমাজে মজুর লাগানোর প্রথা নেই। তাই প্রভু ও ক্রীতদাসের মধ্যে শ্রমবিভাজন আদিম সমাজে নেই।

## ৯.৬.২ উপজাতি সমাজে সম্পত্তি

আদিম সমাজে সম্পত্তির ধারণা আধুনিক সম্পত্তির ধারণা থেকে পৃথক। সেখানে সম্পত্তি দেখাবার বা ধ্বংস করবার প্রবৃত্তিই বেশি, সঞ্চয় করা নয়।

আদিম সমাজে দ্রব্যের মালিকানা এবং কিছু বিশেষ সুবিধা বা অধিকারকে সম্পত্তির মধ্যে ফেলা হয়। এই সম্পত্তি সার্বজনীন বা লোকসমাজের (communal) বা ব্যক্তির (individual) হ'তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন শিকারী উপজাতির মধ্যে, ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। ভারতীয় উপজাতির মধ্যে দুই ধরনের সম্পত্তি স্বীকৃতি। সম্পত্তি যে রকম হোক না, তার উত্তরাধিকার সূত্রে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষের কাছে যায়। ভারতের উপজাতিতে ব্যক্তিগত ও যৌথ, দুই ধরনের উত্তরাধিকার চালু আছে, যদিও আজকাল ব্যক্তিগত মালিকানার উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও কোনও উপজাতির মধ্যে, যেমন নাগা, গ্রামবাসীরা যৌথভাবে গ্রামের জমির মালিক হয়। আমরা জানি যে উত্তরাধিকার পিতৃতান্ত্রিকভাবে কিংবা মাতৃতান্ত্রিক হ'তে পারে।

## ৯.৬.৩ ভারতের আদিম উপজাতির অর্থনৈতিক জীবন

ভারতের উপজাতি সমাজ দেশের তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করে। এগুলি হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চল, মধ্য

ভারত এবং দক্ষিণ ভারত। প্রত্যেকটি অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরে উপরজাতি বাস করে। এই স্তরে কোনও একটা কাজে নৈপুণ্য দেখা যায় না। একটা উপজাতির সদস্যরা জীবনধারণ করবার জন্য অনেক সময় একাধিক কাজ করে। যেমন, শিকারের সঙ্গে সংগ্রহ, কৃষি বা গাছ কাটা চলতে পারে। আবার ঝুম চাষের সঙ্গে পশুপালন চলতে পারে। অর্থাৎ, বাঁচার তাগিদে উপজাতিগুলিতে খুব জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভব হয়েছে।

মূল কাজগুলি ছাড়া বিভিন্ন উপজাতি কিছু কাজ করে যা গৌণ বৃত্তি বলে গণ্য করতে পারি, যেমন শিকার, মাছ ধরা, ঝুড়ি তৈরী, গান বাজনা করা এবং কৃষি ও শিল্পে শ্রমিক হিসাবে কাজ করা। সরকারী কাজে নিয়োগও অনেক উপজাতির একটা নিয়মিত রোজগারের উৎস। এবার আসুন এই বৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করি।

**ক) খাদ্য সংগ্রহ ঃ** খাদ্য সংগ্রহকারী উপজাতি, যেমন কাদার, বীরহর, খাড়িয়া, চেঞ্চু, মালাপান্তারাম, পালিয়ান, ইয়ানাদি এবং কুরুম্বা শিকারের সঙ্গে ফল, মধু, শিকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

**খ) কৃষিকাজ ঃ** পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের উপজাতির অধিকাংশ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি কাজে পুরুষ ও মহিলা সমান ভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবন কোথাও থেমে নেই। অনেক পরিবর্তন ঘটছে। কৃষিকাজে নিয়োজিত উপজাতির মধ্যে রয়েছে ভিল, মুন্ডা, ওরাঁও, মাঝওয়ার, খারওয়ার, বাইগা, কোরওয়া, গোন্দ, হো এবং অসমের উপজাতিগুলি। এর একটা রূপ হচ্ছে ঝুম (Shifting cultivation)।

**খ (১) ঝুম ঃ** সবচেয়ে আদিম কৃষি উপজাতিগুলি একধরনের কৃষিকাজে নিয়োজিত যাকে সাধারণত স্থান পরিবর্তনশীল কৃষিকাজ (Shifting cultivation) বলে। একে নাগাদের ভাষায় 'ঝুম' বলা হয় এবং ভারতে এই কৃষি পদ্ধতি এই নামেই পরিচিত। এর সঙ্গে স্থায়ী কৃষিকাজের তফাৎ আছে। স্থায়ী কৃষিকাজে (settled agriculture) একটা জমিতে বছরের পর বছর ফসল ফলানো হয়। কিন্তু 'ঝুম' পদ্ধতিতে প্রথম জঙ্গলের একটা অংশকে পরিষ্কার করা হয়। গাছ কেটে, সেই গাছ পুড়িয়ে তার ছাই জমিতে মেশানো হয় এবং এইভাবে জমি তৈরী করার পর একটা কাঠি দিয়ে কিছু গর্ত করে কিছু বীজ ছড়ানো হয়। এই জমিতে একবছর কি দু'বছর ভাল ফসল ফলে। তার পর সেই জনগোষ্ঠী আর এক জায়গায় বসবাস শুরু করে। কিছু দিন ধরে আগের জমিটা অনাবাদী থাকে। এইভাবে কয়েক খন্ড জমিতে কয়েক বছরের পর ঘুরে ফিরে কৃষিকাজ হয়।

এটা মনে রাখতে হবে যে সব উপজাতি ঝুম পদ্ধতির মাধ্যমে চাষ করে না। নাগা, ভুঁইয়া, মারিয়া ও বাইগারা এই পদ্ধতির মাধ্যমে চাষ করে। কিন্তু নাগাদের একটা অংশ, রেঙমা নাগারা পাহাড়ে চত্বর কেটে কৃষিকাজ চালায়। আবার ভিল, গোন্দ, সাঁওতাল, খাসি ও অন্য উপজাতি লাঙলের মাধ্যমে কৃষিকাজে পটু।

**গ) হস্তশিল্প (handicrafts) ঃ** অনেক উপজাতি নানারকম হস্তশিল্প তৈরী করে। এর মধ্যে রয়েছে ঝুড়ি তৈরী, চরকায় সুতো কাটা ও তাঁত বোনা। মারিয়া গোন্দ মদ চোলাই করে। সাওরা, কোণ্ড ও গোন্দ উপজাতিরা গবাদি পশুপালন, ধাতুর কাজ, মৃৎপাত্র তৈরী, ইত্যাদিতে দক্ষ। কোরওয়া ও আগারিয়া উপজাতি লোহা তৈরী করে। থারুরা কৃষিকাজ ছাড়াও আসবাবপত্র তৈরী, গৃহে ব্যবহৃত বাসন, ঝুড়ি, গান-বাজনার সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরী করে। মাদ্রাজি ইরুলাও বিভিন্ন হস্তশিল্প যেমন মাদুর, ঝুড়ি, চাকা এবং লাঙল তৈরী করে।

**ঘ) গবাদি পশুপালন ঃ** টোডারা গবাদিপশুপালন করে এবং তাদের অর্থনৈতিক জীবন তাদের গোশালার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। টোডাদের সমাজে গোশালার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ভোটিয়ারা গো পালন ও কৃষিকাজের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে।

**ঙ) শিল্প শ্রমিক ঃ** অনেক শিল্প শ্রমিক উপজাতি পুরুষ ও মহিলা। উপজাতিরা শিল্প জীবনের সঙ্গে দু'ভাবে পরিচিত হয়েছে। হয় তারা শিল্পাঞ্চলে গমন করেছে নয় তাদের অঞ্চলে শিল্প স্থাপিত হয়েছে। বহু সাঁওতাল, গোন্দ, কোণ্ড অসমের চা বাগানে শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত আছে। আবার মধ্য ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় লোহা এবং নানা খনিজ সম্পদ পাওয়া গেছে। ফলে সেসব জায়গায় কয়লা, ইস্পাত ইত্যাদি শিল্প তৈরী হয়েছে। টাটা ইস্পাত কারখানার অশিক্ষিত শ্রমিকদের সিংহভাগ হ'ল সাঁওতাল। এ ছাড়া বন দপ্তরের ঠিকাদারেরা বেশ কিছু উপজাতি পুরুষ ও মহিলাকে গাছ কাটা, রাস্তা তৈরী, ইত্যাদি কাজে লাগায়।

**অনুশীলনী—৪**

১) আদিম অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী?
২) স্থান পরিবর্তনশীল কৃষিকাজ (ঝুম) কী?
৩) উপজাতি সমাজের মূল বৃত্তিগুলি কী কী?

## ৯.৭ আইন ও ন্যায়

আদিম সমাজে আইনের উদ্ভব খুব আস্তে আস্তে হয়। বিভিন্ন লোকাচারকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়। কোনও আদিম সমাজে আইনসভার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা হয় না। গোটা সমাজ যে নিয়ম ও নীতিগুলি স্বীকার করে সেগুলিই আইন। লোউইর (Lowie) মতে, আদিম সমাজের আইন আধুনিক সমাজের থেকে তিন দিক থেকে আলাদা। প্রথমত, এর ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞাতি সম্পর্ক, ভূখন্ড নয়। দ্বিতীয়ত, নীতি ও গণমতের উপর ভিত্তি করে আদিম আইন কানুন হয়। তৃতীয়ত, এটা অপরাধ (crime) ও ব্যক্তিগত অন্যায়ের (tort) মধ্যে তফাৎ করে না। এবার আসুন আমরা আদিম আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি।

**ক) জনমত (Public Opinion) ঃ** আদিম সমাজে জনমতের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। জনমত হচ্ছে সেই মত যা আদিম সমাজ ব্যবস্থায় সবাই মেনে চলে এবং সেই মতকে প্রবর্তন করে। যেমন, আদিম সমাজে সবাই মনে করে যে, ডাইনীরা সমাজের ক্ষতি করে এবং তাকে হত্যা করা উচিত। সেজন্য যখন কাউকে ডাইনী হিসাবে সন্দেহ করা হয় সে তার পরিবারের কাছ থেকেও সহানুভুতি পায় না। সবাই একাধারে বিচারক, পুলিশ ও দন্ডাজ্ঞা পালনকারী।

আদিম সমাজ আইনকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে স্বীকার করে না। যে কোনও অন্যায় হ'ল ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ। তার প্রতিকারের জন্য সেই ব্যক্তি অপরাধী ও তার জ্ঞাতিদের দন্ড দেয়। যেমন, কোনও ব্যক্তি খুন হ'লে তার জ্ঞাতিদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে হত্যাকারীকে বা তার নিকট আত্মীয়কে হত্যা করে সেই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। কিন্তু অপরাধ যদি একটা গুরুত্বপূর্ণ হয় যা সমাজের অমঙ্গল ডাকতে পারে তবে গোটা সমাজব্যবস্থা তার প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসে। যেখানে কোনও অপরাধের ফলে গোটা সমাজকে দৈবদন্ড ভোগ করতে হ'তে পারে সেই অপরাধগুলিকে সমাজ দন্ড দেয়। যেমন, অজাচার, ব্যভিচার, যাদু-টোনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগঠিত জনমত রয়েছে। স্থানের বদলে জ্ঞাতি সম্পর্কের উপর নিভরশীলতা এবং দৈবদন্ডের ভয়ের জন্য-আমরা দেখি যে আদিম সমাজে criminal law বা অপরাধের আইনের থেকে ব্যক্তিগত আইনের (Law of torts) প্রাধান্য বেশি।

**(খ) উদ্দেশ্য (intention)** ঃ আধুনিক আইনে উদ্দেশ্য (intention) হ'ল একজন ব্যক্তির ক্রিয়ার বৈধতা বা অবৈধতার মাপকাঠি। যেমন কোনও ব্যক্তি একজনকে হত্যা করে আত্মহত্যার উদ্দেশ্য কাজটা করেছে বলে দাবী করতে পারে এবং দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকৃত হ'লে আদালত তাকে হত্যার অপরাধের সাজা দেবে না। কিন্তু আদিম সমাজে অপরাধীর উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। হত্যাকে খুন বলে তারা মনে করে। তার পিছনে উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন। কিম্বা যাদুটোনার ফল (কারুর মৃত্যু, ইত্যাদি) থেকে তারা সেই ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিষ্ঠুরভাবে 'অপরাধীর' দন্ড দেয়। আদিম সমাজের এই আইন দৈব দন্ডের উপর বিশ্বাসের ফল।

**গ) যৌথ দায়িত্ব (Collective responsibility)** ঃ আদিম সমাজে রাষ্ট্রের অভাবে গোটা সমাজ আইনকে প্রয়োগ করবার জন্য কাজ করে। এই দায়িত্ব মূলত জ্ঞাতিদের নিতে হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং এই পঞ্চায়েত উপজাতির নিয়মকে লঙ্ঘনের জন্য যারা অভিযুক্ত তাদের বিচার করে।

**ঘ) প্রামাণিক তথ্য (Evidence)** ঃ আদিবাসী সমাজে প্রামাণিক তথ্যের গুরুত্ব আছে। দু'ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ ১) **শপথ** এবং ২) **ভাগ্যপরীক্ষা**। শপথের মাধ্যমে অভিযুক্ত নিজে বলে সে অপরাধ করেছে কি না। অনেক সময় আরো কঠিন প্রমাণ দরকার হয়। অভিযুক্তকে কিছু কঠিন ভাগ্য পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়। যেমন ফুটন্ত গরম জলে তার হাত নিমজ্জিত করা, কিংবা তার জিভকে সুঁচ বিদ্ধ করা ইত্যাদি। যারা এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে না।

**ঙ) দন্ড (Punishment)** ঃ আদিম সমাজে খুব কম ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দন্ড দেওয়া হয়। সাধারণত উপজাতি সমাজে জ্ঞাতিগোষ্ঠী অপরাধীকে দন্ড দেবার ভার নেয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অপরাধীকে দন্ড দেবার প্রথা একমাত্র উগান্ডায় পাওয়া যায়। সেখানে একজন উপজাতি রাজা বা পরিবারের প্রধান তার ব্যক্তিগত হাজতে কোনও অপরাধীকে রাখতে পারে। সাধারণত বদলার মাধ্যমে অপরাধীকে দন্ড দেবার রীতি প্রচলিত আছে। একজন খুনী শুধু অপরাধী নয়। তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী এই অপরাধ করেছে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সেজন্য খুনের বদলা শুধু খুনীর উপর নেওয়া যাবে তা নয়। তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বা পরিবারের যে কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করে বদলা নেওয়া চায়।

**চ) ক্ষতিপূরণ (Weigild)** ঃ আদিম সমাজে জরিমানার মতো কোনও দন্ড নেই। তার বদলে গোটা সমাজেকে জরিমানা করে ক্ষতিগ্রস্ত বা পরিবারকে **ক্ষতিপূরণ (weigild)** দেওয়া হয়। অনেক সময় শাস্তিমূলক ভোজন দিতে বলা হয় অপরাধীকে। গোটা গ্রাম এই ভোজনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

**অনুশীলনী—৫**

১) আদিম সমাজে আইনের সঙ্গে আধুনিক আইনের কী তফাৎ?

২) আদিম আইনের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করুন।

## ৯.৮ সংঘ ও শয়নকক্ষ

উপজাতি সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। যেমন, জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিবাহ, পঞ্চায়েত ইত্যাদি। এইবার আমরা

একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করব যা শিশু ও কিশোরদের সামাজিকীকরণের একটা মুখ্য ভুমিকা পালন করে। এগুলি হয়েছে বয়োগোষ্ঠীর সংঘ এবং শয়ন কক্ষ, যেগুলিকে বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন নামে ডাকে। গোন্দরা একে গোটুল বলে, উত্তরপ্রদেশের ভোটিয়ারা একে রঙবঙ বলে। আমরা এই আদিবাসী সংঘগুলিকে গোটুল বলে উল্লেখ করব।

গোটুলের ভিত্তি হচ্ছে বয়োগোষ্ঠী। এই বয়োগোষ্ঠী অকৃতদার পুরুষ ও মহিলাদের দ্বারা গঠিত। বিবাহিত ব্যাপার হ'তে পারে কিম্বা একটা অনুষ্ঠানের **(rites de passage)** মাধ্যমে হ'তে পারে। বয়োগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম ভাঙলে নানা রকম শাস্তি হ'তে পারে। লোউই (Lowie) মনে করেন যে, এসব সংঘ আদিম সমাজব্যবস্থায় একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

## ৯.৮.১ ভারতে উপজাতিদের গোটুল

ভারতীয় সব উপজাতিদের মধ্যে গোটুল প্রথা দেখা যায়। কনিয়াক নাগা, আও নাগা, আঙ্গামী নাগা, ভোটিয়া, মুন্ডা, মুড়িয়া, হো, গোন্দ প্রভৃতির মধ্যে গোটুল প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কোনিয়াক নাগা, আও নাগা, ইত্যাদির মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা শয়নকক্ষ থাকে। আবার, মুড়িয়াদের মধ্যে দেখা যায় গোটুল ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গে থাকতে পারে।

উপজাতিদের গোটুলের জীবন আপাতদৃষ্টিতে খুব আনন্দময় কিন্তু এর শিক্ষামূলক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রথমত, গোটুলের প্রধান গুরুত্ব হচ্ছে এটা একটা সামাজিকরণের প্রতিষ্ঠান। প্রবীণরা ছোটদের উপজাতির সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ব্যাপারে শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয়ত, নানা রকম অমোদ প্রমোদ ছাড়া, গোটুলের আধিকারিকরা উপজাতি সমাজের নানা প্রয়োজনে সাহায্য করে। তারা বিবাহে সাহায্য করতে পারে। বাড়ি তৈরী করতে পারে। কিম্বা ফসল তুলতে সাহায্য করতে পারে। তৃতীয়ত পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে শিক্ষা দেয়। বড় ছেলেরাও ছোট ছেলেদের এই ব্যাপারে শিক্ষা দেয়। চতুর্থত, অনেক উপজাতি, যেমন পাহাড়ি মারিয়ারা বাড়িতে যৌন সম্পর্কের উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করে না। তাই তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক শয়নকক্ষ তৈরী করা হয়।

পঞ্চমত, গোটুলের আর একটা অবদান হ'ল ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা দান। শিক্ষা মানে লেখাপড়া শেখা নয়। এর অর্থ আরও ব্যাপক। উপজাতির ছেলেমেয়েদের জীবনের সবদিক সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়।

বর্তমানে বর্হিজগতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ক্ষতি করেছে। যে সব উপজাতি খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছে তাদের মধ্যে উপজাতি পরিবারগুলির মধ্যে যে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল তা আজ ভাঙনের মুখে। গোটুলের অভাবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে তীব্র হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, নগর সভ্যতার চাকচিক্য সরল আদিবাসীদের আকৃষ্ট করে। ফলে তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার প্রতি আস্থা বা শ্রদ্ধা থাকে না। আধুনিক হওয়ার বাসনায় নিজেদের চিরাচরিত প্রতিষ্ঠানগুলি উপজাতিগুলি বিসর্জন দিচ্ছে। তাই গোটুল আজ বিলুপ্তির পথে।

**অনুশীলনী -৬**

১) ভারতের কোন্ কোন্ উপজাতির মধ্যে গোটুল আছে?

২) উপজাতি সমাজে সংঘ ও শয়ন কক্ষের ভুমিকা কী?

৩) গোটুল প্রথা কেন অবলুপ্তির পথে? এই প্রতিষ্ঠান দুর্বল হওয়ার ফলে উপজাতি যুবক-যুবতীদের মধ্যে কী প্রভাব পড়েছে?

## ৯.৯ সারাংশ

বর্তমান এককে আপনি ভারতের উপজাতি সমাজের সঙ্গে পরিচিত হ'লেন। আমরা উপজাতি সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি; যেমন, পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক, বিবাহ, অর্থনীতি আইন ও ন্যায়। এছাড়া আমরা উপজাতি সমাজে মহিলার মর্যাদা ও শিশু ও কিশোরদের জীবনে সংঘের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি।

আমরা দেখেছি যে, পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক উপজাতিদের জীবনে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে। উপজাতি সমাজের ভিত্তি পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক। আদিম সমাজ বিবাহের একটি সামাজিক বন্ধন যা শুধু দু'জন ব্যক্তি নয়, দু'টি পরিবারের মধ্যে বন্ধন স্থাপন করে। উপজাতিদের অর্থনীতির সঙ্গে আধুনিক অর্থনীতির তফাৎ আছে। উপজাতিদের অর্থনীতিতে মানুষ মূলত জীবনধারণ করবার জন্য নানা পেশা, যেমন শিকার, ঝুম, ইত্যাদি বেছে নেয়। আদিম অর্থনীতিতে টাকা পয়সার চল নেই যদিও বিনিময় চলে। উপজাতি সমাজে আইন উপজাতিদের রীতিনীতির মধ্যে পাওয়া যায়। আধুনিক সমাজে আইন নৈব্যক্তিক। কিন্তু উপজাতি সমাজে আইন মূলত ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

আদিম সমাজে মহিলারা পুরুষের সমমর্যাদা পায়, যদিও পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে মহিলাদের পদমর্যাদার কিছু তফাৎ রয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের সামাজিকরণের ব্যাপারে গোটুল বা সংঘের গুরুত্ব অসীম।

## ৯.১০ অনুশীলনী

১) ভারতের উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২) উপজাতি সমাজে বিবাহের প্রকার সম্পর্কের রচনা লিখুন।

৩) উপজাতি সমাজে মহিলাদের মর্যাদা কিরকম? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৪) আদিম অর্থনীতির প্রকৃতি কিরকম ছিল? উহার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৫) উপজাতি সমাজের আইন ও ন্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৬) গোটুল কাকে বলে? উহার বৈশিষ্ট্য কি কি? গোটুল কি অবলুপ্তির পথে?

## ৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১) A.R. Desai (ed): Rural Sociology in India, Popural Prakasani, Bombay, 1984.

২) D.N. Mazumdar and T.N.Madan: An Introduction to Social Anthropology, Asia publishing House, Bombay, 1980.

# একক ১০ ❐ ধর্ম ও ভারতীয় সমাজ-১

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য
১০.২ প্রস্তাবনা
১০.৩ হিন্দু ধর্ম কি
১০.৪ হিন্দু ধর্মের অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব
১০.৪.১ ব্রহ্মণ ও আত্মা
১০.৪.২ ধর্ম
১০.৫ হিন্দু ধর্মের মূল দেবতা ও সম্প্রদায়
১০.৬ হিন্দু ধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠান
১০.৭ জৈনবাদ
১০.৭.১ জৈন ধর্মের মূল দর্শন
১০.৮ জৈন ধর্মাচরণ ও জৈন জীবনযাপন
১০.৮.১ জৈন ধর্মাচরণ
১০.৮.২ জৈন সমাজজীবন
১০.৯ বৌদ্ধ ধর্ম
১০.৯.১ বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা
১০.৯.২ বৌদ্ধ দর্শন ও সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক
১০.৯.৩ মহাযান, হীনযান ও বজ্রযান
১০.৯.৪ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি
১০.১০ সারাংশ
১০.১১ অনুশীলনী
১০.১২ গ্রন্থপঞ্জী

## ১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- হিন্দু ধর্ম কি
- হিন্দু ধর্মের দর্শন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
- জৈন ধর্মের মূল দর্শন
- জৈন ধর্মাচারণ ও জীবনযাপন পদ্ধতি
- বৌদ্ধ ধর্মের মূল দর্শন ও তার বিভিন্ন সম্প্রদায়
- বৌদ্ধ সমাজব্যবস্থা

## ১০.২ প্রস্তাবনা

কিন্তু ধর্ম কাকে বলে না জানলে তো এই বিশ্লেষণ নয়। তাই প্রয়োজন সংজ্ঞার। আপাতত আমরা রাজশেখর বসুর চলন্তিকা অভিধানে দেওয়া অর্থ, ''সাম্প্রদায়িক উপাসনা পদ্ধতি'' থেকে ধর্মের সংজ্ঞাদান করব। ''ধর্ম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক উপাসনা পদ্ধতি।'' হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শীরা হচ্ছে ভারতের প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী। এই সাম্প্রদায়িক উপাসনা-গোষ্ঠীর সামাজিক গঠন, বিশ্ববীক্ষা, জীবন যাত্রা ইত্যাদির মধ্যে অনেক ফারাক থাকলেও তারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একে অপরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে যুগ যুগ ধরে। এবার আসুন এই ধর্মগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই।

## ১০.৩ হিন্দু ধর্ম কি?

হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো ধর্ম। হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। হিন্দু ধর্ম কতগুলি বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি হ'ল ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ব্রাহ্মণ, আত্মা ও কর্ম। হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে। আমরা হিন্দু ধর্মের কেন্দ্রীয় ধারণা এবং সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে পরিচিত হব। হিন্দু ধর্ম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়। এটি একটি জীবনযাত্রা। হিন্দু ধর্মের কতকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে হিন্দুদের জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়। এবার আসুন, আমরা হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় ও অধিবিদ্যাগত দিক নিয়ে আলোচনা করি।

## ১০.৪ হিন্দু ধর্মের অধিবিদ্যা ও অর্ধতত্ত্ব

হিন্দু ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যাগত দিক নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব।

### ১০.৪.১ ব্রহ্মণ ও আত্মা

ব্রহ্মণ হচ্ছে একটি শক্তি যার আদি ও অন্ত নেই। ব্রহ্মণ সব জীবনের মধ্যে রয়েছে। ব্রহ্মণ ও আত্মার মধ্যে সম্পর্ক হিন্দু ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সম্পর্ক নিয়ে নানা মত রয়েছে; একটা মত হচ্ছে ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই এবং ব্রহ্মণ পরম ও নির্গুণ। কিন্তু অন্য অনেকের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এবং তারা আত্মার সঙ্গে ও ব্রাহ্মণের ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। আত্মার কোনও লয় নেই, ক্ষয় নেই। আত্মার বেশ কয়েকবার জন্ম হয়, মনুষ্যেতর জীব, মানব ও অতিমানব। আগের জন্মে ভাল ও মন্দ কর্মের দ্বারা আত্মা প্রভাবিত হয়। ভাল বা খারাপ কর্মের ধারণা ধর্মের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, মনে করেন শ্রীনিবাস ও শাহ। এবার আসুন, আমরা ধর্ম ও কর্মের অর্থ জানি।

## ১০.৪.২ ধর্ম

ধর্মের বহু অর্থ আছে। মদনের মতে, ধর্মের মধ্যে বিশ্বতাত্ত্বিক, নৈতিক, সামাজিক এবং আইনগত নীতি রয়েছে, যা হ'ল শৃঙ্খলিত বিশ্বের ধারণার ভিত্তি। ধর্ম সামাজিক জীবনের নৈতিক ভিত্তি। ধর্ম সামাজিক আদানপ্রদানের নিয়ম বেঁধে দেয়। এর ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক অবস্থান (বর্ণ), জীবনের পর্যায় (আশ্রম), এবং অন্তর্নিহিত গুণ। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক ধরনের আচরণ আছে যা ঠিক। এটা হচ্ছে তার স্বধর্ম। এটাকে 'বৃত্তি' বা 'পেশা' হিসাবে দেখা যায়। ধর্ম সুখী জীবনের ভিত রচনা করে। সুতরাং, ধর্ম হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য (অর্থ) এবং সুখ (কাম) অর্জন করা। জীবনের উদ্দেশ্যের (পুরুষার্থ) মধ্যে মোক্ষর প্রধান ভূমিকা আছে। মোক্ষ হচ্ছে জীবন, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চক্র হতে মুক্তি।

এবার আসুন আমরা **পুরুষার্থ, ঋণ** ও **বর্ণাশ্রম** সম্পর্কে আলোচনা করি।

**ক) পুরুষার্থ ঃ** হিন্দু ধর্ম একটি সুস্থ, স্বাভাবিক ও সফল জীবনযাপনের উপর জোর দেয়। এর মূলে আছে চারটি উদ্দেশ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই উদ্দেশ্যগুলিকে **পুরুষার্থ** বলা হয়। **ধর্ম** হল মূলত নৈতিকতা। অর্থ হচ্ছে বৈষয়িক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ভাল চাকুরী বা সম্মানজনক পেশা, গাড়ি, বাড়ি, টাকাকড়ি। **কাম** হচ্ছে যৌন আকাঙ্খা মেটাবার উদ্দেশ্য। প্রেম, বিবাহ, ইত্যাদি এই পুরুষার্থের মধ্যে পড়ে মোক্ষ হচ্ছে জন্ম ও পুনর্জন্মের হাত হ'তে মুক্তি। তিনিই মুক্ত পুরুষ যিনি মোক্ষলাভ করেছেন। এই সংসারে পুরুষার্থগুলিকে সৎভাবে আহরণ করতে হবে। হিন্দু ধর্ম একটি পুর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রা। হিন্দু ধর্মের পূর্ণতা এই চার পুরুষার্থের সমন্বয় ঘটানোর মধ্যে রয়েছে। এই প্রক্রিয়া হিন্দুদের প্রত্যেক মুহূর্তকে আতমসমীক্ষার মধ্যে ফেলছে এবং অসংখ্য সামাজিক ও নৈতিক ঋণের মধ্যে বাঁধছে। উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলির ঐচ্ছিক গ্রহণকে হিন্দুরা **ঋণ** বলে।

**খ) ঋণ ঃ** হিন্দুদের চারটি দায়িত্ব বা কতর্ব্য আছে। এগুলিকে ঋণ বলা হয়। এই দায়িত্বগুলি জীবনের বিভিন্ন স্তরে পালন (আশ্রম) করা হয়।

হিন্দুদের জীবনে চারটি স্তর আছে। এগুলি হ'ল ঃ **ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ** ও **সন্ন্যাস**। জীবনের প্রথম স্তর হ'ল **ব্রহ্মচর্য**। এই স্তরে মানুষ অবিবাহিত থাকে এবং জ্ঞানার্জন করবার জন্য লেখাপড়া করে। জীবনের দ্বিতীয় স্তর হ'ল **গার্হস্থ্য**। জীবনের এই পর্যায়ে মানুষ বিবাহ করে সংসারী হয় এবং সন্তান প্রতিপালন করে। জীবনের তৃতীয় স্তর **বানপ্রস্থ** শুরু হয় যখন গৃহস্থ গৃহ ছেড়ে উদাসী জীবন যাপন করে কিন্তু সে সংসারের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক রাখে। চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ে বৃদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসারের মায়া পুরোপুরি পরিত্যাগ করে এবং অরণ্যে বাকি জীবন কাটায়। বিদ্যা নিবাস মিশ্র মনে করেন যে, ব্রহ্মচর্যে ঋষিদের কাছে কর্তব্য পালন করা হয়, গার্হস্থ্যে পূর্ব পুরুষদের কাছে। বানপ্রস্থে দেবতাদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা হয়। শেষে সে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

**গ) বর্ণাশ্রম ঃ** হিন্দুদের জীবনের উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজব্যবস্থার মধ্যে অর্জিত হয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে চারটি **বর্ণ** আছ। এই বর্ণগুলি হ'ল **ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য** ও **শূদ্র**। একজন হিন্দু একটি বর্ণে জন্মায় এবং মোক্ষের জন্য বর্ণ ধর্ম পালন করে। ঋক্ বেদের বিখ্যাত পুরুষ শূক্তে এই চতুবর্ণের উৎপত্তির কথা আছে। ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয়েছে। জ্ঞানার্জন হচ্ছে ব্রাহ্মণের কাজ। **ক্ষত্রিয়** তার বাহু থেকে নির্গত হয়েছে রণ ও শাসন হ'ল এদের কাজ। আর বৈশ্যের আবির্ভাব হয়েছে তার উরু থেকে। এদের পেশা হ'ল বাণিজ্য। শূদ্র ব্রহ্মার পদ থেকে নির্গত হয়েছে। শূদ্রের কাজ হ'ল অন্য তিন বর্ণের সেবা করা।

এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে ঋক্‌বেদ নীরব। এই বর্ণগুলির মধ্যে অসংখ্য জাত রয়েছে। এদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পেশা, পবিত্রতা-অপবিত্রতার সম্পর্কে ধারণা সামাজিকভাবে আরোপিত। জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গেলে প্রত্যেক জাতির লোকেরা তাদের জাতিধর্ম পালন করে। সব হিন্দুরা এই বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনে চলে। বর্ণাশ্রম হিন্দুদের সামাজিক পরিচয় বাহক।

**ঘ) কর্ম ঃ** সাধারণ হিন্দুদের চেতনায় কর্ম ও ধর্মের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ আছে। ধর্ম যদি সৎ জীবনযাপনের সূত্র হয় কর্ম হ'ল ধর্মের দ্বারা নির্ধারিত জীবনযাত্রা পালন করবার চেষ্টা। কর্মের অর্থ হ'ল ক্রিয়া। **শ্রীমদভগবৎগীতা** নিষ্কাম কর্ম করবার উপদেশ দেয়। সাধারণ হিন্দুদের চেতনায় কর্মের সঙ্গে জন্ম, পুণর্জন্ম ও মোক্ষর একটা সম্পর্ক আছে। অনেকে বিশ্বাস করে যে, বর্তমান জন্মের সুখভোগ বা দুঃখ ও দুর্দশার সঙ্গে গত জন্মের সৎ বা অসৎ কর্ম করার সম্পর্ক রয়েছে। কর্ম নির্ধারণ করে কোনও জাতে একজন হিন্দু জন্মাবে, কী ধরনের সুখভোগ বা দুঃখভোগ সে করবে। তার ভবিষ্যৎ জন্ম বর্তমান কর্মের উপর নির্ভর করবে। হিন্দুরা তিনভাবে কর্ম করতে পারে।

১) **পূজার** মাধ্যমে কর্ম করা যায়। বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনাকে পূজা বলে। বৈদিক যুগ থেকে পূজা করবার প্রথা চলে আসছে। বৈদিক যুগের পর পূজার সঙ্গে বলি প্রথা যোগ হয়। সাধারণ হিন্দুদের ধারণা যে পূজা নামক কর্ম করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের দিক নির্ধারণ করা যায়।

২) **জীবন বৃত্ত (life cycle)**-কর্মের সঙ্গে অনেক হিন্দু জীবনবৃত্তকে একাত্ম করেন। প্রত্যেক হিন্দুকে বিবিধ সংস্কার পালন করতে হয়। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সঙ্গে যে সব আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে তাদের সংস্কার বলা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি হিন্দুদের নৈতিকভাবে উচ্চমার্গে পৌঁছে দেয়। মৃত্যুর পর একজন হিন্দু পূর্বপুরুষ হিসাবে গণ্য হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি নবজাতককে সামাজিক পরিচয় দেয়। যেমন, অন্নপ্রাশন ও নামকরণ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'ল নবজাতককে সমাজের সঙ্গে পরিচয় করানো। আবার বিবাহের উদ্দেশ্য হ'ল নরনারীর যৌন সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি।

৩) **তীর্থ** উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়া তীর্থদর্শনও কর্ম করার আর একটা উপায়। ভারতবর্ষে হিন্দুদের বহু তীর্থ আছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন গঙ্গাসাগরমেলা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীদের টানে। এ ছাড়া রয়েছে বেশ কিছু দেবস্থান বা মন্দির। যেমন, কালীঘাট হচ্ছে একান্ত পীঠের একটি। উত্তর প্রদেশের কুম্ভমেলা রাজা হর্ষবর্ধনের আমল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে দু'টি জোর্তিলিঙ্গ, কেদারনাথ ও বদরীনাথ। দেবস্থান ছাড়া রয়েছে কিছু পবিত্র নগর-কাশী, বৃন্দাবন (উত্তরপ্রদেশ), গয়া (বিহার) প্রভৃতি। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে তীর্থদর্শনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

সব হিন্দুরা জন্ম ও পুনর্জন্মের বৃত্ত থেকে মুক্তি চান। কী পথে এই মুক্তি আসবে? গীতা কর্ম করবার উপদেশ দেয়। কিন্তু সে কর্ম নিষ্কাম কর্ম হ'তে হবে। কোনও ফলের আশা না করে নিজের কর্তব্য করা বা দায়িত্ব পালন করাটাকে নিষ্কাম কর্ম বলে।

**ঙ) মোক্ষ ঃ** হিন্দু ধর্মতত্ত্বের লক্ষ্য হ'ল মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভের অর্থ হ'ল জন্ম ও পুনর্জন্মের গণ্ডি হ'তে মুক্তি। মোক্ষর সঙ্গে কর্ম ও ধর্মের একটি সম্পর্ক আছে। সৎ কর্মের মাধ্যমে মানুষ জন্ম ও পুনর্জন্মের গণ্ডি হ'তে মুক্তি লাভ করবে এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্মাণের সঙ্গে মানবাত্মার মিলন ঘটবে। মোক্ষ অর্জন করবার জন্য চাই গভীর জ্ঞান, সৎকর্ম, এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি। জ্ঞানার্জনের জন্য একজন মানবের চাই বিশ্বসংসারকে

পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করা। কিন্তু এই পদ্ধতি কতিপয় ব্যক্তি গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে আপনার পছন্দ দেবদেবীকে চিরাচরিত পদ্ধতিতে পূজা করা। এই পদ্ধতি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব অবলম্বন করেছিলেন। **শ্রীমদভগবদগীতা** মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে সৎকর্মের উপর জোর দিয়েছেন। ফলে সাধারণ মানুষ এই মার্গের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করতে পারে।

## ১০.৫ হিন্দু ধর্মের মূল দেবতা ও সম্প্রদায়

হিন্দু ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বেদ ও বৈদিক আচার আচরণ। বৈদিক যুগে যজ্ঞ ছিল মূল উপাসনা পদ্ধতি। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তিনজন প্রধান দেবতা।

১) **ব্রহ্মা** - যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা।

২) **বিষ্ণু** - যিনি জগৎকে রক্ষা করেন ও পালন করেন।

৩) **মহেশ্বর বা শিব** - যিনি প্রলয়ের দেবতা।

এই তিন দেবতা ছাড়া আমরা অসংখ্য বড় ও ছোট মাপের দেবতা দেখতে পাই। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে অধিকাংশ দেবতা প্রকৃতির দেবতা। যেমন ইন্দ্র (আকাশ), অগ্নি (অগ্নি), বরুণ (জল)। এদের বাহন হ'ল পর্বত, বা কোন প্রাণী ইত্যাদি যাদের হিন্দু ধর্মে উপাসনা করা হয়। এছাড়া কিছু আঞ্চলিক দেবদেবী রয়েছে যাদের উৎপত্তি লৌকিক বিশ্বাস থেকে। বাংলায় যেমন কালী ও মনসা জনপ্রিয় দেবী। কিছু দেবদেবীর উৎপত্তি আঞ্চলিক হ'লেও কিছুকাল পর হিন্দু ধর্মে তাদের স্থান দেওয়া হয়েছ। যেমন 'সন্তোষী মা' এবং 'বৈষ্ণোদেবী'।

পূজা এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপাসনা করার পদ্ধতি আস্তে আস্তে বৈদিক যুগের যজ্ঞে স্থান নেয়। এই পূজার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রচনা করা। তাই মূর্তি পূজার প্রবর্তন। আমরা লক্ষ্য করি যে, পূজার ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মে গড়ে ওঠে তিনটি সম্প্রদারয়। এগুলি হ'ল—(ক) বৈষ্ণববাদ; খ) শৈববাদ এবং গ) শক্তিবাদ। এবার এগুলির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয় করা যাক।

ক) **বৈষ্ণববাদ** - বৈষ্ণববাদীরা বিষ্ণুর উপাসক। এখানে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে।

খ) **শৈববাদ** - শৈববাদীরা শিবের উপাসক। এরা বৈষ্ণবাদীদের থেকে অনেক কঠোরভাবে তপস্যা করে। যোগ পদ্ধতি তপস্যায় ব্যবহার হয়।

গ) **শক্তিবাদ** - শক্তির আরাধনা আসলে কিছু দেবী, যেমন দুর্গা, কালী, ইত্যাদির আরাধনা। শক্তিবাদে তান্ত্রিক পদ্ধতির মাধমে পূজা করা হয়। শক্তিবাদকে আপনি বৈষ্ণববাদ ও শৈববাদের মধ্যে খুঁজে পাবেন।

## ১০.৬ হিন্দু ধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠান

হিন্দু ধর্মের  কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে যার বৈশিষ্ট্যগুলি আকৃতি ও ক্রিয়ার দিক থেকে অনন্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কতকগুলি ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে কাজ করে। এবার আসুন এগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১) **জাত** - হিন্দু ধর্মের একটি নিজস্ব সামাজিক সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনের ভিত্তি হচ্ছে জাতপাত ব্যবস্থা।

জাতপাত ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল সামাজিক ব্যবস্থা। অন্তর্বিবাহ, স্তরভাগ, জাতের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির আদানপ্রদানে নানা বিধিনিষেধ ইত্যাদি জাতপাত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

২) **বিবাহ** - হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ একটি বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান। মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে একজন হিন্দুকে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী পূর্বপুরুষদের প্রতি কিছু আচার-আচরণ করতে হয়। যেমন, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা গয়ায় পিণ্ডদান। এই ক্রিয়াগুলি পুরুষ উত্তরাধিকারীদের করা কর্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুকে পুরুষ সন্তান প্রজনন করবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করতে হয়। নইলে তার মোক্ষলাভ হবে না। প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মতে বিবাহের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলি হল ঃ

ক) **ধর্ম** - সৎ কার্য ও আচরণ করা।

খ) **প্রজ** - সন্তানের জন্ম দেওয়া।

গ) **রতি** - যৌন সুখভোগ।

সুতরাং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মতে পত্নী ও সন্তান ছাড়া একজন হিন্দু পুরুষ অসম্পূর্ণ।

৩) **পরিবার** - হিন্দুদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে গার্হস্থ আশ্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবার গঠন। গার্হস্থ আশ্রমে একজন হিন্দু তার পরিবার রক্ষার্থে ও মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে তার **ধর্ম** ও **কর্ম** করে। হিন্দুদের আদর্শ পরিবার হচ্ছে **যৌথ পরিবার**। এই ধরনের পরিবারে সাধারণত একটি গৃহে তিন পুরুষ থাকে। হিন্দু যৌথ পরিবার সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক। পারিবারিক সম্পত্তি ও বাসস্থান যৌথ। যৌথ পরিবারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুই-তিন পুরুষের এক একটি গৃহে বাস। বয়সে সবচেয়ে বড় পুরুষ হচ্ছে বাড়ির কর্তা। তার ছেলে, তাদের পরিবার, এমন কি কিছু নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়রাও এই পরিবারের সদস্য হ'তে পারে।

৪) **উত্তরাধিকার** - বাংলা ও আসাম বাদ দিয়ে বেশিরভাগ জায়গায় **মিতাক্ষর** নামক উত্তরাধিকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় একজন হিন্দুর পুত্রের তার পিতার সম্পত্তির প্রতি জন্মগত অধিকার থাকে। আসাম ও বাংলার **দায়ভাগ** ব্যবস্থায় একজন পুরুষ তার সম্পত্তি যাকে খুশি দিতে পারে। নিজের সম্পত্তি সম্পর্কে তার পূর্ণ অধিকার আছে।

হিন্দুদের উত্তরাধিকার বিধিতে মেয়েদের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার নেই। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের বিবাহের সময় কিছু সম্পত্তি দেওয়া হয় যাকে **স্ত্রীধন** বলে।

স্বাধীনতার পর দু'টি আইন প্রণয়ন করা হয়। এগুলি হ'ল Hindu Succession Act (1956) ও Hindu Adoption and Maintenance Act (1956)। এই দু'টি আইন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইন আনুযায়ী একজন হিন্দু স্বামী স্ত্রী ও পরিবার পালনে আইনত বাধ্য। একজন হিন্দু পুরুষ যদি মৃত্যুর আগে কোন ইচ্চাপত্র (will) না করেন তবে তার সম্পত্তি তার মা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে। এই আইনে একজন মহিলাকে তার বাবা ও স্বামীর সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকারিণী করা হয়েছে।

## ১০.৭ জৈনবাদ

জৈনবাদ ভারতের মহান ধর্মের মধ্য অন্যতম ধর্ম। জৈনদের দেশের সব জায়গায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁরা মূলত পশ্চিম ভারত, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে থাকেন। ঐতিহাসিকরা আমাদের জানিয়েছেন যে, জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম গণসঙ্ঘের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা গোঁড়ামীর বিরোধিতা করেন এবং বৈদিক শাস্ত্রের কর্তৃত্বের বিরোধীতা করেন এবং তার সঙ্গে জাতপাতের ধারণা বর্জন করেন। তারা যে সম্প্রদায় স্থাপন করেন তা ভিক্ষুকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ভিক্ষুরা বিশ্বসংসার পরিত্যাগী সন্ন্যাসী। এমনই একজন সন্ন্যাসী ছিলেন-জৈনবাদের পয়গম্বর, বর্ধমান মহাবীর। এটা ভুললে চলবে না যে, জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম স্বতন্ত্র ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। এগুলি হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করবার জন্য গড়ে ওঠে। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, মহাবীর (৫৯৯-৫২৭ খ্রীঃ পূঃ) বুদ্ধের থেকে বয়সে বড় ছিলেন। বুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬০ এ আবির্ভূত হন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০ তে নির্বাণ লাভ করেন।

মহাবীর ছিলেন জৈন ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা মার্গ দর্শনকারী আছেন। মহাবীর একজন রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর বাবা নাটা একবংশীয় গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন। ছোটবেলায় মহাবীর পিতামাতার প্রতি কর্তব্য করেন। তাঁদের মৃত্যুর পর তিনি বিশ্বসংসারের মায়ার বন্ধন ত্যাগ করে তিরিশ বছর বয়সে বনবাসী হন। তের বছর ধরে নিরলস তপস্যার ফলে তিনি অবিদ্যার বন্ধন ভেঙে বিশ্বের শিক্ষক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ৪২ বছর ত্রুটিমুক্ত জীবন যাপন করে মহাবীর অনশনে মৃত্যু বরণ করেন।

### ১৯.৭.১ জৈন ধর্মের মূল দর্শন

জৈন ধর্মের মূল বক্তব্য হ'ল যে, কোনও প্রাণীকে আঘাত না করলে একজন নির্বাণ বা চিরশান্তি লাভ করে। জৈনরা শান্তিতে বিশ্বাস করে। মানুষে মানুষে শান্তি, মানুষ ও জীবে শান্তি, বিশ্বসংসারে শান্তি ও সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জৈনদের মূল দর্শন।

জৈনরা মনে করে যে, সবকিছুর মধ্যে প্রাণ আছে-পাথর থেকে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গে আত্মা বিরাজ করছে। একে বলে জীব। আত্মার অস্তিত্ব অন্য আত্মার সমষ্টির মধ্যে। হিন্দুদের আত্মার মতো সব জীবের কোনও লয় বা ক্ষয় নেই। জৈনরা বিশ্বাস করে যে, কর্ম নির্ধারণ করে পুনর্জন্মের সময় কার অবস্থা কিরকম হবে।

জীবের ধারণার সঙ্গে আর একাট ধারণার উল্লেখ করতে হয়। সেটা হ'ল অহিংসা। মহাবীরের নিয়ম অনুযায়ী কাউকে অপমান করা চলবে না। কারোর প্রাণনাশ করা চলবে না। কিন্তু কঠিন তপস্যা ও শারীরিক কষ্টের মাধ্যমে সমস্ত ইচ্ছা, লোভ ইত্যাদিকে দমন করতে হবে এবং বিশ্বসংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। নির্বাণ লাভ হ'লে জন্ম ও পুনর্জন্মের বৃত্ত শেষ হবে এবং তপস্যাকারীর আত্মা মুক্তি পাবে। মহাবীরের পদবী (জীন) থেকে এটা পরিস্কার। জীন মানে যে জয় করে। এর সঙ্গে জাগতিক অনুভূতি থেকে মুক্তির যোগ আছে।

খুব মক সময়ের মধ্যে জৈন ধর্ম ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে জৈন ধর্মালম্বীরা প্রাচীন বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, ইত্যাদি পূর্বভারতীয় রাজ্যে বসবার শুরু করে। তাদের প্রভাব কাশী ও কোশল অবধি বিস্তৃত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে কলিঙ্গের রাজা খরভেল জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন ও জৈন শ্রমণদের জন্য গুহা, জৈনের মূর্তি প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

অশোকের পৌত্র, রাজা সম্প্রতি জৈন ধর্মের আর এক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর ফলে জৈন ধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে। তামিল গ্রন্থ যেমন ''মনিমাকালাই'' ও ''সিলাপালিকারাম'' জৈন প্রভাব সম্পর্কে আমাদের জানায়। পঞ্চ থেকে দ্বাদশ শতক অবধি গঙ্গা, কদম্ব, চালুক্য এবং রাষ্ট্রকুটগণ জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

গুপ্তযুগে (৩২০-৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্য ও পশ্চিম ভারতে জৈন প্রভাব জোরদার হয়। সপ্তম শতকে শেতাম্বর সম্প্রদায়ের রাজশক্তি বৃদ্ধি পায়। এর কারণ রাজপৃষ্ঠপোষকতা। ১১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গুজরাটের চালুক্যদের দরবারে শক্তি বৃদ্ধি করে। এখনো এইসব জায়গায় মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের উপর জৈনবাদ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।

একটি ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ থাকতে পারে যার ফলে কালক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায় তৈরী হয়। জৈনবাদ এর ব্যতিক্রম নয়। জৈনবাদের প্রথম (Schism) জীন জীবিত থাকাকালীন হয় এবং এরকম সাতবার ভাঙন হবার পর জৈন ধর্মের মূল দুটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এগুলি হ'ল শ্বেতাম্বর (যারা পোষাক পরে) ও দিগম্বর (যারা নগ্ন)। এই ভাগ হয় মহাবীরের তিরোভাবের ৬০৯ বছর দিন। বাদানুবাদটি মূলত শ্রমনদের কাপড় পরা উচিত কি না - এই নিয়ে হয়েছিল। আর একটা কারণ হ'ল দিগম্বরেরা মনে করতেন যে, মহিলারা জন্ম ও পুনর্জন্মের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে পারবে না।

জৈন ধর্মের মূল সম্প্রদায়গুলি কিছু উপ-সম্প্রদায়ে (গচ্ছা) বিভাজিত। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্বেতাম্বরদের একটি উপ-সম্প্রদায় **স্থানকবাসী** পশ্চিম ভারতে আবির্ভূত হয়। এই সম্প্রদায়টি জীনের মূর্তিপজার বিরোধীতা করে। ষোড়শ দশকেই দিগম্বরদের একটি গচ্ছা মূর্তিপূজার বিরোধীতা করে। এর হ'ল তেরাপা। শ্বোতম্বরদের মূল গচ্ছার নাম হ'ল খাসাতারা, তপ ও অবলতল। দিগম্বরমদের নন্দি, খাস্থা, দ্রাবিড় ও সেন।

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি মূলত মৌখিকভাবে জীনের সময় থেকে রয়েছে। সময় বিশেষে এই গ্রন্থগুলি লিপিবদ্ধ করা হ'ত। জৈন পবিত্র সাহিত্যকে প্রথম গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় পাটালিপুত্রতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ দশকের শেষে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় দশকের শেষে মথুরা ও ভালাবীতে জৈন সম্মলন হয়। চতুর্থ ও শেষ জৈন সম্মেলন করা হয় ভালাবীতে ৪৫৪ বা ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই সম্মেলনে মনে হয় শ্বেতাম্বরদের আবির্ভাব হয়। শ্বেতাম্বরদের ধর্মগ্রন্থে ৪৫টি অঙ্গ (ভাগ) আছে যাতে ১১ অঙ্গ, ১২ উপাঙ্গ, ৪ মূলাসূত্র, ৬ চেদাসূত্র, ২ চুলিকাসূত্র ১০ প্রকিরনাকর রয়েছে।

দিগম্বররা মনে করেন যে, মহাবীরের মূল গ্রন্থ হারিয়ে গেছে। তাঁরা প্রাকৃতে রচিত দু'টি গ্রন্থ, পুষ্পদন্ত ও **ভুটভালিন** রচিত গ্রন্থ, **কর্মপ্রভর্ত** এবং **গুণধরার** কাশ্যপ্রবর্তকে স্বীকৃতি দেয়।

## ১০.৮ জৈন ধর্মাচরণ ও জৈন জীবন যাপন

আগের খণ্ডে আমরা জৈন ধর্মের মূল দর্শন আলোচনা করেছিলাম। এবার আসুন, আমরা জৈন ধর্মাচরণ ও সমাজজীবন নিয়ে আলোচনা করি।

### ১০.৮.১ জৈন ধর্মাচরণ

জৈনদের সমাজে তাদের ধর্মাচরণকে জৈন বিশ্বাস ও হিন্দু সমাজ প্রভাবিত করে। সাধারণ জৈন সঙ্ঘে চার ধরনের সদস্য দেখতে পাওয়া যায়। যথা, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রী। তাদের ত্রিরত্নে অচল, বিশ্বাস

আছে। ত্রিরত্ন হচ্ছে জৈনধর্মের মূল ভিত্তি। এই ত্রিরত্নে বিশ্বাস করলে সঠিক বিশ্বাস, সঠিক জ্ঞান ও সঠিক আচরণ পালন করতে হবে। সন্ন্যাসীরা অন্তরে ও বাহিরে মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু গার্হস্থরা কিছু অনুষ্ঠান করতে পারে; যেমন, মূর্তি পূজা। কিন্তু সাধারণ জৈনদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রতি দুর্বলতা লক্ষ্যণীয়। হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু আচরণ, যেমন পুষ্পাঞ্জলী, আরতি ইত্যাদি জৈনরা নিজেদের ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সন্ন্যাসীরা ও সাধারণ মানুষ কিছু প্রতিজ্ঞা করে। যেমন ১) জীবকে আঘাত না করা; এবং ২) জীব হত্যা যাতে না হয় সেইজন্য রাত্রে পান ও আহার করা। জৈনদের মূল দু'টি ভাগ করা যায়। ১) সাধারণ জৈন পুরুষ ও মহিলা (শ্রবক) ও সন্ন্যাসী (জাতি) শ্রবকরা অহিংসা, সত্যবাদিতা, দান ধ্যান ইত্যাদি ব্রত ও গ্রহণ করে। এছাড়া সন্ন্যাসীদের মতো গৃহস্থরা কিছু কর্তব্য করে। জৈনরা যেকোনও প্রকার মাদকদ্রব্য কঠোরভাবে বর্জন করে। তারা নিরামিষভোজী।

## ১০.৮.২ জৈন সমাজজীবন

জৈনরা একটি ছোট সম্প্রদায়। কিন্তু তাঁদের বিত্ত ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য জৈনরা ভারতের ক্ষমতাবান সম্প্রদায়ের অন্যতম। ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে মূল পেশা। উত্তর ভারতে জৈন ও হিন্দু বৈশ্যদের মধ্যে বিবাহের রেওয়াজ আছে। হিন্দু যৌথ পরিবারের মতো জৈনদের যৌথ পরিবার রয়েছে। তাঁরা কঠোরভাবে একগামীতা পালন করে এবং তাদের আচরণবিধি তাঁদের একটি স্বাতন্ত্র্য দেয়। জৈনরা খুব আত্মসচেতন। শৈশব থেকে তাঁদের শরীর ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে শেখানো হয়। তাই জৈন পুরুষ ও মহিলারা খুব শান্ত ও সংযত। সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা অনেক কঠোর। তারা ভিক্ষাবৃত্তি করে নিজেদের অন্ন যোগাবে এবং সম্পত্তি পরিত্যাগ করবে। গুরুর শিক্ষার উপর তারা সবচেয়ে বেশি জোর দেয়। সন্ন্যাসীদের বিশ্ববীক্ষার মধ্যে দেহ, গুরু, শিষ্যও অধ্যয়ন। সন্ন্যাসিনীরাও একই কঠোর আচরণ-বিধি পালন করে। একজন সন্ন্যাসিনীর কর্তব্য হ'ল দেখা যে, সাধারণ জৈন মহিলা, স্ত্রী ও কন্যাদের যেন ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। জৈনরা স্ত্রী-শিক্ষার উপর খুব জোর দেয়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসিনী থাকলেও দিগম্বরদের মধ্যে মহিলা সন্ন্যাসী নেই। যখন একজন সন্ন্যাসী বোঝেন যে, তাঁর দেহ আর কোনও অগ্রগতি করতে পারবে না তখন তিনি অনশন করে দেহ ত্যাগ বা মৃত্যুবরনের সিদ্ধান্ত নেন। জৈনদের প্রধান উৎসবগুলি জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনে শুভ সময়কে অবলম্বন করে হয়। এগুলি হ'ল—(ক) গর্ভধারণ, (খ) জন্ম, (গ) দীক্ষা, (ঘ) জ্ঞানপ্রাপ্তি (কেবল জ্ঞান), (ঙ) মৃত্যু ও জীনের মুক্তি।

এবার আসুন জৈনদের মুখ্য উৎসবগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করি।

১) **পরিউষন বা প্রিউসন্ন** - এটি জৈনদের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব। এটি ভদ্রপাদ মাসে (August-September) পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল চিত্তশুদ্ধি। তার প্রক্রিয়া হ'ল সবাইকে ক্ষমা করা এবং সবাইকে সেবা করা। উৎসবের শেষ দিনে জৈনরা দরিদ্রদের ভিক্ষা দেয় এবং মহাবীরের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে। উৎসবের সময় জৈনরা যা যা দোষ করেছে তা স্বীকার করে নেয়। এই স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য হ'ল সমস্ত খারাপ অনুভূতি নির্মূল করা।

২) **ওলি** - ওলি হ'ল উপবাসের অনুষ্ঠান যা বছরে দু'বার পালিত হয়। চৈত্র মাস (March-April) ও আশ্বিন মাসে (September-October) এ ব্রত নয়দিন করে পালিত হয়।

৩) দেওয়ালীর সময় জৈনরা মহাবীরের নির্বাণ উদ্‌যাপন করে। প্রদীপ জ্বেলে এই উৎসব পালন করা হয়।

৪) **জ্ঞানপঞ্চমী** - এই উৎসব দেওয়ালীর পাঁচ দিন পর পালন করা হয়। মন্দিরে আরাধনা করা হয় এবং পুঁথি আকারে জৈনদের ধর্মীয় পুস্তকগুলির পূজা করা হয়।

৫) **মহাবীর জয়ন্তী** - চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতে জৈনরা মহাবীরের জন্মদিন উপলক্ষে মহাবীর জয়ন্তী পালন করেন।

৬) এই উৎসবগুলি ছাড়া জৈনরা বহু হিন্দু উৎসব পালন করেন। তার মধ্যে রয়েছে হোলি, মকর সংক্রান্তি, নবরাত্রি, (উত্তরভারতে), কার্তিক, পোঙ্গল ও যুগাদ (দাক্ষিণাত্যে)।

জৈনদের কাছে পূজার্চনা বাধ্যতামূলক। তাই তারা মন্দিরে মহাবীর এবং সমস্ত নির্বাণপ্রাপ্ত আত্মার অর্চনা করে। জৈন ধর্মাচরণের মধ্যে রয়েছে মূর্তি পূজা, স্তোত্রপাঠ, মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা। এগুলি জৈন ধর্মের উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাবের নিদর্শন। জৈন ও হিন্দুদের বিশ্বাস, পূজার্চনা ও ধর্মাচারণের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জৈনদের কর্ম সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে হিন্দুদের কর্ম সম্পর্কে ধারণার অনেক মিল আছে। মহাবীরের অহিংসা সম্পর্কে মতামত হিন্দুদের খুবই প্রভাবিত করে। মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ধর্মকে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রয়োগ করে। বৈষ্ণবদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধের মধ্যে জৈন ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। জৈনরাও হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। জৈনদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মের ষোলটা সংস্কারের প্রভাব দেখা যায়। জৈনরা হিন্দু জাতপাত ব্যবস্থা দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত। মধ্যযুগে জৈনদের মধ্যে একটা জাতপাত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু জৈন মুনিরা জাতপাত ব্যবস্থা মানেন না।

## ১০.৯ বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্ম চারটি মহান সত্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলি হ'ল দুঃখকে স্বীকার করা, দুঃখের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, দুঃখকে শেষ কী করে করা যায় এবং অষ্টাঙ্গিকা মার্গের মাধ্যমে দুঃখের অবসান।

**ক) জীবন মূলত দুঃখের ঃ** অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, বুদ্ধের দর্শনের মূল প্রতিজ্ঞাগুলি অধিবিদ্যাগত নয়; এগুলি মনস্তাত্ত্বিক। এর কেন্দ্রীয় প্রতিজ্ঞা হচ্ছে কোনও মানুষের দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। সারনাথে বুদ্ধের প্রথম বাণীতে বুদ্ধ দুঃখের সম্পর্কে একথা বলেছেন। এই হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম কথা।

**খ) দুঃখের কারণ হ'ল ক্ষমতা, সুখ ও অস্তিত্বের ইচ্ছা ঃ** দুঃখের কারণ হ'ল ''তনহ'' বা ক্ষমতা, সুখ ও অস্তিত্বের লিপ্সা। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি এই লোভকে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে। দুঃখ ও ''তনহ''র কারণ বিশ্বসংসার সম্পর্কে অজ্ঞতা। বিশ্ব সংসার চিরপরিবর্তনশীল (অনীক্কা)। বুদ্ধের মতে, পৃথিবীতে আত্মা নেই (অনাত্মা) কিন্তু কর্ম ও কারণের ফলে পুর্নজন্ম হয়।

গ) দুঃখকে জয় করবার জন্য কামনা পরিত্যাগ করতে হবে। দুঃখকে ব্যক্তিগত নৈতিক নিয়ম দিয়ে জয় করতে হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের মূল মন্ত্র। যারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করে চিত্তশুদ্ধির উচ্চমার্গে পৌঁছেছেন তারা নির্বাণ প্রাপ্ত হবে।

**ঘ) দুঃখকে মোচনের জন্য মহান অষ্টাঙ্গিকা মার্গ ঃ**

বুদ্ধদেব মনে করতেন যে, সঠিক মতামত, সঠিক উদ্দেশ্য, সঠিক কথা, সঠিক আচরণ, সঠিক চেষ্টা, সঠিক মনস্ক ও সঠিক মনোযোগ - এই **অষ্টাঙ্গিকা মার্গে** চললে মানুষ দুঃখ হ'তে মুক্তি পাবে। জন্ম ও পুনর্জন্মের গণ্ডি থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ নির্বাণ লাভ করবে।

## ১০.৯.১ বৌদ্ধ সমাজব্যবস্থা

যখন একজন বৌদ্ধ সমাজে যোগ দেন তাঁর কোনও ধর্মে যোগ দেওয়ার দরকার নেই। তার যোগদানের অনুষ্ঠানে একজায়গায় তাকে বলতে হয়

বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি।
ধম্মং স্মরণং গচ্ছামি।
সংঘং স্মরণং গচ্ছামি।

অর্থাৎ

বুদ্ধকে আমি স্মরণ করি।
ধর্মকে আমি স্মরণ করি।
সংঘকে আমি স্মরণ করি।

বুদ্ধদেব মনে করতেন যে, অষ্টাঙ্গিকা মার্গ সাধারণ জীবনে পালন করা কঠিন। তাই বৌদ্ধ ধর্মে দু'ধরনের সদস্য আছে - **বৌদ্ধ ভিক্ষু** ও সাধারণ গৃহী **বৌদ্ধ**।

১) **বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণেরা** পরিবার, বৃত্তি ও সমাজ পরিত্যাগ করে একলা কিম্বা অন্য শ্রমণদের সঙ্গে বনে বাস করবেন। পোষাকে খাদ্যে ও বাসস্থানে তাঁদের অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতে হবে। বৌদ্ধ শ্রমণেরা ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবেন। শ্রমণদের দশটি আজ্ঞা পান করতে হবে।

১) শ্রমণরা জীব হত্যা করবেন না;

২) তাঁরা চৌর্যবৃত্তি করবেন না;

৩) তাঁরা অসতী হবেন না;

৪) তাঁরা মিথ্যা কথা বলবেন না;

৫) তাঁরা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করবেন না;

৬) তাঁরা দুপুরবেলার পর শক্ত খাদ্য খাবেন না;

৭) তাঁরা নাচ, গান বা নাটকে অংশগ্রহণ করবেন না;

৮) তাঁরা ফুলের মালা ব্যবহার করবেন না। নানা রকমের সাজার দ্রব্য ব্যবহারও নিষিদ্ধ।

৯) তাঁরা উচ্চাসন বা গদিযুক্ত বিছানা ব্যবহার করবেন না;

১০) তাঁরা স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করবেন না।

এছাড়া সন্ন্যাসজীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিধান রয়েছে। সবচেয়ে পুরাতন বৌদ্ধ দলিল, **প্রতিমোক্ষ**, ২৫০ রকম ভাবে একজন শ্রমণের বিবেক পরীক্ষা করবার পদ্ধতির কথা বলেছেন। মাসে দু'বার এইভাবে একজন শ্রমণ তাঁর বিবেক পরীক্ষা করবেন। উপবাসের দিবস উপাসর্থ এই পরীক্ষার জন্য ধার্য হয়েছে। যেকোনও জাতের, দুরারোগ্য ব্যাধি বা গুরুতর পাপমুক্ত ব্যক্তি বা অন্য দিক থেকে মুক্ত পুরুষ বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দিতে পারেন।

২) সাধারণ গৃহী বৌদ্ধদের জন্য বুদ্ধদেবের কিছু উপদেশ ছিল। এই বৌদ্ধদের উনি সময় উপযোগী নৈতিক জীবন পালন করতে পরামর্শ দেন। পিতামাতা, শিক্ষক, স্ত্রী, সন্তান, চাকর, অধস্তন কর্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের প্রতি এদের কর্তব্য পালন করা উচিত। তাদেরকে বুদ্ধ জীবহত্যা, চৌর্যবৃত্তি, অসতীত্ব, মিথ্যাচার এবং মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন। যদিও এর ফলে তারা নির্বাণপ্রাপ্তি করবে না, তবুও সাধারণ বৌদ্ধরা **পুনর্জন্ম** লাভ করলে তাদের অনুকুল পুনর্জন্ম পাওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে তারা সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায়ের সদস্য হ'তে পারবে ও তাদের **অরহট** বা সাধুর মর্যাদা অর্জন করা সম্ভবপর হবে (Hackmann)। এই পুনর্জন্মের ধারণা হিন্দু ধর্মের **কর্ম** ধারণার সঙ্গে যুক্ত।

একজন সাধারণ বৌদ্ধকে চিরকৌমার্য পালন করতে হয় না। কিন্তু তাকে স্ত্রী প্রতি অনুগত হ'তে হবে। বৌদ্ধধর্মে বিশাল অনুষ্ঠানের কোনও স্থান নেই। কারণ বুদ্ধ সরল জীবনযাপন করায় বিশ্বাস করতেন।

## ১০.৯.২ বৌদ্ধ দর্শন ও সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক

বৌদ্ধ দর্শন তদানীন্তন সমাজের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল? ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে এই ধারণাগুলির সঙ্গে কতটা মিল বা অমিল ছিল? আসুন এইসব বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করি।

**ক) ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ—**

বৌদ্ধদর্শনর সঙ্গে উপনিষদের চিন্তা ও শ্রমণদের পরম্পরার সঙ্গে কিছু মিল থাকলেও বুদ্ধদেব শুধু পুরোন ধ্যানধারণাকে নতুন ভাবে বলেন নি। বৌদ্ধ দর্শন সনাতন হিন্দু দর্শন থেকে পুরোপুরি আলাদা। ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের আমূল তফাৎ। বুদ্ধদেব এমন একটি সামাজিক দর্শন প্রবর্তন করলেন যা যুগ যুগ ধরে মানব সমাজকে প্রভাবিত করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে শুধুমাত্র সম্পর্ক ত্যাগ করে বুদ্ধ ক্ষান্ত হন নি। তার মূল বিশ্বাসগুলিকেও বাতিল করেছিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তির মতে, ভেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করাটা অজ্ঞতা। ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদ মনে করে যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঈশ্বরের সৃষ্টি কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের মতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার রাজতন্ত্র মানুষেরই সৃষ্টি। ফলে, বুদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না দিয়ে ইহজাগতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

**খ) রাজতন্ত্র ও জাতের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা—**

ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুসারে রাজতন্ত্র ও জাত ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা যে, এগুলি মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, তদানীন্তন সমাজ বদলের সম্ভাবনা এনে দেয়। বৌদ্ধধর্মের মতে, সবকিছু বদলাচ্ছে; ফলে বর্ণ ব্যবস্থা ও রাজতন্ত্র বদলাতে পারে। বুদ্ধ ঐতিহাসিক শক্তির গতিপ্রকৃতিও লক্ষ্য করেছিলেন। গণসংঘের ভাঙন যে রোখা যাবে না তা তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ সংঘকে গণসংঘের আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। বৌদ্ধ সংঘে সবাই সমান, সে যে পরিবার বা সামাজিক স্তর থেকে আসুক না কেন।

কিন্তু এই সমতা শুধুমাত্র ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাহ্যিক সমাজে বৌদ্ধধর্ম আমূল সামাজিক পরিবর্তন আনার

কথা বলেনি। বুদ্ধদেব সমাজে কিছু কিছু নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেছিলেন। দান, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সংস্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন। বৌদ্ধ নীতিদর্শন ''দিবে আর নিবে''র ভিত্তিতে রচিত। মনিবরা চাকরদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন। কিন্তু তার বদলে চাকরদের তাঁদের মনিবদের সেবা করা কর্তব্য। ঠিক সেইভাবে রাজার প্রতি প্রজাদের যেমন কর্তব্য আছে, প্রজাদের প্রতি রাজারও কর্তব্য আছে।

**গ) দানের মাধ্যমে উদ্বৃত্তর পূণর্বিতরণ—**

দান বা ভিক্ষা দেওয়া বৌদ্ধ দর্শনে একটি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। দানের মাধ্যমে দু'টি জগৎ-সাধারণ বৌদ্ধ ও শ্রমণদের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরী হয়। সৎ বৌদ্ধরা সংঘকে ও ভিক্ষুদের দান করে রক্ষা করতেন। দানের মাধ্যমে সমাজ তার প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে রক্ষা করত; এদের মধ্যে ছিল শ্রমণ ও দরিদ্ররা। দান হচ্ছে যজ্ঞের বিপরীত। যজ্ঞের মাধ্যমে কোনও উদ্বৃত্ত তৈরী করা যেত না। কিন্তু দানের মাধ্যমে উদ্বৃত্তের পুনর্বিতরণ হ'ত।

এক কথায় যদি বলতে হয়, তবে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পর্কে এ কথা বলা ভুল হবে না যে, বুদ্ধদেব সমস্ত সামাজিক অসাম্য দূর করতে চান নি। বৌদ্ধ দর্শন একটি সভ্য সমাজ তৈরী করতে চেয়েছিলেন; সাম্যবাদী সমাজ নয়। মধ্যম পথ শোষক সমাজের শোষণের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চেষ্টা করেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল্যবোধ, বিশেষ করে জন্মভিত্তিক স্তরবিন্যাস ও ইহজাগতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মীয় রঙ চড়ানোর সমালোচনা করেছিল বৌদ্ধ দর্শন। এর ফলে এটা খুব স্বাভাবিক যে, ভারতের অত্যাচারিত গোষ্ঠীগুলি বৌদ্ধ ধর্মের দর্শনের মধ্যে একটা নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিল। বৌদ্ধ দর্শন তখনকার ও বর্তমানের যুক্তিবাদীদের কাছে যথেষ্ট আদরণীয়। এইসব কারণে বৌদ্ধ ধর্ম শুধুমাত্র ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি; দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়াতেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছে। বিশ্ব সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

## ১০.৯.৩ মহাযান, হীনযান ও বজ্রযান

বৌদ্ধ দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাসে, এই দর্শনের অনেক বদল ঘটে। বুদ্ধদেবের পর বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারমুখী হয়ে ওঠে এবং গোটা এশিয়া মহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মে নতুন নতুন মতবাদ ও নতুন মূল্যবোধ আহরিত হয়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাবেও বৌদ্ধ ধর্ম অনেক বদলেছে। বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা ছিল যে, একজন ব্যক্তি তার নিজের মুক্তির জন্য বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে কাজ করবে। এই পথে সে ''অরহন্ত'' বা সিদ্ধপুরুষ হ'তে পারবে। বৌদ্ধ ধর্মে কোনও মূর্তি পুজার কথা ছিল না। কিন্তু জনমতের চাপে আস্তে আস্তে কিছু কিছু বদল হ'তে শুরু করে। প্রথম বুদ্ধের সঙ্গে জড়িত কিছু প্রতীককে সম্মান দেখানো হয়। পরে বুদ্ধকে দেবতা হিসাবে পূজা করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বা প্রথম খ্রীষ্টাব্দের সময় থেকে বৌদ্ধ ধর্মে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ওয়েবরের মতে জনপ্রিয় হ'তে গেলে একটি ধর্মকে হয় একজন ত্রাণকর্তার কথা বলতে হবে নয়তো তাকে যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিতে হবে। বৌদ্ধ ধর্ম দুটি পথই অবলম্বন করেছিল। প্রথমে একজন ত্রাণকর্তার কথা বলে এবং পরে তান্ত্রিক ধারণা অবলম্বন করে। শেষে বৌদ্ধ ধর্মের তিনটে রূপ দেখা যায়—হীনযান, মহাযান ও ব্রজ্রজান। এবার আসুন এইগুলির মধ্যে কী তফাৎ তা দেখা যাক।

**ক) হীনযান ঃ** বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বেশ কয়েকটা বৌদ্ধ সম্মেলন হয় যার উদ্দেশ্য ছিল কিছু ধর্মীয় প্রশ্নের সমাধান। এর নিট ফল হ'ল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। একটি সম্প্রদায়, যাদের **থেরাবাদী** বলা হয়, তাঁরা বিশ্বাস করে সে তারাই বুদ্ধের যোগ্য উত্তরসূরী। আবার **মহাযানীরা** মনে করে যে, বুদ্ধের বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা তারাই দিতে

পারে, **থেরাবাদ** বা **হীনযান** সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, তাইল্যাণ্ড, লাওস, ভিয়েতনম ও কাম্বোডিয়ায় রয়েছে। ভারতের বহু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র হীনযান বর্তমানে রয়েছে। হীনযানের মূল ভিত্তি হচ্ছে **ত্রিপিটক**, যার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রীর শিক্ষা ও দর্শন রয়েছে।

**খ) মহাযান ঃ** বৌদ্ধ ধর্মের এই সম্প্রদায়টিকে নেপাল, সিকিম, চিন, কোরিয়া ও জাপানে পাওয়া যায়। এটি বহু গোষ্ঠীর একটা সম্প্রদায় যা হীনযান সম্প্রদায়ের দর্শন থেকে আলাদা। মহাযানীরা বুদ্ধকে দেবতা হিসাবে পূজা করে। তাদের দর্শনের মধ্যে বোধিসত্ত্বের ধারণা একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এরা বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধের আগে তিনি অনেকবার জন্মগ্রহণ করেন। কোনও না কোনও কারণে তারা বুদ্ধ বা **অরহন্ত** হ'তে পারেনি। একজন যখন অরহন্ত বা মুক্ত পুরুষ হন, তখন তিনি আর সমাজের কোনও কাজে লাগেন না। তাই মহাযানীদের মতে, বোধিসত্ত্বরা যে সব মানুষ মুক্তি পেতে চাইছেন যে সব মানুষকে তাঁদের পুণ্যের অংশ দিয়ে মুক্তি বা নির্বাণ পেতে সাহায্য করেন। এই সম্প্রদায়কে মহাযান বলা হয় কারণ হীনযান থেকে অনেক বেশি মানুষকে এই সম্প্রদায় মুক্তি দিতে সক্ষম।

**গ) তন্ত্রযান বা বজ্রজান ঃ** বৌদ্ধ ধর্মের এই শাখাটি তিব্বত, মাঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়ার কিছু অংশে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ দর্শনের এই স্তরে যাদুবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যানধারণায় বিশ্বাস দেখা যায়। বজ্রযানবাদীরা মনে করে যে, মোক্ষলাভ করতে গেলে কিছু যাদু করবার ক্ষমতা আহরণ করতে হবে। একে তারা **বজ্র** বলে। এই বজ্রবাদে দেবতাদের শক্তি দেবীদের উপর নির্ভর করে। এই দেবীদের বেধিসত্ত্বের স্ত্রী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এরা তাদের রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে কাজ করে। তাদের **তারা** বলা হয়। যারা তপস্যা করে উচ্চমার্গে পৌঁছেছে তাদের হাতে এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আসে। বজ্রযান সম্প্রদায় একদা বাংলা ও বিহারে জনপ্রিয় ছিল। এখনো তিব্বতে এর অস্তিত্ব রয়েছে। লামাবাদ বজ্রযানের সঙ্গে জড়িত। তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদের একটি মন্ত্র হ'ল ''ওঁ মণিপদ্মে হুম''। এই ধরনের মন্ত্র মানুষকে যাদুবিদ্যার্জিত ক্ষমতা দেয় বলে বিশ্বাস।

## ১০.৯.৪ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি

নিজের দেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ঘটে। তার কারণ হ'ল বৌদ্ধধর্মের বহু ধ্যান ধারণা হিন্দু ধর্ম আত্মস্যাৎ করে। চতুর্থ থেকে নবম শতক অবধি হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। বুদ্ধ সব ধর্মকে সহ্য করবার কথা বলেছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেনি। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু ধর্ম যত কাছে এলো তত বৌদ্ধ ধর্ম ভাঙন ধরল। শক্তি আরাধনার সঙ্গে আঁতাত করে তারা আরো অবনতি হ'ল। হিন্দু ধর্মও বৌদ্ধ ধর্মের ভাল দিকগুলি গ্রহণ করল। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদের নেতৃত্ব দেয়। বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটাকে তিনি মডেল হিসাবে অবলম্বন করেন; হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলিকে সেই মডেল অনুযায়ী সাজান। তাঁর দর্শন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শেষ আঘাত হানে মুসলমান আক্রমণকারীরা। তারা বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংস করে। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে, বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি তার বিনাশের ফলে হয়েছে। কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মকে আস্তে আস্তে গ্রাস করেছে।

## ১০.১০ সারাংশ

এতক্ষণ আমরা ভারতের অসংখ্য ধর্মের মধ্যে কয়েকটি ধর্মের সারাৎসার আলোচনা করলাম।

বলাই বাহুল্য, ভারতে আচরিত ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্মই সর্বাধিক প্রাচীন এবং অধিকাংশ ভারতবাসী হিদু ধর্ম পালন করেন। হিন্দু ধর্ম কতকগুলি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলি হ'ল ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বলা হয়, হিন্দু ধর্ম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়। এটি একটি জীবনযাপন পদ্ধতি। হিন্দু ধর্মের মূল উপাস্যদেবতা হ'ল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। হিন্দু ধর্মের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়; যথা, বৈষ্ণববাদী, শৈববাদী এবং শক্তিবাদী। হিন্দুধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জাতপাত প্রথা, বিবাহপদ্ধতি, পরিবার ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্য থেকেই সামাজিক পরিবর্তনের ফসল হিসেবে উদ্ভুত হয়। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর। জৈন ধর্মের মূল বক্তব্য হ'ল শান্তি, অহিংসা ও মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ। জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সাধারণত জৈন সংঘে চার ধরনের সদস্য দেখতে পাওয়া যায়—সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, সাধারণ পুরুষ ও সাধারণ স্ত্রী। হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু আচার ব্যবস্থা জৈনরা নিজেদের ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সামাজিকভাবে বিত্ত ও নৈতিকতার জন্য ভারতে জৈনরা খুব শক্তিশালী সম্প্রদায়। এদের মূল উৎসবগুলি হ'ল ঃ পরিউষণ, ওলি, দেওয়ালী, জ্ঞানপঞ্চমী ও মহাবীর জয়ন্তী। পূজার্চনা জৈনদের কাছে বাধ্যতামূলক।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম হল ঃ দুঃখকে স্বীকার করা, দুঃখের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, দুঃখকে কি করে শেষ করা যায় এবং অষ্টাঙ্গিকা মার্গের মাধ্যমে দুঃখের অবসান। বৌদ্ধধর্মে দু ধরনের সদস্য আছে ঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; যথা, মহাযান, হীনযান ও বজ্রযান।

## ১০.১১ অনুশীলনী

১) সঠিক উত্তরে দাগ দিন—

হিন্দু ধর্ম হ'ল—

ক) সব থেকে অর্বাচীন ধর্ম

খ) পুরাতন ধর্মের মধ্যে দ্বিতীয়

গ) খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে আবির্ভূত হয়

ঘ) সব থেকে প্রাচীন ধর্ম।

২) পুরুষার্থ কাকে বলে?

৩) হিন্দু পুরুষার্থর উপর একটি টীকা লিখুন।

৪) হিন্দু বিবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৫) হিন্দু পরিবারের উপর একটি টীকা লিখুন।

৬) হিন্দু মতাক্ষর উত্তরাধিকার প্রথার সঙ্গে দায়ভাগ উত্তরাধিকার প্রথার কী তফাৎ?

৭) হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কী সম্পর্ক?

৮) হিন্দুত্ববাদ কী? তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৯) সঠিক উত্তরে (✓) দাগ দিন ঃ

ক) জৈন ধর্ম—

১) বেদের কর্তৃত্ব মেনে ছিল

২) বেদের কর্তৃত্ব মানে নি

৩) বেদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিল

৪) উপরিউক্ত সব কটি ঠিক

খ) জৈন ধর্মের মূল বক্তব্য হ'ল—

১) সমস্ত প্রকৃতি জীবিত

২) শুধুমাত্র মানুষ জীবিত

৩) কোনও কিছু জীবিত নয়

৪) উপরিউক্ত সব ক'টি ভুল

১০) জৈন ধর্মের কী কী উৎসব আছে তার সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

১১) জৈন ধর্মে কী কী সম্প্রদায় রয়েছে?

১২) জৈনদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

১৩) বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে কোন্ বক্তব্য সত্যি? তা দাগ (✓) দিন।

ক) বৌদ্ধ ধর্ম.....

১) জীবহত্যা কে প্রশয় দেয়

২) জাত ব্যবস্থাকে সমর্থন করে

৩) অষ্টাঙ্গিকা মার্গের মাধ্যমে নির্বাণ প্রাপ্তির পথ দেখায়।

৪) কোনটাই সত্যি নয়।

১৪) বৌদ্ধ ধর্মের চার পবিত্র সত্য কি?

১৫) বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রদায়ের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

১৬) বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের কী তফাৎ?

১৭) ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির কারণ কী?

## ১০.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১) M.N. Srinivas and A. M. Shah : *'Hinduism' in International Encyclopadia of Social Sciences, Macmillan and Freepress, New Delhi, 1972.*

২) T. N. Madan (ed) : *Religious in India, OUP, New Delhi, 1991*.

৩) S. Radhakrishnan : *Hindu View of Life, Blooli & Sons, Bombay.*

৪) M. K. Gandhi : *What is Hinduism? National Book Trust, Calcutta.*

৫) Olga. V. Mezentseva : *Ideological Struggle in Modern India : Implications of Hinduism, Vostok, Calcutta*.

৬) Annie Besant : *Seven Great Religions, Theosophical publishing House, Madras.*

৭) Swami Suddhasattwananda : *These spoke the Budddha, Sri Ramkrishna Math, Mylapore*.

৮) P.N. Chopra (ed) : *Buddhism in India and ----of Education and culture, Govt. of India, New Delhi.*

# একক ১১ ❑ ধর্ম ও ভারতীয় সমাজ-২

গঠন


১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ খ্রীষ্টধর্ম

১১.৩.১ উৎস ও বিশ্বাস

১১.৩.২ বাইবেল মতে ঈশ্বরের ধারণা

১১.৩.৩ খ্রীষ্টীয় সংগঠন

১১.৪ খ্রীষ্টান সমাজব্যবস্থা

১১.৪.১ খ্রীষ্টান চার্চ ও তার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক

১১.৪.২ খ্রীষ্টধর্মের উপর সমাজের প্রভাব

১১.৫ ভারতে খ্রীষ্টধর্ম

১১.৬ প্রাক্ ইসলামী আরব সমাজ এবং ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব

১১.৭ ঈশ্বর সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

১১.৮ ইসলাম ধর্মের মূল সম্প্রদায় ও উপাদান

১১.৮.১ ইসলামী ধর্মের মূল সম্প্রদায় ও উপাদান

১১.৯ ইসলামী চোখে সামাজিক প্রতিষ্ঠান

১১.১০ ইসলামত ও ভারতীয় সমাজ

১১.১০.১ মুসলমানদের মধ্যে জাতপাত ব্যবস্থা

১১.১২ শিখ সমাজ ও শিখ ধর্মের উদ্ভব

১১.১২.১ শিখ গুরু

১১.১২.২ শিখ জীবন বৃত্তের আচার অনুষ্ঠান

১১.১২.৩ শিখ ধর্মে দীক্ষাদানোৎসব

১১.১৩ শিখদের আচরণ বিধি ও সংস্কারবাদী আন্দোলন

১১.১৪ ভারতের উপজাতিদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস

১১.১৫ উপজাতি ধর্ম

১১.১৫.১ উপজাতি দেবতাদের পতন

১১.১৬ সারাংশ

১১.১৭ অনুশীলনী

১১.১৮ গ্রন্থপঞ্জী

## ১১.১ উদ্দেশ্য

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য হ'ল আপনাকে খ্রীষ্ট, ইসলাম, শিখ ও উপজাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও সমাজ সম্পর্কে অবগত করা। এই পরিচ্ছেদ পড়বার পর আপনি

(১) এই ধর্মগুলির মূল সূত্র এবং বিশ্বাসগুলি আলোচনা করতে পারবেন;

(২) এদের ধর্মপ্রবক্তাদের শিক্ষাগুলিকে আলোচনা করতে পারবেন।

(৩) এদের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

(৪) এইসব ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

## ১১.২ প্রস্তাবনা

ভারত বহু জাত ও ধর্মের দেশ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ভারতীয় সমাজে বহু ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ। একটা সামাজিক গোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষা ও আচরণ তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়। খ্রীষ্ট, ইসলাম ও শিখ ধর্ম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলির অন্যতম। ভারতীয় সমাজের একটি বড় অংশ খ্রীষ্ট, ইসলাম ও শিখ ধর্মাবলম্বী। খ্রীষ্ট, ইসলাম ও শিখ ধর্মও সমাজকে বিশ্লেষণ তাই আমাদের কাছে সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এই এককে এঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিচয় আলোচিত হবে।

যদিও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা মূলত ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন খ্রীষ্টানরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন। তাঁরা অনেকগুলি ধর্মীয় সংগঠন ও সম্প্রদায়ে বিভাজিত। ধর্মীয় ধ্যানধারণার মধ্যে তফাৎ এর মূল কারণ। খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে মূলত তিনটি বিভাজন রয়েছে।

(ক) রোমান ক্যাথলিক সংগঠন।

(খ) পূর্বাঞ্চলীয় গোঁড়া সংগঠন।

(গ) প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়গুলি।

এছাড়া রয়েছে কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাস (cult) যা বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্টান ধর্মের থেকে আলাদা। এর মধ্যে আছে Christian Science Jehovah's Witnesses, Mormonism, কিম্বা ''Latter-day saints.''–The Unification church অথবা Moonies, ইত্যাদি। খ্রীষ্টানধর্মকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা যায় কাজ একটি ধর্ম করে সেগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। এই কাজগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ (১) ধর্ম মানুষকে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিক ক্ষমতা দেয়; (২) মন্দের ব্যাখ্যা; (৩) বর্তমান জীবনের উন্নয়ন; (৪) মুক্তির উপায় করবার পরিকল্পনা; (৫) এক আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা।

## ১১.৩.১ উৎস ও বিশ্বাস

খ্রীষ্টধর্ম যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। কিন্তু এর ভিত্তি হ'ল ইহুদি ধর্মে (Judaism)। এটা ঈশ্বরের দ্বারা দর্শিত ধর্মের মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি বাইবেল গ্রন্থে পাওয়া যায়। এটিই খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল দু'টি বইয়ে বিভক্ত—Old Testament ও New Testament। প্রাচীনকাল হ'তে বাইবেলের বিভিন্ন বই বিভিন্ন লেখক দ্বারা বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে। তাই আমরা The Gospel according to St. Matthews বা The Gospel according to St. Duke ইত্যাদি পাই। Old Testament এই বইগুলি হিব্রু বা আরামাইক ভাষায় লেখা হয়। বাইবেলের জীবন ও শিক্ষার কথা ছাড়া তাঁর অনুচর (Apostles) দের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কথা আছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস এই পুস্তকে পাওয়া যায়। এই অংশটি মূলত গ্রীক ও কিছুটা আরামাইক ভাষায় লেখা। New Testament এর প্রথম চারটি বই, যাতে যীশুর জীবন, মৃত্যু এবং নবজন্মের কথা রয়েছে তাদের Gospel বলে।

যীশুখ্রীষ্ট একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি যিনি দু'হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন। যীশু মাত্র ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর লৌকিকজীবন তিন বছরের ছিল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করেন, অলৌকিক কাণ্ড ঘটান, যেমন মৃতকে জীবিত করেন এবং মানুষকে এমন জীবন যাপন করতে শেখান যা ঈশ্বরকে খুশি করবে। কিন্তু, খ্রীষ্টানদের মতে, যীশুর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, সমাধি দেওয়া হয় এবং তৃতীয় দিনে কবর থেকে তিনি পুনরুত্থান করে তাঁর অনুগামীদের কাছে আবির্ভূত হন। আর তার পরে যীশু স্বর্গারোহন করেন। যীশু দাবী করেছিলেন যে, উনি ঈশ্বরের পুত্র এবং সেইভাবে তিনি আচরণ করেন। পাপাচারীদের ক্ষমা করে তিনি ইহুদি ধর্মগুরুদের চক্ষুশূল হন। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ঈশ্বর বলে মনে করতেন। সেজন্য খ্রীষ্টধর্মের একটি মূল ধারণা হ'ল যে যীশুই সত্যিকারের পুরুষ ও সত্যিকারের ভগবান।

## ১১.৩.২ বাইবেল মতে ঈশ্বরের ধারণা

বাইবেলের মতে ঈশ্বরের (God) ধারণা খুব জটিল। ঈশ্বর এক, কিন্তু বাইবেলে তিনি তিনজন ব্যক্তি হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। এগুলি হ'ল ঃ পিতা (Father), পুত্র (Son) ও পবিত্র প্রেত (Holy spirit) বা পবিত্র আত্মা। একে বাইবেলে বলে ত্রয়ীর একাত্মতা (Unity in Trinity)। বাইবেলের মতে, যীশু হ'লেন ঈশ্বর (God)। চিরকুমারী মেরীকে পবিত্র আত্মা অন্তঃসত্ত্বা করেছিলেন। এই মেরীর পুত্র হ'লে যীশু। ঈশ্বরের মূর্ত মানবিক রূপ হ'লেন যীশু এবং যীশুর এই জন্ম মানব মঙ্গলের এক ঐশ্বরিক পরিকল্পনার ফল। যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর মান সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বরকে কেন মানব রূপ ধারণা করতে হয় সেটা জানতে হ'লে আমাদের বুঝতে হবে বাইবেলের মতে পাপ (sin) ও মন্দর (evil) কী করে উৎপত্তি হ'ল। বাইবেলের মতে, ঈশ্বর (God) মর্ত্য (earth) ও স্বর্গ (heaven) তৈরী করেন এবং মানবজাতির প্রথম পূর্বপুরুষ আদম এবং ঈভ তাঁরই প্রতিকৃতি। কিন্তু আদম এবং ঈভ তাদের সৃষ্টি কর্তার আজ্ঞা পালন করেননি। তাঁরা পৃথিবীতে আনলেন পাপ এবং মন্দ। এর ফলে গোটা মানবজাতি এই মূল পাপের ভাগীদার ও উত্তরাধিকারী হ'ল এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে পরিচিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। একমাত্র একজন পাপহীন মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং মৃত্যুর মাধ্যমে মানব সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে। এরকম মানুষ ছিলেন

অমৃত পুরুষ-যীশু। ঈশ্বর মানব সমাজকে এত ভালবাসতেন যে, তিনি তাঁর সন্তান, যীশুকে পাঠালেন যাতে মানব সমাজ অন্তত দুর্গতির হাত থেকে বাঁচে। তাই যীশু হ'লেন মানব সমাজের ত্রাতা। বাইবেলের মতে, যীশুর উপর যে বিশ্বাস রাখে সেই অনন্ত দুর্গতির হাত থেকে মুক্তি পায়।

বাইবেলের মতে, মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। দেহের মৃত্যু ঘটলেও আত্মা অবিনশ্বর। খ্রীষ্টান ধারণায় মোক্ষ হ'ল মৃত্যুর পরে আত্মার অনন্ত স্বর্গবাস বা ব্যক্তিত্বের অনন্ত সুখভোগ। খ্রীষ্টধর্ম জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না। খ্রীষ্টান মতে, মানুষ একবারই পৃথিবীতে জন্মায়। সুখী পারলৌকিক জীবন যাপন করার সুযোগ মানুষ একবারের বেশি পায় না। যদিও আদম ও ঈভের মূল পাপ মানবজাতিকে ঈশ্বরের কোপে ফেলে তাদের জীবনে অভিশাপ ডেকে এনেছিলেন, যীশু মানবসমাজের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। যীশুখ্রীষ্টকে ত্রাতা হিসাবে স্বীকার করে।

খ্রীষ্টধর্মের মুক্তির পথ বাইবেলের প্রাচীন ও নবভাগের (New & Old Testament) মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। প্রাচীন ভাগ ইহুদি পরম্পরার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যীশু একজন ইহুদি ছিলেন এবং তিনি ইহুদি রীতি নীতি পালন করতেন। Old Testament মূলত ভবিষ্যকালের কথা বলেছে। সেখানে যা পূর্বঘোষণা ইত্যাদি ছিল তা যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। খ্রীষ্টানদের কাছে New Teatament এ Old Testament এর ভবিষ্যৎবাণী, যে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে মানবজাতির কল্যাণে কাজ করবার জন্য পাঠাবে, তা পরিপূর্ণ হ'ল। Old Testament এ বার বার মানবজাতিকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর সৎ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করেন ও অসাধু বা মন্দ ব্যক্তিদের শাস্তি দেন। Old Testament ও New Testament এ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের বর্ণনা পাওয়া যায়।

### ১১.৩.৩ খ্রীষ্টীয় সংগঠন

প্রথম দিককার খ্রীষ্টান সংগঠনের (Church) ভিত্তি ছিল যে, যীশুখ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বর-এই বিশ্বাস। প্রথম দিকে খ্রীষ্টানরা প্রার্থনার জন্য রোজ গীর্জায় মিলিত হ'ত। কিন্তু আস্তে আস্তে প্রার্থনার জন্য একটা বিশেষ দিন নির্ধারিত করা হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে খ্রীষ্টানরা সেই দিন মিলিত হয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করে। একে বলা হ'ত প্রভু বা ঈশ্বরের দিন বা রবিবার (Sunday)। এখনও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই প্রথা চালু আছে। সাধারণভাবে খ্রীষ্টানদের ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বরকে উপাসনা করা। আত্মা ও সত্যের মাধ্যমে এই উপাসনা করা হয়।

## ১১.৪ খ্রীষ্টান সমাজব্যবস্থা

প্রত্যেক ধর্মীয় সংগঠনের সমাজব্যবস্থা কিছু নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই নীতিগুলি তাঁদের সংহতির ভিত্তি হয়। এবার আসুন আমরা দেখি খ্রীষ্টান সমাজব্যবস্থা কীভাবে সংগঠিত হয়। যীশুর শিক্ষা থেকে খ্রীষ্টান সমাজব্যবস্থার মূল নীতিগুলির কথা জানা যায়।

**(ক) সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ**

যীশু খ্রীষ্টের সমাজ দু'টি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে রয়েছে। (১) সমস্ত হৃদয়, আত্মা ও মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসো; (২) তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতন করে ভালোবাসো। যীশুর মতে, ''প্রতিবেশী'' শব্দটা

শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার হয়নি। এর অর্থ হ'ল সমস্ত নরনারীর প্রতি প্রীতি-এক অর্থে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। সাধারণ সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা নেই। একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধকে সম্ভব করতে পারে।

**(খ) সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি**

খ্রীষ্টান সমাজব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি হ'ল সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। খ্রীষ্টান ধর্মীয় সংগঠন বিভিন্ন জাত শ্রেণী ও সংস্কৃতির মানুষকে একত্র করে একটি নতুন সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐক্য জাগিয়ে তোলে। সাধু পলের নব খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ''তোমাদের মধ্যে কেউ ইহুদি, ক্রীক, ক্রীতদাস, মুক্তপুরুষ, পুরুষ বা নারী নেই, কারণ তোমরা যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে এক'' (Galatians 3 : 28)। প্রথম দিককার খ্রীষ্টানেরা, যারা তাঁদের আগের সমাজ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তাঁরা নিজেদের ভাই-বোন বলে সম্বোধন করতেন। তাঁরা সব কিছু, যেমন খাবার, আসবাব, ইত্যাদি ভাগ করতেন, এবং তাঁদের উপার্জিত অর্থ সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য দান করতেন। ফলে, তাঁদের মধ্যে একটা সমতাবাদী সমাজ গড়ে উঠেছিল। যীশু তাঁর সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপর এই সমতাবাদী আদর্শকে কার্যকর করবার ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যীশু তাঁর অনুচরদের শেখালেন যে, ঈশ্বরই সব ক্ষমতার উৎস এবং নেতার কাজ হচ্ছে অনুচরদের সেবা করা, শাসন করা নয়।

**(গ) দুঃস্থদের সেবা**

খ্রীষ্টান আদর্শ সমাজের আর একটি নীতি হ'ল দুঃস্থদের সেবা করা। যীশু তাঁর নিজের জীবনে আর্তদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ ছিলেন। তাঁর অনুচরদের যীশু দুঃস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। কারণ ঈশ্বর আর্তদের সেবককে পুরষ্কৃত করবেন। এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ঈশ্বরকে সেবা করবার নামান্তর।

## ১১.৪.১ খ্রীষ্টান চার্চ ও তার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক

খ্রীষ্টান সমাজে চার্চের একটা মুখ্য ভূমিকা আছে। খ্রীষ্টানদের বিশ্ববীক্ষা চার্চ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চার্চ হচ্ছে যীশুর কথিত আদর্শ সমাজের বাস্তব রূপ। আবার চার্চকে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে কাজ করতে হয়। এই সমাজের নীতি বা নিয়ম, তার কাজের প্রণালী অনেক সময় খ্রীষ্টান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে না। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা এই অমিলের কথা ভালভাবে জানতো এবং তার জন্য তাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে। আদর্শ খ্রীষ্টান সমাজকে তারা স্বর্গ বলে মনে করত। কিন্তু বাস্তব সমাজকে তারা মর্তের সমাজ বলে ভাবতো।

চার্চ এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে যে অমিল ছিল তা বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছিল। কি করে চার্চ বাস্তব সমাজের সঙ্গে খাপ খায়? সমাজের উপর চার্চ কী প্রভাব ফেলেছে? সমাজ চার্চের উপর কী প্রভাব ফেলেছে? এই প্রশ্নগুলি সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্ন, অভিযোজন ও আত্তীকরণের প্রশ্ন।

খ্রীষ্টান চার্চকে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। যদি চার্চ সমাজকে পুরোপুরি গ্রহণ করে তবে সেটা খ্রীষ্টান আদর্শের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু সমাজকে পুরোপুরি বর্জন করার অর্থ হ'ল প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করা যার ফলে একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব দানা বাঁধতে পারে। এই আচরণ খ্রীষ্টান আদর্শের পরিপন্থী। তা প্রথম দিককার পূর্ববর্ণিত কোনও পন্থা অবলম্বন করেনি। চার্চের নেতারা একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা ইহজাগতিক সমাজকে আদর্শগত দিক থেকে বর্জন করলেও বাস্তবে মেনে নেন। এই পদ্ধতিতে

যীশু তদানীন্তন সমাজকে ধ্বংস করবার চেষ্টা না করে বদলানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, খ্রীষ্টানত জীবনযাত্রা ইহজাগতিক জীবনযাত্রার থেকে উন্নত। যেখানে ঈশ্বরের হুকুম এবং মানুষের নির্মিত আইনের মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে সেখানে একজন খ্রীষ্টান মানুষকে না মেনে ঈশ্বরকে মানবেন।

খ্রীষ্টানরা মনে করেন যে, রাজনৈতিক এবং পৌর কর্তৃত্ব ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্বের অধিকারী। সেজন্য পৌর দায়দায়িত্ব, যেমন কর দেওয়া ইত্যাদি খ্রীষ্টানরা ঠিকমত পালন করে। আবার যদিও সবাই যীশুখ্রীষ্টের কাছে সমান, তবুও তখনকার সমান্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে স্বামীর কথা শুনতে হ'ত এবং ক্রীতদাসকে তাঁর প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে হ'ত। স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ করতে হ'ত। প্রভুর ও ভৃত্যের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব যত বৃদ্ধি পেতে লাগল তত তার মূল্যবোধ ও আদর্শ বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মানবিক আদর্শ, যেমন মুক্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমতা পাশ্চাত্য সমাজে ধীরে ধীরে গৃহীত হ'ল এবং তার জন্য খ্রীষ্টধর্ম অনেকাংশে দায়ী।

## ১১.৪.২ খ্রীষ্টধর্মের উপর সমাজের প্রভাব

খ্রীষ্টধর্ম যেমন সমাজকে প্রভাবিত করেছে সমাজও খ্রীষ্টধর্মকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতিলাভের পর গোটা ইউরোপের সমাজ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। তখন খ্রীষ্টধর্মের সংগঠন চার্চ প্রভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধীশ্বর হয়। যদিও চার্চ একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের ফলে তাতে বৈষয়িক ও ইহজাগতিক মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটে।

খ্রীষ্টান ধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের মধ্যে বিভাজন ঘটেছে। নানা ধরনের প্রভাবশালী গোষ্ঠী উপদল তৈরী করেছে। হয়ত তারা মূল সংগঠনের মধ্যে সংগঠনের বিভিন্ন বিচ্যুতির প্রতিবাদ করে তাকে সংস্কার করতে পারে। কিংবা তার মূল সংগঠনে ভাঙন ধরায় ও নিজেদের সংগঠন তৈরী করে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের কিছু রোমান ক্যাথলিক ও পূর্বাঞ্চলীয় চার্চগুলি বৈষয়িক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই সন্নাসীরা যীশুর প্রদর্শিত পথে জীবন যাপন করেছিল। বিভিন্ন মঠে এই সন্ন্যাসীরা থাকতেন। শেষ অবধি এঁরা মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যান এবং তার ফলে মূল সংঘগুলির সংস্কার ঘটে।

দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলনগুলি মূল সংঘগুলির বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ হিসাবে প্রকাশ পায়। অনেকগুলি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে গজিয়ে ওঠে। এরা এই সংঘ ত্যাগ করে। এই আন্দোলনকে প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলন বলা হয়। এরা শুধু বাইবেলের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে। Roman catholic এবং Eastern Orthodox চার্চগুলি বাইবেল ছাড়াও চার্চের পরম্পরার কর্তৃত্ব স্বীকার করে।

খ্রীষ্টান আন্দোলন একটা নতুন মূল্যবোধ তৈরী করেছিল। খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে দিয়ে এসেছে আধুনিকতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সামাজিক উদ্ভবের প্রতি পদে আমরা দেখি যে, খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে অন্য কিছু উপাদান, যেমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেমন পরিবার ও আত্মীয় গোষ্ঠী এবং স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার সঙ্গে জটিল সম্পর্ক ছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খ্রীষ্টানদের প্রতিষ্ঠানীকরণের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে পরিচিত হওয়া দরকার।

প্রতিষ্ঠানীকরণের প্রথম রূপ হচ্ছে কিছু কিছু ধর্মীয় সংঘের অস্তিত্ব। এই সংঘগুলির সঙ্গে সমাজের বিশেষ সম্পর্ক নেই। উদাহরণ হিসাবে আমরা কিছু খ্রীষ্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করতে পারি।

প্রতিষ্ঠানীকরণের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে Catholic Church। ক্যাথলিক চার্চ হচ্ছে খ্রীষ্টানদের একটি স্থায়ী ধর্মীয় সংগঠন। ক্যাথলিক চার্চ কিন্তু রাষ্ট্রের থেকে পৃথক। চার্চের উদ্দেশ্য মূলত মানুষের আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশ ঘটানো যাতে সে মৃত্যুর পর মুক্তি পায়। ইহজাগতিক বিষয়গুলি তাই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে লাগল।

প্রতিষ্ঠানীকরণের তৃতীয় রূপ হ'ল Protestant গোষ্ঠীর আবির্ভাব। এখানে আমরা দেখছি যে, ধর্মীয় বিষয়ে মতপার্থক্য ও ধর্মীয় যাজকদের দুষ্কর্মের প্রতিবাদে এই আন্দোলনের জন্ম হয়। শুধু তাই নয়; প্রোটেষ্টান্টবাদ মানুষকে যাজকদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দিয়ে তার মুক্তির পথ ব্যক্তির উপরেই ছেড়ে দেয়। ভগবানের উপর বিশ্বাস মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে এটি প্রোটেষ্টান্টদের মূল কথা। প্রোটেষ্টান্টদের অনেকগুলি উপদল আছে। তার মধ্যে মূল গোষ্ঠী, Calvinism, বা ক্যালভিনবাদ ইহজাগতিক ক্রিয়ার মাধ্যমে মর্ত্যে ঈশ্বরের রাজত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার উপর জোর দেয়।

প্রোটেষ্টান্ট সংশোধনবাদী আন্দোলনে ইউরোপে আধুনিকতা আনে ও অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটায়। প্রোটেষ্টান্টরা বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন এবং আইন সম্পর্কেও তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। প্রোটেষ্টান্ট সংশোধনবাদী আন্দোলন জাতিয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়।

ম্যাক্স হ্বেবার প্রোটেষ্টান্ট নৈতিকতার সঙ্গে ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের একটি কার্যকারণ সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থে, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ম্যাক্স হ্বেবার বলেন যে, পিউরিটানি গোষ্ঠীগুলি ইহজাগতিক ক্রিয়াকর্মকে ঈশ্বরের উপাসনা হিসাবে মনে করতেন। বৃত্তি (calling) আসলে ঈশ্বরের প্রদত্ত কাজ। Puritan Protestant দের কিছু কিছু ধারণা হ্বেবার লিপিবদ্ধ করেন। এগুলি হচ্ছে ঃ

(১) একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও তার শাসক, কিন্তু তিনি মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ও তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

(২) এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের মুক্তি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছেন। ফলে আমরা আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের ভাগ্য বদলাতে পারি না। ঈশ্বরের হুকুম আমাদের জন্মের আগে তৈরী হয়েছে।

(৩) ঈশ্বর নিজের গৌরবের জন্য বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন।

(৪) তাঁর মুক্তি হোক বা নরকবাস হোক, মানুষকে ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে হবে।

(৫) ইহজাগতিক দ্রব্য, মানব প্রকৃতি বা দেহ পাপ ও মৃত্যুর মধ্যে পড়ে। ঐশ্বরিক আশীর্বাদ ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই।

এই ধারণাগুলি ক্যালিভনবাদীদের আত্মনিয়ন্ত্রিত, কর্মঠ, সৎ ও ইহজাগতিক কৃচ্ছসাধন করতে প্রেরণা যোগায়। তাঁদের কাছে কর্মই ধর্ম। ক্যালভিনবাদীদের এই বিশ্বাসের সঙ্গে ধনতন্ত্রের একটা আত্মিক যোগ আছে। ক্যাথলিকরা অর্থ উপার্জন বা বাণিজ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনার কোনও যোগসূত্র দেখেননি। ইহজাগতিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর উপাসনা করা যায় এটা ক্যালভিনবাদীদের অবদান। তাঁদের মতে, নিজের কর্তব্য ভালভাবে করা একটি গুণ। ইহজাগতিক কর্ম এবং ধণতন্ত্রের বিকাশের মধ্যে একটা আত্মিক সংযোগ রয়েছে। কিন্তু হ্বেবার যা দেখেছিলেন তা শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রে সত্য।

## ১১.৫ ভারতে খ্রীষ্টধর্ম

ভারতবর্ষে যীশুর এক অনুচর, টমাস, খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তন করেন। টমাস কেরলে আসেন ৫২ খ্রীষ্টাব্দে এবং বিভিন্ন জায়গায় গীর্জা প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) যান। মাইলাপুরে ৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শহীদ হন। কেরলের প্রথম দিককার খ্রীষ্টানদের বংশধরদের তাই সাধু টমাসের খ্রীষ্টান বলে পরিচিত হয়। এদের সিরিয় খ্রীষ্টানও বলা হয় কারণ এরা সিরিয় পদ্ধতিতে উপাসনা করতেন। সিরিয় খ্রীষ্টানরা কেবল সমাজের উচ্চজাতের মর্যাদা পায় এবং তারা বিত্তবান ছিল। তারা খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিল বলে মনে হয় না।

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ব্যাপারে ইউরোপীয়রা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে মূলত বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে। বণিকদের সঙ্গে পাদ্রিদেরও আগমন ঘটে। প্রথমে আসেন পোর্তুগীজরা। তাদের পর ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ ও মার্কিন পাদ্রিরা ভারতে আসেন। ফলে ভারতীয় খ্রীষ্টানরা ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনে (church) বিভক্ত। কেউ পোর্তুগীজ চার্চের সদস্য আবার কেউবা গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের সদস্য। পাদ্রিরা তাদের কাজকর্ম মূলত সেইসব জায়গায় করত সেখানে তাদের দেশের রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সারা দেশময় ছড়িয়ে আছে।

যদিও ইংরেজরা ভারতে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েছে, প্রথমদিকে তারা খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারের অনুমতি দিতে ইতস্তত করে। ধর্মপ্রচারকেরা মূলত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কাজ করে। অস্পৃশ্যদের মধ্যেও ধর্মপ্রচারকরা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। পোর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা দক্ষিণ ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মানুষকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়। তারা একাজে এতটা সাফল্য অর্জন করে যে, খ্রীষ্টানদের দুই তৃতীয়াংশ দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া যাবে। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানরাই ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ছিল ১৬.৭৭ মিলিয়ন। এটি ছিল ভারতের মোট জনসংখ্যার ২.৪৩ শতাংশ। ভারতের সব রাজ্যে খ্রীষ্টানদের পাওয়া যায়। সব জেলায় কিছু খ্রীষ্টান রয়েছে। তারা অধিক সংখ্যায় কিছু কিছু জায়গায় থাকে। ভারতের খ্রীষ্টানদের কেরল, তামিলনাড়ু, গোয়া এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য যেমন নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরায় পাওয়া যায়।

বিশ্বের খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে নানা বিভাজন লক্ষ্য করা যায় তা ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যেও দেখা যায়। আমরা জানি যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে দু'টি মূল বিভাজন আছে—Roman Catholic ও Protestant। ভারতে ক্যাথলিকদের মধ্যেও দু'টি মূল ভাগ রয়েছে—যারা ল্যাটিন আচার অনুষ্ঠান মেনে চলে ও যারা সিরিয় আচার অনুষ্ঠান মেনে চলে। আবার প্রোটেস্টান্টরা উত্তর ভারতের চার্চ (Church of North India) ও দক্ষিণ ভারতের চার্চ (Chruch of South India) তে বিভক্ত। এছাড়া রয়েছে অ্যাংলিকান (Anglican) ও সিরিয় খ্রীষ্টান (Syrian Christian)। এই চার্চগুলির বিভিন্ন জায়গায় প্রভাব রয়েছে, যেমন গোয়ায় রোমান ক্যাথলিকরদের প্রভাব সর্বাধিক। এর কারণ হ'ল দীর্ঘদিন পোর্তুগীজ, যারা রোমান ক্যাথলিক, গোয়াবাসীদের উপর রাজত্ব করেছে। ফলে এই ঐতিহাসিক কারণে গোয়ায় Roman Catholic Church-এর নিরঙ্কুশ প্রভাব রয়েছে।

**অনুশীলনী - ১**

(১) বাইবেল গ্রন্থের পুরাতন ও নূতন পুস্তকের (Old and New Testament) মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন (আটটি ব্যাকের অধিক নয়)।

(২) খ্রীষ্ট ধর্মে দেহ ও আত্মার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন (পাঁচটি বাক্যের মধ্যে)।

(৩) যীশু মৃত্যু হতে ক'দিন পরে উত্থান করেন?

(ক) পঞ্চম দিনে।

(খ) চতুর্থ দিনে

(গ) তৃতীয় দিয়ে

(ঘ) দ্বিতীয় দিনে।

(৪) খ্রীষ্টদর্শনের মতে সঠিক আচরণের ভিত্তি হল

(ক) ইহজাগতিক নীতি

(খ) ঈশ্বরের ইচ্ছা না মেনে অন্য পারলৌকিক মানের উপর।

(গ) ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে অন্য পারলৌকিক মানের উপর।

(ঘ) আত্ম সার্থের উপর

(৫) খ্রীষ্টধর্মে উল্লেখিত আদর্শ সমাজের তিনটি মূল নীতির কথা উল্লেখ কর।

(৬) খ্রীষ্টধর্মের মূল সম্প্রদায়গুলি উল্লেখ কর।

## ১১.৬ প্রাক ইসলামী আরব সমাজ এবং ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব

ইসলামের আবির্ভাবের আগে, আরব সমাজে নানা সামাজিক সমস্যা ছিল। আরব সমাজ ছিল একটা উপজাতি ভিত্তিক সমাজ (tribal society)। এটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল যেখানে শুধুমাত্র পুরুষেরা সমস্ত অধিকার ভোগ করত। মহিলাদের কোন অধিকার ছিল না। তাদের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। তাদেরকে দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হ'ত পয়গম্বর মহম্মদ আরব সমাজের ধর্মীয় জীবনের অধঃপতন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং আরবদের নৈতিক জীবন সংস্কার করবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের কাছে নতুন মূল্যবোধ তুলে ধরে হজরত মহম্মদ আরব সমাজকে সংস্কার করবার চেষ্টা করলেন। তিনি রক্তের সম্পর্কের বদলে মানুষকে ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে একত্র করবার চেষ্টা করলেন। এই নতুন সমাজ হ'ল ইসলামী সমাজ যা ভ্রাতৃত্ববোধের উপর গঠিত। ইসলামের প্রকৃত অর্থ হ'ল ''ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে পুরোপুরি নতি স্বীকার করা।'' কিন্তু এর মানে কোনও অদৃষ্টবাদ নয়। নৈতিক দিক থেকে এর আদর্শ হচ্ছে সঠিক পথে থাকা। ইসলামের বুৎপত্তি একটি শব্দ থেকে যার অর্থ হ'ল শান্তি।

## ১১.৭ ঈশ্বর সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

প্রত্যেক মুসলমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব শেখায় যে, একজন আল্লা রয়েছেন। তাঁর কোনও সহচর নেই। আল্লা সর্বশক্তিমান। তাঁর আদি বা অন্ত নেই। সবাইকে তাঁর কাছে বিনীত হ'তে হয়। সবাই তাঁর

মাধ্যমে উন্নতি করবার পথ খুঁজবে। সবাই আল্লার অধস্তন জীব। তারা আল্লার অনুগ্রহ চায়। সবচেয়ে বেশি অনুগৃহীত হ'ল তারা যাবার আল্লার হুকুম তামিল করে।

আল্লা দেবদূত সৃষ্টি করেছেন — সব মুসলমান এই কথা বিশ্বাস করে। যদিও সব ইসলামী ধর্মাবলম্বী এদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁরা দেবদূতদের অর্চন করে না। দেবদূতরা আল্লার সৃষ্ট যৌন ইচ্ছামুক্ত জীব। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লা যুগ যুগ ধরে তাঁর আদেশ কোনও কোনও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কোরানের মাধ্যমে পয়গম্বর মহম্মদকে সব কিছু শিখিয়েছেন। সব মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, আল্লার বাণী তাঁরই দেওয়া পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, যুগে যুগে মানুষকে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও অবিশ্বাস থেকে মুক্তি দিতে মহম্মদ পৃথিবীতে এসেছিলেন। মুসলমানরা পয়গম্বরদের মধ্যে কোনও তফাৎ করে না। কিন্তু তারা মনে করেন যে, হজরত মহম্মদ আল্লার শেষ পয়গম্বর। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, একটা দিন আসবে যখন প্রত্যেকের বিচার করা হবে। মৃতরা কবর থেকে উত্থান করবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে স্বর্গ ও নরকের ধারণা রয়েছে।

এই বিশ্বাসগুলি ছাড়া মুসলিমরা নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি করবে ঃ

(ক) ধর্মের বিশ্বাসকে নিয়মিত উচ্চারণ করা ঃ যেমন ''আল্লা হো আকবর'' (আল্লা মহান)।

(খ) আল্লার কাছে পাঁচবার প্রার্থনা করতে হবে ঃ

(১) ভোরের বেলায়

(২) দুপুর বেলায়

(৩) মধ্য বিকালে

(৪) গোধূলি লগ্নে

(৫) গোধূলীর দেড় ঘন্টা পর।

এছাড়া প্রতি শুক্রবার একজন মুসলমানকে বিশেষ প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে হবে। এখানে যৌথভাবে প্রার্থনা করা হয়।

**(গ) জাকত** — (এক ধরনের আইনগত দান) যা এক ধরনের কর - তা প্রত্যেক মুসলমানের দেওয়া কর্তব্য।

**(ঘ) রমজান** — যা মুসলিম পঞ্জিকার নবম মাস উপবাস করতে হবে।

**(ঙ)** জীবনে একবার সম্পন্ন মুসলমানের হজ নামক তীর্থ করা উচিত। এখানে মুসলমানরা পবিত্র কাবা দর্শন করে।

এই কর্তব্যগুলি পালন করলে একজন মুসলমান নিজের দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। তার মন পবিত্র হয়। সে মানসিক দিক থেকে উন্নতি লাভ করে।

ইসলামীয় মতে, যদি একজন মুসলমান এই ধারণাগুলিতে বিশ্বাস রাখে এবং সে আল্লার ইচ্ছা অনুসারে সে কাজগুলি করে, তবে মৃত্যুর পর তার বেহেস্তে (স্বর্গে) স্থান হবে।

## ১১.৮ ইসলাম ধর্মের মূল সম্প্রদায় ও উপদল

কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় আচরণ সামাজিক সম্পর্কমুক্ত নয়। বিশ্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক রাখতে হয় এবং এর ফলে অপরকে যেমন এ প্রভাবিত করে, সে নিজেও প্রভাবিত হয়। এবার দেখা যাক, ইহজগতের সঙ্গে ইসলামের কী সম্পর্ক রয়েছে। যদিও কোরান বিশ্বের সব মুসলমানকে জীবনের পথ দেখায়, তবুও যখন এটি নানা দেশে প্রব্রজন করল তখন সেইসব দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি তাকে প্রভাবিত করল। কয়েক শতক ধরে এই প্রক্রিয়া চলে। ইসলামের একটি গতিশীলতার নীতি রয়েছে এবং মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও মুসলিম জীবনযাত্রা স্থান ও কাল অনুযায়ী বদলেছে। এবার আসুন এই গতিশীলতার নীতি (principle of movement) বোঝার চেষ্টা করি।

কোরানে কোনও পরিষ্কার উত্তর না থাকায় আল্লার বাণী, বয়গম্বরদের সিদ্ধান্ত যে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য গ্রহণীয় হ'ত। **সুন্না,** অর্থাৎ লোকাচারকে পারস্পরিকভাবে সঠিক বলে গণ্য করা হ'ত। এ থেকে বিচ্যুত হওয়া অর্থাৎ বিদ্দৎ হচ্ছে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত বা সৃষ্টি যাকে প্রতিষ্ঠা পেতে হ'লে নিজের উৎকর্ষ প্রমাণ করতে হবে। এর ফলে প্রাক্ ইসলামী সমাজ ছিল রক্ষণশীল। ইসলাম এই পন্থা বদলে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের সিদ্ধান্ত এবং তার উপর ভিত্তি করে পরম্পরাকে শিরোধার্য করল। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর আমরা লক্ষ্য করি যে, চারটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তারা কোরানের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে ও ন্যায়ালয়ের কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা দেখা। আব্বাসিদ খলিফাদের সময় ইসলামী সূত্র আলোচিত হয় এবং চারটি সম্প্রদায় আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যালোচনা করে। নবম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইসলামী আইন একটি রূপ নেয়।

### ১১.৮.১ ইসলামী সমাজে উপদল

ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বেশকিছু ভাগে বিভক্ত। মুসলিম সমাজের দু'টি প্রধান উপদল **সুন্নী ও শিয়া।** সুন্নীগোষ্ঠী শিয়াদের থেকে বেশি প্রভাবশালী। এবার আসুন এদের সম্পর্কে জানা যাক।

**(১) সুন্নী ঃ** সুন্নীদের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের শিয়াদের থেকে পৃথক করে। এগুলি হ'ল—

(ক) তারা সুন্না (অর্থাৎ পরম্পরা) তে বিশ্বাস করে।

(খ) তারা খলিফাকে সমাজের কিছু মুষ্টিমেয় লোককে দিয়ে নির্বাচিত করার ব্যাপারে আগ্রহী। তারা মনে করে যে, এটাই মহম্মদ চেয়েছিলেন।

**(২) শিয়া ঃ** এই গোষ্ঠীর মুসলমানদের সুন্নীদের সঙ্গে শুধু একটা বিষয়ে মতভেদ। তারা মনে করে যে, একমাত্র আলি ও তার উত্তরসূরীরা হজরত মহম্মদের যোগ্য উত্তরসূরী। এর কারণ হ'ল আলি শুধু মহম্মদের জ্ঞাতি ভাই ছিলেন না, তিনি পয়গম্বরের একমাত্র বংশধর, তাঁর কন্যা ফতিমার স্বামী।

শিয়ারা মনে করে যে, তিনজন খলিফা, আবু বকর, ওমর এবং ওসমান, অন্যায়ভাবে মুসলমানদের নেতৃত্ব দখল করেছিল। মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলিকে তারা বঞ্চিত করে।

## ১১.৯ ইসলামের চোখে সামাজিক প্রতিষ্ঠান

যে কোনও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়। সমাজতত্ত্বের শিক্ষার্থী হিসাবে আপনি এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবেন। মুসলিম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তিনটি ভিত্তি আছে। এগুলি হ'ল

- পরিবার
- বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ
- উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে কিছু প্রতিষ্ঠান

এবার আসুন মুসলমান সমাজে এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি কী এবং এগুলির কাজ সম্পর্কে আমরা জানি।

**(ক) পরিবার ঃ** ইসলাম ধর্মে পরিবারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোরানের এক তৃতীয়াংশে পরিবার সম্পর্কে নানা নিয়ম লিপিবদ্ধ করা আছে। হজরত, মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত সুন্নর মধ্যে অনেকগুলি পরিবার সম্পর্কিত। এর উদ্দেশ্য একটাই ; সেটা হচ্ছে পরিবার কীভাবে কাজ করলে সেটা অটুট থাকে এবং সব সদস্যের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকে, তা দেখা এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার যেন রক্ষিত হয় সে ব্যাপারেও পরগম্বর মহম্মদের চিন্তা ছিল। মুসলমানদের পরিবার হল **প্রসারিত পরিবার** (extended family)। এখানে তিন-চার পুরুষের সদস্য থাকতে পারে। এই পরিবারের গঠনে তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরটি স্বামী, স্ত্রী তাঁদের পিতা ও মাতা এবং পরিচারক ও পরিচারিকার দ্বারা গঠিত। এছাড়া রয়েছে বেশ-কিছু নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এদের একসাথে থাকার দরকার নেই। কিন্তু এদের অপরের উপর অধিকার রয়েছে। রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়, বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয় এবং পালক পিতা ও পালিকা মাতা এর মধ্যে রয়েছে।

ইসলামীয় সমাজে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ককে সমাজের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। তাই পরিবারের উপর কোরান খুব গুরুত্ব দিয়েছে।

পরিবারের মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানব সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা। গোটা সমাজের ভিত্তি হ'ল পরিবার। এটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো যেটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত স্থিতাবস্থা রক্ষা করে। পরিবারের মূল কার্য ও উদ্দেশ্য কোরান ও শরিয়তে বর্ণিত আছে। এগুলি হ'ল ঃ (১) মানবজাতির রক্ষা ও প্রসার, (২) নীতির সুরক্ষা, (৩) আবেগগত ও মানসিক স্থিতিশীলতা, ৪) সামাজিকীকরণ ও সুস্থ মূল্যবোধ গঠন, ৫) আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা।

**খ) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ ঃ** পরিবার রক্ষার্থে ও সুষ্ঠুভাবে এই প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে বিবাহের আদেশ দেওয়া হয়েছে। পয়গম্বর মহম্মদ বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন। ইসলামের তত্ত্ব অনুযায়ী বিবাহ যৌন আকাঙ্খা মেটাবার পদ্ধতি নয়। এর আসল উদ্দেশ্য প্রজনন। আরবী ভাষায় বিবাহকে নিকাহ বলা হয়। এর আসল অর্থ হ'ল একত্রিত করা। প্রত্যেক মুসলমানের বিবাহ করা বাঞ্ছনীয়। কোরানের মত নিকাহ হ'ল স্বামী ও স্ত্রী মধ্যে চুক্তি। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে এই চুক্তিতে সই করে। দুই পক্ষের কিছু সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। বিবাবের সময় মহিলার জন্য একটা অর্থ বরাদ্দ করা হয়। একে বলে মেহর (mehr)।

হজরত মহম্মদের আগে আরব সমাজে একজন পুরুষ যত খুশী বিবাহ করতে পারত। এবং যে কোনও সময় বিবাহ করা যেত। সেই বিবাহ সিদ্ধ ছিল। মহম্মদ কিছু নিয়মকানুন করলেন যার ফলে চারটির বেশি স্ত্রী কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। কোরান সব স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করবার পরামর্শ দেন। ইসলাম বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে। মুসলিম সমাজে আর এক ধরনের বিবাহ হ'ল 'মুতা' বিবাহ। প্রাক্-ইসলামি সমাজ থেকে এই ধরনের বিবাহ চলে আসছে। যখন কোনও ব্যক্তি বাড়ারি বাহিরে কিছুদিনের জন্য থাকে তখন সে একজন মহিলার সঙ্গে চুক্তি করে একটা বিশেষ সময় সীমার জন্য বিবাহ করে। এই চুক্তি সম্পূর্ণ দুই ব্যক্তির মধ্যে হয়। এই বিবাহের ফলে বৈধ সন্তান জন্মায় এবং সম্পত্তিতে তাদের অধিকার থাকে। কিন্তু স্ত্রীর কোনও আইনী সুরক্ষা নেই। সে যেমন স্বামীর সম্পত্তির অংশ দাবী করতে পারে না, স্বামীরও তার সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার নেই **আকবরীশিয়া** ছাড়া সব মুসলমান গোষ্ঠী এই বিবাহকে অবৈধ বলে। ইরান ও অন্য শিয়া প্রধান দেশে এই ধরনের বিবাহের এখনো প্রচলিত আছে। যেহেতু ইসলামে নিকাহ্ একটি চুক্তি, প্রয়োজনে সব চুক্তির মতো একেও শেষ করা যায়। তালাকের মাধ্যমে বিবাহ নামক অবসান ঘটে। এখানে এটা লক্ষ্যণীয় যে, হিন্দুদের মধ্যে তালাক ছিল না। হিন্দু বিবাহ একটি সংস্কার যা জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্বামী-স্ত্রীকে বেঁধে রাখে।

মহম্মদ তালাকের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বলেন যে, আল্লার কাছে তালাক সবচেয়ে অপ্রিয়। তবুও সামাজিক কারণে তালাক অনেক সময় প্রয়োজন হয়। তাই মহম্মদ এমনভাবে নিকাহ ও তালাকের নিয়ম তৈরী করেন যাতে বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির স্থায়িত্ব থাকে কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতাও অক্ষুন্ন থাকে। তালাকের ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়পক্ষের অধিকার আছে।

যদিও কোরান স্বামীকে তালাক দেবার অধিকার দিয়েছে তবুও এই অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে অনেক শর্ত মানতে হয়। হজরত মহম্মদ আহসান ধরনের তালাক পছন্দ করেছিলেন কারণ এই ধরনের তালাকে অনেক শর্ত রয়েছে যার ফলে প্রতিটি পদে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা আনার সুযোগ রয়েছে।

১) স্বামী প্রথমে একবার তালাক বলবে যাতে ভবিষ্যতে স্বামী ও স্ত্রী মধ্যে সমঝোতার সুযোগ থাকে।

২) স্ত্রীর যখন কোনও ঋতুশ্রাব হচ্ছে না তখন তালাক উচ্চারণ করতে হবে।

৩) স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তাঁর সঙ্গে তিন মাস কোন যৌন সম্পর্ক করবে না।

এই প্রথার উদ্দেশ্য হ'ল হঠাৎ করে না ভেবে চিন্তে যেন স্বামী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। এখানে পুনর্বিবেচনা ও সমঝোতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবুও যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব ফিরে না আসে তবে তালাক সিদ্ধ হবে ও স্ত্রীকে স্বামীর বাড়ি ছাড়তে হবে। তার কারণ তালাকপ্রাপ্ত মহিলা আইনগত ভাবে স্ত্রী রইল না।

তালাকের ব্যাপারে মহিলাদের কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারকে খুলা বলা হয়। খুলা করবার কতগুলি শর্ত আছে ঃ

১) একজন মহিলা খুলা চাইতে পারে যদি তার স্বামী সাত বছর ধরে নিরুদ্দেশ থাকে এবং তার কোনও খবর পাওয়া যায় না।

২) যদি একজন মহিলা নিকাহ করবার সময় যে মেহর পেয়েছিল তা খুলার সময় ফেরৎ দিতে না পারে, তবে সে মবারত চাইতে পারে। মবারতের অর্থ হল দু'জনের মধ্যে (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী মধ্যে) বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তালাক দেওয়া হয়।

৩) যদি স্বামী তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন হয়ে আদালতের কাছে তাফ্রিকা চাইতে পারে। তাফ্রিকা প্রক্রিয়ায় স্বামী ও স্ত্রী আদালতের রায়ে আলাদা হয়ে যায়। স্বামীকে দেয় মেহর দিতে হবে।

আদালত তালাক দেবে যদি ঃ ১) স্বামীর সঙ্গে সবসময় খারাপ ব্যবহার করে, ২) নিকাহর চুক্তির না মানলে, ৩) পুরুষত্বহীনতা কোনও চিকিৎসায় না সারে, ৪) স্বামী বা স্ত্রী পাগল হয় ৫) এছাড়া অন্য কোনও কারণ যার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

**(গ) উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠান ঃ**

ইসলামী উত্তরাধিকার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর সম্পত্তিতে একটা পূর্ব নির্দিষ্ট ভাগ রয়েছে। সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারে না। মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক অধিকার সুরক্ষিত করবার জন্য মহিলাদের পৈতৃক সম্পত্তি একটা ভাগ দেওয়া হয়। পুরুষদের সঙ্গে মহিলারা সম্পত্তির ভাগীরদার হয়। এর ফলে মহিলাদের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। কোরান পরিষ্কার বলেছে ঃ একজন পুরুষ তার বাবা-মা ও নিকট আত্মীয় যা রেখে গেছে তার একটা ভাগ পাবে মহিলারাও বাবা-মা ও নিকট আত্মীয় যা রেখে তা পাবে। (পবিত্র কোরান-আয়াত ৪.৭) একজন ব্যক্তির যদি মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র ও কন্যা দুইই আছে তবে তার সম্পত্তি তিনভাগ করা হবে, যার মধ্যে থেকে দু'টি ভাগ পুত্র ও এক ভাগ কন্যা পাবে।

কোরানে উত্তরাধিকাররে নিয়মকানুন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। প্রথম উত্তরাধিকারীর গোষ্ঠী হচ্ছে সেই সব আত্মীয় যারা মৃতের খুব কাছের লোক। এদের কোরান একটি নির্দিষ্ট ভাগ দিয়েছে। কোরানে কারা উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি তার একটা তালিকা দেওয়া হ'ল।

১) বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে উত্তরাধিকারী

২) স্বামী

৩) স্ত্রী

৪) রক্তের সম্পর্ক

৫) আপন ঠাকুরদা

৬) নাতনী

৭) আপন বোন

৮) রক্তের সম্পর্কের বোন

৯) সহোদর ভাই

১০) সহোদর বোন

১১) রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের ভাগ

১২) বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে আত্মীয়তার ফলে উত্তরাধিকার। এর মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী ভাগ নিয়ে আলোচনা করা যায়।

ক) একজন পুরুষ তাঁর মৃতা স্ত্রী অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী।

খ) সন্তান থাকলে স্বামী এক চতুর্থাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

গ) একজন স্ত্রী, তাঁর স্বামীর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ভাগ পেতে পারে যদি স্বামীর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হয়। স্বামী যদি সন্তান রেখে যান তবে স্ত্রী স্বামীর এক অষ্টমাংশ সম্পত্তির ভাগিদার হবে।

১৩ ক) একজন বাবা তাঁর সন্তানের সম্পত্তির একট ষষ্ঠাংশ পাবেন যদি মৃত সন্তান কোনও পুত্র বা নাতি রেখে যান।

খ) যদি মৃত কোনও সন্তান না রেখে যান তবে তার বাবা এই ভাগ ছাড়া আর একটা ভাগ পাবেন।

## ১১.১০ ইসলাম ও ভারতীয় মুসলমান

ভারতের মতো বহু ধর্মের দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী বহু শতাব্দী ধরে পাশাপাশি বসবাস করেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা হিন্দুদের সঙ্গে বহু যুগ ধরে মেলা-মেশার পর ভারতীয় নীতি, মূল্যবোধ, ও পরম্পরার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাধারণত ইসলামীয় সমাজ সুন্নী ও শিয়া গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছে। তার কারণ এই দুই গোষ্টির মধ্যে ইসলামের ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতামতের অমিল রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে ভাগ লক্ষ্য করা যায় তাতে হিন্দু জাতপাত ব্যবস্থার প্রভাব বেশি।

### ১১.১০.১ মুসলমানদের মধ্যে জাতপাত ব্যবস্থা

মুসলমানদের মধ্যে কোনও জাতপাত ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকারের জাতপাত ব্যবস্থা না থাকলেও জাতসদৃশ্য বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। এগুলি বৃত্তিমূলক বিভাজন।

কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, মুসলমান সমাজ জাত-সমাজের মত বিভাজিত। ভারতের মুসলমান সমাজে সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান ইত্যাদি বিভাজন দেখে এই সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, মুসলমান সমাজে জাতপাত ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও মুসলমান সমাজ জাতবিভক্ত নয়, তবুও আমরা দেখি যে, তাদের সমাজব্যবস্থায় জাতের মতো কিছু সমষ্টি রয়েছে। এমন একটি স্তরবিন্যাস হ'ল **আশরফ ও আরজল।**

**আসরফরা** হচ্ছে সম্মানীয় মুসলমান। এরা নিজেদের খানদানি মুসলমান বলে মনে করে। এরা প্রথম যুগের অভিবাসীদের বংশধর এবং এককালে ক্ষমতাবান ছিল।

আরজলদের অপরিষ্কার মুসলমান বলা হয়। এরা অনেকে নিচু জাতের হিন্দু ছিল এবং সুলতানী আমলে বা তারও পরে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এরা হ'ল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ।

**অনুশীলনী-২**

১) পাঁচটি বাক্যের মধ্যে ইসলামের অর্থ কী তা লিখুন।

২) মুসলমানদের কী কী কর্তব্য করা উচিত তার একটি তালিকা করুন।

৩) পাঁচটি বাক্যের মধ্যে ইসলামের মূল উপদলগুলির উল্লেখ করুন। এদের মধ্যে কী তফাৎ?

৪) পবিত্র কোরানে স্বামী ও স্ত্রী মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে?

৫) মুসলিমদের বিবাহের প্রকৃতি চারটি বাক্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ করুন।

৬) বিবাহ সংক্রান্ত উত্তরাধিকারের ভাগ তিন বাক্যের মধ্যে লিখুন।

৭) মুসলমানদের মধ্যে জাতের উপাদান সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

## ১১.১১ শিখ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

শিখ ধর্মের জন্ম হয় এমন একটা সময় যখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব হচ্ছিল। শিখ-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক, এই দুই ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেন। পাঞ্জাবী একটা লোকগাথায় গুরু নানকের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার বর্ণনা আছে।

''নানক শাহ ফকির, হিন্দু কা গুরু, মুসলমান কা পীর।''

প্রথম দিকের শিখ উপাখ্যানে এই ধর্মকে ভক্তি আন্দোলনে একটা দিক হিসাবে দেখান হয়েছে। কিন্তু কিছু আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত একে ভারতের সন্ত পরম্পরায় অংশ হিসাবে দেখেছেন। এটা ঠিক যে, গুরু নানকের আন্দোলন ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্তি ছিল না। কিন্তু শিখ ধর্ম ও দর্শনের কিছু স্বাতন্ত্র্য যে ছিল তা শিখ ধর্ম ও দর্শনকে ভালভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়।

''শিখ'' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ শিষ্য থেকে। শিষ্যের অর্থ হ'ল ছাত্র বা চ্যালা। যারা গুরু নানকের অনুগামী হলেন তাঁরা শিখ বলে পরিচিত হলেন। শিখ ধর্মের গুরুর প্রতি সম্মান দেখানো ও গুরুর শিক্ষা মেনে চলা হচ্ছে শিখদের পবিত্র কর্তব্য। শিখ জীবনযাত্রায় নৈতিকও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই মূল্যবোধের মধ্যে সততা, সবার সঙ্গে সব কিছু ভাগ করে নেওয়া এবং উচ্চ-নীচ, বা ধনী-দরিদ্রের তফাৎ ঘোচানোর উপর জোর দেওয়া হয়, এবার আসুন, শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, গুরু নানক সম্পর্কে কিছু জানি।

শিখ ধর্মকে প্রতিষ্ঠাতা করেন গুরুনানক (১৪৬৯-১৫৩৯)। গুরু নানক ছিলেন একজন বাল প্রৌঢ় শিশু। ছোটবেলা থেকে তাঁর ধ্যানশীল মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁকে ইহজাগতিক ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত করবার চেষ্টা অসফল হয়। গুরু নানক তিনজন লোদি শাসকের সমসাময়িক ছিলেন। এঁরা হ'লেন বাব্বর লোদি (১৪৫১-১৪৮৯), সিকান্দার লোদি (১৪৮৯-১৫১৭) এবং ইব্রাহিম লোদি (১৫১৭-১৫২৬)। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের পত্তনও দেখছিলেন। গুরু নানকের লেখনীতে লোদি মোগল শাসকদের সমালোচনা আছে। শৈশব থেকে তিনি আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে মগ্ন ছিলেন। ধর্মের নামে নানা রকম ভণ্ডামী চলত, তা দেখে নানাক খুব দুঃখ পেতেন। তিনি গরীব ও দুঃস্থদের সেবা করতে ভালবাসতেন।

সুলতানপুরে থাকার সময় নানকের জ্ঞানপ্রাপ্তি হ'ল। জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রবুদ্ধকরণের পরে নানক প্রথম যে কথা বলেন তা হ'ল ''হিন্দু নেই, মুসলমান নেই।'' যখন হিন্দু ও মুসলিম অহরাত্র সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, নানকের এই বাণী হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের এক নব উদ্যোগ সূচনা করে।

নানক ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন, বিদেশেও যান এবং হিন্দু ও মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মস্থান দর্শন করেন। তিনি কথোপকথনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বোঝালেন যে সৎকার্য ছাড়া মুক্তি নেই। তিনি বলেন ''সত্য বড় কিন্তু সত্যের পথে জীবনযাপন করা আরও বড় কথা।'' গুরু নানক সাধারণ মানুষের দুর্দশায় মানবিকভাবে পীড়িত হয়েছিলেন। বিশেষ করে বাবরের সেনাদের হাতে ভারতীয় নারীদের চরম লাঞ্ছনা তাঁকে ব্যথিত করে।

সেনাদের হাতে বন্দী করে এই নারীরা ক্রীতদাসী হয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। মাজ-দি-ভর এ নানক যে সমাজের বর্ণনা করেছিলেন তা একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ। এমন একটা সমাজে নানক একটা নতুন ধর্মের জন্ম দেন।

### ১১.১১.১ গুরু নানকের দর্শন

গুরু নানক একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তাকে 'ইক' (অর্থাৎ এক) হিসাবে বর্ণনা করেন। ঈশ্বর এক, তাঁর কোনও সঙ্গী নেই। নানকের ঈশ্বর দর্শন 'জপজী' অর্থাৎ আদি ধর্মতত্ত্ব। তাঁর শিক্ষা একেশ্বরবাদী। সেখানে অন্য কোনও দেবতা বা মানুষের উপাসনা করবার স্থান নেই। মধ্যযুগের ভারতে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য সংসার ত্যাগ করবার রীতি ছিল। কিন্তু নানক মনে করতেন সংসারে থাকা যায়। কারণ এই বিশ্বসংসারই ঈশ্বরের, যে ঈশ্বর সত্য এবং এখানে তাঁর অধিষ্ঠান। নানক মনে করতেন অপবিত্রর মধ্যেও পবিত্র হয়ে থাকা যায়। একজন এই জগতে থেকেও জগৎ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন, মনের মধ্যে ঈশ্বরকে রেখে, আশা না করে অথচ আশার মধ্যে থেকে বাঁচতে পারেন।

নানকের শিক্ষার সার তিনটি পাঞ্জাবী শব্দের মধ্যে নিহিত আছে। এগুলি হচ্ছে, 'নাম জপনা' 'কীর্তি করনা' ও 'ওয়ান্দ চাকনা'। এর অর্থ হচ্ছে সর্বদা ঈশ্বরকে মনে রাখবে, সৎভাবে নিজের রুটি রোজগার করবে ও নিজের পরিশ্রমের ফসল সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবে। তাঁর সমতা সম্পর্কে শিক্ষা বাস্তবায়িত করবার জন্য নানক দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এদের বলা হয় 'সংগর্ত ও 'পতঙ্গ'। এর অর্থ হ'ল সভায় সবাই এক সঙ্গে বসবে এবং যখন লঙ্গর (সার্বজনীন রন্ধনশালা) থেকে খাবার খাওয়া হবে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে বসতে হবে।

## ১১.১২ শিখ সমাজ ও শিখ ধর্মের উদ্ভব

এই ভাগে আমরা গুরু নানক কর্তৃক সৃষ্ট শিখ সমাজের মডেল নিয়ে আলোচনা করব এবং শিখ ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে আপনাকে জানাব। গুরু নানক শিখসমাজের গোড়াপত্তনম করেন ও শিখ আচরণবিধি প্রণয়ন করে। তাঁর জীবনের শেষ পাদে গুরু নানক রাভি নদীর তীরে একটি ছোট গ্রামে বসবাস শুরু করেন। সেই গ্রামের নাম করণ করেন কর্তারপুর। এর অর্থ ''ঈশ্বরের স্থান''। এখানে গুরু নানক চাষবাস করে জীবন ধারণ করেন এবং অন্যদের সঙ্গে তাঁর রোজগার ভাগ করে নেন। আস্তে আস্তে এই কর্তারপুরে গুরু নানকের শিষ্যদের একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। কিন্তু এটি কোনও সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায় নয়। এখানে সাধারণ মানব মানবী-স্বাভাবিক কাজকর্ম নিয়ে বাস করছে। তাঁরা সৎভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জন করে এবং তাঁদের পরিশ্রমের ফসল অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। কর্তারপুরে একটা আদর্শ জীবন যাপনের নক্সা তৈরী করে যা ভবিষ্যতের শিখ সমাজ ও শিখ মূল্যবোধের ভিত্তি হয়।

এই নতুন দর্শন-যার মূল মন্ত্র হচ্ছে সকালে ওঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং সদাসর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করা— একটা নতুন সমাজ গঠন করল। এখানে কোনও শোষক বা শোষিত নেই। সৎভাবে জীবন যাপন করা ও নিজের রোজগার ভাগ করবার শিক্ষা সমতাবাদী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। শিখ গুরুরা আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক রাজ্যের মধ্যে একটা সুস্থ সমন্বয় ঘটান।

## ১১.১২.১ শিখ গুরু

আপনারা দেখেছেন যে, অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে ধর্মীয় দর্শনের অনেক বদল হয় যদিও মূল নীতিগুলি ঠিক থাকে। শিখ ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। শিখ ধর্মের ইতিহাসে বিবিধ প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়। গুরু নানকের পর নয়জন গুরু তাঁর নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে ক্ষান্ত হননি। তাঁরা শিখ সম্প্রদায়ের জন্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন।

গুরু নানকের পর **দ্বিতীয় গুরু** হিসাবে গদিতে বসেন গুরু অঙ্গদদেব। তিনি গুরুমুখী নামক একটি নতুন অক্ষরমালা প্রবর্তন করেন। এই অক্ষরে শিখদের সব পবিত্র লেখা ও দলিল লেখা হয়। গুরু গ্রন্থসাহেব গুরুমুখীতে লেখা।

**তৃতীয় গুরু,** গুরু অমর দাস শিখ আন্দোলনকে আরও জোরদার করলেন যখন তিনি মঞ্জিস ও পিরিস নামক দু'টি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এই প্রতিষ্ঠানগুলি হ'ল গুরুত্বপূর্ণ শিখ পুরুষ ও মহিলা প্রচারকেরা নিজেদের এলাকায় যে অবস্থানগুলিকে অলংকৃত করতেন সেগুলি। গুরু অমরদাস জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য লঙ্গরে খাওয়া বাধ্যতামূলক করেন।

**চতুর্থ গুরু**, গুরু রামদাস, অমৃতসরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি বহু, বণিক ও কারিগরকে অমৃতসরে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ করেন। এর ফলে খুব কম সময়ে অমৃতসর একটি শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে।

**পঞ্চম গুরু**, গুরু অর্জনদেব গুরু রামদাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি হরমন্দির সাহেব তৈরী করান। (এই হরমন্দিরই স্বর্ণ মন্দির হিসাবে খ্যাত।) তিনি গ্রন্থ গ্রন্থসাহেব করে হরমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

ষষ্ঠ গুরু, গুরু গোবিন্দ, **অকাল তখত** (অমর সিংহাসন), তৈরী করেন এবং একে শিখদের ইহজগতের সর্বোচ্চ কর্তা হিসাবে ঘোষণা করেন।

**সপ্তম গুরু**, গুরু হররায়, তাঁর পূর্বপুরুষদের কাজ চালিয়ে যান। তিনি বাগ্রিয়ান ও কাইবাল নামে দুই ভাইকে ধর্মীয় কাজে তত্ত্বধানের দায়িত্ব দেন।

**অষ্টম গুরু**, গুরু হরকৃষণ, দিল্লীর অধিবাসীদের বসন্ত রোগ সারিয়ে দেন। তাঁর সম্পর্কে লোককথা ও প্রার্থনায় বলা হয় যে, তাঁর দৃষ্টি সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর করত।

**নবম গুরু** গুরু তেগ বাহাদুর তিলক, ও জানজু-হিন্দু ধর্মের পবিত্র চিহ্ন রক্ষার্থে শহীদ হন। তেগ-বাহাদুরের মৃত্যুর ফলে শিখ ধর্মে অনেক পরিবর্তন ঘটে।

**দশম গুরু**, গুরু গোবিন্দ সিং, ধর্ম রক্ষার্থে 'খালসা' নামক একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন। ১৬৯৯ সালের বৈশাখী দিবসে গুরু গোবিন্দ সিং শিবালিক পাহাড়ের আনন্দপুরে শিখদের একটা সভা ডাকেন। সভাতে বক্তৃতা দেবার সময় তিনি পাঁচ জনের মাথা চান। যাঁরা মস্তক দেন তাঁরা শিখ ধর্মে দীক্ষিত হন। তাদের এখনো পাঁজ পিয়ারা হিসাবে শিখদের প্রার্থনায় স্মরণ করা হয়। এই পিয়ারা বা ভালবাসার পাত্রদের তিনজন নিচু জাত থেকে এসেছিলেন। তাঁদের পুনর্বার নামকরণ করা হয়। তাঁরা সিং (বা সিংহ) পদবী গ্রহণ করেন।

শিখ ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন গুরু গোবিন্দ সিং গুরু গ্রন্থ সাহেবকে শিখদের চিরকালের গুরু হিসাবে ঘোষণা করেন। গুরু গ্রন্থ সাহেব গ্রন্থনা করেন গুরু অর্জনদেব। এই বইটি শিখদের সর্বজনীন মনোভাবের পরিচয়। গুরু গ্রন্থ সাহেব ৫,৮৯৪টি ভজন আছে যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি (২,২১৬) গুরু অর্জন দেবের লেখা।

শিখরা একেশ্বরবাদী। শিখদের উপাসনা মন্দিরকে বলা হয় গুরদোওয়ারা। একটি শুধুমাত্র উপাসনার স্থল নয়। এটি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, দুঃস্থদের রক্ষাকবচ। যাদের সাহায্য করবার জন্য কেউ নেই তারা গুরুদোয়ারায় আশ্রয় নিতে পারে। সব ধর্মের লোকেরা এখানে আশ্রয় পেতে পারে। লঙ্গর থেকে তাদের নিখরচায় খাদ্য দেওয়া হয়। গুরুদোওয়ারার কেন্দ্র স্থলে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, গুরু গ্রন্থ সাহেবকে রাখা হয় একটা উঁচু বেদির উপর, কারণ শিখেরা মনে করেন যে, তাঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মানুষের থেকে বড়। সবার মধ্যে এমন সমতা বজায় থাকে যে গুরুদোওয়ারায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কোনও বিশেষ স্থান দেওয়া হয় না।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গুরুদোওয়ারা আছে। এগুলির মধ্যে কিছু গুরুদোওয়ারারা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, কারণ সেগুলি কোনও না কোনও শিখ গুরুর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু অন্য অনেক গুরুদোওয়ারা রয়েছে যেগুলির কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। কিন্তু সেগুলি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে তৈরী করেছেন। শিখ গুরুদোওয়ারা একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, তার চূড়ায় নিশান সাহেব নামে একটি হলদে পাতাকা দেখা যায়। এর কেন্দ্রে রয়েছে শিখ ধর্মের প্রতীক, খণ্ড।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ গুরুদোওয়ারায় ঢুকতে পারেন যদি তাঁরা জুতো খুলে পা ধুয়ে, মাথার উপর একটি কাপড় দিয়ে ঢোকেন। গুরুদোয়ারার দরজা সব সম্প্রদায়ের জন্য মুক্ত। এ ব্যাপারে স্বর্ণমন্দিরে প্রথাটি আমরা উল্লেখ করতে পারি। হরমন্দির সাহেবের চারটে দরজা আছে। এর অর্থ হ'ল এটি পৃথিবীর চারদিকের মানুষের কাছে খোলা। এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং মুসলমান পীর-মিয়া মীর।

## ১১.১২.২ শিখ জীবনবৃত্তের আচার অনুষ্ঠান

শিখ-সমাজ জীবনে শিখ কিছু আচার অনুষ্ঠান আছে। আসুন এগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করি।

**(ক) শিশুর জন্ম ঃ**

শিশুর জন্মের পরে আদি গ্রন্থ সাহেব থেকে নির্বাচিত পাঁচটি পদ্য পাঠ করা হয়। একজন শিখ মহিলা সন্তান প্রসবের পর শারীরিকভাবে উপযুক্ত হ'লে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন।

**খ) শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান ঃ**

শিশু জন্মাবার পর একটি নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। সাধারণত পয়লা বৈশাখ, খালসার প্রতিষ্ঠা দিবসে, এই নামকরণ অনুষ্ঠান করা হয়। এটি বাড়িতে বা গুরুদোওয়ারাতে হ'তে পারে। পুরোহিত ধর্মগ্রন্থ খোলেন এবং প্রথম যে শব্দটি তাঁর চোখে পড়ে সেটাই শিশুর নাম হয়। সব পুরুষ শিশুকে সিং (সিংহ) উপাধি দেওয়া হয়। মেয়েদের কাউর (রাজকন্যা) উপাধি দেওয়া হয়। শিখদের মধ্যে কোনও জাত নেই। তাই জাত নাম-যা স্তরবিন্যাস বোঝায় তা অচল।

**গ) বিবাহের অনুষ্ঠান**

শিখ সমাজে সাধারণ অভিভাবকেরা বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে নিজেদরা ঠিক করে তাঁরা কাকে বিয়ে করবে। শিখ বিবাহের কতকগুলি নিয়ম আছে। বর ও বরযাত্রী কনের বাড়িতে বিয়ের জন্য যায়। প্রথমে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে বলে 'মিলনী'। এই অনুষ্ঠানে দু'পক্ষের অভিভাবক ও আত্মীয় বা একসঙ্গে মিলিত হয় ও প্রতীকি উপহার বিনিময়ে করে, আহারাদি হয়। আসল বিবাহ অনুষ্ঠান, আনন্দ করাজ, শিখ-পুরোহিতের পৌরহিত্যে করা হয়। এটা বাড়িতে হ'তে পারে অথবা গুরুদোওয়ারায় হতে পারে। এই অনুষ্ঠানে নব দম্পতি গুরুগ্রন্থ সাহেব এর চারপাশে চারবার প্রদক্ষিণ করে। শিখ গায়েকরা কিছু নির্বাচিত ভজন বা স্তোত্র গ্রন্থসাহেব থেকে গাইতে থাকে। 'লন্ডন' এর মাধ্যমে দম্পতির কাছে সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ পৌঁছে দেওয়া হয়। এই বিয়ের গানগুলির শিখ সমাজে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সবাই মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দেয়। তার পর বর ও বরযাত্রী কনে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। গোটা অনুষ্ঠানটি আনন্দের সঙ্গে কিন্তু অনাড়ম্বরভাবে হয়। শিখ বিবাহে পণ প্রথার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

## ১১.১২.৩ শিখ ধর্মে দীক্ষাদানোৎসব

কোনও কোনও ধর্মে দীক্ষাদানোৎসব হয়ে থাকে। যেমন খ্রীষ্টানদের মধ্যে baptism প্রচলিত আছে। শিখদের মধ্যেও এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান হয়।

গুরু নানক থেকে নবম গুরু তেগ বাহাদুর পর্যন্ত শিখ গুরুরা নতুন সদস্যদের চরণ-অমৃত (গুরুর পাদোদক) খেতে দেওয়া হ'ত। কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিং এটি বদলে 'খাণ্ডে-দা-পাহুই' (দু'ফলা তারওয়াল দিয়ে শুদ্ধ করা জল) করেন। এই পদ্ধতিতে তিনি ১৬৯৯ সালে আনন্দপুর সাহেবে পাঁজ পিয়ারাদের দীক্ষিত করেন। বর্তমানে যখন ছেলে-মেয়েরা কৈশোর পৌঁছয় এবং তারা ধর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম বলে বিবেচিত হয় তখন তাদের শিখ ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। খালসা তৈরী করবার সময় গুরু গোবিন্দ সিং যে দীক্ষাদান অনুষ্ঠান করেন সেই একই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিখদের আজও দীক্ষিত করা হয়। যদিও এই অনুষ্ঠান বছরের যে কোনও সময় করা যায় বৈশাখীর দিন যে দিনে খালসা সৃষ্টি হয়েছিল সেই দিনটা সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করা হয়। অনুষ্ঠানটি একটি সভার সামনে ধরা হয়। পাঁচজন দীক্ষিত শিখকে বাছা হয় যারা নবদীক্ষিতদের দীক্ষাদান করাবেন। জলে চিনি গুলে অমৃত তৈরী করা হয় খাণ্ডা (দু'মুখো) তরওয়াল দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কীর্তন করা হয়। তার পর গুরু সাহেবের সামনে দীক্ষিতদের খালসার শপথ নিতে হয়। অমৃত নিয়ে দীক্ষিতদের মুখের উপর ছেটানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিখদের বিভিন্ন অভিবাদন ''বোলে সো নিহাল'', সিরিওয়াহে গুরুজী কা খালসা, সিরি ওয়াহে গুরু জী কী ফতে'' উচ্চারণ করা হয়। দীক্ষিত পুরুষ ও মহিলা শিখদের উপর কড়া নির্দেশ আছে যে, তারা নিম্নে উল্লেখিত প্রতীকগুলি মানবেন ঃ

(ক) **কেশ**—শিখদের শরীরের কোনও অংশে কোনও চুল বা লোম কমানো চলবে না।

খ) **কড়া**—সব দীক্ষিত শিখদের কড়া পড়তে হয়। এটি একটি লোহার বালা যা ডান হাতে পরতে হয়। এটা শিখদের সব সময়ে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের শিখ আচরণবিধি পালন করতে হবে ও সৎকার্য করতে হবে।

গ) **কৃপাণ**—এটি একটি ছোট তরওয়াল। এর অর্থ হ'ল ''আমাকে আমার তরওয়াল দিয়ে রক্ষা কর।'' আত্মরক্ষার্থে কৃপাণ ব্যবহার করা যায়। দুর্বলদের সাহায্য করার জন্য কৃপাণ ব্যবহার হয়।

ঘ) **কাঙ্গা**—তাদের লম্বা চুল ঠিক রাখতে শিখরা চুলের বেণীতে চিরুণী (কাঙ্গা) বেঁধে রাখে।

ঙ) **কচ্ছা**—এটি হ'ল ছোট অন্তর্বাস। এটি পরিবার অর্থ হ'ল শিখদের যে কোনও মুহূর্তে লড়াই করবার পোষাক পরতে হবে। এটি নৈতিকতা ও সতীত্বরও প্রতীক।

## ১১.১৩ শিখদের আচরণবিধি ও সংস্কারবাদী আন্দোলন

শিখদের কতগুলি আচরণবিধি রয়েছে যা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া তাদের ইতিহাসে বিবিধ সংস্কারবাদী আন্দোলন হয়েছে। আমরা এই দু'টিই আলোচনা করব।

শিখদের আচরণ রেহত মারিয়াদা নামক একটি আচরণবিধির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই আচরণবিধি শিখদের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে। এই আচরণবিধিতে শিখদের কিছু কাজ করতে বারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে হ'ল মুসলমান পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হালাল মাংস খাওয়া, চুল, বা লোম কাটা, ধূমপান করা, মদ্যপান করা এবং ব্যাভিচার।

আগে আমরা বলেছি যে, শিখ গুরুরা জাতপাত ব্যবস্থাকে নির্মুল করার জন্য দু'টি প্রতিষ্ঠান, **সঙ্গত** ও **পঙ্গত**, গড়েন। কিন্তু তাঁদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শিখ গুরুরা জাতপাত ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেন নি। গুরুদোওয়ারাতে বা লঙ্গরে একসারিতে বসার সময় জাতপাতের বিচার না থাকলেও জীবনবৃত্তের কিছু অনুষ্ঠান, মূলত বিবাহে জাতপাত ব্যবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিখ সমাজ কিছু কিছু জাতে বিভক্ত রয়েছে। যেমন **জাট, ক্ষাত্রি, অরোরা, রামগবীয়া**। শিখ ধর্ম অবলম্বন করেও নিচু জাতগুলি সমতা অর্জন করতে পারে নি। তাদের 'মাহজীবী' শিখ বলে একটি বর্গে ফেলা হয়। যখন স্বর্ণমন্দির ও অন্যান্য শিখ গুরুদোওয়ারাগুলি উদাসী মহান্তদের তত্ত্বধানে আসে তাঁরা মহাজাবী শিখদের জন্য আলাদা সময় স্থির করে যে সময় তারা পূজা দিতে পারবে। শুধু তাই নয়, পূজা দিতে গেলে এদের উচ্চ জাতের লোক ভাড়া করতে হ'ত। এরা মন্দিরের ভেতর পূজার সামগ্রী পৌঁছে দিত। অকালী আন্দোলনের ফলে এই ধরনের বিধিনিষেধের অবসান ঘটে এবং গুরুদোওয়ারার নিয়ন্তরণ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায়। শিখ সমাজের আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহ খুব বিরল। ধর্মীয় ও আদর্শগত স্তরের শিখ সমাজে বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। শিখদের মধ্যে কিছু ধর্ম সংস্কার আন্দোলন হয় যেমন, **নিরংকরী, নামধারী** এবং **অকালী** আন্দোলন। এদের উদ্দেশ্য ছিল শিখ সমাজকে শিখ বিরোধী আচরণ থেকে মুক্ত করা। অনেক সময় এগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনেরও রূপ নিয়েছে। শেষে এগুলি শিখ ধর্মের এক একটি **উপদল (seat)** হিসাবে পরিচিত হয়।

**(ক) নিরংকরী আন্দোলন**

মহারাজা রঞ্জিত সিং এর আমল থেকে শিখ সমাজে নানা সংস্কারবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রথম যে আন্দোলনটি গড়ে ওঠে তাকে নিরংকরী আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন বাবা দয়াল। তিনি শিখ ধর্মে নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এর মধ্যে ছিল পৌত্তলিকতা, কবরপূজা, বৃক্ষপূজা এবং জটিল ব্রাহ্মণবাদী আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাস। বাবা দয়াল তাঁর অনুচরদের এক ঈশ্বর বা একজন নিরংকর কে পূজা করতে নির্দেশ দেন। যেহেতু এরা একজন নিরংকরে বিশ্বাস করতে বাবা দয়ালের অনুচরেরা নিরংকারী নামে পরিচিত

হয়। তারা শিখ ধর্মের অন্য আচার অনুষ্ঠান পালন করত। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে বাবা দয়ালের বাণী পৌঁছাতে পারে নি। তার কারণ শিখদের মধ্যে শিক্ষার অভাব।

নিরংকরী আন্দোলনের একজন অনুচর, বাবা অবতার সিং সন্ত নিরংকরী নামে আর একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন বা নিরংকরী আন্দোলনের পাশাপাশি চলত।

(খ) **নামধারী আন্দোলন**

**নামধারী** আন্দোলন শুরু করেন ভগত জওহয়মল এবং বাবা বালক সিং। এই আন্দোলন ককা আন্দোলন নামেও পরিচিত। বাবা রাম সিং এর নেতৃত্বে এই আন্দোলন শিখদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বাবা রাম সিং তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দেন যে তারা যেন এক ঈশ্বরকে প্রার্থনা এবং ধ্যানের মাধ্যমে ভজনা করে। যে **রেহাত্মা** বা নৈতিক নিয়ক তিনি তৈরী করেছিলেন তাতেও সবসময় ঈশ্বরকে পূজা করবার কথা বলা আছে। বাবা রাম সিং জাতপাত ব্যবস্থা, নামজাতক হত্যা, বাল্যবিবাহ এবং মেয়েদের বিবাহের মাধ্যমে বিনিময় প্রথার বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি সবাইকে সহজ ও সরল **আনন্দবিবাহ** পালন করতে উপদেশ দেন। যেহেতু বাবা রাম সিং সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এতে প্রমাদ গণে এবং নামধারী আন্দোলনের উপর হস্তক্ষেপ করে।

নামধারী বা কুকা আন্দোলন মূলত শান্তিপ্রিয় আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে তবুও কুকাদের উপর ইংরেজদের নির্যাতন, সাধারণ মানুষের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তোলে এবং ভবিষ্যতের আন্দোলনের বীজ বপন করে।

(গ) **অকালী আন্দোলন**

অকালীরা শিখ সেনাবাহিনীর আত্মহননকারী বাহিনীর অংশ ছিল। এই সেনাবাহিনী গঠিত হয় ১৬৯০ সালে যখন মোগলদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য গুরু গোবিন্দ সিং মোগল শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হলেন। অকালীরা নিহাঙ হিসাবে পরিচিত। তারা সাধারণত নীল পোষাক পরে।

১৯২০ সালে অকালী আন্দোলন আবার শুরু হয়। তারা ইংরেজদের বিরোধীতা করতে একটা আধা সামরিক সংগঠন তৈরী করে। অকালীরা শিখ সমাজের নেতৃত্ব দেয় এবং তাদের নেতৃত্ব মহন্তদের কর্তৃত্ব থেকে সব শিখ ধর্মস্থান মুক্ত হয়ে শিখ সমাজের নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসে। পাঞ্জাবী ভাষাভাষী শিখ রাজ্যের জন্যেও অকালীরা আন্দোলন করে। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব একটি রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**অনুশীলনী-৩**

১) ‘‘শিখ’’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি ‘‘শিষ্য’’ থেকে। শিষ্য শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে এসেছে?

(ক) সংস্কৃত

(খ) পারসী

(গ) পালি

(ঘ) পাঞ্জাবী

২) ছয়টি বাক্যের মধ্যে গুরু নানকের জ্ঞানদীপ্ত সম্পর্কে লিখুন।

৩) গুরুনানকের শিক্ষার তিনটি রীতি কী?

৪) নিম্নলিখিত কোন গুরুদেব মধ্যে কে অমৃতসর প্রতিষ্ঠা করেন?

ক) গুরু হার রায়

খ) গুরু রামদাস

গ) গুরু তেগ বাহাদুর

ঘ) গুরু গোবিন্দ সিং

৫) কে গুরু গ্রন্থসাহেব সংকলিত করেন?

ক) গুরুর রামদাস

খ) গুরু তেগ বাহাদুর

গ) গুরু গোবিন্দ সিং

ঘ) গুরু অর্জুন দেব

৬) গুরু গ্রন্থসাহেবে কাদের ভজন আছে?

ক) শুধুমাত্র শিখ গুরুদের

খ) শুধু শিখ গুরু ও হিন্দু সাধকদের

গ) শুধু শিখ গুরু ও মুসলিম সাধকদের

ঘ) শিখ গুরু, হিন্দু ও মুসলমান সাধকদের

৭) শিখদের ধর্মীয় আচরণে কী কী নিষিদ্ধ তা উল্লেখ করুন।

৮) বাবা দয়াল, নিরংকারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, কোন্ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করনে?

ক) পৌত্তলিকতা

খ) কবর, গাছ, ইত্যাদির পূজা

গ) ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুষ্ঠানে বিশ্বাস

ঘ) যা যা উল্লেখ করা হয়েছে সব

৯) নামধারী আন্দোলনের কী উদ্দেশ্য ছিল?

ক) সরল বিবাহ জনপ্রিয় করা

খ) পণ-বিবাহ জনপ্রিয় করা

গ) জাতপাত ব্যবস্থা জনপ্রিয় করা

ঘ) কম বয়সে বিবাহ জনপ্রিয় করা

১০) অকালী আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

## ১১.১৪ ভারতে উপজাতির মধ্যে ধর্মবিশ্বাস

ভারতের উপজাতিদের মধ্যে যে ধর্ম বিশ্বাস রয়েছে তা অনেক নৃতত্ত্ববিদ সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলে মনে করতেন। সর্বপ্রাণবাদ হচ্ছে আদিম ধর্মের মধ্যে একটি যার সঙ্গে যাদুবিদ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে। এরকতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

১) সর্বপ্রাণবাদ মনে করে যে, মানুষের জীবনে প্রেতাত্মা ইত্যাদি সঙ্গ দেয়;

২) এদের মধ্যে কিছু প্রেতাত্মা জীবনের বিভাগের মুখ্য দেবতা। যেমন, অসুখের একটা দেবতা আছে, শিকারের একটা দেবতা ইত্যাদি। এদের তুষ্ট করলে এই দেবতা বা অপদেবতাদের থেকে কোন বিপদ আসবে না।

কোরওয়া উপজাতির মধ্যে আমরা দেখি যে, একটা শস্যর দেবতা, একটা গবাদি পশুর দেবতা যেমন রয়েছে, তেমনি বেশ কিছু দেবতা রয়েছে যারা এই উপজাতিদের তাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে ধারণা, মোড়ল সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি প্রভাবিত করে।

আমরা দেখেছি যে, সর্বপ্রাণবাদীরা কিছু ভাল দেবতা ও অপদেবতায় বিশ্বাস করে, যাদের তুষ্ট করলে অনেক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা যায়। সব আদিম ধর্মের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ক্ষতিকারক শক্তি সম্পর্কে উপজাতিরা বেশি সচেতন।

## ১১.১৫ উপজাতি ধর্ম (Tribal Religions)

আদিম ধর্মের সঙ্গে সর্বপ্রাণবাদের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়। হাটনের মতে সর্বপ্রাণবাদ (animism) ধারণার বদলে উপজাতি ধর্ম (tribal religious) ধারণাটির ব্যবহার করা উচিত। হাটন (Hutton) এবং এলভিন (Elvin) বলেছেন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে আদিম ধর্মের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। ঘুরে উপজাতি সমাজকে ''পশ্চাৎপদ হিন্দু'' বলে মনে করেন।

হাটন উপজাতিদের ধর্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখেছেন। (১) আত্মা-বস্তু (soul matter) থেকে শস্যের সার হয় এবং জীবনের উৎপাদন হয়; (২) মস্তক শিকার, মানব বলি এবং (cannibalism) সব আত্মা বস্তু হ'তে বিশ্বাস থেকে সম্ভবত এসেছে, (৩) মৃত্যুর সঙ্গে নানা ধর্মীয় আচার যেমন বিশাল বিশাল কবর (megalitihic monuments) ও মৃতের কাষ্ঠ প্রতিমা, (৪) পরজন্ম বিশ্বাস; (৬) আত্মার পুনর্জন্ম (reincarnation of son) এবং (৬) টোটেমবাদ (totemism)।

অনেক নৃতত্ত্ববিদদের মতে, মানা (mana) তে বিশ্বাস হ'ল ধর্মের গুরু। মারেটের (Marett) মতে, আদিম মানুষের ধর্মীয় জীবন কতকগুলি অবোধ্য নৈব্যক্তিক, অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মানা ইন্দ্রিয়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু সেটা কোনও একটা পাশবিক শক্তি হিসাবে পরিচিত হ'তে পারে। এই শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর থাকে। একে বলে মানা (mana); যা বলে মেলানেশীয়রা সেই শক্তিকে ডাকত। মজুমদারের বোঙ্গাবাদের সঙ্গে মানাদের খুব মিল আছে। মুণ্ডা, হো প্রভৃতি ছোটনাগপুরের উপজাতিগুলি বোঙ্গাবাদে

বিশ্বাস করে। এই ধারণা মেলানেশীয়দের মানাবাদের মতো। হোদের বোঙ্গার ধারণাটা অস্বচ্ছ। বোঙ্গার সম্পর্কে তারা মনে করে যে, এগুলি নৈর্ব্যক্তিক। বোঙ্গার কোনও বিশেষ রূপ নেই।

মুণ্ডাদের বোঙ্গা স্বাপ্নাদেশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎবাণী করে। দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে খবর দেওয়া হয় বা বিপদ হ'তে সাবধান করে দেওয়া হয়। বোঙ্গা হচ্ছে একটি অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতা বা সব শক্তির উৎস। যেমন, সাইকেল একটা বোঙ্গা, ষ্টিমইঞ্জিন আরো ক্ষমতাশালী বোঙ্গা। আর এরোপ্লেন এগুলির থেকেও বড় একটা বোঙ্গা।

ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ক্ষমতার বা সম্মানের তাফৎকেও বোঙ্গা তারতম্য বলে মনে করা হয়। যে কোনও ঘটনা যা বর্তমান পরিবেশ বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে তাকে বোঙ্গা বলা হবে। অনেক সময় লোককাহিনী কিছু বস্তু বা জীবজন্তুকে পরিবেশ থেকে আলাদা করে দেখে এগুলিও বোঙ্গা।

## ১১.১০.১ উপজাতি দেবতাদের পতন

ভারতের উপজাতিগুলি সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে বদলে যাচ্ছে। অনেক সময় এই যোগাযোগ উপজাতি সমাজের মঙ্গল করছে, কারণ তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো উপযোগী জ্ঞান ও প্রযুক্তি উপজাতিগুলি এদের কাছ থেকে পাচ্ছে। শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় যেমন দেখিয়েছেন যে, ছোটনাগপুরের উপজাতিগুলি খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করার ফলে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু উল্টোটাও সত্যি। C. Von furer-Haimendorf and Mills দেখিয়েছেন যে, নাগারা খ্রীষ্টান হয়েছে; তারা নানা চাপের সম্মুখীন হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উপজাতির মধ্যে ভাঙন দেখা যায়।

মুরিয়া গোন্দদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব অনেক বেশি। এলউইনের মতে, তাদের ধর্মের সঙ্গে শৈবদের খুব ছিল আছে। কিন্তু আবার ওদের ধর্মের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যা হিন্দু ধর্মের তাকে আলাদা করে। গোন্দদের অনেক দেবতা আছে যাদের খুব সরলভাবে পুজো করে। তাদের পুরহিত রয়েছে এবং দেবতাদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করবার জন্য লোক (medium) রয়েছে।

**অনুশীলনী-৪**

১) সর্বপ্রাণবাদগ কী?

২) বোঙ্গাবাদ কী?

## ১১.১৬ সারাংশ

এই এককে আপনি ভারতের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিত হলেন। এই ধর্মগুলি হল খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, শিখ ধর্ম। এছাড়া উপজাতিদের ধর্ম সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে।

খ্রীষ্ট ধর্ম-যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। এই ধর্মের অনুশাসনগুলি 'বাইবেল'-এ পাওয়া যায়। বাইবেলের মতে, ঈশ্বরের ধারণা খুব জটিল। ঈশ্বর এক কিন্তু বাইবেলে তিনি তিনজন ব্যক্তি হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। বাইবেলের মতে মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। দেহের মৃত্যু হ'লেও আত্মা অবিনশ্বর। খ্রীষ্টধর্মের মুক্তির পথ বাইবেলের প্রাচীন ও নবভাগের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। সাধারণভাবে খ্রীষ্টানদের ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বরকে উপাসনা করা। আত্মা ও সত্যর মাধ্যমে এই উপাসনা করা হয়। যীশুর শিক্ষা থেকে খ্রীষ্টান সমাজব্যবস্থার মূল নীতিগুলি

হ'ল ঃ সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও দুঃস্থদের সেবা। খ্রীষ্টানদের বিশ্ববীক্ষা চার্চ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চার্চকে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে কাজ করতে হয়। খ্রীষ্টধর্ম যেন প্রভাবিত করেছে, সমাজও খ্রীষ্টধর্মকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। খ্রীষ্টানরা ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট-এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ভারতে ৫২ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট টমাস প্রথমে কেরলে এবং তৎপরবর্তীকালে অন্যত্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ব্যাপারে ইউরোপীয়রা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উপরোক্ত দু'টি সম্প্রদায় ছাড়াও ভারতে অ্যাংলিকান ও সিরিয়ান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও দেখা যায়।

ইসলাম ধর্মের উদ্‌গাতা হ'লেন পয়গম্বর মহম্মদ। 'ইসলাম'-এর ব্যুৎপত্তি 'শান্তি' শব্দের থেকে। প্রত্যেক মুসলমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ইসলামী ধর্মতত্ত্বানুসারে 'আল্লাহ' সর্বশক্তিমান; তাঁর আদি বা অন্ত নাই। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কোরানের মাধ্যমে পয়গম্বর মহম্মদকে সব কিছু শিখিয়েছেন। আল্লার বাণী তাঁরই দেওয়া পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। মুসলমিদের কাছে পবিত্র কর্তব্য হ'ল ধর্মবিশ্বাসকে নিয়মিত ধর্মাবলম্বীরা মূলত শিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলিম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হ'ল পরিবার, বিবাহ ও উত্তরাধিকার। মুসলমানদের মধ্যে তেমন জাতপাত ব্যবস্থা না থাকলেও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জাত-সদৃশ বিভাজন লক্ষ্য করা যায়; যেমন, আশরফ, আরজল, আতরাফ প্রভৃতি।

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরুনানাক হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। 'শিখ' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'শিষ্য' থেকে যার অর্থ হ'ল ছাত্র বা চ্যালা। শিখ ধর্মের গুরুর প্রতি সম্মান দেখানো ও গুরুর শিক্ষা মেনে চলা হচ্ছে শিখদের পবিত্র কর্তব্য। গুরুনানক একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। নানকের ঈশ্বর দর্শন 'জপজী' অর্থাৎ আদি ধর্মতত্ত্ব। নানকের শিক্ষার সার তিনটি পাঞ্জাবী শব্দের মধ্যে নিহিত আছে; যথা, নাম জপনা, বীতি করনা ও ওয়ান্দ এটি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, দুঃস্থদের রক্ষাকবচ। শিখদের পবিত্র গ্রন্থকে 'গ্রন্থসাহেব' বলা হয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গুরুদোয়ারা আছে। শিখ সমাজজীবনে বেশ কিছু আচার-অনুষ্ঠান আছে। এদের মধ্যে দীক্ষাদানোৎসব গুরুত্বপূর্ণ। শিখদের কেশ, কড়া, কৃপাণ, কাঙ্গা, কচ্ছ রাখা বাধ্যতামূলক। শিখদের ইতিহাসে কিছু সংস্কারবাদী আন্দোলন হয়েছে, যেমন নিরংকারী, নামধারী, অকালী প্রভৃতি।

ভারতের উপজাতিদের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস রয়েছে তাকে নৃতাত্ত্বিকরা সর্বপ্রাণবাদ বলেছেন। উপজাতিদের ধর্মে বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল আত্মা-বস্তু, মস্তক শিকার, মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ধর্মীয় আচার। আদিম মানুষের ধর্মীয় জীন কতকগুলি অবোধ্য, নৈর্ব্যাক্তিক, অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাসরে উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে 'মানা' বলা হয়। কেউ কেউ একে বোঙ্গাবাদও বলেন। ভারতের উপজাতিগুলি সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এসে পাল্টে যাচ্ছে।

## ১১.১৭ অনুশীলনী

১) বাইবেলের মতে ঈশ্বরের ধারণা কিরূপ?

২) খ্রীষ্টান সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে টিকা লিখুন, খ্রীষ্টান চার্চ ও তার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি?

৩) ইসলাম ধর্মের মূল সম্প্রদায় ও উপদলগুলি কি কি?

৪) ইসলাম ধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কি কি?

৫) শিখ ধর্মের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন ও গুরু নানকের দর্শন সম্বন্ধে টিকা লিখুন।

৬) শিখদের সংস্কারবাদী আন্দোলন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

৭) ভারতের উপজাতিদের মধ্যে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে টীকা লিখুন।

## ১১.১৮ গ্রন্থপঞ্জী


1. J. Macquarriee : Principles of Chiristian Theology, S.C.M. Press, London, 1966.

2. C. Clemea : Religions of the World, Manas Publication, Delhi.

3. Dr. M. Hafiz (compiled) : Thus Spake Prophet Muhammad, Ramkrishna Math.

4. A. Ameer : The Spirit of Islam, Idarale–I Adabiyat, Delhi, 1978.

5. A. A. Kader : The Conception of God in Islam, The Islamic Centre, Washington, 1989.

6. J. Takle : The Faith of Islam, Deep and Deep, New Delhi, 1978.

7. Khushwant Singh : History of the Sikhs, Vol I & II, Princeton University Press, 1986.

8. Harbans Singh : Heritage of the Sikhs, Manohar, New Delhi, 1985.

9. Mohbinder Singh : The Sikhs, National Institute of Punjab Studies, New Delhi, 1988.

10. Majumdar & Madam : An Introduction to Social Authropology, Asia Publishing House, Bombay, 1977.

# একক ১২ ❑ সংস্কৃতকরণ

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা
১২.৪ সংস্কৃতকরণ ও সামাজিক পরিবর্তন
১২.৪.১ সমালোচনা
১২.৫ আধুনিকীকরণের অর্থ ও প্রকৃতি
১২.৫.১ ভারতের আধুনিকীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তন
১২.৫.২ ভারতীয় সমাজে আধুনিকীকরণের সীমাবদ্ধ
১২.৬ পশ্চিমীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তন
১২.৬.১ ভারতীয় চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে পশ্চিমীকরণ
১২.৬.২ সমালোচনা
১২.৭ সারাংশ
১২.৮ অনুশীলনী
১২.৯ সারাংশ

## ১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়?
- ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান প্রধান দিক ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ভারতবর্ষে সমাজে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া
- ভারতীয় সমাজে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া
- ভারতীয় সমাজে পশ্চিমীকরণ প্রক্রিয়া

## ১২.২ প্রস্তাবনা

সমাজ বিদ্যার ছাত্রছাত্রী হিসেবে আপনার ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া আবশ্যক। তাই এই এককে আলোচিত হবে ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তন ও এই পরিবর্তনে

কয়েকটি প্রক্রিয়া যেমন সংস্কৃতকরণ, আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমীকরণ প্রভৃতির মুখ্য ভূমিকা। বিশেষত, কিভাবে আদি যুগ বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ বিবিধ প্রক্রিয়ার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। মূল কথা হ'লো এই যে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনের ধারাটিকে অনুসন্ধান করা এই এককের আলোচ্য বিষয়।

## ১২.৩ ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করা সময়োচিত হবে যে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়ায় আবির্ভাব ব্রিটিশ আমলের বহু পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শক্তির আগমনের ফলে তার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের ধারাটি অনুসরন করলে একথা অনুমান করা যায় যে এই সমাজ বিভিন্ন সময়ে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব ও বহিরাগত সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতের মধ্যে বিরোধ ভারতীয় সমাজের বর্ণ ও জাতপাতভিত্তিক ধ্রুপদী কাঠামোর ভিতকে অনেকাংশে নড়িয়ে দিয়েছে। 'সামাজিক পরিবর্তন' বলতে যদি একটি সমাজের প্রচলিত কাঠামো, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতির পরিবর্তন বোঝায় তাহলে বলা যায় যে ভারতীয় সমাজ প্রায়শই আভ্যন্তরীন বিরোধ ও বাইরের সমাজের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়েছে। অতএব পরিবর্তনের মুখ্য কারণ সম্পর্কে আপনার অবগতির জন্য প্রথমত, বৈদিকযুগ থেকে প্রচলিত বর্ণ ও জাতপাতভিত্তিক সমাজের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, বিরোধ এবং দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে যথাক্রমে আধুনিক ভাবধারা ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে যোগাযোগের ফলে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনের প্রকৃত রূপটি উদঘাটন করা হবে।

## ১২.৪ সংস্কৃতকরণ ও সামাজিক পরিবর্তন

অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস তাঁর ''Social Change in Modern India' গ্রন্থে ভারতে সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে 'সংস্কৃতকরণ' (Sanskritisation) ধারণার সূত্রপাত করেছেন। 'সংস্কৃতকরণ' বলতে তিনি জাত ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত উঁচু জাতের আচার : অনুষ্ঠান, বৃত্তি ও জীবন ধারা প্রভৃতি অনুসরণ করে নীচু জাতের উঁচু জাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াসকে বুঝিয়েছেন। উপরোক্ত গ্রন্থে তাঁর নিজের ভাষায় 'Sanskritisation is the process by which a low Hindhu Caste, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high and frequently, ''twice-born' caste. Generally such changes are followed by a claim to a higher position in the caste hierarchy than that traditionally conceded to claimant caste by the local comunity. The claim is usually made over a period of time, in fact, a generation or two before the ''arrival'' is conceded.'' অর্থাৎ 'সংস্কৃতকরন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নীচু জাতি, অথবা উপজাতি অথবা কোনো গোষ্ঠী উঁচুজাতি বা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনধারা ইত্যাদি অনুকরণের মাধ্যমে উঁচুজাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াস চালায়। সাধারণভাবে এ ধরনের পরিবর্তন বা উচ্চাকাঙ্খী জাতির এই ধরনের দাবী দীর্ঘসময় ধরে অর্থাৎ একটি বা দুটি প্রজন্ম ধরে বজায় থাকে, যতদিন না পর্যন্ত তাদের এই দাবী সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই ধারনা অনুযায়ী সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া হিন্দুসমাজে 'উর্দ্ধগামী সচলতা'র (upward mobility) সাথে সম্পৃক্ত।

অধ্যাপক শ্রীনিভাস এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র হিন্দুজাতি বর্গের মধ্যে আবদ্ধ নয় বরং ভিল (পশ্চিম ভারত) গোন্ড ও ওঁরাও (মধ্যভারত) পাহাড়ী (হিমালয়) প্রভৃতি উপজাতি ও জনজাতি বর্গের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এছাড়া পূর্ববর্তী কিছু রচনায় তিনি যে ব্রাহ্মনমুখী সংস্কৃতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার সীমাবদ্ধতা অনুধারন করে এই গ্রন্থে তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সংস্কৃতকরণ মডেলের কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং একথা অনুমান করা যায় যে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া শুধু ব্রাহ্মণমুখী ছিল না। সমগ্র হিন্দু সমাজের জাতব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে চতুবর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য জাতির মধ্যে বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই প্রক্রিয়ার প্রকৃত চরিত্র ও কারন অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এই বিষয়ে শ্রীনিভাস মন্তব্য করেছেন যে বর্ণব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি বর্ণের সামাজিক অবস্থান স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অথচ জাত ব্যবস্থায় একটি জাতির অবস্থান পরিবর্তনশীল।

সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াকে শুধু ব্রাহ্মণ্যবাদীর মডেলের সংকীর্ন গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে অধ্যাপক শ্রীনিভাস সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারনে বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংঘটিত সংস্কৃতকরন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষন করার পথ প্রশস্ত করেছেন। এ বিষয়ে তিনি যেগুলি উল্লেখ করেছেন তা হ'লো : ক) শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা সর্বোচ্চ হওয়ায় তাদের জীবনধারা ও আচার-অনুষ্ঠান অনুকরণ করে অপেক্ষাকৃত নীচু জাতিবর্গের উঁচু স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রয়াস; খ) ভূমির মালিকানা অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রয়াস; গ) সাধারণভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক নিজ জাতের গন্ডীর মধ্যে স্থাপনের প্রবণতা দেখা গেলেও অনেকক্ষেত্রে অনুলোম বিবাহ যার দ্বারা উঁচুজাতিভুক্ত পুরুষের সাথে নীচুজাতিভুক্ত মেয়ের বিবাহ দিয়ে জাতবিচারের সামাজিক মর্যাদায় উঁচু স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টা, ঘ) প্রাক-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তি, জনবল ও চাষযোগ্য বিশাল ভুখন্ডের মালিকানা ইত্যাদির সাহায্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে কোনো নীচু জাতি বা তার স্থানীয় অংশের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা অর্জনের প্রয়াস; ঙ) তীর্থস্থান ও বিবাহ বহুক্ষেত্রে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়েছে। প্রত্যেকটি তীর্থস্থানে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে পূণ্যার্থীদের সমাগম হলেও অনেক ক্ষেত্রে পূণ্যার্থীদের আগমন স্থানীয়ভাবে জাত বা গ্রামভিত্তিক হয়ে থাকে। এই তীর্থক্ষেত্রগুলি তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা বহুলাংশে প্রভাবিত করে থাকে। স্থানীয় প্রভাবশালী জাতি তীর্থস্থানের ঐতিহ্যও আচার দ্বারা প্রভাবিত হলে ক্রমে তা উল্লম্বভাবে (vertical) অপ্রধান জাতিসমূহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন জাতভুক্ত মানুষের জীবন-যাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে থাকে; এবং চ) রাজানুগ্রহে নীচু জাতি থেকে উঁচু জাতে উত্তরন অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় রচিত 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে সেনযুগে বল্লালসেনের আদেশে সুবর্ণবণিকদের শূদ্র পর্যায়ে অবনমন কৈবর্তদের সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল বাংলাদেশে মন্দির নির্মানের মাধ্যমে নবশাখ, অজলচল প্রভৃতি জাতির সামাজিক মর্যাদার উচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেছেন। সঙ্গত কারণে একেও সংস্কৃতকরন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যায়।

হিন্দুসমাজে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীনিভাস আরো যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেগুলি হলো রাজপুতকরন (Rajputisation), পাঞ্জাব ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশে জাঠ ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মনদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে উঁচুজাতিভুক্ত হিন্দুদের উপজাতীয় সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান অনুকরণ প্রভৃতি। এমনকি সামাজিক কাঠামোয় সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত সাধু-সন্ত, বণিক ও

কৃষকগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান ও আদব কায়দা সমূহকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। ক্রমে কিছু হিন্দুধর্ম ভিত্তিক সংগঠন যেমন আর্য সমাজ, সনাতন ধর্ম-সমাজ ও সাম্প্রতিকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি সংস্কৃতকরন প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে গত কয়েকদশক ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। হিন্দু জাত ব্যবস্থার প্রান্তে বা বাইরে অবস্থিত জাতি ও উপজাতিদের জন্য প্রচলিত জাত ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে বা কখনো হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে এ ধরনের সংগঠন বিভিন্ন জাতিগত বিরোধ ও দাবী সমূহ মীমাংসার প্রচেষ্টা চালায়। অতএব একথা প্রতীয়মান যে সংস্কৃতকরন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তনের বাহন নয়, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবেও এর গুরুত্ব রয়েছে কারণ এর দ্বারা আচার ব্যবহার ও জীবন যাত্রায় লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন ঘটে। এ সম্পর্কে শ্রীনিভাসের মন্তব্য 'Sanskritisation has been a major process of cultural change in Indian history' এর সাথে আঁন্দে বেতের সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াকে 'the principal medium cultural mobility in Indian Society' হিসেবে অভিহিত করার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষনীয়।

### ১২.৪.১ সমালোচনা

হিন্দুসমাজের পরিবর্তনের প্রধান কারণ হিসেবে সংস্কৃতকরন প্রক্রিয়ার ধারণা স্বীকৃতি লাভ করলেও কিছু সমাজতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে এর অবিসংবাদী ভূমিকা অগ্রাহ্য করেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক ভি. কে. আর. ভি. রাও ও মিলটন সিঙ্গার বলেছেন যে প্রধানত দুটি কারণে 'সংস্কৃত করণ' ধারনার দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের সব ধারাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ আর্থিক প্রতিপত্তি সত্ত্বেও হিন্দু বর্ণ সমাজে সামাজিক মর্যাদা না থাকায় বৈশ্যরা বর্ণ ব্যবস্থা বিরোদী বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। জাঠ কৃষকরাও বর্ণসমাজকে উপেক্ষা করে শিখ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেকে আবার মুসলিম ধর্ম বহন করে।

সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়ার একমুখী বিশ্লেষণে সেই সামাজিক বাস্তবটি পরিস্ফুট হয় নি। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমীকরণ, রাজনীতি করণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে উঁচু ও নীচু জাতের মধ্যে ভেদরেখা যে ক্রমেই বিলীয়মান তা সংস্কৃতকরণের ধারনা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া শুধু জাতভিত্তিক পরিবর্তন ব্যতীত বঞ্চনার বিরুদ্ধে নীচুজাত বর্গের মধ্যে যে প্রতিরোধমূলক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তা এই ধারনার দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। অতএব ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে এই ধারনার অসম্পূর্ণতা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি একথাও সত্য যে ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে জাতপাতের প্রাবল্যও অনস্বীকার্য। তাই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান চিহ্নিতকরণে সংস্কৃতকরণের ধারণা আজও অনেকক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

## ১২.৫ আধুনিকীকরণ এর অর্থ ও প্রকৃতি

সামাজিক পরিবর্তনের সাথে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যান-ধারনার প্রসার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাক্ প্রাথমিক উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত ও বিবর্তন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটায় যার প্রভাবে প্রাক-আধুনিক সমাজ পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়।

আধুনিকীকরণ বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ একে অর্থনৈতিক মান ও শিল্পায়নের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন বা কোনো সমাজ বিজ্ঞানী শুধুমাত্র আর্থিক উন্নয়নের মানের

নিরিখে বিচার না করে সার্বিক উন্নয়নের (all-round development)। ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন। ড্যানিয়েল লার্নার তাঁর 'The Passing of Industrial Societies' গ্রন্থে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অনুযায়ী আধুনিকীকরণ এমন এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদ (backward) সমাজ জীবন ধারনের মানের নিরিখে উন্নত সমাজের স্তরে উন্নীত হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। তাঁর মতে আধুনিকীকরণ সব যুগেই বর্তমান তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে গন মাধ্যম ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে অনগ্রসর সমাজগুলি উন্নত সমাজের বিকাশের মান অর্জনের লক্ষ্যে সক্রিয় হয়। এই উদ্দেশ্যে তার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পবিকাশের মাধ্যমে উন্নতসমাজগুলির সমকক্ষ হতে প্রয়াসী হয়। এই বক্তব্যের সাথে সাযুজ্য রেখে লার্নার আধুনিকীকরণের কয়েকটি উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি হলো ঃ ক) নগরায়ণ, খ) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ; গ) প্রচার মাধ্যমের প্রচলন; এবং ঘ) রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। তাঁর এই বক্তব্য অনুযায়ী আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতার গণতন্ত্রীকরণ, স্বতন্ত্র গণমাধ্যম ও শিক্ষার প্রসার আবশ্যক।

## ১২.৫.১ ভারতবর্ষে আধুণিকীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তন

ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আনুধাবন করা যায়। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে দীর্ঘ কালব্যাপী মুসলিম শাসনে ভারতীয় সমাজের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পরবর্তীকালে ব্রিটিশযুগে ভারতবর্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয়। বলা হয় যে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ভারতীয় সমাজের অগ্রণী অংশের মধ্যে আধুনিক মনস্কতার আবির্ভাব ঘটে যার নেতৃত্ব দেন রাজা রামমোহন রায়। সনাতন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার বিরোধীতা করে তিনি সমাজকে স্থবিরতা থেকে মুক্তি দিয়ে সচল করতে চেয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও অন্যান্য মনীষিগণ সংস্কারমূলক আন্দোলন ও লেখনীর মাধ্যমে জাত-পাত ব্যবস্থা, লিঙ্গ-বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি অসাড়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে যুগযুগব্যাপী কুসংস্কার ও গোঁড়ামীকে আঘাত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, চারুকলা ইত্যাদি ভারতীয় জীবনধারার গভীরে প্রবেশ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও আলোর উন্মেষ ঘটে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এই পরিবর্তন সম্ভব হলেও একে পশ্চিমীকরণ বলা যায় না কারণ পশ্চিমীকরণের সাথে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও মিশনারি কার্যকলাপ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যা বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মনন গঠনে সহায়ক নয়।

উপরোক্ত ধারনা অনুযায়ী ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরন ত্বরান্বিত হয়েছে আধুনিকমনস্ক বুদ্ধিজীবিবর্গের অভ্যুদয়ের ফলে। আধুনিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত বুদ্ধিজীবিগন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রশাসনিক বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। এর ফলে পুরনো চিন্তাধারার পরিবর্তে গনতন্ত্র, উদারবাদ, মানবতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য, আইনের অনুশাসন, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় প্রভৃতি সামাজিক স্বীকৃতি ও বৈধতা অর্জন করে। এই মতে ভারতীয় সমাজে আধুনিকীকরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন ব্রিটিশযুগে 'জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। ঔপনিবেশিক শাসনে পিষ্ট ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের যে বীজ উপ্ত হয়েছি তা থেকে প্রায় সমগ্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। মনে করা হয় যে এর ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ এক অখন্ড জাতীয়তাবোধের আবদ্ধ হয়।

পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে জাতিগঠনের উদ্যোগ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরনে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করে। শাসনব্যবস্থার সংস্কার প্রধানত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হ'লেও এই সংস্কারের ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন জনসাধারনের সাথে রাষ্ট্র ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তোলে। পাশাপাশি সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ বিলোপ, ধর্ম, শ্রেণী ও জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক নিরাপত্তা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত জনসাধারণকে সচেতন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে। এর প্রভাবে পুরনো আনুগত্য ও দাসত্ব ঘুচে গিয়ে একটি সক্রিয় পৌরসমাজ সৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জল হয়ে উঠেছে। এছাড়া স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাভিত্তিক উন্নয়নের নীতি, শিক্ষার প্রসার, কৃষির পাশাপাশি শিল্পে বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যোগাযোগ ও অর্থকরী উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট, দূরসঞ্চার, দূরদর্শন ইত্যাদির ব্যবহার ভারতীয় সমাজকে অন্যান্য আধুনিক সমাজের সমকক্ষ করে তুলেছে। সাম্প্রতিকালে শিল্পায়নের (globalisation) ফলে আধুনিকীকরন প্রক্রিয়া তীব্র হয়েছে যদিও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর ফলাফল প্রায়শই বিপর্যকর।

## ১২.৫.২ ভারতীয় সমাজে আধুনিকীকরণের সীমাবদ্ধতা

পূর্ববর্তী আলোচনায় আধুনিকীকরণের ইতিবাচক দিকটি উপস্থাপিত হলেও এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারনা থাকা প্রয়োজন। তাই আলোচ্য বিষয় যেহেতু আধুনিকীকরন সেক্ষেত্রে উনিশশতকে বাংলায় নবজাগরণ ও ব্রিটিশশাসনে ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃত রূপটি উন্মোচন করা আবশ্যক। সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধান থেকে জানা যায় উনিশশতকের নবজাগরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ আদৌ সম্ভব ছিল না। প্রাচীনত্বের বাঁধন থেকে সমাজকে মুক্ত করতে যে সমস্ত সংস্কারকের কথা সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তাঁরা প্রায় সবই সমাজের অগ্রণী ও বিত্তশালী অংশের প্রতিনিধি ছিলেন। আপামর ভারতবাসীর জীবন যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কোনো তাগিদ তাঁদের ছিল না। যার ফলে সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে তাঁরা আধুনিক ভাবধারার বার্তাবাহক হয়ে উঠতে পারেন নি। বরং প্রতিপত্তি বজায় রাখার স্বার্থে একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেছিলেন তেমনই অন্যদিকে হিন্দুধর্ম—ভিত্তিক সামাজিক বিভাজনগুলি বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এর ফলে সমাজে ইংরেজী শিক্ষিত এক নূতন সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল যাদের সাথে অসংখ্য কৃষিজীবী, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছিন্ন মানুষের যোগাযোগ ছিল না। তাই সমাজের উপর তলার ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরনে যথার্থ দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর একাধারে ব্রিটিশ অপশাসন ও ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী চেতনার বিকাশে ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীগণ নানারকম অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন ছিল স্বল্পকালস্থায়ী। ১৮৩১ খৃ: তে ডিরোজিওর মৃত্যুর পর আন্দোলন কিছুকাল স্থায়ী হলেও তাঁর ছাত্রদের বিভ্রান্তমূলক কার্যকলাপে তা দিশাহীন হয়ে পড়ে লক্ষ্যকে সামনে রেখে চেনার প্রসারে যে নিরসল প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল তা ডিরোজিওর অনুগামী ছাত্রদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। তার ফলে ভারতীয় জনমানসে এই আন্দোলন গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে সমাজের একাংশের মধ্যে বিদেশীশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্বার্থে দেশীয় শিক্ষা, শিল্প

ও সামাজিক কাঠামোর ধ্বংসসাধন ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার পরিবর্তে অনগ্রসরতাকে ত্বরান্বিত করেছে। ডানিয়েল লার্নারের বক্তব্য অনুযায়ী শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের সূচক হিসেবে বহন করলে দেখা যাবে যে প্রাক্-ব্রিটিশ শাসনপর্বে টোল, পাঠশালা ও মাদ্রাসা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষার যে দেশজ পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল তা ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের চাপে অবলুপ্ত হয়েছিল। তার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেগুলি কখনোই পূর্বতন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে নি। তদুপরি ভারতবর্ষে আধুনিকতার দেশীয় বণিকদের প্রতিপত্তি হ্রাস, দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন, ইংরেজ বণিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির একচেটিয়া কারবার ও 'সম্পদ নির্গমন' (resource-drain) ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। কার্ল মার্কসও ১৮৫৩ তে লেখা 'British Rule in India' প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকার পাশাপাশি ভারতীয় সমাজের পুনরুজ্জীবনে তার ইতিবাচক ভূমিকার কথা স্মরণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে মত পরিবর্তন করে তিনি তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে কিভাবে ব্রিটিশ শাসন ভারতের নিজস্ব সমাজ কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করেছে। পুঁজিবাদী স্বার্থে সমস্ত কিছুই আরোপিত হওয়ার ফলে আধুনিক সমাজব্যবস্থা গঠনের কোনো ভিত তৈরী হয় নি। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র আর্থিক কাঠামোর ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটে ঔপনিবেশিক শক্তির আর্থিক স্বার্থে। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও ব্রিটিশদের দ্বারা জাত-পাত ভিত্তিক বিভাজন-সৃষ্টি ও সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচক মন্ডলী (separate electorate) গঠন ভারতীয় সমাজকে জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িক দিক থেকে বিদীর্ন করে ফেলে, বলাই বাহুল্য যে এর ফলে স্বাধীনতার পর ভারতে রাজনৈতিক বিকাশের ধারা সুসংহত রাষ্ট্রগঠনে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে নি।

আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে এই সমাজের আধুনিকীকরন প্রায়ই সরল পথ অনুসরণ করে নি। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরন পরিবর্তন বিরোধী ও রক্ষনশীল প্রতিরোধের দ্বারা ব্যহত হয়েছিল। পরস্পর বিরোধী উপাদানসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব আধুনিকীকরন প্রক্রিয়াকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করেছে। ফলত, এই প্রক্রিয়া পদে পদে প্রতিহত ও বিভিন্ন দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত। তাই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে আপতদৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু মনে হলেও বাস্তবে এর অবদান আশানুরূপ নয়। সমাজে এর প্রভাব কখনো আংশিক (partial) বা, কখনো স্থানিক (local)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ এর দ্বারা সার্বিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয় নি। যথার্থ আধুনিকীকরনের পরিবর্তে এর অবক্ষয়ী রূপটি ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই একে বিকৃত আধুনিকীকরন (distorted modernisation) হিসেবে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়।

## ১২.৬ পশ্চিমীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন বা কোনো সমাজের অবস্থান্তর কদাচিৎ-একটিমাত্র প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে না, বরং একাধিক প্রক্রিয়ার সম্মেলনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের প্রবাহটি যথার্থভাবে পরিবর্তনমুখী হয়ে ওঠে। অতঃপর পূর্বে আলোচিত সংস্কৃতকরন ও আধুনিকীকরন ছাড়াও ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে পশ্চিমীকরনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ভারতীয় সমাজে পশ্চিমীকরন ব্রিটিশশক্তি আগমনের পূর্বে সংঘটিত হয় নি। প্রচলিত ধারনা অনুযায়ী ব্রিটিশদের আগমনের ফলে নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা। চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য আদব-কায়দা

ও চিন্তাধারা প্রবেশ করে। শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে ব্রিটিশ শাসকগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ মজবুত করেছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীনিবাস বলেছেন যে ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতবর্ষে আধুনিক রাষ্ট্র গঠন ও তার অঙ্গ হিসেবে আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, যোগাযোগব্যবস্থা, মুদ্রনব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রচলন ভারতীয় সমাজ জীবনে নূতন বিন্যাসের সূচনা করেছিল।

ব্রিটিশ ভারতের স্বার্থান্বেষী ঔপনিবেশিক নীতির ফলে গ্রামকে কেন্দ্র করে কৃষি ও কুটীর শিল্প ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য রেলব্যবস্থা ও রাস্তাঘাট নির্মাণ পশ্চিমী ধ্যানধারনাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। পশ্চিমীকরনের ফলে সংবাদপত্র প্রকাশনা, প্রতিনিধিত্বমূলক গনতন্ত্রের আদর্শ, ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জাত-পাত নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদির সূচনা হয়। এ ধরনের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্রিটিশ চিন্তাবিদদের রচনা থেকে উৎসারিত পাশ্চাত্য দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতীয় মননে গভীর প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়। সমাজের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত এক অগ্রনী অংশের আবির্ভাব ঘটে। এরা জন্মসূত্রে দেশীয় হলেও আদব-কায়দা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পশ্চিমী ধ্যানধারনাকে গ্রহন করা শ্রেয় মনে করেছিলেন। এসবের সার্বিক প্রভাবে সমাজ থেকে ক্রমশ বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও অমানবিক কার্যাবলী যেমন সতীদাহ প্রথা, নরবলি, দাসব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। এছাড়া শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে পাপ ও পূণ্য বিচার না করে আইনের অনুশাসনের দ্বারা ন্যায় ও অন্যায় বিচার ভারতীয় সমাজজীবন থেকে গোঁড়ামী ও কুসংস্কারকে দূর করতে সাহায্য করে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসন পর্ব থেকে সামাজিক পরিবর্তনের এই ধারাকে শ্রীনবাস 'পশ্চিমীকরন' আখ্যা দিয়েছেন। প্রসঙ্গ উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে তিনি ড্যানিয়েল লার্নার রচিত 'The Passing of Industrial Societies' গ্রন্থে প্রদত্ত 'আধুনিকীকরণ' তত্ত্বকে গ্রহন করেননি। তাঁর মতে মধ্যপ্রাচ্যের সমাজগুলিতে পাশ্চাত্য (Western) সম্পর্কে বিরাগ লার্নারকে 'পশ্চিমীকরন' এর পরিবর্তে 'আধুনিকীকরণ' তত্ত্ব গ্রহণ করতে পরোক্ষে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু শ্রীনিবাস-এর মতে ভারতীয় সমাজের সাথে ঐতিহাসিক কারনে যেহেতু ব্রিটিশদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। সেহেতু পশ্চিমীকরনের ধারণাকে বর্জন করে এই সমাজের পরিবর্তনের প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাঁর নিজের পর্যবেক্ষন অনুযায়ী 'In the analysis of social and cultural change in India the British model of Westernisation is obviously the most important one.'

শ্রীনিবাসের মতে এই পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাবে প্রাত্যহিক কর্মাদি যেমন খাদ্যগ্রহণ, পরিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুদ্ধিকরণের (purfity) মানসিকতার প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী পিতল, ব্রোঞ্জ বা রুপোর বাসন সহযোগে মেঝেতে উপবিষ্ট হয়ে খাদ্য গ্রহন করা হ'তো। খাদ্য গ্রহনের পূর্বে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে গৃহদেবতাকে নিবেদন করা একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। পশ্চিমীকরনের ফলে বৃহৎ নগরসমূহে শিক্ষিত ও পাশ্চাত্যমনস্ক ব্যক্তিদের মধ্যে মেঝের পরিবর্তে চেয়ার-টেবিলে বসে স্টিলের বাসন ও চামচ সহযোগে শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার না করে খাদ্যগ্রহণ করার রীতি চালু হয়। সনাতন রীতি বর্জন করে নগরকেন্দ্রিক জীবনে শিক্ষিত ও উচ্চ-বিত্তের মানুষদের মধ্যে সবান্ধবে নৈশাহারের প্রচলনও এ ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এছাড়া ক্রমশ বিভিন্ন খাদ্য সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে শুধু গুণাগুণ বিচার করে সেগুলি গ্রহণের অভ্যাসও চালু হয়।

ভারতবর্ষে পশ্চিমীকরণ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকালে শ্রীনিবাস লক্ষ্য করেছেন যে পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী ক্ষেত্রে সফল ও

উচ্চপদস্থগন বৃহৎ ক্রমবর্ধমান নগরগুলিতে পশ্চিমী আদব কায়দা রপ্ত করে সমাজের অন্যান্যদের প্রভাবিত করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের অধিবাসীগন বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উঁচু বর্ণ ও জাতির মধ্যে পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। উত্তর প্রদেশে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের মধ্যে পশ্চিমী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ দৃষ্টান্তমূলক। এ প্রসঙ্গে তিনি এডওয়ার্ড শিল্‌স্, বি. বি. মিশ্র ও সেলিগ্ হ্যারিসনের রচনায় আলোচিত পশ্চিম-মনস্ক ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের কথা উত্থাপন করেছেন। তিনি এও লক্ষ করেছেন যে উত্তর ভারতে কায়স্থ, বাংলায় বৈদ্য, পশ্চিমভারতে পার্সি ও বানিয়া, উত্তর প্রদেশে মুসলিম, কেরালায় নায়ার, সিরিয়ান খ্রীষ্টান প্রভৃতি জাতি ও সম্প্রদায় পশ্চিমীকরণে অগ্রহণী ভূমিকা পালন করেছিল।

পশ্চিমীকরণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে শ্রীনিবাস প্রাচীন ও আধুনিকযুগে বিশেষ করে পেশা ও বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'চলমানতা ও চলমানহীনতা' (continuity and dicontinuity)—এই উভয়ের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন বৃত্তিতে যুক্ত উন্নত গোষ্ঠী পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পূর্ববর্তী মূল পেশাকে পুরোপুরি বর্জন না করে তারই আধুনিক সংস্করণের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যঘেঁষা মূল্যবোধের প্রভাবে যেমন বানিয়ার সন্তানের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা, গোষ্ঠীপতির পুত্রসন্তানের সেনাবাহিনীতে যোগদান বা ব্রাহ্মণ সন্তানের শিক্ষাজগতে প্রবেশ—এ ধরনের পেশাকেন্দ্রিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। শুধু তাই নয় পশ্চিমীকরণের প্রভাবে নিম্নজাতিবর্গের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হওয়ার জন্য সংগঠিত আন্দোলনের ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

## ১২.৬.১ ভারতীয় চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে পশ্চিমীকরণ

পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে ভারতবর্ষে মনন গঠনে বুদ্ধিজীবী বর্গের উত্থান ঘটে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে অন্যান্য যশস্বীগন, বিবেকানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, গোখলে, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন প্রভৃতি মনীষীগণ যুক্তি ও মানবতাবাদের যে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা অনেকাংশে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারনা দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সর্বদা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকে তাঁরা প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করেছিলেন মনে করলে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে দেশীয় বুদ্ধিজীবী ও সমাজসংস্কারক বর্গের প্রকৃত মনোভাবকে উপেক্ষা করা হবে। তাঁরা একদিকে যেমন দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপযোগীতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন অনুরূপভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ব্রিটিশশাসন দ্বারা পরিপুষ্ট পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে সততই সন্ধিহান ছিলেন। সুতরাং তাঁরা নির্বিচারে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেননা। তর্কাতীতভাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণীয় না হলেও আপন সমাজের সীমাবদ্ধতা ও পশ্চিমী সংস্কৃতির কুফলগুলি নিরূপন করে তাঁরা ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে যথার্থ সংজ্ঞা রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এসত্ত্বেও মূলকথা স্বীকার্য যে এর অনিবার্যফল হিসেবে রাজনীতি ও জাতীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, জাত-পাত, লিঙ্গ, ধর্ম, শ্রেণী ইত্যাদির বিচারে বৈষম্য না করে প্রত্যেক ভারতবাসীকে সমমর্যাদা ও অধিকার প্রদান এবং আইনের অনুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি যে পশ্চিমী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল সে কথা অনস্বীকার্য।

## ১২.৬.২ সমালোচনা

ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনের যে চিত্র শ্রীনিবাস অঙ্কন করেছেন তাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের স্বার্থন্বেষী মনোভাবের যথার্থ প্রতিফলন হয়নি। ব্রিটিশ শক্তির প্রতি অনুগত করে তুলতে চেয়েছিল। এ বিষয়ে

মেকলে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার অবতারনা প্রাসঙ্গিক। 'জেনারেল কমিটি অফ্ পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন' এর সভাপতি হিসেবে মেকলে ১৮৩৫ খ্রিঃ ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর বিখ্যাত মিনিট পেশ করেন। এখানে তিনি বলেন—প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে একদল ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি করা ''যারা আমাদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শাসিত মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে। তারা হবে সেই শ্রেণীর মানুষ যারা বর্নে ও রক্তে থাকবে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতাদর্শে, নৈতিকতায় এবং বৌদ্ধিক প্রয়াসে হবে ইংরেজ'' (...who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons Indian in colour and blood, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect''). এই বক্তব্য থেকে ব্রিটিশ শক্তির সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। এ বিষয়ে ব্রায়ান হজ্সন্ নামে জনৈক প্রাচ্যবাদী পন্ডিত ১৮৩৫ খ্রিঃ সঠিকভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে মেকলেবাদ ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে উপস্থিত অনাকাঙ্খিত দূরত্বকে আরো প্রসারিত করবে (Macaulayism....will help to widen the existing lamentable gulf that divides us from the mass of people). অতএব, শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি থেকে ইংরেজদের প্রকৃতি উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।

পশ্চিমীকরন সম্পর্কে শ্রীনিবাসের আলোচনায় উপরোক্ত বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। উপরন্তু তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমীকরনকে কতকগুলি মৌলিক নীতি, মান ও আদর্শের আধার হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এছাড়া অনেকক্ষেত্রে পশ্চিমী সমাজগুলিকে একত্রে মানবতাবাদী ও লোকহিতকর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যা সর্বাংশে নির্ভুল নয়।

সুতরাং পশ্চিমী সমাজসমূহ ও বিশেষত ইংরেজ সমাজ সমস্ত কলুষতা থেকে মুক্ত এমন ধারণা সঠিক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইংরেজ জাতি সমগ্র বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু তাদের সমৃদ্ধির পশ্চাতে কারণসমূহ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে শুধু মসী নয় মূলত অসির আস্ফালনে প্রায় সমগ্র বিশ্ব তাদের পদনাত হয়েছিল যে অধ্যায়ের অনেকটাই লুণ্ঠনের ইতিহাসে ভারাক্রান্ত। সুতরাং এই পটভূমিকে ভিত্তি করে দ্বিধাহীনভাবে বলা সম্ভব নয় যে পশ্চিমীকরন প্রক্রিয়ায় আবৃত হয়ে ভারতীয় সমাজ নূতন যুক্তিবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল অথবা ভারতীয় সমাজের হৃদয়ে প্রথোতি উচ্চমার্গীয় দর্শন ব্রিটিশশাসনপর্ব অবধি নানাকারনে সুপ্ত অবস্থায় থেকে নূতন সংস্কৃতির স্পর্শে এসে আধুনিক রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। যাই হোক পশ্চিমীকরণ তত্ত্ব গ্রহণ ও বিশ্লেষণে একাধিক প্রশ্ন উথাপনের অবকাশ থাকলেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর (paradigm) ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভাবধারার মুখ্য ও প্রতিনিধি রূপে ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও জীবধারা ভারতীয় সমাজের অগ্রনী অংশের দ্বারা আদৃত হয়েছিল যার অবশ্যাম্ভাবী ফল হিসেবে ভারতীয় সমাজের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে।

## ১২.৭ সারাংশ

ভারতীয় সমাজ বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতকরণ, আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমীকরণের প্রভাবে ভারতবর্ষে জাত-পাত ভিত্তিক সামাজিক কাঠামো, সনাতন আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সংস্কৃত করণের প্রভাবে পুরোনো জাতি-ব্যবস্থায় শিথিলতা, আধুনিকীকরনের ফলে গোঁড়ামী বর্জন করে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ও পশ্চিমীকরণের ফলে সমাজের অগ্রণী অংশের মধ্যে পাশ্চাত্য মনস্কতা নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের সাবেকী ব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।

## ১২.৮ অনুশীলনী

১। ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতকরন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

২। আধুনিকীকরণের ফলে ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনের রূপটি নির্ণয় করুন।

৩। পাশ্চাত্য সমাজের সাথে সংস্পর্শের ফলে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করুন।

৪। পশ্চিমীকরন সম্পর্কে ভারতীয় চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।

৫। আধুনিকীকরণ সম্পর্কে ড্যানিয়েল লার্নার এর বক্তব্য আলোচনা করুন।

## ১২.৯ গ্রন্থপঞ্জী


১. Srinivas, M. N. : Social change in Modern India, 1987

২. Rudolph Lloyd, Hand Rudolph Sussane H: The Modernity of Tradition, 1967

৩. নীরাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, ১৯৮০।

৪. নির্মল কুমার বসু : হিন্দু সমাজের গড়ন, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

৫. Mandelbaum, David G. : Society in India, 1989

৬. Einsenstadt, S. N. : Modernisation Protest and Change, 1966

# একক ১৩ ❑ জনসংখ্যার বিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তন

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ জনসংখ্যা বিন্যাসের বিভিন্ন দিক ও সামাজিক পরিবর্তন

১৩.৩.১ জন্ম-মৃত্যু

১৩.৩.২ স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত

১৩.৩.৪ গ্রাম ও শহর অনুপাত ও অভিবাসন

১৩.৩.৫ অভিবাসন ও প্রবাসন

১৩.৪ সারাংশ

১৩.৫ অনুশীলনী

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

## ১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- জনসংখ্যান তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়?
- জনসংখ্যাবিন্যাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক
- ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে জনসংখ্যা বিন্যাসের ভূমিকা

## ১৩.২ প্রস্তাবনা

এই একক পাঠ করার সময় আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে কোনও সমাজই পরিবর্তনকারী উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। পরিবর্তন সময়ভেদে অনিবার্য এবং তার মধ্য দিয়েই একটি। সমাজ যুগোপযুগী হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক পরিবর্তন সমাজতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং সমাজতাত্ত্বিকগন অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি জনসংখ্যা বিন্যাসের বিশেষত্বকে সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সুতরাং জনসংখ্যার আয়তন ও বিন্যাস সমাজতত্ত্বে একটি বিচার্য বিষয় কারণ একটি সমাজের বাস্তব অবস্থার সাথে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন।

## ১৩.৩ জনসংখ্যা বিন্যাসের বিভিন্ন দিক ও সামাজিক পরিবর্তন

কোনও একটি সমাজের প্রগতি বা অগ্রতি জনসংখ্যার আয়তন ও তার বিন্যাসের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে জনসংখ্যার বিন্যাস বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বিন্যাসের বিশেষত্ব অধ্যায়নের বিষয়টি জনসংখ্যানতত্ত্বে (demography) আলোচিত হয়। এই তত্ত্ব প্রধানত সমাজে জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি (growth) অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর হার (birth-date ratio), ঘনত্ব (density), স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত (rural-urban ratio), পরিযান (migration), অভিবাসন-প্রবাসন (immigration/emigration) এবং বয়স ভিত্তিক অনুপাত (age-wise ratio) ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে। এছাড়া অঞ্চল ও জীবিকা ভিত্তিক বিন্যাস জনসংখ্যান তত্ত্বের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। বর্তমানে জনসংখ্যান তত্ত্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ এমিল ডুর্কহেইম্ একটি সমাজের জনসংখ্যার আয়তন ও ঘনত্বের উপর আলোকপাত করেছিলেন The Division of Labour in Society (১৮৯৩) গ্রন্থে তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে একটি সমাজের প্রকৃতি বা চরিত্র পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কিংসলে ডেভিস, ম্যালথাস প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ সমাজ ও অর্থনীতি বিশ্লেষণে জনসংখ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জনসংখ্যার আয়তন ও তার বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে টি.বি. বটোমোর যথার্থভাবে মন্তব্য করেছেন যে সামাজিক গঠন অনেকাংশে জনসংখ্যার বিশেষত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়। আলোচনার এই পর্বে আপনার সঠিক অনুধাবনের জন্য জনসংখ্যার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতটি উপস্থাপিত করা হবে।

### ১৩.৩.১ জন্ম-মৃত্যু

জনসংখ্যার তত্ত্ব অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যুর হার সামাজিক গঠনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। জন্মের হার যদি মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে একটি সমাজ পর্যাপ্ত মানবসম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ পায়। অপরদিকে তুলনায় মৃত্যু হার বেশী হলে সেই সমাজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার অত্যাধিক হ'লে স্বল্পসংখ্যক কাজের জন্য বহুসংখ্যক কর্মপ্রার্থীর উপস্থিতি জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করে তেমনি সমাজের ব্যবহার্য সম্পদের উপর তা অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করে। জীবনযাপনের ন্যূনতম বিষয়গুলি যেমন খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, পরিবহন, শিক্ষা, জীবিকা ও সর্বোপরি পরিবেশ ইত্যাদি জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এরফলে প্রাপ্ত সম্পদে ও চাহিদার মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান তৈরী হয়। স্বল্প সম্পদ করায়ও করার জন্য সমাজের অভ্যন্তরে শুরু হয় প্রতিযোগীতা যা ক্রমে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও অসামাজিক কার্যকলাপ বা অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়। অপরপক্ষে জন্ম ও মৃত্যুর হার ব্যবহার্য সম্পদের সাথে পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠলে জনসংখ্যার দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির সঠিক ব্যবহার সম্ভব হবে এবং স্বনির্ভর (self-reliant) সমাজ গড়ে উঠবে।

ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিশিয়ে জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি অপ্রতুল সেখানে জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সমাজে নানারকম সমস্যা সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই মৃত্যুর তুলনায় জন্মের হার ক্রমশ বাড়ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও জন্ম ও মৃত্যুহার-এর মধ্যে ব্যবধান ঘোচে নি। বিগত দুই বা তিন দশকের হিসেব অনুযায়ী। ১৯৭১-৮০-'র দশকে জন্মের

হার প্রতি হাজারে ৩৭.২ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১৫ শতাংশ ছিল। এবং ১৯৮১-৯০-এ হাজার প্রতি জন্মের হার ৩২.৫ শতাংশ এবং হার ১১.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ১৯৯৩-তে মধ্যবর্তী সমীক্ষা অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যুর হার যথাক্রমে ২৯ এবং ১০ শতাংশ। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য ভারতবর্ষে জনসংখ্যার বিশাল আয়তনের জন্য দায়ী। ধরে নেয়া যেতে পারে যে রক্ষণশীল মনোভাব এর জন্য ভারতীয় সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি যথাযথভাবে কার্যকর করা যায় নি, এর ফলে দেশের অসংখ্য মানুষ জীবন-ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত। Human Development Report 2000 অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার ৩৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। বেকারীসমস্যাও বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এ ধরনের 'জনবিস্ফোরণ' ভারতবর্ষে কয়েকদশক ধরে অব্যাহত। এর দরুন সামাজিক স্থিতীশীলতা সংকটাপন্ন। বেকারী, দারিদ্র, স্বাস্থ্যহীনতা, ও পরিবেশ সংকট সহ নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব জীবনধারণকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

### ১৩.৩.২ জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যার ঘনত্বের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক সমাজতাত্ত্বিকগন বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে বসবাসের মোট স্থানের অনুপাতে বসবাসকারী জনসংখ্যার আয়তন বোঝায়। নির্দিষ্টভাবে জনসংখ্যার ঘনত্বকে প্রতি বর্গকিলোমিটারের বসবাসকারী জনসংখ্যা গণনার দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

অঞ্চল বা এলাকা ভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্বে তারতম্য বিশ্বের প্রতিটি সমাজেই বর্তমান। একই রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে জনসংখ্যার ঘনত্বে আঞ্চলিক তারতম্য আছে। এই তারতম্যের পশ্চাতে একাধিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উপাদান সক্রিয়। মূলত অর্থনৈতিক কারণে একটি এলাকায় বা অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম বা বেশী হয়। কলকারখানা বা শিল্পের বিকাশের ফলে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান বা জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ, ন্যূনতম ব্যয়ে জীবন যাপনের সুবিধা ইত্যাদি জনসংখ্যার জন্য দায়ী। এছাড়া অন্যান্য কারণ যেমন গোষ্ঠী, জাতি, রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক বসবাসের প্রবণতা, শিক্ষার সুযোগ ও যৌথ পরিবার ঘনত্ববৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে স্বল্পস্থানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। এরফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সহ সমাজের সব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ সমাজের সনাতন শ্রম বিভাজন ব্যবস্থাকে (division of labour) নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন আনে। প্রাচীন রীতিনীতি বিলুপ্ত হয় কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত মানুষ একত্রে বাস করার ফলে আন্ত-ব্যক্তি সম্পর্ক, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, এবং সম্প্রদায়, জাত-পাত ও শ্রেণী কেন্দ্রীক সম্পর্কে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। ধীরে ধীরে নুতন সংস্কৃতি ও ভাবধারা সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দিতে উদ্যত হয়। ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে এবং প্রচুর জনসমাগমের ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে গতির সঞ্চার করে এবং এলাকাটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে তদুপরি বিস্তীর্ণ এলাকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার পথে নগরায়ণের পথ প্রশস্ত হয়। এর ফল হিসেবে সামাজিকক্ষেত্রে পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সমাজে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন সমস্যা যেমন বেকারী, দারিদ্র, বস্তি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদির সৃষ্টি হয় ও জীবনধারণের ন্যূনতম সামগ্রী যেমন খাদ্য, পানীয় জল, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির যোগান অপ্রতুল হয়ে পড়ে। সুতরাং, জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির হারের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে যে সর্বভারতীয় হিসেবে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে ২৭৪ জন বাস করে। কিন্তু শহরাঞ্চলে বিশেষ করে মহানগরগুলিতে ঘনত্বের পরিমান অনেক বেশী যা গ্রাম থেকে আসা অসংখ্য মানুষের পরিমানের (migration) ফলে ঘটেছে। ফলে জনসংখ্যার অসম (uneven) বন্টন দেখা যায়। ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে তা কল্যাণকর হয়ে ওঠে নি। নগরে অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ এবং গ্রামাঞ্চলেও কর্মের সুযোগের অপ্রতুলতা সামাজিক অগ্রগতিকে কোনোভাবেই সুনিশ্চিত করতে পারে নি। বসবাসের স্থান (space) অনুপাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হওয়ার ফলে অনেক সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে সামাজিক সংহতিকে (social cohesion) নষ্ট করেছে।

## ১৩.৩.৩ স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত

জনসংখ্যার বিনাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্ত্রী-পুরুষ সংখ্যার আনুপাতিক আয়তন সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আপনার এ প্রসঙ্গে অবহিত থাকা প্রয়োজন যে সমাজের পিতৃতান্ত্রিক চরিত্র পুরুষ সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়। তথাপি নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য অথবা বিপরীত প্রক্রিয়া নারী-পুরুষের অনুপাতে ব্যাপক পরিবর্তন হ'লে একটি সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সংখ্যাগত অনুপাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন সামাজিক মুক্তির পুনর্বিন্যাসকে ত্বরান্বিত করে।

জনসংখ্যান তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে একটি সমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের জন্মহার কম না হ'লে শুধু নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবীর শক্তিশালী হয়। সন্তান লালন-পালন সহ পারিবারিক অন্দরমহলের ঘেরাটোপ পেরিয়ে নারীসমাজ সমাজের বৃহত্তর জগতে প্রবেশাধিকার অর্জন করে।

বর্তমানে নারীমর্যাদা ও বিকাশের মান একটি সমাজের অগ্রগতির সূচক হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। নারীবিকাশের চেতনা উর্দ্ধগামী হওয়ায় নারী এখন আর পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং সন্তান-ধারণ শরীরের উপর নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন নারীকে আত্মসচেতন ও মর্যাদা পূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে সাহায্য করেছে। সমাজে নারী অধিকারের এহেন পরিবর্তন তর্কাতীতভাবে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। অতএব নারীমর্যাদার এই ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন নারী-পুরুষের সম্পর্কে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে।

নারী-পুরুষের মধ্যে সংখ্যাগত ভারসাম্য বজায় রাখা সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উৎপাদন ব্যবস্থার চাপে কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তাণের জন্ম অধিক কাম্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছ। সেই দিন লক্ষ্য রেখে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে স্ত্রী-ভ্রূণ হত্যার ঘটনা ব্যাপক আকার ধারণ করে যার প্রাভাবে জনসংখ্যায় নারীর সংখ্যা হ্রাসের আশংকা দেখা যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য স্ত্রী-ভ্রূণ হত্যা বেআইনি হিসেবে ঘোষিত হয়। সুতরাং আশা করা যায় যে স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না এবং সমাজে নারী-পুরুষের সংখ্যাগত ভারসাম্য বজায় থাকবে, অতএব, সামাজিক শক্তি হিসেবে নারীর আত্মপ্রকাশ তার সংখ্যাগত শক্তির উপরও নির্ভরশীল যা যথার্থভাবে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় গৃহীত।

রাষ্ট্রসংঘের একটি হিসেব অনুযায়ী (১৯৯৪) ভারতবর্ষের জনসংখ্যায় স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতে প্রায় সমান। অর্থাৎ সংখ্যার বিচারে নারী পুরুষের থেকে পিছিয়ে নেই বললেই চলে। কিন্তু জনসংখ্যার আয়তনে নারীর সংখ্যা উপেক্ষণীয়

হ'লেও চাকুরী ও বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার নারীর স্থান গৌণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে কর্মসংক্রান্ত ক্ষেত্রে ১৯৯১-৯৩-এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী নারীর সরকারী বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এছাড়া ১৯৯১-এর লোকগণনা অনুযায়ী স্বাক্ষরতার হার পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৪ এবং ৩৯ শতাংশ। Human Development Report 2000 অনুযায়ী যা যথাক্রমে ৬৫ এবং ৪৩.৫ শতাংশ। সংসদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে কারণ লোকসভার মোট ৫৪৪ টি আসনের মধ্যে ১৯৯১ এ নারী ৫.৩ শতাংশ আসনে প্রতিনিধিত্ব করেছিল যা বর্তমানে ৮.৯ শতাংশ। সুতরাং নারীর সংখ্যাগত আয়তন ভারতবর্ষে সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় নি। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ফলে নারীর স্থান আগের তুলনায় অনেকটাই উন্নত কারণ শিক্ষা, চাকরী ও বিভিন্ন প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানে নারীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যাগত দিক থেকেও নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পাওয়ার ফলে নারী অধিকারের অনেক দাবীই যে অচিরে অর্জিত হবে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

## ১৩.৩.৪ গ্রাম-শহরে অনুপাত ও অভিবাসন [Rural-Urban Ratio and Migration]

গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাতিক পার্থক্য একটি সমাজের পরিচয় বহন করে। নানা কারণে গ্রামের তুলনায় শহরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। গ্রাম থেকে আগত মানুষ শহরে ভিড় করে প্রধানত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। গ্রামজীবনে নিত্যনৈমিত্তিক চাহিদার অপূর্ণতা, কৃষিকাজ ব্যাতীত অন্যান্য উপযুক্ত জীবিকা ও বৃত্তির অভাব, নগরজীবনের গতিময়তার প্রতি আকর্ষণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ নগরকে বেশী সংখ্যক মানুষের বাসস্থানে পরিণত করে। এছাড়া গ্রামীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ও ভাঙ্গন এবং সাম্প্রদায়িক, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত বিরোধের দরুন নিরাপত্তাহীনতা ও অন্যান্য স্থানীয় সমস্যা মানুষকে গ্রাম থেকে শহরে আসতে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং একাধিক কারণে গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা স্ফীত হয়।

নগরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে নগরায়ন (urbanisation) বলা হয়। নগরায়নের মূলে আছে অসংখ্য মানুষের গ্রামজীবন থেকে নগরজীবনে প্রবেশের ঈপ্সা। এই গ্রামীন জীবন থেকে নগরজীবনে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অভিবাসন (migration) বলা হয়। আধুনিক কালে শিল্প, প্রশাসন, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গ্রামের তুলনায় গুরুত্ব অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরকেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। এই প্রক্রিয়া সব সময়েই বিভিন্ন মাত্রায় অব্যাহত থাকে। মোটামুটিভাবে এটা স্বীকৃত যে সামন্ত্রতন্ত্রের অবসানের পর থেকে আধুনিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নগরকেন্দ্র গুলির আবির্ভাবের দরুন গ্রামের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। আধুনিক শিল্পোন্নত ও শিল্পে অনুন্নত এই দুই প্রকার সমাজেই গ্রাম ও নগরের মধ্যে জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাস লক্ষনীয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিস্ফুট যে গ্রাম ও নগরজীবনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে যা সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। গ্রামের তুলনায় নগরে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। নগরের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে Lewis Wirth বলেছেন যে.....'it is the initiating and controlling centre of economic, political and cultural life that has drawn the most remote countries of the world into its orbit and woven diverse areas, people and activities into a cosmos.'

সমাজতন্ত্রের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্র ধরে নগরজীবনের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, গ্রামে তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শহরাঞ্চলে মানুষের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গী, বেশভূষা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ সামগ্রিক ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়ত, নগরে জনসমাগমের ফলে

ব্যক্তিগত সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা হ্রাস পায় এবং পরোক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্কৃতি ও পেশাগত পার্থক্য থাকায় তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না এর ফলে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (social control) বাঁধন কঠোরতা থেকে মুক্ত। জনসংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি ব্যাহত হয়। তৃতীয়ত, নগরকেন্দ্রীক জীবনধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লো পেশা বা বৃত্তির (occupation) ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বা বিশেষীকরণ (diversification specialisation)। গ্রামীন সমাজে কৃষিকে কেন্দ্র করে বৃত্তিসমূহ (occupations) গড়ে উঠে। কিন্তু অন্যদিকে শহরাঞ্চলে কৃষির পরিবর্ত্তে শিল্প ও প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য যে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে বৃত্তির বৈচিত্র্যকরণ ও বিশেষীকরণ ঘটে কারণ প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতি বিভিন্ন রকম দক্ষতা ভিত্তিক বৃত্তির (skilled job) জন্ম দেয়। চতুর্থত, নগরজীবনে পরোক্ষ সম্পর্ক ও বৃত্তিতে দক্ষতা ভিত্তিক বিশেষীকরণের ফলে ব্যক্তিতে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটে। গ্রামীণ জীবনে ঈর্ষা ও বিরোধ সাধারণত সীমিত ও ব্যক্তি স্বার্থ কেন্দ্রীক। তুলনায় শহরাঞ্চলে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও বিরোধ জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। পঞ্চমত, গ্রামের তুলনায় নগরে জনসংখ্যার স্ফীতি বহুবিধ সমস্যার জন্ম দেয়। নগরে ব্যাপক জনসমাগমের দরুণ ঘনবসতির সৃষ্টি, নগরের আর্থিক ব্যবস্থা, পরিকাঠামো, নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি বিপর্যস্ত করে। বিশেষ করে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে নগরকেন্দ্রগুলি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি বিপর্যস্ত করে। বিশেষ করে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে নগরকেন্দ্রগুলি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের বসবাসের স্থান হিসেবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত এলাকা অন্যদিকে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যহীন বস্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া আশ্রয়হীন ভবঘুরে ও ছিন্নমুল মানুষ ফুটপাথ, রেলস্টেশন প্রভৃতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। এতে যে শুধু পরিবেশ দূষিত হয় তা নয় দারিদ্র্য, অশিক্ষা অজ্ঞতা মানুষকে বিভিন্ন অপরাধমূলক ও অসামাজিক কর্মে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পরিবর্তনের রেখা অগ্রগতির পরিচায়ক হ'লেও অনেক সময় তা অধোগতির পথে ধাবিত হয়। স্বভাবতই নগরায়নের ফলে গ্রামের তুলনায় নগরজীবনে কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। নগরগুলি আধুনিক চিন্তা, প্রযুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পীঠস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপক প্রচলন, পেশাভিত্তিক সংগঠন ও গণমাধ্যমগুলির ব্যাপক উপস্থিতির ফলে পুরনো আনুগত্য ও বন্ধন (primordial loyalties and bondage) বিলুপ্ত হয়। নতুন আধুনিক প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাধারার উন্মেষ অধিকার সচেতন ও প্রতিবাদমুখর সমাজ গড়ে তোলে। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরিবর্তে মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের বিরোধীতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। অন্যভাবে বলা যায় যে পৌর সমাজের (civil society) উৎপত্তি ও বিকাশ নগর সমাজের অভ্যন্তরে ঘটে? সুতরাং নগরে জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধি সামাজিক পতিরবর্তনকে যে ত্বরান্বিত করে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ভারতবর্ষেও গ্রাম-নগরের মধ্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক ব্যবধান সমাজ জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে জনসংখ্যার মাত্র ২৫.৭৩ শতাংশ নগরে বসবাস করলেও যা Human Development Report 2000, অনুযায়ী ২৭.৭ শতাংশ হলে মহানগরগুলিতে জনসংখ্যার আয়তনে অত্যাধিক স্ফীতি জনসংখ্যা বিন্যাসে ভারসাম্যের অভাব প্রমাণ করে। তাছাড়া ভারতবর্ষ গ্রামভিত্তিক দেশ হলেও সেখানে কর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অপ্রতুলতা সামাজিক অগ্রগতির পরিচায়ক নয়। তারফলে গ্রাম হয়ে পড়ে নগরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নগরেও উদ্বৃত্ত পরিষেবার ব্যবস্থা না থাকায় পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। সাধারণ প্রয়োজনেও নগরের উপর নির্ভরশীলতা

গ্রামীন সমাজকে লক্ষ্যহীন করে তোলে। গ্রামীণ সমাজ বিভিন্ন মাধ্যম বিশেষ করে প্রচারমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে নগর-সংস্কৃতি ও আদব-কায়দা অনুকরণ করে। এর পাশাপাশি গ্রামীন জীবনে রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ব্যাপক উপস্থিতি গ্রামের মানুষদের অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন করে তুলেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে গ্রাম-নগর এর জনসংখ্যা আনুপাতিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে নগরায়নের হার আগের তুলনায় কমে এলেও জনসংখ্যার ভারসাম্যের অভাব ও গ্রামগুলির শহরের উপর নির্ভরশীলতা অগ্রগতিমূলক সামাজিক পরিবর্তনের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

## ১৩.৩.৫ অভিবাসন ও প্রবাসন (Immigration and Emigration)

অভিবাসন ও প্রবাসন বিভিন্ন সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে এবং আধুনিককালেও কোনো সমাজেই এই প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। অর্থাৎ সব সমাজেই কমবেশী আগমন ও বহির্গমন সংঘটিত হয়। বলাই বাহুল্য যে এর ফলে সমাজে সচলতা সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন কারণে অভিবাসন ও প্রবাসন প্রক্রিয়া দুটি সংঘটিত হয়। এরমধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ সমূহ অন্যান্যদের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক কারণ-সমূহ যেমন আত্মীয়তার বন্ধন, গোষ্ঠীজীবন, শিক্ষার সুযোগ, পরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবনের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা অভিবাসন ও প্রবাসনের জন্য দায়ী।

এ প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক কারণসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা প্রয়োজন। প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে অর্থনৈতিক কারণে অভিবাসন ও প্রবাসন ঘটেছে। দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকা অর্জনের সুযোগ, শিক্ষা ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা অভিবাসন ও প্রবাসনের প্রবণতা বৃদ্ধি করে। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অশান্তি, সামগ্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যালীলা এর জন্য দায়ী, অর্থনৈতিক কারণে পক্ষে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ব্রিটিশযুগে ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে ব্রিটিশগন দক্ষিণ আমেরিকায় বিশেষ করে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ যেমন মরিশাস, ফিজি প্রভৃতি দেশে শিল্প ও উৎপাদনের স্বার্থে ব্যাপক সংখ্যক ভারতীয় শ্রমিককে (indentured labour) রপ্তানী করে। তারপর থেকে অসংখ্য ভারতীয় ভিটেমাটি থেকে উৎপাটিত হ'য়ে বংশপরম্পরায় সেইসব দেশে প্রবাসী ভারতীয় হিসেব থেকে যায়। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, কানাডা ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে উচ্চশিক্ষা ও উচ্চস্তরের পেশার সন্ধানে দেশত্যাগ প্রবাসন পক্রিয়াকে অব্যাহত রেখেছে। এ ধরনের দেশান্তরী প্রবণতাকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় 'মেধা নির্গমন' (brain drain) বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা ও দেশভাগ এবং ১৯৭১ এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাহানির ফলে পূর্ববাংলা থেকে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হিসেবে থেকে যায়। এ ধরনের ঘটনাবলী সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অতএব অভিবাসন ও প্রবাসনের ফলে সামাজিক গোষ্ঠী সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে পুনর্বিন্যাস ঘটে যার প্রতিফলন সমাজের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রায়শই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে ভারতবর্ষে অভিবাসন ও প্রবাসন উভয়ই বর্তমান এবং অনেক সময় এর ফলে সুদূরপ্রসারী হয়। এছাড়া আরো কিছু জনসংখ্যাগত উপাদান ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। এর মধ্যে বয়স ভিত্তিক (age-group) অনুপাত ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে স্বাক্ষরতার হার (literary)

উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে স্বাক্ষরতার হার ৫২ শতাংশের সামান্য বেশী এবং আগামী বৎসরগুলিতে শিশু ও বৃদ্ধদের তুলনায় শারীরিক সক্ষম ব্যক্তিদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তার পাশাপাশি সেই মানব সম্পদকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারলে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জনসংখ্যার আয়তনকে সঠিক পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করতে না পারলে সামাজিক পরিবর্তনের রেখা নিম্নগামী হবে।

## ১৩.৪ সারাংশ

জনসংখ্যাগত উপাদান সমূহের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক অনস্বীকার্য। জনসংখ্যার আয়তন ও তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যায় জন্ম ও মৃত্যুর হার, স্ত্রী ও পুরুষ অনুপাত গ্রাম ও নগর অনুপাত ঘনত্ব, বয়সের অনুপাত ও স্বাক্ষরতার হার ইত্যাদি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান ও অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক ও কার্যকলাপে পরিবর্তন। অতএব সমাজ পরিবর্তনের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধানে জনসংখ্যা বিন্যাসের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

## ১৩.৫ অনুশীলনী

১। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে জনসংখ্যা বিন্যাসের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

২। ভারতবর্ষের মতো দেশে জনসংখ্যার বিপুল স্ফীতি সামাজিক পরিবর্তনকে।

৩। ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্তনে জনসংখ্যায় স্ত্রী-পুরুষ ও গ্রাম-শহর অনুপাতের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪। ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে জনসংখ্যায় জন্ম-মৃত্যুর হার ও ঘনত্বের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

## ১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী


১. Bottomore, T.B.: Sociology, 1975

২. MacIver, R.M. and Page, C.H. : Society, 1964

৩. Davis Kingsley : Human Society, 1966.

৪. Aggarwal, J.C. : Human Development in India Science Independence, 1996.

৫. Aggarwal, J.C. : Human Development in India Since Independence, 1996.

৬. Sri Nivasan, K. : Ragulating Reproduction in India's Population, 1995.

# একক ১৪ ❑ সামাজিক আন্দোলন ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও লিঙ্গ বৈষম্য

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ পরিবেশবাদী সামাজিক আন্দোলন ও সমাজ পরিবর্তন

১৪.৩.১ সামাজিক পরিবর্তনে পরিবেশবাদী আন্দোলনের গুরুত্ব ও সমাজতত্ত্বে পরিবেশ পরিবেশচিন্তা

১৪.৩.২ পরিবেশ সংকটের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ

১৪.৩.৩ পরিবেশ সংকটের পুঁজিবাদী বিশেষণ

১৪.৩.৪ পরিবেশ সংকট সম্পর্কে বিশ্বব্যপী চেতনার উন্মেষ

১৪.৩.৫ ভারতবর্ষে পরিবেশ সংকট ও সামাজিক আন্দোলন

১৪.৪ লিঙ্গবৈষম্য ও সামাজিক আন্দোলন

১৪.৪.১ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব

১৪.৪.২ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের পটভূমি

১৪.৪.৩ প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষে লিঙ্গবৈষম্য আন্দোলন

১৪.৪.৪ স্বাধীনোত্তোর পর্যায়ে লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন

১৪.৫ সারাংশ

১৪.৬ অনুশীলনী

১৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

## ১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- সামাজিক আন্দোলন ও সমাজ পরিবর্তনের সম্পর্ক
- সমাজ পরিবর্তনে পরিবেশবাদী ও লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকা
- ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে পরিবেশবাদী ও ভূমিকা লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ধারা

## ১৪.২ প্রস্তাবনা

এই একক অধ্যয়নের দ্বারা আপনি জানতে সক্ষম হবেন যে কিভাবে সামাজিক আন্দোলন একটি সমাজের গর্ভে জন্ম নেয়। একথা স্বীকৃত যে বৃহত্তর বা সামগ্রিক কল্যানে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী, প্রথা ও কার্যাবলী সমূহকে বর্জন করে পূর্বকৃত ভুলসংশোধনে সমাজের অভ্যন্তরে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করা সামাজিক আন্দোলন সমূহের মূখ্য উদ্দেশ্য। তাই সমাজ পরিবর্তনকামী সামাজিক আন্দোলনসমূহ ন্যায্যতই সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় যা ব্যাতীত সামাজিক পরিবর্তনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়। অতএব সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি, গতিপ্রকৃতি ও সমাজের উপর তার প্রভাব সমাজতত্ত্বে একটি অবশ্য বিচার্য বিষয় যা এই এককে পরিবেশ সমস্যা ও লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়দুটি কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে।

## ১৪.৩ পরিবেশবাদী সামাজিক আন্দোলন ও সমাজ পরিবর্তন

সামাজিক আন্দোলন নানারকম বৈষম্য, বঞ্চনা ও সামাজিক বিরোধের পরিণতি হিসেবে সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য এই ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠে। সামাজিক আন্দোলন সামাজিক বিচ্যুতি সমূহ সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমষ্টিগত প্রয়াস (collective Action) হিসেবে সংঘটিত হয়। অতএব, সামাজিক আন্দোলন হ'লো সেই ধরণের সমষ্টিগত সামাজিক প্রচেষ্টা যা কিছু গুরুতর ব্যাধি সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য পয়াসী হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এ ধরনের সমষ্টিগত প্রয়াস আকস্মিক বা সাময়িক নয় বরং তা দীর্ঘকাল ধরে ধারাবহিকভাবে বজায় থাকে।

### ১৪.৩.১ সামাজিক পরিবর্তনে পরিবেশবাদী আন্দোলনের গুরুত্ব ও সমাজতত্ত্বে পরিবেশচিন্তা

সাম্প্রতিক কালে সামাজিক সমস্যাবলীর গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করে সমাজতাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে চিরাচরিত বিষয়গুলি ছাড়াও প্রায় প্রত্যেকটি সমাজেই কিছু মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন। দীর্ঘকাল ধরে অনালোচিত এই সমস্যাবলী সুপ্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ পাদপ্রদীপের সামনে এসে আধুনিক সমাজকে কিছু গুরুতর প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

সম্প্রতি তাই সমাজ, মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানবসভ্যতা গড়ে ওঠার পথে নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস মানবসমাজের পক্ষে বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত শতাব্দীর শেষ অধ্যায় থেকে পরিবেশ সংকট থেকে পরিত্রানের জন্য তৃতীয় বিশ্বসহ সমগ্র বিশ্বসমাজ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়ে আসছে। তাই বিগত দুই বা তিন দশকে সমাজতত্ত্বের ভাষায় 'পরিবেশ সচেতনতা যুগ' বলে অভিহিত করলে তা অত্যুক্তি হয় না।

পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর গুরুত্ব সমাজবিজ্ঞানের (Social Sciences) চর্চায় স্বীকৃত হ'লেও পৃথকভাবে সমাজতত্ত্বে এই আলোচনার স্থান নিরূপণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মূল প্রয়োজন হ'লো মানব জগতের এর সাথে প্রাকৃতিক জগৎ এর অচ্ছেদ্য বন্ধন-এর প্রায় বিস্মৃত বিষয়টিকে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার অঙ্গনে স্থাপন করা। চিরাচরিত বিষয়গুলি ছাড়াও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মানবজগৎ ও প্রাকৃতিক জগৎ এর সম্পর্কের পূর্ণমূল্যায়ন অপরিহার্য। কারণ প্রকৃতি থেকে আহৃত সম্পদ বন্টনও ভোগ এ সামাজিক শৃঙ্খলার অভাব প্রাকৃতিক জগৎ এর

ভারসাম্য ক্রমশ নষ্ট করে কি ভাবে মানব সমাজকে গভীর সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তার অনুসন্ধান থেকে সমাজতত্ত্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না।

পরিবেশ সংকট সম্পর্কে সমাজতত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ প্রধানতঃ নগরসমাজতত্ত্বে আলোচিত হয়েছে। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি কেন্দ্র হিসেবে আধুনিক নগরের উত্থান যে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে তা নগর সমাজতত্ত্বের (Urban Sociology) অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে প্রখ্যাত নগর সমাজতাত্ত্বিক লুই মামফোর্ড নগর বিকাশের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের বিষয়টি বিভিন্ন প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছেন। উদ্ভিদ ও জলাশয় নষ্ট করে কলকারখানা, বহুতল অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ অসংখ্য মানুষের জীবিকা ও বসবাসের ব্যবস্থা করলেও প্রকৃতপক্ষে নগরবাসীকে বিপন্ন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সুতরাং পরিবেশ সংকটের মাত্রা নগরে বহুগুণ বেশী, যার সূত্রপাত হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার না দিয়ে নগরকে শুধুই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্র (foci) হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার মধ্যে। অতএব সমাজতত্ত্বে পরিবেশবাদী চর্চা নগরসমাজতত্ত্বে উপস্থাপিত হয়েছে এবং নগর এই আলোচনার ধারণাগত ক্ষেত্রে (conceptual boundary) হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীকালে পরিবেশ সংকট নগর ছাড়িয়ে অন্যান্য অঞ্চলে ঘনীভূত হয়েছে এবং তার ফলে পরিবেশতত্ত্বকে সামগ্রিকভাবে সামাজিক আন্দোলন আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

## ১৪.৩.২ পরিবেশসংকটের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ

সভ্যতার অগ্রগতির পথে যুগপৎভাবে পরিবেশ ধ্বংস ও প্রকৃতিকে মানবিক চাহিদার বশীভূত করা যে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর তা মার্ক্সবাদী সমাজভাবনায় আলোচিত হয়েছে। এঙ্গেল্‌স্ তাঁর 'Dialectics of Nature এবং মার্ক্স তাঁর Capital গ্রন্থে মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণে মন্তব্য করেছেন যে পুঁজিবাদের (capitalism) ক্রমবিকাশ প্রাকৃতির ভারসাম্য নষ্টের জন্য দায়ী। প্রকৃতিকে মানব হিতৈষণার প্রেক্ষিতে বিচার করার পরিবর্তে যথেচ্ছ মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করায় নির্বিচারে শিল্পবিস্তার। নগরায়ন ও জনবিস্ফোরন প্রভৃতি সমাজবিকাশের সুস্থ ও স্বাভাবিক ধারাকে ব্যহত করেছে। আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাদ প্রকৃতি থেকে লভ্য সম্পদকে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে লুণ্ঠন করেছে। শিল্পবিকাশের নামে এহেন দস্যুতা মানবসমাজকে এক গভীর সংকটেই নিমিজ্জিত করেছে। এ বিষয়ে Gus Hall মন্তব্য করেছেন "The main impulse of our social system is the question of profit. The result is unplanned anarchic production which allows the pollution and indiscriminate plunder of our natural resources".

প্রকৃতির উপর আক্রমণ বিগত কয়েকশতাব্দী ধরে অব্যাহত। পুঁজিবাদ বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ে অনগ্রসর অঞ্চল ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে পরাভূত করে আর্থিক শক্তিতে বলীয়ান শ্রেণী প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে করায়ত্ত করে ও তার উপর ব্যক্তিগত অধিকারকে বৈধবলে প্রতিষ্ঠা করে। উৎপাদিকা শক্তির উত্তরোত্তর বিকাশ ও বাজার অর্থনীতির বিশ্বায়ন অনুন্নত ও প্রযুক্তিতে পশ্চাৎপদ সমাজগুলিকে ভোক্তাতে (consumer) পরিণত করেছে। এঙ্গলস্ তাঁর 'Dialectics of Nature' গ্রন্থে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে শ্রমের ব্যবহারের কথা বলেছেন। তাঁর মতে অভীষ্ট পূরণের জন্য শ্রমই মানুষের প্রধান হাতিয়ার। প্রযুক্তিভিত্তিক শ্রমপ্রয়োগের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে প্রকৃতিতে সংরক্ষিত সম্পদ এর উপর যা দ্রুতগতিতে নিঃশেষিত হওয়ার পথে। অতএব শ্রম ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ আজ প্রয়োজন মিটিয়েছে বলে মনে হ'লেও সমাজের দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় নি। মানুষ ও

প্রকৃতির সম্পর্কের এই বিকৃতি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অন্বেষনে উপযোগীতাবাদকে (Utilitarianism) ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এর ফলে অপ্রতিহতভাবে পুঁজিবাদী আগ্রাসন প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ধ্বংস করেছে। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সভ্য জগতের বা শিল্পোন্নত দেশগুলি সমগ্র বিশ্বে বৃক্ষ ও জীবজগৎকে ধারাবহিকভাবে ধ্বংস করে আসছে। এর ফলে পরিবেশ দূষনের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা ক্রমশ বিলীয়মান।

## ১৪.৩.৩ পরিবেশ সংকটের পুঁজিবাদী বিশ্লেষন

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও ভারসাম্যকে অপরিমেয় হিসেবে গণ্য করে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিঃসন্দেহে প্রকৃতির দান থেকে বঞ্চিত হবে। আসন্ন বিপর্যয় থেকে সমাজকে উদ্ধার করতে প্রকৃতিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে পুঁজিবাদী মতাদর্শেও নানারকম বিশ্লেষণের অবতারণা করা হয়েছে। এই চিন্তাধারায় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রকৃতিকে নির্বিচারে লুণ্ঠন করা প্রসঙ্গটি উল্লেখ না করে পরিবেশ দূষণকে শিল্পায়নে ব্যবহৃত প্রযুক্তির সমস্যা বলে ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত সমস্যা নিতান্তই শিল্পায়ন ও প্রযুক্তি জনিত সমস্যা। অর্থাৎ এই সংকট ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই কম-বেশী বর্তমান। শ্রেণীবৈষম্যযুক্ত ও শ্রেণীহীন সমাজের পরিবেশ দূষণ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত শিল্পায়ন, আধুনিক প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার, দূষণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ সংকট দূর করতে আগ্রহী। ফলত, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন (Sustainable Development) ও যান-বাহনের ক্ষেত্রে ইউরো-টু বিধি প্রয়োগ, কলকারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থ নির্গমনের প্রতিরোধের ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের কথা প্রচার করে। সুতরাং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত এই দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুচ্চারিত।

## ১৪.৩.৪ পরিবেশ সংকট সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী চেতনার উন্মেষ

সমাজের সাথে প্রাকৃতিক সম্পর্ক নিরূপনে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার সূত্রপাত সাম্প্রতিককালে হয়েছে। প্রকৃতি ও মানবসমাজ যে অবিচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ এবং মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্যই যে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সমাজ-সচেতনতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জার্মান চিন্তাবিদ এর্নস্ট হেকেল ‘পরিবেশবিদ্যা’ (Ecology) নামে স্বতন্ত্র বিষয়ের অবতারনা করেন। প্রকৃতির উপর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বহুদিন আগে থেকে সংঘটিত হলেও সামাজিক প্রতিরোধ অনেক পরে সংঘটিত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিরোধ কখনো রাজনৈতিক সংগ্রাম কখনও বা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রায় সব অগ্রসর ও অনগ্রসর সমাজে পরিবেশ রক্ষার পক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সমাজের সচেতন ও সংবেদনশীল মানুষ পরিবেশ রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। পরিবেশ সংকটের বিভিন্ন দিক যেমন বায়ুদূষণ, জলদূষণ, তাপমাত্রাবৃদ্ধি, ওজন স্তরের ক্রমশ হ্রাস, বনাঞ্চল ধ্বংস, জলাশয় ও ক্রমহ্রাসমান খোলা জায়গা ইত্যাদি সম্পর্কে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করার প্রয়াস অতীতের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতালী, জাপান, জার্মানী, ভারত ও অন্যান্য দেশের অনেক দেশে পরিবেশ দূষণ ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ১৯৭৩ এ জাপানে জল দূষণের জন্য রাসায়নিক কারখানাগুলির বিরুদ্ধে মৎস্যজীবিদের আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতে সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে চিপ্‌কো আন্দোলন মেধা পাটকর ও তাঁর সংগঠন দ্বারা পরিচালিত ‘নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন’ ইত্যাদি বিগত ও বর্তমান দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়া আরো কিছু আন্দোলন আঞ্চলিক

স্তরে সংঘটিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বনাঞ্চল, জীবজগৎ, জলাশয় প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয় স্তর থেকে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

পরিবেশ সচনেতা ও সংরক্ষণমুখী আন্দোলন বিগত কয়েকদশক ধরে গড়ে উঠেছে। গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তর এর দশক থেকে পরিবেশবাদী সামাজিক আন্দোলন (Green Movement) শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে ব্রায়ান টোকার (Brian Toker) লক্ষ্য করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমীদেশসমূহে সবুজ আন্দোলন (Green Movement) সেই সব দেশে ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন থেকে জন্ম নিয়েছে। ১৯৭০ এর দশকে সমগ্র বিশ্বে জ্বালানী সংকট সম্পর্কে গণপ্রতিক্রিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্টার প্রশাসনের Global 2000 Report, Ecologist (১৯৭২) এবং Brundtland Report এর Our Common future (১৯৭৮) ইত্যাদি রচনায় পরিবেশ দূষণের মাত্রা সম্পর্কে আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে। ১৯৭০-৮০'র শেষভাগে পরিবেশবাদী (Green parties) এর উদ্ভব হয়েছিল এবং ক্রমশ পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যবান রচনা ও গ্রীণ অর্থাৎ সবুজ সংঘটনসমূহ (Green Organisations) গড়ে উঠেছে।

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনার উন্মেষ ইউরোপীয় জ্ঞানবিপ্লবের (Englishtenment) ঐতিহ্যের অনুসারী নয় বরং পাশ্চাত্যে জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক আধুনিকতার পাশাপাশি পরিবেশবাদী চিন্তাধারা পৃথকভাবে গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে সমাজ গবেষকগণ প্রায়শই লক্ষ্য করেছেন যে নির্বিচারে শিল্পায়নের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সমাজের প্রতিবাদী অংশ। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সমাজসেবী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ পরিবেশ দূষণের সংকট সম্পর্কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করে, প্রাকৃতিক সম্পদকে বাঁচিয়ে রেখে শিল্পায়নের গতিকে ধীর লয়ে পরিচালিত করলে সুস্থ জীবনযাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

## ১৪.৩.৫ ভারতবর্ষে পরিবেশসংকট ও সামাজিক আন্দোলন

ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর আক্রমণ ঔপনিবেশিক যুগ থেকে অব্যাহত। সাম্প্রতিককালে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ও সেগুলির রূপায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সমূহ পর্যালোচনা প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের সহায়ক। নর্মদা সাগর ও সর্দার সরোবর প্রকল্পদুটি মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে সেচের জল যোগান ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু এই প্রকল্পদুটি রূপায়িত হ'লে একটি হিসেব মত ১৯৮১-এর লোকগণনা অনুযায়ী ২ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ উচ্ছেদ হবে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের উচ্ছেদ হওয়ার মূল্য সেচব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে অগ্রগতির কথা ভাবা হয়েছিল তা ভিত্তিহীন, এর বিরুদ্ধে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' সংঘটন তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এছাড়া ম্যাঙ্গালোরে প্রস্তাবিত ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি এ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস কারাখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে ফিশার নেম্‌স্ এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন কমিটি ১৯৯৫—এ আন্দোলন শুরু করে। কর্নাটকে পরিবেশ রক্ষার জন্য এই আন্দোলনে Indian Institute of Science এর পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ, শিক্ষক, নাগরিক অধিকার রক্ষাকর্মী প্রমুখ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহ করেন। 'নর্মাদা বাঁচাও আন্দোলন', ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, চিল্কা হ্রদে দূষণ বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলন বর্তমান জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং অসংখ্য শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সমাজসেবী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যোগদান করে শক্তিশালী অরাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অন্যান্য আরো তীব্র আন্দোলন শুরু করে এবং ডুপন্ট কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প ত্যাগ করতে বাধ্য করে। পশ্চিমবঙ্গে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স থেকে নির্গত অশোধিত কোল গ্যাস ও বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ ঐ এলাকাকে দূষিত করেছে যার বিরুদ্ধে 'ডানকুনি দূষণ বিরোধী মঞ্চ' গড়ে উঠেছে। মৎস্যজীবি সমিতি,

বিজ্ঞান চক্র এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও গণসংগঠনের সদস্যগন জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করতে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিরল নয়। শিল্পায়নের সাথে তাই অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে পরিবেশদূষণ ও পরিবেশ সরক্ষণের বিষয়টি। শিল্পোন্নত দেশগুলি শিল্পায়নের নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পরিবেশ ধ্বংসকারী প্রযুক্তি রপ্তানী সেখানকার পরিবেশ নষ্ট করে যথেচ্ছ মুনাফা অর্জন করতে চাইছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী কয়েক শতাব্দী ধরে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যে ধ্বংস যজ্ঞ সংঘটিত হয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে যথার্থ ও কার্যকরী আন্দোলন অদ্যাবধি সংঘটিত হয়নি। বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু প্রতিরোধমূলক আন্দোলন সংঘটিত হ'লেও সামগ্রিকভাবে সহমত গড়ে উঠেনি যদিও জনমত ও সচেতনতা ক্ষুদ্র আকারে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সক্রিয়। এক্ষেত্রে অতি প্রয়োজন হ'লো সামাজিক সহমত সৃষ্টি করা। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক সমাজ বর্তমানে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন যার মোকাবিলা একমাত্র সহমতের ভিত্তিতে সম্ভবপর।

## ১৪.৪ লিঙ্গ বৈষম্য ও সামাজিক আন্দোলন

### ১৪.৪.১ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারী-পুরুষ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গ-বৈষম্য বিরোধী চেতনা বিশ্বের প্রায় সব সমাজের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। সমাজ গবেষকদের মতে ব্যাপক পরিমানে (Large scale) উৎপাদনের প্রয়োজনে দৈহিক শক্তির প্রয়োগ ও উৎপাদনে ভারী যন্ত্রের ব্যবহার এবং উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ভোগ এ পুরুষের প্রাধান্য পুরুষকে নারীর তুলনায় প্রবলতর হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর পাশাপাশি জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ও তার জন্য বিপুল পরিমান ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা পুরুষকে উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে যার ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভাজন রেখা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতির প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক সম্পর্কের সূচনা হয়েছে। পরিবারে ও বর্হিজগৎ এর সব ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা দীর্ঘকাল ধরে পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য—এই উভয় সমাজের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সমাজের পিতৃতান্ত্রিক (Partriarchy) কাঠামো নারীকে সর্বাংশে পুরুষের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত করে। এর ফলে নারীর স্থান নির্ধারিত হয় অন্তঃপুরে গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে। আধুনিক কালেও শিক্ষা ও চারী ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার অর্জিত হলেও নারী কখনোই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে নি। ফলত, নারীর সমানাধিকারের কাঙ্খিত বিষয়টি কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়েছে।

### ১৪.৪.২ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের পটভূমি

লিঙ্গ বৈষম্য একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে পরিগনিত হ'লেও বিভিন্ন বৈষম্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। যেমন পাশ্চাত্যে নারী বৈষম্যের প্রেক্ষাপটটি ভিন্ন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারী সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। পরবর্তীকালে শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজেও নারী পুরুষের সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নি। উল্লেখ্য যে পশ্চিমী সমাজগুলিতে নারী অধিকার সংক্রান্ত সমস্যাবলী বিভিন্নরকম সামাজিক বাস্তবতার সাথে যুক্ত ধর্মীয় অনাচার, বর্ণবৈষম্য, দাসী হিসেবে ব্যবহার, নির্মম, কামনার উপকরণ হিসেবে স্ত্রীলোকের অবাধ কেনাবেচার

বন্দোবস্ত এ সবই পাশ্চত্যে নারীর অমর্যাদাকর অবস্থান চিত্রটি প্রকাশ করে। নারীর অবমূল্যায়নে চার্চ ও সামন্ততন্ত্রের ভূমিকা নারীকে আর্থিক ও যৌনতার উপকরণ হিসেবে পণ্যের মত ব্যবহারকে চালু করে। এর ফলে নারীর স্থান শুধু সন্তান-উৎপাদন, লালন-পালন ও গৃহপ্রভুর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং মনোরঞ্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পদার্পণের সুযোগ ছিল অলীক কল্পনামাত্র। এর ফলে পাশ্চাত্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্যের মতই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার বহুকাল ধরে প্রচলিত। ঋগবেদের যুগে হিন্দুসমাজে নারী মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তীকালে নারীর স্থান নিম্নমুখী হয়েছে। ভারততাত্ত্বিকবর্গের (Indologists) মতে 'গৌরবময় বৈদিক যুগে' সমাজে নারী উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তীকালে 'স্মৃতি পবে' নারীমর্যাদা পূর্বাবস্থায় বজায় থাকেনি। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান সম্পর্কে মনুসংহিতায় নারীর সামাজিক মর্যাদার অবমূল্যায়ন হয়েছে যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে রামায়ন ও মহাভারতের দুই প্রধান নারীর চরিত্র সীতা ও দ্রৌপদীর অবমাননাকর চিত্রায়নের মধ্যে। ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে পুরুষদের বহুবিবাহ, নারীর বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য, স্ত্রী-শিক্ষারোধ ও সঙ্কোচন, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি অমানবিক কার্যকলাপ হিন্দু সমাজে সামাজিক প্রথা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যদিও নারীর প্রতি এই বৈষম্য সম্পর্কে বশ কিছু সমাজ গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে মুসলিম আক্রমনকারীদের হাত থেকে মানমর্যাদা রক্ষা করার জন্য হিন্দু নারীদের একটি সামাজিক ঘোরাটোপের মধ্যে রাখা আবশ্যিক হ'য়ে পড়েছিল, তবুও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নারীর প্রয়োরজন সম্পর্কে সমাজ কখনোই উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে নি। ফলে খন্ডিত কিংবা পৃথক সত্তা (identity) হিসেবে নারীচেতনার স্ফুরণের ভিত্তি সেই সময়েই প্রস্তুত হয়েছিল।

আলোচনার এই পর্বে আপনার জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা দরকার। যে বহিরাক্রমণের পূর্ব থেকে নারীর অধিকারের মানবিক প্রশ্ন সম্পর্কে সমাজে যে দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে সেই আচলায়তনের কোনও পরিবর্তন হয় নি। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামীর প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব, মুসলিম আক্রমণ প্রভৃতির ফলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটলেও সমাজের অভ্যন্তরীন কাঠামোর (deep structure) কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনের সন্ধিক্ষনে উপস্থিত হলেও সমাজের মৌলিক নীতি সমূহের দৃশ্যত কোনো পরিবর্তন হয় নি।

## ১৪.৪.২ প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষে লিঙ্গ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন

আপনার জানা প্রয়োজন যে, শিল্পসমৃদ্ধ সমাজে লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন যে প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছে অনুন্নত সমাজগুলিতে তা সেভাবে গড়ে ওঠে নি। ভারতীয় সমাজে স্ত্রী শিক্ষার অনুপস্থিতি, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বহুবিবাহ, অকালবৈধব্য, সতীদাহ প্রথা ও পুত্র সন্তানের প্রতি শিশুকাল থেকে পক্ষপাতিত্ব শুধু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করে নি নারীর জীবনকে অসহনীয় অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। নারী শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী বার্ধক্যে পুত্রের অধীন—এই বিধি অনুযায়ী নারীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রচিত হয়েছে।

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান বিশ্লেষণে ব্রিটিশ ও ভারতীয় লেখকবৃন্দের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। জেম্‌স্ মিল তাঁর History of British India (১৮২৬) গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে, নারীর প্রতি উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও তাদের সামাজিক অবস্থান একটি সমাজের অগ্রগতির পরিচায়ক। উন্নত সমাজে নারী যতটাই উচ্চমর্যাদায় আসীন অনুন্নত

সমাজে ততটাই অবেহেলিত। একই রকম মন্তব্য করেছেন স্যার হার্বার্ট হোপ রিজলে। ভারতীয় সমাজ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য ছিল যে, নারীকে অনৈতিকভাবে দূরবস্থায় রেখে জাতি গঠনের জন্য শৌর্য ও আত্মত্যাগমূলক গুণাবলী কোনও সমাজই অর্জন করতে পারে না। এই মত অনুযায়ী একমাত্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের এই দুর্দশা দূর করা সম্ভব।

পক্ষান্তরে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে ভারতীয় সমাজ গবেষকগণ ভিন্ন যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। অধ্যাপক রজত রায় এর মতে, নারী সম্পর্কিত নূতন মতাদর্শ পাশ্চাত্য ও দেশজ চিন্তার মিলনে গড়ে উঠেছে। এছাড়া ভারত তাত্ত্বিকগণ সমাজে নারীর স্থান বিশ্লেষনে ভারতীয় সমাজের বিকাশের পর্যায়কে 'স্বর্ণযুগ' ও 'অন্ধকারময়যুগ' এই অভিধারয় বিশেষিত করে বৈদিকযুগে নারীর মর্যাদপূর্ণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগন ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমে নারীকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হতে শিখিয়েছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ সমাজসংস্কারক ভারতীয় সংস্কৃতির ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে গোঁড়া হিন্দুসমাজের পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বেশ কিছু আধুনিকমনস্কা নারীর আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে সরোজ নলিনী দত্ত ও সরলা দেবী চৌধুরানীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, হৈমবতী সেন, পন্ডিতা রমাবাঈ, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সিস্টার শুভলক্ষ্মী প্রমুখ বিশিষ্টা নারী তাদের লেখনী ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী শিক্ষা ও চেতনা প্রসারে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সমষ্টিগতভাবে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ভারতবর্ষে ১৯০৫ এ সর্বপ্রথম 'ভারত মহিলা পরিষদ' গঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত National social Congress এর অধীনে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের বিভিন্ন সভায় মহিলা সদস্যগণ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও ক্ষতিকর সামাজিক প্রথাসমূহ দূরীকরনের জন্য সক্রিয় হয়েছিলেন। ১৯১০ এ সরলাদেবী চৌধুরানীর উদ্যোগে 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' গঠিত হয়। অবিভক্ত দেশের প্রধান শহরগুলিতে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য নারী সংগঠন গড়ে উঠে। এগুলি হ'লো 'Women's India Association, National Council of Women এবং All India Women's Conference ইত্যাদি। Theosophical Society'র সাথে যুক্ত থাকলেও Women's Indian Association এ সব ধর্ম জাতি ও বর্ণভুক্ত নারীদের সদস্যপদ লাভে কোনো বাধা ছিল না। এই সমিতিও প্রধানত নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগী হয়। ১৯২৫ এ National Council of Women স্থাপিত হয়। পর্দাপ্রথা, জাতি বৈষম্য, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি নারীর অমর্যাদার জন্য দায়ী এবং তার জন্য ব্যাপক স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের কথা এই সংস্থার দ্বারা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু এই সংস্থা প্রধানত সমাজের অভিজাত নারীদের দ্বারা পরিচালিত ছিল যার ফলে এটি যথার্থ জাতীয় সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ১৯২৭ এ All India Women's Conference এর পুণা অধিবেশন ভারতবর্ষে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সংগঠনে অনেক শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত নারীবৃন্দ যোগদান করেন।

লিঙ্গবৈষম্যের অবসান যে শিক্ষাপ্রসারের সাথে সমান্তরাল ভাবে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সম্ভব নয় তা ঔপনিবেশিক যুগে নারীবাদী নেতৃবর্গ সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সরলাদেবীর 'নেতৃত্বে ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' Women Indian Association এবং সরোজিনী নাইডু, অ্যানি বেসান্ত, মধুলক্ষ্মী রেড্ডী নারী ভোটাধিকার অর্জনের জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু সমকালীন জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অনীহার জন্য তাঁদের

এই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় নি। এ বিষয়ে জেরাল্ডিন ফর্বস মন্তব্য করেছেন যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনাগ্রহের ফলে অনেক নারীবাদী সংস্কারক আশাহত হয়েছিলেন কারন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃবন্দ নারীসংঘটনগুলিকে উপেক্ষা করে আপোষের পক্ষপাতী ছিলেন।

রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনের পাশাপাশি আইনগত ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার প্রসারিত করতে নারীবাদী নেতৃত্ব সরব হয়েছিলেন। অর্জিত শিক্ষা, সমাজসেবার অভিজ্ঞতা, ভোটাধিকারের আন্দোলন, স্বাধীনতাসংগ্রামের অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নবোপার্জিত আত্মবিশ্বাস ভারতীয় নারীদের আইনগত প্রতিবন্ধকতা (Legal disabilities) দূর করতে প্রবৃত্ত করে। সম্পত্তির উপর অধিকার, বিবাহ ও সন্তানের উপর অধিকারকে কেন্দ্র করে এই দাবী গড়ে উঠে। এর ফলে নারী সম্পত্তির উপর অধিকার মূল্যায়নের জন্য ১৯৪১-এ বি.এন.রাউ-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় যদিও এই কমিটি নান্দরীবাদীর প্রতি সুবিচার করতে পারে নি। সুতরাং স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিভিন্ন দিক থেকে বিদীর্ন ভারতবর্ষের সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি নারীসমস্যা জনিত দাবী সমূহকে যথার্থভাবে বিচার করতে পারে নি। ফলত, লিঙ্গ বৈষম্যের মত অমানবিক বিষয়টির কোনও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয় নি।

## ১৪.৪.৪ স্বাধীনোত্তোর পর্যায়ে লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন

পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হ'লেও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আকাঙ্খিত স্তরে পৌঁছয় নি। জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের মতোই নারীবাদীর প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং দায়সারা গোছের (Lip service) পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহীন ছিলেন। স্বাধীনতার পর অনেকেই হয় হতাশগ্রস্ত নয় সরকারী আনকূল্য (Patronage) গ্রহন করেও সমাজের উঁচুতলার মহিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে দেশের বৃহত্তর নারীসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। স্বাভবিকভাবেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত (casualty) হয় দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত নারীবাদী সমূহ।

সত্তর ও আশির দশক থেকে ভারতবর্ষে নারীবাদী আন্দোলনে একটি ভিন্নধারা গড়ে উঠে। কিছু স্বেচ্ছাসেবী (voluntary) সংস্থা, প্রচার মাধ্যমে ইত্যাদি অসংগঠিতভাবে পূর্বতন দাবীসমূহ উত্থাপন করতে থাকে। ১৯৭৫ এ পুনেতে নারীবাদী কর্মী ও নেতৃবর্গ United women's Liberation struggle Conference গঠন করে। এই সম্মেলনে কৃষিশ্রমিক, অধ্যাপক, সমাজসেবী, শিক্ষক, ছাত্র প্রমুখ পণপ্রথা থেকে শুরু করে নারীসমস্যা সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৯ এ মহিলাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নূতন দিল্লীতে 'মানুষী' নামে একটি নারীবাদী পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করে। এই পত্রিকায় নারীদের কর্মক্ষেত্র সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, বিবাহিতা নারীর সমস্যা, নারীর প্রতি হিংসাশ্রয়ী আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করতে শুরু করে। প্রচারমাধ্যম সক্রিয় হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় বধূ হত্যা ১৯৮৭ তে রাজস্থানের দেওরালা গ্রামে রূপ কানোয়ারকে সতী বানিয়ে হত্যা, প্রভৃতি ঘটনা ক্রমশ জনসমক্ষে উঠে আসে। ১৯৮২ তে স্বল্পসংখক মহিলার দ্বারা নূতন দিল্লীতে 'সহেলী' নামে একটি সংস্থা সঙ্কটাপন্ন মহিলাদের সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে পণের জন্য অত্যাচারিত মহিলাদের সাহায্য করা ও বধূহত্যা, হিংসার আশ্রয় প্রভৃতির বিরুদ্ধে মহিলাদের আশ্রয় ও সাহায্যাদি দান করা এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।

সুতরাং স্বাধীনতার পর বিভিন্ন অঞ্চলে নারী-স্বার্থ করার জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে উঠলেও জাতীয় স্তরে নারী সংগঠনের অস্তিত্ব প্রায় অনুপস্থিত। তাই বর্তমানে বিভিন্ন অরাজনৈতিক নারীবাদী সংস্থা সীমিত ভাবে

কার্যকলাপ বজায় রেখেছে। অপরদিকে প্রায় প্রত্যেকটি মহিলা সংগঠন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ট। সুতরাং পরবর্তীকালে বিভিন্ন চাপের ফলে নারীবাদী আন্দোলন অনেকাংশে স্বকীয়তা হারিয়েছে। সামাজিক আন্দোলনকে সমষ্টিগত প্রয়াস এর নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে নারীবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত সংগঠনগুলির ভূমিকা গৌণ এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলি ও তার শাখা মহিলা সংগঠনসহ প্রবলতর ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে হয়ত স্বতন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় অবস্থান থেকে রাজনৈতিক দল প্রভাবিত আন্দোলনে পরিবর্তনের জন্য দৃষ্টি ভঙ্গীগত এই রূপান্তর (paradigm shift) ভবিষ্যৎ এ নারী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত ও আজ্ঞাবাহী কার্যকলাপে পরিণত করবে।

## ১৪.৫ সারাংশ

পরিবেশকে ধ্বংস করে মানুষ বাঁচতে পারে না কারণ জীবনধারনের মুখ্য উপাদান পরিবেশ থেকেই সংগৃহীত হয়। স্মরণে রাখতে হবে যে প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত নয়। তাই সম্পদের অপব্যবহার রোধ না করলে পরিবেশদূষণ জনিত বিপর্যয় অবশ্যাম্ভাবী। প্রকৃতিকে নির্বিচারে লুণ্ঠন করার প্রতিবাদে ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সামাজিক প্রতিরোধের দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করবে তাই নয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনকে সম্ভব করবে।

সামাজিক আন্দোলনের অপর ক্ষেত্র অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানকল্পে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র বৈষম্যবিরোধী দাবী ক্রমশই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই পিতৃতান্ত্রিক উপস্থিতি। তাই নারী এখন পৃথক সত্তা হিসেবে স্বীকৃত। ভারতবর্ষেও লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতার সংঘটিত হয়েছে। সামাজিক অনাচার ও নারীর প্রতি নির্মম আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সত্ত্বেও নারীর সামাজিক অবস্থানের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয় নি। এর মূলে আছে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান যথার্থ আন্দোলনের অভাব। তবুও দেশের বিভিন্ন স্থানে লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী চেতনা ক্ষুদ্র পরিসর ছাড়িয়ে ব্যাপ্তি অর্জন করছে।

## ১৪.৬ অনুশীলনী

ক) ১। **সামাজিক আন্দোলনের অর্থ সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।**

২। সমাজতত্ত্বে পরিবেশ চিন্তার স্থান নির্ণয় করুন।

৩। প্রাকৃতিক সম্পদের আত্মঘাতীমূলক অপব্যবহার সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

৪। পরিবেশবাদী চেতনার উন্মেষ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৫। ভারতবর্ষে পরিবেশবাদী সামাজিক আন্দোলনের ধারা আলোচনা করুন।

খ) ১। **পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবের সাথে লিঙ্গবৈষম্যের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।**

২। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের পটভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষে লিঙ্গবৈষম্যের বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

৪। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃতি আলোচনা করুন।

৫। ভারতবর্ষে লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি উল্লেখ করুন।

## ১৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী


১. Laptev, I : The Planet of Reason, 1977

২. Hall, G : Gan We Live Under Capitalism, 1972

৩. বিপন্ন পরিবেশ ঃ নাগরিক মঞ্চ, ১৯৯৭

৪. Nair, S.N. : Ecorestoration : Concepts and Procedures, INTACH, 1993

৫. Jayal, N.D. : Tropical Desertification : an Unseen Crisis, INTACH, 1990

৬. Forbes, Geraldine : Women in Modern India, 1996.

৭. Chatterjee, Partha : Nation and its Fragments, (Chaptors Six and Seven), 1997

৮. Shah Ghanashyam : Social Movements in India, 1990

৯. Yates, G. G : What Women Want : The Ideas of the Movement, 1976

# একক ১৫ ❑ নগরায়ন, উন্নয়ন ও নগর পরিকল্পনা

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য
১৫.২ প্রস্তাবনা
১৫.৩ নগরায়নের ার্থ
১৫.৪ ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি
১৫.৪.১ নগরের সংজ্ঞা
১৫.৫ উন্নয়ন
১৫.৫.১ নগর উন্নয়ন
১৫.৬ নগর পরিকল্পনা
১৫.৭ সারাংশ
১৫.৮ অনুশীলনী
১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

## ১৫.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন

- নগরায়নের অর্থ ও তাৎপর্য
- ভারতবর্ষে নগরের অনুমোদিত সংজ্ঞা
- ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি
- উন্নয়ন ও নগর উন্নয়নের তাৎপর্য
- ভারতবর্ষে নগরপরিকল্পনার তাৎপর্য

## ১৫.২ প্রস্তাবনা

বিশ্বের কোনও সমাজ নগরায়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। সর্বত্রই জনসংখ্যার গ্রাম ও শহর ভিত্তিক বিভাজন বর্তমান। কিন্তু নগরায়নের পশ্চাতে কারণসমূহ ও ফলাফল অর্থাৎ সমাজ জীবনে তার প্রভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অনুধাবন করা যাবে যে নগরায়নের সূত্রপাত ও তার প্রভাব সব সমাজে একরকম নয়। শিল্পে অগ্রসর ও শিল্পে অনগ্রসর সমাজে নগরায়নের চরিত্র ও সমাজে তার প্রভাব একে অপরের থেকে স্বতন্তর। নগরায়নের এই বিশেষত্ব থেকে ভারতবর্ষও ব্যতিক্রম নয়।

## ১৫.৩ নগরায়নের অর্থ

ভারতবর্ষে নগরায়নের গতিপ্রকৃতি করার পূর্বে নগরায়নের সংজ্ঞা ও অর্থ সম্পর্কে আপনার স্পষ্ট ধারানা থাকা প্রয়োজন। অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিকের মতে নগরায়ন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনও অঞ্চল তার পূর্বাবস্থা (গ্রাম) থেকে নগরে পরিণতয়। সাধারণভাবে উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জীবিকা, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন হ'লে নগরের সৃষ্টি হয়। এই মৌলিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় কৃষি থেকে শিল্প, দ্রুতগতির যানবাহন প্রচলন, চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ভূমিব্যবহারের শিল্প ও বাণিজ্যের আধিপত্য প্রভৃতি। এই সবরে সমন্বিত ফল হল নগরায়ন যা একধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নগর জীবনের বৈচিত্র্য, সুযোগসুবিধা ও গতিময়তার আকর্ষণে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ গ্রাম পরিত্যাগ করে নগরবাসী হয়। অবিরতভাবে কখনও দ্রুত (rapid) বা কখনও ধীর (slow) গতিতে গ্রাম থেকে নগরে জনসমাগমকে নগরায়ন বলা হয়। গ্রাম থেকে বিভিন্ন কারনে যখন মানুষ নগরে চলে আসতে বাধ্য হয় তখন তাকে বলা হয় push factor। অপরদিকে শহরের আকর্ষনে গ্রাম পরিত্যাগকে বলা হয় pull factor। বেশীরভাগ সমাজে উভয়ই বর্তমান।

## ১৫.৪ ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি

ব্রিটিশ শাসনের বহু আগে থেকে ভারতবর্ষে নগরের উত্থান হয়েছে। মূলত, প্রশাসনিক কেন্দ্র ও তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে সেই সময় নগদর গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষেত ঔপনিবেশিক স্বার্থে নগরের সৃষ্টি হয়। এই ধারা স্বাধীনতার পরেও অব্যাহত থেকেছে।

স্বাধীনতার পর নগরায়নের ফলস্বরূপ ভারতীয় সমাজে ব্যপাক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের প্রতি বীতশুদ্ধ হয়ে বহু মানুষ গ্রাম ছেড়ে নগরে বসবাস শুরু করে। প্রথমত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র, বেকারী, নিরাপত্তার অভাব তীব্র হওয়ায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষ নগর অভিমুখী হয়েছে। জনসংখ্যা অনুপাতে চাষযোগ্য জমির অভাব খরা ও বন্যার ফলে প্রায় প্রতি বৎসর শস্যহানি, সেচের অপ্রতুলতা ইত্যাদি গ্রামে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে যা মানুষকে নগরে আসতে বাধ্য করেছে। দ্বিতীয়, নগরজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার সুযোগ অনেককে নগর জীবনে প্রবেশ করতে প্রবৃত্ত করেছে। তৃতীয়ত ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময় ও ১৯৭১ এ বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সময় অসংখ্য উদ্বাস্তুর আগমনের ফলে নগরায়ন প্রক্রিয়া তীব্র হয়েছে। সর্বোপরি প্রশাসন, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে নগর যেহেতু গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে সেইহেতু নগর বসবাসের প্রবণতা বেশী। সুতরাং ভারতবর্ষে নগরায়ন বিগত দুই দশকে ধীরগতিতে চললেও সমাজজীবনে নগরের প্রভাব ও আধিপত্যের কোনো হেরফের হয়নি।

১৯৯১ এর সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে মোট ৮৪৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ২১৭ মিলিয়নের বেশী নগরে বাস করে। এই অংশ মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের বেশী। দ্রুত নগরায়নের হারকে বিলম্বিত করা সম্ভব হলেও প্রথমশ্রেণীভুক্ত ৩০০টি নগরে ১৯৮১-৯০ এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ৪৬.৮৭ শতাংশ যা নগরায়ন প্রক্রিয়ায় ভারসাম্যের অভাবকে প্রতিফলিত করে। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে বিকৃত নগরায়নের ফলে কোনও নগরে জনসংখ্যার অত্যাধিক স্ফীতি বা কোনো একটিতে জনসংখ্যার অপ্রতুলতা দেখা যায়। একদিকে বৃহৎ নগরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যাধিক অপরদিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নগরগুলিতে জনসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি বৃহৎ নগরগুলিকে

সমস্যা জর্জরিত করে তোলে। এ ধরনের ভারসাম্যহীন নগরায়ন বৃহৎ নগরসমূহে নানারকম সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম দেয়।

### ১৫.৪.১ নগরের সংজ্ঞা

জনগণনার প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতবর্ষে নগর ও গ্রামের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা হয়। অতএব নগর ও গ্রাম চিহ্নিত করতে জনগণনা দ্বারা স্বীকৃত সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। ১৯৭১ এর জনগণনার গৃহীত সংজ্ঞায় ১৯৮১ ও ১৯৯১ জনগননায় কিছু সংশোধন করা হয়। তারপর থেকে নগরের সংজ্ঞা নির্ধারণে যে মাপকাঠি গৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ (ক) পৌরনিগম, পৌরসভা, ক্যান্টমেন্ট বোর্ড অথবা নোটিফায়েড টাউন কমিটির অধীন সমস্ত অঞ্চল; (খ) বসবাসকারী জনসংখ্যার আয়নত ন্যূনতম ৫০০০; (গ) কর্মরত জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ অ-কৃষি কাজে নিযুক্তি; (ঘ) প্রতি বর্গকিলোমিটারের অন্তত ৪০০ লোকের বাস। বর্তমান সংজ্ঞা অনুযায়ী এই চারটি শর্ত পূরণ করলে একটি স্থান নগর বলে ঘোষিত হয়।

## ১৫.৫ উন্নয়ন

উন্নয়নের ধারণাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বে এ বিষয়ে যোগাযোগ থাকলেও এদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সমাজতত্ত্বে উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা বলা হয়। উপকরণগত (material) উন্নয়ন সামাজিক বিকাশ ব্যতীত নিরর্থক হয়ে পড়ে। তাই শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক প্রণালী ও অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

আগস্ট কোঁত উন্নয়ন প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে সমাজপরিবর্তনের সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে পরিবর্তন আসে আবার তার ফলে সামাজিক প্রণালীতেও পরিবর্তন অনিবার্য। এই প্রকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে জ্ঞানের বিকাশ। কারন অশিক্ষা ও অজ্ঞতা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা দূরভীত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস যা সফল হলে মানুষ নিজস্ব বুদ্ধি, বিচারবোধ ও কর্মশক্তির দ্বারা পুরনো প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করতে সচেষ্ট হয়। তাই সমাজতাত্বিকগণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সাাজিক প্রণালী পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়নের তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই ধারনার সূত্র ধরে হবহাউস মানুষের মননশীলতাত বিকাশকে সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিচার করেছেন।

উন্নয়নের এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ভারতবর্ষের উন্নয়নের বিষয়টি উত্থাপন করা প্রয়োজন। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে উন্নয়ন সম্পর্কে পাশ্চাত্য আধুনিক ধারণা শিল্প ও প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের কথা প্রচার করে। কিন্তু এভাবে নগর উন্নয়ন পদ্ধতি বিকাশের পরিবর্তে যে একাধিক সমস্যার জন্ম দেয় তা সাম্প্রতিককালে অনুভূত হয়েছে। সমাজ থেকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য আধুনিক উন্নয়ন পদ্ধতি সক্ষম হয়নি। সমাজের প্রত্যেকের বুদ্ধি কর্মশক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটকে বিচার না করার জন্য প্রাকৃতিক কাঠামোগত উন্নয়নের (physical development) প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর ফলে গত কয়েক দশক ধরে দারিদ্র্য, বেকারী, অপরাধপ্রবণতা, দুর্নীতি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ভারতীয় সমাজকে জর্জরিত করে তুলেছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাই ন্যূনতম প্রয়োজনের উপকরণসমূহ, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি ব্যবস্থার সাথে অশিক্ষা, দারিদ্র, বেকারী, অজ্ঞতা, ইত্যাদি দূর করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর জন্য দরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সমন্বয়।

### ১৫.৫.১ নগর উন্নয়ন

সাধারণভাবে নগর উন্নয়ন বলতে বোঝায় নগরের আর্থিক, সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। বাসস্থান নির্মাণ, বস্তি উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, আলো ও পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিকালে পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি নগর উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (components) হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ভারতবর্ষে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সামাজিক পরিকল্পনার অভাব নগর সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে। 'ইদানীংকালে পরিলক্ষিত হয়েছে যে নগরেও দারিদ্র্য, বেকারী, অশিক্ষা অজ্ঞতা ও নানারকম সামাজিক অনাচারের সমস্যা কম নয়। তা সত্ত্বেও নগর উন্নয়নের প্রচলিত পদ্ধতির সাথে সামাজিক পরিকল্পনার বিচ্ছিন্নতা ভারতবর্ষে নগর উন্নয়নকে বিপথে পরিচালিত করেছে। নগরের চাহিদা নগরজীবনে অবক্ষয়ের প্রবণতাকে রোধ করতে পারে নি।

বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীকে নগর উন্নয়নের সাথে গ্রামীন উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়। গ্রাম ও নগরসমাজ একই ব্যবস্থার দু'টি দিক এবং একটি সমস্যাক্রান্ত হলে অপরটিও সুস্থ থাকতে পারে না। এই ধারনার ভিত্তিতে নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করার কথা বলা হয়। সুতরাং নগর উন্নয়ন সম্পর্কে পূর্বতন ধারণা অচল এবং এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য গ্রামকে স্বনির্ভর করে তোলার কথা বলা হয়। সমান্তরাল ভাবে গ্রাম ও নগরের উন্নয়নকে নিশ্চিত না করলে গ্রামে সৃষ্টি সমস্যা নগরে স্থানান্তরিত হবে যার ফলে নগর-সমাজের সংহতি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত চাপ নেওয়ার মত ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ায় নগরজীবন অসহনীয় পড়ে যা ইতিমধ্যে নগরজীবনে সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যে প্রতিফলিত।

## ১৫.৬ নগর পরিকল্পনা

যে কোনও পরিকল্পনা অবিন্যস্ত সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় সুপরিকল্পিত ভাবে নগরকে সমস্যামুক্ত করার প্রয়াস। অর্থনৈতিকত পরিকল্পনাবিদের দৃষ্টিতে নগরের প্রধান সমস্যা, যেমন পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। অপরদিক নগর পরিকল্পনার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক ব্যাধি সমূহের প্রতিকার করে সুশৃঙ্খলা সমাজ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অ্যালভিন বস্‌কফ্ নগরপরিকল্পনা রূপরেখা সামাজিক ও প্রাকৃতিক যোজনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক পরিকল্পনা হ'লো ''The Design, allocation construction and interelation of necessary facilities or means of urban living.'' সামাজিক পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি বলেছেন,''...the creation of desired influences on the behaviour, values, satisfactions and interaction patterns of an urban population.'' কিন্তু সামাজিক চাহিদা, সমস্যা ও আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে পরিকল্পনা সার্থক হয় না। এখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত। তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামাজিক চাহিদা, ও ফলাফলের সাযুজ্য স্থাপন আবশ্যিক। নচেৎ পরিকল্পনা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে নগর পরিকল্পনার বিষয়টির গুরুত্ব স্বাধীনতার অব্যবাহত কাল পর থেকেই স্বীকৃত হয়নি। গান্ধীবাদ নীতি অনুসরন করে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নগর উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত উল্লেখ ছিল না, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে নগরউন্নয়নের বিষয়টিতে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বস্তুত তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় নগর উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীকালে সব পরিকল্পনাতে নগর সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনায় আপ্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে

নগর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এ বিষয়ে National Commission on Urbanisation (1988) মন্তব্য করেছেন যে মূলত পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন রাস্তাঘাট, সেতু, বাজার নির্মাণ ইত্যাদির মধ্যে নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু নগরসমস্যার গভীরতর বিষয়গুলি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারী, দারিদ্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্ব পায়নি। তার ফলে পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে সার্থক হয়নি। অর্থাৎ নগর সমাজ এর উন্নয়নের মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়নি যার ফলে সেগুলি দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত। এখানে নগর পরিকল্পনার প্রধান দুর্বলতা হল যে জনগণের চাহিদা ও পরিকল্পনা মাফিক কর্মসূচীর সামাজিক ফলাফলের যথার্থ পরিমাপ করা হয়নি। সামাজিক বাস্তবতাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রচেষ্টা তাই পদে পদে ব্যাহত হয়েছে।

## ১৫.৭ সারাংশ

এই এককে ভারতবর্ষে নগরায়ন, উন্নয়নে নগরের গুরুত্ব ও নগর পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। নগরায়নের প্রকৃতি বিশ্লেষনে একথা পরিস্ফুট হয়েছে যে ভারতবর্ষে নগরায়ন ধীরগতিতে অগ্রসর এবং তাতে ভারসাম্য অনুপস্থিত। ভারসাম্যহীন নগরায়নের সাথে যুক্ত হয়েছে যথার্থত পরিকল্পনার অভাব এবং মূল সমস্যাগুলির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব।

## ১৫.৮ অনুশীলনী

১। নগরায়ন বলতে কি বোঝায়?
২। ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
৩। ভারতবর্ষে ভারসাম্যহীন নগরায়নের ফলে উদ্ভুত সমস্যা সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।
৪। কি কি ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করলে একটি স্থানকে নগর বলা হয়।
৫। উন্নয়ন ও নগর উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
৬। কি কারনে গ্রাম ও নগরের সমান্তরাল উন্নয়নের কথা বলা হয়।
৭। ভারতে নগর উন্নয়নের ও নগর পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

## ১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী


১। Breese, Zerald : Urbanisation inthe Newly Developing Countries, 1978.

২। Dube, S.C. : Modernisation and Development : The Search Alternative Paradigms, 1978

৩। Dasgupta, B. : Urbanisation, Migration and Rural change : A study of West Bengal, 1988.

৪। Gilbert, A & Gugler, A : City, Poverty and Development, 1984.

৫। Ramchandran, R. : Urbanisation and Urban Systems in India, 1989.

# একক ১৬ ❑ সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যাবলী

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য
১৬.২ প্রস্তাবনা
১৬.৩ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
১৬.৪ ভারতবর্ষে সামাজিক সমস্যাবলী
১৬.৪.১ দারিদ্র্য
১৬.৪.২ বেকারত্ব
১৬.৪.৩ অপরাধ
১৬.৪.৪ কিশোর-অপরাধ
১৬.৪.৫ বিবাহ-বিচ্ছেদ
১৬.৪.৬ মাদকাসক্তি
১৬.৪.৭ দুর্নীতি
১৬.৫ সারাংশ
১৬.৬ অনুশীলনী
১৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

## ১৬.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন—

- সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
- ভারতবর্ষে সামাজিক সমস্যাগুলির চরিত্র
- ভারতীয় সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা
- ভারতীয় সমাজের উপর সমস্যাগুলির ক্ষতিকর প্রভাব

## ১৬.২ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্বের বহুবিধ প্রয়োগের মধ্যে সামাজিক সমস্যাবলীর উৎপত্তি ও প্রতিকারের উপায়সমূহ অনুসন্ধান অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয়। সমাজতাত্ত্বিক গণ মনে করেন যে, সামাজিক সমস্যাবলী সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নে অন্তর্ভুক্ত না করলে এই বিষয়ের চর্চা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। যাইহোক, এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে পাশ্চাত্যের শিল্প সমাজ এবং অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পহীন সমাজের মধ্যে সমস্যাজনিত পার্থক্যের রেখা সুস্পষ্ট। অর্থাৎ উভয়

প্রকার সমাজই ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। অতএব ভারতীয় সমাজের সমস্যাবলীর পৃথক চরিত্র অনুযায়ী সেগুলি এই এককে আলোচিত হয়েছে।

## ১৬.৩ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

সামাজিক সমস্যার অর্থ ও সংজ্ঞা নিরুপনে সমাজতাত্ত্বিকগণ একমত নন। তাঁদের একরকম মতে সমাজে প্রচলিত ও গৃহীত নিয়ম বা অনুশাসন লঙ্ঘন করলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং উদ্ভুত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়। Ogburn ও Nimkoff সামাজিক বিশৃঙ্খলার তিনটি কারন উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলো—প্রথমত, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামাজিক জীবনধারার অমিল থেকে উদ্ভুত বিশৃঙ্খলা; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির একক জীবনধারার সাথে সমাজের সমষ্টিগত জীবনধারার মধ্যে বৈপরীত্যজনিত বিশৃঙ্খলা এবং তৃতীয়ত, জীবনযাপনের বিবিধ উপাদানের মধ্যে অসংগতি জনিত বিশৃঙ্খলা। এ বিষয়ে Raab ও Selznick বলেছেন 'A social problem exists when organised society's ability to order relationships among people seems to be failing; when its institutions are falterning, its laws are being flouted, the transmission of its values from one generation to the next is breaking down, the framework of expectations is being shaken.' Barbara Wootton একে 'Social Pathology' বলে অভিহিত করে এমন সব কর্ম (action) ও তার সাথে যুক্ত ব্যক্তির (doer) কথা উল্লেখ করেছেন যার প্রতিকারে সরকারী অর্থ ব্যয় হয়। T.B. Bottomore এ বিষয়ে বলেছেন যে Wootten পরিস্থিতিকে (situation) বিচার না করে (action) কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।

## ১৬.৪ ভারতবর্ষে সামাজিক সমস্যাবলী

শিল্পোন্নত সমাজগুলির সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে Bottomore লক্ষ্য করেছেন যে, এই সব সমাজে অপরাধ ও দুষ্কর্ম জনিত সমস্যা তীব্র, কারণ দারিদ্র্যের সমস্যা সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। ভারতবর্ষের মত শিল্পে অনুন্নত দেশে সামাজিক সমস্যাবলী প্রায়শই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সাথে যুক্ত। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে অপরাধ ও কিশোরদের দুষ্কর্ম জনিত সমস্যার ব্যাপকতা কম নয়। তাই ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যা আলোচনায় আর্থিক দুর্দশাজনিত সমস্যা ও তার পরোক্ষ প্রভাবে উদ্ভুত সমস্যাগুলি আলোচনা করব। সাম্প্রতিকালে ভারতীয় সমাজের যে সব সমস্যার প্রতি সমাজতাত্ত্বিকগণ দৃষ্টিপাত করেছেন সেগুলি হল দারিদ্র্য, বেকারী, অপরাধ, কিশোরদের দুষ্কর্ম, বিবাহ-মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি। ভারতীয় সমাজে বর্ণ, জাতপাতজনিত সমস্যা, জনসংখ্যা ও নগরায়নের সমস্যা, এবং পরিবেশ ও লিঙ্গ-বৈষম্য জনিত সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী এককগুলিতে শেষোক্ত সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

### ১৬.৪.১ দারিদ্র্য

দারিদ্র্যের সমস্যা ভারতবর্ষে নূতন নয়। বিগত কয়েক দশকে পরিসংখ্যানগত তথ্যে সামান্য হেরফের হলেও এই সমস্যার তীব্রতা, সমাজের দরিদ্র অংশকে একইভাবে কশাঘাত করে চলেছে। Human Development Report 2000 অনুযায়ী বর্তমানে ভারতবর্ষে ৩৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে এবং অন্য একটি সমীক্ষা

(১৯৯৫) অনুযায়ী ১৯৯২ এ মোট জনসংখ্যার মোটামুটি ৪০ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। এর মধ্যে ৪২ শতাংশের বাস গ্রামাঞ্চলে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের তীব্রতা বেশি যদিও নগরে ৩৭ শতাংশ দরিদ্র মানুষের বাস। গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক মানুষের বাস ও প্রধানত কৃষি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার অপ্রতুলতাত গ্রামীন জীবনে দুর্দশা বয়ে নিয়ে এসেছে।

গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন দারিদ্র্য নিবারণ কর্মসূচীর কোনোটিই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়নি। দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করার ফলে অসংখ্য মানুষ জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু, নারী ও বয়স্কগণ, কারণ উপকরণ অপ্রতুল হওয়ার ফলে তারাই সব চেয়ে বেশী বঞ্চিত হয় যদিও কর্মক্ষম ব্যক্তিদের দুর্দশা কম নয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুই তাদের নাগালের বাইরে থাকে। অতএব স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চার দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও অবস্থার বিশেষ কোনও গুণগত পরিবর্তন হয় নি।

## ১৬.৪.২ বেকারত্ব

স্বাধীনতার পর থেকেই বেকার সমস্যা ভারতীয় সমাজেদ গভীর ব্যাধিরূপে উপস্থিত। সমাজতাত্ত্বিক ডুর্কহ্যাইম এর মতে বেকারত্বের গ্লানি ঘোচাতে মানুষ অনেক সময়ে আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়। বেকারত্বের ফলে ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং জীবন হয়ে ওঠে বিষময়। পরিবারে বেকার সমস্যা অন্যান্যদের কাছে হয়ে ওঠে অবজ্ঞার পাত্র। ভারতবর্ষে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সমস্যা প্রধানত জনসংখ্যার বিস্ফোরন ও সম্পদের অসম বন্টন থেকে উদ্ভুত। তার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগের সাথে কর্মপ্রার্থী ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। এছাড়া মন্থর অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রাম ও শহরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিপর্যয়, শিল্পে বিলগ্নীকরণ, কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংকোচন, ইত্যাদির ফলে ভারতবর্ষেত বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

ভারতবর্ষে প্রধানত তিন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। যেমন : (ক) গ্রামীন বেকার সমস্যা। (খ) শহরের বেকার সমস্যা। (গ) শিক্ষিত শ্রেণী বেকার সমস্যা।

ভারতবর্ষে, অধিকাংশ জনগণ কৃষি কাজকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু ক্রমশ জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকায় ও অনেকত জায়গায় ভূমিসংস্কার না হওয়ায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষ নামমাত্র জীবিকার সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। সরকার সমস্যার অনুধাবন করে কিছু কর্মসূচী যেমন National Rural Emplyment programme, Food for Work Programme, Integratged Rural Development Programme, Rural Landless Employment. Programme ও অন্যান্য কিছু কর্মসূচী চালু করে। কিন্তু অবস্থার লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সূদূরপরাহত। শহরাঞ্চলেও সমস্যার তীব্রতা কম নয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত মানুষ নিম্নস্তরের (menial jobs) কাজের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। পরিবহন, রিকশা ও ভ্যান চালক, ক্ষৌরকার, চর্মকার, ধোপা, দোকানের কর্মচারী, ফেরিওয়ালা, মিস্ত্রী, মজুর, শ্রমিক, ঝি-চাকর হিসেবে অসংখ্য মানুষ শহরাঞ্চলে অতি অল্প আয় সত্ত্বেও এই সব জীবিকার সাথে যুক্ত থাকে। স্বাভাবিকভাবেই উপার্জিত অর্থের দ্বারা কোনোরকমে জীবনধারণ করে তারা প্রান্তিক অস্তিত্বে (marginal existence) পর্যবসিত হয়। এর ফলে তারা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চনা ও অসহায় অবস্থার সন্মুখীন হয়ে দরিদ্র মানুষ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ডেকে অনে। শিক্ষিত শ্রেণীর বেকার সমস্যাও বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ভারতবর্ষে বর্তমান শিক্ষালাভের পর সঠিক যোগ্যতা অর্জনের পরেও কর্মের সংস্থান অনিশ্চিত। কর্মবিনিয়োগ

কেন্দ্রগুলিতে হাজার হাজার শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী নাম নথীভুক্ত করে চাকুরীর আশায় দিন অতিবাহিত করছে। অনেক সময় যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী না পেয়ে কম বেতন সম্পন্ন যে কোনও চাকুরীতে যোগ দিতে বাধ্য হয় যা ইতিমধ্যেই সহজলভ্য নয়। সুতরাং সমস্যা সংকটজনক হয়ে উঠেছে। এর ফলে বলাই বাহুল্য সামাজিক ক্ষেত্রে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান সুদূর পরাহত।

## ১৬.৪.৩ অপরাধ

অপরাধ সংক্রান্ত সমস্যা মনস্তত্ত্বে আলোচিত হলেও সমাজতত্ত্বে এর গুরুত্ব কম নয়। অপরাধ কেন সংঘটিত হয় এবং কি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি অপরাধমূলক কর্মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে তা সমাজতত্ত্বের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। দু-এক কথায় অপরাধের সংজ্ঞা নির্ণয় করা দুরূহ তবে সমাজের স্বীকৃত নিয়ম কানুন ও আইন সমূহ লঙ্ঘনকে অপরাধ বলে গণ্য করা যায়।

অপরাধ সাধারণভাবে দন্ডনীয়। কিন্তু একটি সমাজে যা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত অন্য সমাজে তা নাও হ'তে পারে। অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ এ প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অপরাধমূলক কর্মে যোগসূত্রের কথা উত্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে জলবায়ু, তাপমাত্রা, ভৌগোলিক অবস্থান অপরাধের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য দায়ী। তা ছাড়া অর্থনৈতিক, বংশানুক্রমিক ও পারিবারিক এবং জাতিগত কারণে অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়। ভারতীয় সমাজের অনেক সময় শবর, ডোম ইত্যাদি নিম্ন জাতিভুক্ত মানুষের মধ্যে অফরাধপ্রবণথা সমাজতাত্ত্বিকগণ লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে, শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিকীকরণ-এর অভাব এই প্রবণতার জন্ম দেয়। মিশেল ফুকো এ বিষয়ে আধুনিকতার পাশাপাশি তথাকথিত সভ্যসমাজের বৃত্তের বাইরে এমন এক অংশের মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন যারা আধুনিক সভ্যতার দৃষ্টিতে অপরাধী, উন্মাদ ও অপ্রকৃতিস্থ। সুতরাং অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন কারণ একক বা যৌথভাবে এর জন্য দায়ী। তাছাড়া অপরাধকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা আবশ্যক।

ভারতবর্ষের মত দেশে অপরাধের চরিত্র নানাধরণের। বিভিন্ন কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রধানত রুচি ও শিক্ষার অভাবে মানুষ অপরাধমূলক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় মানুষ অপরাধের আশ্রয় গ্রহন করে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এ ধারণা প্রযোজ্য নয়। অনেক সময় সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত অংশের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে দুর্নীতি, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব, শিশু শ্রমিকদের প্রতি অমানবিক আচরণ ও আরো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অন্যায় ও অপরাধের সাথে যুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

## ১৬.৪.৪ কিশোর-অপরাধ

T. B. Bottomore বলেছেন যে দারিদ্র্যের তীব্রতা কম হওয়ায় শিল্পসমাজগুলিতে অপরাধ ও কিশোরদের দুষ্কর্মের প্রবণতা বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষের মত অনুন্নত সমাজেও এ ধরনের সামাজিক তীব্রতা কম নয়। ভারতবর্ষেও ধনী ও দরিদ্র পরিবারের কিশোরদের মধ্যে দুষ্কর্মের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু অভিযুক্ত কিশোরদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয় না কারণ তারা অধিকাংশ সময়েই অন্য ব্যক্তি ও পরিস্থিতির প্রভাবাধীন হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ বয়স কম হওয়ায় ভালো মন্দ বিচার করার সামার্থ তাদের হয় না। সুতরাং শাস্তি না দিয়ে তাদের সংশোধনাগার ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় সুস্থ ভাবে সমাজ জীবনে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কিশোর বয়সে দুষ্কর্ম প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিরোধ

ও সংঘর্ষ, পারিবারিক সমস্যা ও সার্বিকভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে দুষ্কর্মের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় সমাজে একটি গুরুতর ব্যাধিরূপে উপস্থিত।

## ১৬.৪.৫ বিবাহ বিচ্ছেদ

বিবাহ বিচ্ছেদ শুধু পাশ্চাত্য সমাজেই নয় ভারতীয় সমাজেও একটি গুরুতর সমস্যা রূপে স্বীকৃত। নানা কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় শিল্পায়ন, নগরায়ন জাতিগত, আর্থিক রুচির বিচারে অসমতা পুরুষ ও মহিলা ও পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ধর্মীয় অনুশাসন ও আইনগত বাধা কম হলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন না থাকা সত্ত্বেও আইনগত প্রতিবন্ধকতা থাকা বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা তুলনায় কম। তবু ও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা বাড়ছে। পূর্বে স্বামীর আধিপত্য মেনে স্ত্রী জীবনযাপনের অভ্যস্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে নারীবাদী চেতনার প্রসারের ফলে মেয়েরা অনেকক্ষেত্রেই স্বামীর আধিপত্য নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারছে না। এর ফলে পরিবারে অশান্তি ও কলহ বাড়ছে যার পরিণতি বিবাহবিচ্ছেদ। কর্মরত মহিলাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাযুক্ত চেতনা বৃদ্ধির ফলে এ ধরনের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ভারতীয় সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের বৃদ্ধি ও তার ফলে পারিবারিক বিপর্যয় একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে সমাজতত্ত্বের চর্চায় অন্তর্ভুক্ত।

## ১৬.৪.৬ মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি সমাজে একটি বিপথগামী অভ্যাস হিসেবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকদ্রব্য ব্যবহার সমাজে নিন্দিত হলেও সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মাদকাসক্তি একটি কু-অভ্যাস হিসেবে বিবেচিত। কারণ এর ফলে পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বিশেষ করে পরিবারের উপার্জনক্ষম ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে পরিবার বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। অল্পবয়স্কদের কাছে এই ধরনের দৃষ্টান্ত থাকায় তারা নানারকম দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এ ধরনের সমস্যা ভারতীয় সমাজে তীব্র আকার ধারন করেছে। এর ফলে পরিবারসহ সমগ্র সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাধাবন্ধনহীন পরিবারের সদস্যগণ সামাজিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় একে সামাজিক বিচ্যুতি (social deviance) বলা হয়।

## ১৬.৪.৭ দুর্নীতি

দুর্নীতি কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক যদিও সাধারণভাবে নীতিহীন অপরাধমূলক কাজকে দুর্নীতি বলে আখ্যা দেওয়া যায়। সুতরাং সব নীতিহীন কাজকে দুনীর্তি বলা হয় না। যে সব নীতিবিরুদ্ধ কাজের দ্বারা অন্য ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতিসাধন করে ব্যক্তিগত লাভ অর্জিত হয় তাকে দুর্নীতি বলা যায়।

ভারতীয় সমাজে দুর্নীতি অনেকদিন ধরে বজায় আছে। সমাজের সব স্তরে দুর্নীতি বিস্তৃত যা মূলত আর্থিক। শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ব্যতিরেকে ভারতীয় সমাজজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূরীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, দুর্নীতি সব দেশেই কম বেশী বর্তমান, কিন্তু ভারতবর্ষে

দুর্নীতিকে স্বাভাবিক করে তোলার প্রবণতা বিপজ্জনক। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার দুর্নীতি দেখতে পাওয়া যায়। কালোবাজারী, চোরাকারবার, ভেজাল, স্বজনপোষণ, সরকারী দপ্তরে দুর্নীতি ইত্যাদি নানারকমের দুর্নীতি ভারতীয় সমাজজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং সমাজের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি অপসারণ না করলে সমাজ গভীর সংকটে নিমজ্জিত হবে।

## ১৬.৫ সারাংশ

ভারতীয় সমাজের সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমস্যাগুলি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এগুলির প্রতিকার করতে হ'লে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে এমনভাবে প্রস্তুত করা দরকার যা সমস্যাগুলি দূর করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যথার্থ প্রয়াসের অভাবে সমস্যাগুলি মারাত্মক ব্যাধির আকার ধারণ করেছে এবং পরিস্থিতিত আয়ত্বাধীনে না থাকায় সমাজের সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।

## ১৬.৬ অনুশীলনী

১। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের মতামত আলোচনা করুন।

২। ভারতীয় সমাজে দারিদ্র্য ও বেকারীর সমস্যা সম্পর্কে আপনার মত কি?

৩। ভারতীয় সমাজে অপরাধ ও কিশোরদের দুষ্কর্ম প্রবণতার সমাজতাত্ত্বিক কারণসমূহ আলোচনা করুন।

৪। সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৫। ভারতীয় সমাজে মাদকাসক্তির কুফল বিশ্লেষণ করুন।

৬। ভারতীয় সমাজে দুর্নীতির ব্যাপকতা বিশ্লেষণ করুন।

## ১৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী


১। Orgurn and Nimkoff : A Handbook of Sociology, 1960.

২। Dutta Gupta, Bela : Conteporery Sociall Problems in India, 1964.

৩। Bottomore, T. B. : Sociology, 1975.

৪। Nisbet, R and Merton R. K. : Contemporary Social Problems, 1966.

৫। Aggarwal, J. C. : Human Development in India Since Independence, 1996.